গৃহভঙ্গ

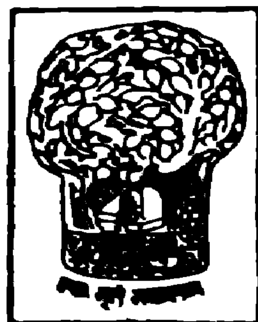
অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

গৃহভঙ্গ

এস. এল. ভৈরপ্পা

অনুবাদ

নন্দিতা মুখোপাধ্যায়



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

1990 (শক 1912)

মূল্য ঃ 30·00 টাকা

Original Title : GRIHABHANGA *(Kannada)*
Bengali Translation : GRIHABHANGA

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি-110016
কর্তৃক প্রকাশিত।

ভূমিকা

বর্তমান শতকের শুরুকে কন্নড় উপন্যাস-সাহিত্যের জন্মকাল বলে ধরা হয়। এই জন্ম-লগ্নটি যাঁদের কৃতিত্বে সুচিহ্নিত তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় গল্লগনাথের নামই বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু এবং বর্তমান যুগের বিপুল বিস্তৃতিকে গল্লগনাথ তাঁর উপন্যাসে রূপ দিয়েছেন। কন্নড় উপন্যাস-সাহিত্যকে তিনি এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য ভাষার উপন্যাস-সাহিত্যের সঙ্গে কন্নড় ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী-দের পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছেন। গল্লগনাথের ঐতিহ্য অনুসরণ করে ক্রমশঃ এই সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হয়েছে তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল, নবোদয়, রম্য, নব্য ইত্যাদি নানা শাখাপ্রশাখায় তা আরো পল্লবিত হয়ে উঠেছে। এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। প্রথম---নব্যদল এবং অন্য সমস্ত গোষ্ঠীগুলিই নিজেদের বিশেষ মতবাদপুষ্ট ধারাগুলিকে অনুসরণ করে চলেছেন তাঁদের রচনায়, আর দ্বিতীয়---এঁরা ছাড়াও রয়েছেন কিছু বিখ্যাত উপন্যাসকার, যাঁরা কোন বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত বলে নিজেদের চিহ্নিত করেননি। সাম্প্রতিককালের কন্নড় সাহিত্যের সমালোচনাগুলিতে প্রধানতঃ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসকারদের রচনাই আলোচিত হচ্ছে। ডঃ ভৈরপ্পার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে এই কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, কারণ কন্নড় ভাষার দুই মহান ঔপন্যাসিক---ডঃ শিবরাম কারন্ত ও ডঃ এস. এল. ভৈরপ্পা এঁরা দুজনেই কখনো কোন গোষ্ঠী বা দলভুক্ত বলে নিজেদের প্রচার করেননি। উপন্যাসকারের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়ে এঁরা জীবনকে দেখেছেন এবং নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে তাকে যথাযথভাবে রূপ দিয়েছেন। বিভিন্ন মতবাদ বা আদর্শের অন্ধ অনুসরণকারী সাহিত্যিকদের সাহিত্যকৃতির মধ্যে ব্যাপ্তি বা উদারতার অভাব ক্রমশই উপলব্ধ হয়েছে, তবু এখনও কিছু সাহিত্যিক আছেন যাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে জীবনের সঙ্কীর্ণ একপেশে ছবিই এঁকে চলেছেন। কন্নড় ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীরঙ্গ কন্নড়সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের রচয়িতা। 'দেবুড়ু'র জীবনের অভিজ্ঞতা সাহিত্যিকসুলভ সৃজনী প্রতিভার গুণে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চতুরঙ্গজীর উপন্যাস 'সর্বমঙ্গলা' ট্র্যাজিক উপন্যাস হিসাবে একটি সার্থক সৃষ্টি। বিভিন্ন পুরুষ বা জেনারেশনের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন বিনায়ক গোকক তাঁর 'সমরসবে জীবন' (সমরসই জীবন) উপন্যাসে। কে. বি. পুট্টপ্প (কুবেম্পু) তাঁর রচিত 'কানুর সুকম্ম হেগডতী' এবং 'মলেগলল্লী মদুমগল্লু' (পাহাড়তলীর বউ) উপন্যাস দুটির মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন গ্রামীণ জীবনের মধ্যে যে উদার বিস্তৃতি আছে সেই উপকরণ দিয়ে মহাকাব্য রচনা সম্ভব। রাওবাহাদুর রচিত 'গ্রামায়ণ'* উপন্যাসে দেখানো হয়েছে গ্রামীণ জীবনের এক বিরাট ট্র্যাজেডি, কোন ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির চেয়ে যার আবেদন অনেক গভীর। একটি বিশেষ অঞ্চল যেন পাঠকের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তালিকা আরো বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু মূল বক্তব্য হল, উপরোক্ত উপন্যাসগুলিতে উক্ত লেখকদের

সহজ স্বাভাবিক জীবনবোধ ও জীবনদৃষ্টির প্রকাশ ঘটেনি, তার পরিবর্তে জীবনের তীব্র আবেগময় অস্বাভাবিক মুহূর্তগুলির প্রতিই তাঁরা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। একথা ভুললে চলবে না যে, ডঃ শঙ্কর মোকাশী 'পুনেকরে'র বহু-আলোচিত উপন্যাস 'গঙ্গব্বা গঙ্গামাঈ'* (লেখকের একমাত্র উপন্যাস) এবং ডাঃ য়ু. আর. অনন্তমূর্তি রচিত 'সংস্কার' উপন্যাসটিও এই তীব্র আবেগপ্রবণতা ও স্বাভাবিকতার অভাব থেকে মুক্ত নয়।

কন্নড় উপন্যাসজগতের এই পটভূমিকায় ডঃ ভৈরপ্পার সাহিত্যকৃতি আলোচনা করতে বসলে মনে হয় কেবলমাত্র ডঃ শিবরাম কারন্ত এবং ভৈরপ্পা এই দুজনই তাঁদের রচনার মধ্যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একত্র সমন্বিত করেছেন এবং নিজেদের ভাবনাচিন্তা ও জীবনবোধকে উপন্যাসের মাধ্যমে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন সমাজের সকল স্তরের পাঠকদের মধ্যে। বর্তমানে কন্নড় ভাষার সাহিত্যকর্মের বিপুলতা সত্ত্বেও ঠিক এই ধরনের প্রবণতা আর কারো রচনায় বড় একটা চোখে পড়ে না।

আমাদের দেশের যুগসন্ধিকালের সমস্ত সমস্যাকে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা রাখে একমাত্র উপন্যাস-সাহিত্য। তাই সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটির দায়িত্ব যথেষ্ট। ডঃ ভৈরপ্পা অত্যন্ত সচেতন এবং সংবেদনশীল মন ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী, তাই তাঁর রচনায় যুগ-পরিবর্তনের সন্ধিলগ্নের অবশ্যম্ভাবী সংঘাত, দ্বন্দ্ব, মনশ্চাঞ্চল্য ও আলোড়ন অত্যন্ত স্বাভাবিক দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে।

ডঃ ভৈরপ্পার প্রথম উপন্যাস 'ধর্মশ্রী'। প্রেমের আকর্ষণে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে উদ্যত এক হিন্দু যুবকের জীবনের দ্বন্দ্বের কাহিনী এটি। তাঁর পরবর্তী বহু উপন্যাসেই মানব মনের যুক্তি ও বুদ্ধির সঙ্গে ভাবনা ও আবেগের এই সংঘাত বর্ণিত হয়েছে। 'ধর্মশ্রী' উপন্যাসে হিন্দু যুবকটির অন্তর্দ্বন্দ্ব চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে লেখক এ ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ধর্ম পরিবর্তনের বিধান থাকা উচিত। এর পরের উপন্যাস 'দূর সরিদরু' (দূরে চলে যায়) মন ও বুদ্ধির অসমতা থেকে উৎপন্ন পরিস্থিতি নিয়ে লেখা---এই উপন্যাসটি প্রধানতঃ দুটি চরিত্রের বিতর্কমূলক আলোচনা, কিন্তু সে আলোচনায় যেন ঠিক প্রাণসঞ্চার করতে পারেননি লেখক।

'বংশবৃক্ষ' ভৈরপ্পার প্রথম বিখ্যাত উপন্যাস। যুগসন্ধিক্ষণের সমস্ত সমস্যাই এ কাহিনীতে চমৎকারভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বিশেষ করে ক্যাত্যায়নীর প্রগতিশীলতার ছবি আঁকায় লেখকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সমস্ত উপন্যাসটির মধ্যে শ্রোত্রি যেমন ধর্ম-ভাবনা ও সাত্ত্বিকতার প্রতীকরূপে উজ্জ্বল হয়ে আছেন, তেমনি বিধবা ক্যাত্যায়নীর পুন-র্বিবাহের মধ্য দিয়ে ভাস্বর হয়ে উঠেছে আধুনিকতার চেতনা। সনাতন ধর্মভাবনা ও আধুনিকতার চেতনা---এই দুটি ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত, কোথাও কোন বিতর্কের সৃষ্টি না করেও লেখক এত শক্তিশালীভাবে দুটি ধারাকে চিত্রিত করেছেন, যা ইতিপূর্বে আর কোন কন্নড় উপন্যাসে দেখা যায়নি। লেখক দুটি ধারাকেই বিশ্বাসযোগ্যভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পেরেছেন এবং পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র ও কাহিনীর মাধ্যমে জীবনের ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়েছেন নিখুঁতভাবে। (এই জনপ্রিয় উপন্যাসটি এবং এর ভিত্তিতে রচিত

রাষ্ট্রপতি-পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রটি ভৈরপ্পাকে সর্বভারতীয়স্তরের খ্যাতিমান লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।)

'জলপাত' উপন্যাসটি দাম্পত্যজীবনের সমস্যা নিয়ে রচিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বাড়াবাড়ি কত সময় দাম্পত্যজীবনকে দুঃখময় করে তোলে তাই দেখান হয়েছে এখানে। শিল্পীর জীবনে সন্তানের আবির্ভাবকে কৃত্রিম উপায়ে রোধ করতে গিয়ে তার শিল্পীসত্তা ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওঠে। বোম্বাইয়ের নগরজীবনের পটভূমিতে শিল্পী এবং উদীয়মান ডাক্তারের সমস্যাকন্টকিত জীবন সমান ঔজ্জ্বল্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে এ গল্পে। বিতর্ক-মূলক বিষয়বস্তু সত্ত্বেও 'জলপাত' রচনা হিসেবে 'দূর সরিদরু' অপেক্ষা সার্থক সৃষ্টি।

'নাথী নেরল্লু' (কুকুরের ছায়া) একটি ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস। পুনর্জন্মের রহস্য নিয়ে রচিত এই কাহিনীটি সমগ্র কন্নড়সাহিত্যে এক নতুন ধরনের সৃষ্টি। এই উপন্যাস সম্বন্ধে ভৈরপ্পা নিজেই মন্তব্য করেছেন, 'দুই পরস্পরবিরোধী ভাবনা ও বিশ্বাসের জগতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেছে গল্পটি।' 'নাথী নেরল্লু' পড়ার পর লেখকের বর্ণিত বিবরণ পাঠককে ভাবায় কিন্তু চরিত্রগুলি মনে তেমন দাগ কাটে না। এই উপন্যাসের 'জৌগয়া' চরিত্রটি 'গৃহভঙ্গ'-এর 'অইয়াজী' চরিত্রকে মনে পড়িয়ে দেয়। এই ধরনের বিষয় নিয়ে ভৈরপ্পা আরো উপন্যাস লিখেছেন। 'তব্বলিয়ু নিনাদে মগনে' (বাছা, তুই অনাথ হলি) উপন্যাসেও এই ধরনের সমস্যাই আলোচিত হয়েছে। গোয়ালাদের জীবন নিয়ে লেখা এই কাহিনীতে আমাদের গ্রামীণ জীবনের অন্ধ সংস্কার ও সঙ্কীর্ণ মনোভাব কিভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে তারই পূর্ণ পরিচয় বিধৃত হয়েছে। গোয়ালা সমাজের একটি ছেলে বিদেশ থেকে ফিরে নিজেদের এলাকার অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে, তাকে সাহায্য করতে চায় তার আমেরিকান স্ত্রী। শেষ পর্যন্ত মনে হয় আমেরিকান মেয়েটির দেশে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনভাবেই সমস্যার সমাধান হবে না। কিন্তু এই সমস্যা ছাড়াও আরো একটি বক্তব্য আছে এ উপন্যাসে, সেটি হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রামের গোচারণভূমিকে অধিক ফসল উৎপাদনকারী কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করার সরকারী প্রচেষ্টা ও তার পরিণাম। একদিকে আধুনিকতার আকর্ষণ অন্যদিকে পুরাতন রীতি ও সংস্কার এই দুইয়ের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত চরিত্রগুলি গ্রামের পটভূমিকায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ভৈরপ্পার সূক্ষ্ম সংবেদনশীল রচনাশক্তির গুণে।

'মতদান' উপন্যাসে ভৈরপ্পা এক নতুন পথে পা দিয়েছেন। এই প্রথম রাজনীতি তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এক জনপ্রিয় ডাক্তারের রাজনীতিতে যোগদান এবং তার ট্র্যাজিক পরিণাম বর্ণিত হয়েছে এ উপন্যাসে। রাজনীতির ক্ষেত্রে যে কত নোংরামী আছে তা বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী কল্পনাও করতে পারেন না—এই কথাই এখানে লেখকের মূল বক্তব্য। ভৈরপ্পার নতুন উপন্যাস 'দাটু'ও এই একই বিষয় নিয়ে লেখা।

মোটামুটিভাবে বলা যায়, এই সময় পর্যন্ত ভৈরপ্পার উপন্যাসগুলিতে জীবনের পবিত্র শুচি-সুন্দর দিকটিই চিত্রিত হয়েছে এবং পারিবারিক বা দাম্পত্যজীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে কাহিনী রচিত হয়েছে। কিন্তু 'গৃহভঙ্গ' উপন্যাসে ধ্বনিত হল এক নতুন সুর। পূর্ববর্তী উপন্যাসকারদের দ্বারা স্বীকৃত অনেক প্রচলিত মূল্যবোধ সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এ

উপন্যাসে। তিপটুর, চন্নপট্টন অঞ্চলের মানুষদের গল্প এটি, সময়সীমা 1920 থেকে 1940–45 সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রথম অধ্যায়ে পাটোয়ারী রামন্নার পারিবারিক জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গম্মা বিধবা, শিক্ষাদীক্ষার নামগন্ধও নেই তার মধ্যে, তার মুখ-নিসৃত অকথ্য শব্দগুলিই গৃহভঙ্গের প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। তার দুই ছেলে চেন্নিগরায় ও অপ্পন্নায়ার স্বভাবে বেশ পার্থক্য আছে। চেন্নিগরায় অলস ও স্বার্থপর, নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য একবিন্দু মমতা নেই তার মনে। স্ত্রীর ওপর জুলুম করলেও মনে মনে সে একান্ত কাপুরুষ। সে এতই কুঁড়ে আর উদাসীন যে, মনে হয় তার স্ত্রী নন্‌জম্মা যদি অপ্পন্নায়ার স্ত্রীর মত কলহপ্রিয়া হত তাহলে হয়ত তার স্বভাব কিছুটা বদলাতে পারত। কিন্তু কন্ঠীজোইসের মত মানুষের মেয়ে হয়েও নন্‌জম্মার সহিষ্ণুতা অসাধারণ। দুই পরিবারের শান্তি ও সুনাম রক্ষায় তার চেষ্টার অন্ত নেই, কিন্তু সারাটা জীবন তা। একটানা দুঃখের কাহিনী। স্বামী মূর্খ ও লোভী, শাশুড়ী তো নৃশংস পশুর মতই নিষ্ঠুর। নন্‌জম্মার সংসার যেন নরক, এই নরককে স্বর্গে পরিণত করতে সে বদ্ধপরিকর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যায়। বিবাহিতা কন্যা, বুদ্ধিমান পুত্র পরপর প্লেগের কবলে পড়ে মারা গেল। অবশেষে সে নিজেও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তি পেল এই দুঃখময় জীবন থেকে।

এই পর্যায়ের অন্য বিখ্যাত উপন্যাস 'বংশবৃক্ষ'-এর 'শ্রোত্রি' চরিত্রের সঙ্গে 'গৃহভঙ্গ'-এর 'কন্ঠীজোইস'-এর তুলনা করা চলে। একদিক থেকে দেখতে গেলে কন্ঠীজোইস দেবদ্বেষী নাস্তিক, কারণ সে ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করে। কিন্তু তবু তার মধ্যে নীচতা নেই। অর্থাৎ দেবদ্বেষী নাস্তিক মানুষও যে ভাল লোক হতে পারে, তাই দেখাতে চেয়েছেন ভৈরপ্পা। ঠিক তেমনিই অইয়াজীও শুদ্ধাচারী সনাতন ধর্মের অন্ধ উপাসক নন, তিনি অন্য জাতের ছেলের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। আবার খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ বংশেও চেন্নিগরায়ের মত মূর্খ অমানুষ জন্মায়। এতদিন পর্যন্ত ভৈরপ্পা আধুনিক ও প্রাচীনপন্থীদের সংঘাতকেই চিত্রিত করতেন কিন্তু 'গৃহভঙ্গ' উপন্যাসে তিনি তর্কবিতর্কের মধ্যে না গিয়ে মানব মনের বৈচিত্র্যকেই উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছেন। তাই এ উপন্যাসের নায়িকা, বিশ্ব'র মা নন্‌জম্মার ধীরোদাত্ত চরিত্র অপূর্ব ঔজ্জ্বল্য নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তার বিবাহ হয়েছে এক মূর্তিমান আলস্যের সঙ্গে। তার তীব্র জীবনসংগ্রাম তাকে এক সার্থক ট্র্যাজিক নায়িকার মহিমায় উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। নন্‌জম্মার দুঃখ পাঠকের মনে একই সঙ্গে জাগায় ভীতি ও করুণা। ভৈরপ্পা গ্রাম জীবনের পটভূমিকায় এমন এক মহিমা-মণ্ডিত চরিত্র এঁকেছেন যা যে কোন মহাকাব্যে স্থান পাবার উপযুক্ত।

উপন্যাসের উপসংহারে দেখা যায় রাক্ষসী প্লেগ যেন এক অমোঘ দুর্দৈবের মত সবাইকে টেনে নিচ্ছে তার বিরাট করাল গ্রাসের মধ্যে। কিন্তু এই সর্বগ্রাসী মৃত্যুর বর্ণনাও কাহিনীর স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে বলে মনে হয় না।

'গৃহভঙ্গ' উপন্যাসে জীবনের একটা দিককে সার্থকভাবে চিত্রিত করার কাজে লেখক সফল হয়েছেন। কন্নড় উপন্যাস-সাহিত্যের সমস্ত উল্লেখযোগ্য গুণগুলিই এই উপন্যাসের মধ্যে কোন না কোনভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কথোপকথনের ভাষায় গ্রাম্যভঙ্গীর প্রয়োগ

চরিত্রগুলিকে বাস্তবসম্মত করেছে। কন্নড় ভাষার এই বিখ্যাত উপন্যাসটি যে এত জনপ্রিয় হয়েছে তার কারণ এখানে 'বংশবৃক্ষ'-এর মত তর্কবিতর্কের মাধ্যমে কোন যুক্তি বা মতবাদকে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেননি লেখক। তার পরিবর্তে 'গৃহভঙ্গ'কে তিনি একটি বিশুদ্ধ সাহিত্যকৃতি হিসাবেই সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

রাওবাহাদুরের 'গ্রামায়ণ'ও* ট্র্যাজিক উপন্যাস, কিন্তু সেখানে একটি সমগ্র আঞ্চলিক জীবনের ট্র্যাজেডি রূপায়িত হয়েছে, আর 'গৃহভঙ্গ' নন্‌জম্মা নামে একটি মেয়ের ব্যক্তিগত জীবনের সংগ্রাম ও ব্যর্থতার কাহিনী। 'গৃহভঙ্গ'-এ ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজেডিকে উজ্জ্বল করেছেন ভৈরপ্পা, আর 'গ্রামায়ণ'-এ সমষ্টিগত জীবনের ট্র্যাজেডিকে তুলে ধরেছেন রাওবাহাদুর।

'গৃহভঙ্গ' উপন্যাসে লেখকের নির্লিপ্তি দেখে অবাক হতে হয়। ঈশ্বর যেমন নিজের সৃষ্টিকে নিরীক্ষণ করেন অসীম নির্লিপ্ততায় ঠিক তেমনি নির্লিপ্ত নিরুচ্ছ্বাস ভঙ্গিতে লেখক বর্ণনা করেছেন জীবনের বিচিত্রতাকে। ভৈরপ্পা নিজেই বলেছেন, 'এ উপন্যাসে কোন বিশেষ সমস্যাকে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়নি, শুধু নিছক বাস্তবকে রূপায়িত করতে চাওয়া হয়েছে।' এ প্রচেষ্টায় তিনি যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

'গৃহভঙ্গ'-এর পর প্রকাশিত 'নিরাকরণ' ও 'গ্রহণ' বেশ দুর্বল রচনা। এক স্বামীজী বিবাহ করতে ইচ্ছুক হলে সারা গ্রামে কিরকম হৈচৈ পড়ে যায় তাই নিয়েই 'গ্রহণ'-এর গল্প। স্বামীজীর উক্ত ইচ্ছার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই, তাই তাঁর বাসনাও পূর্ণ হয়। কিন্তু স্বামীজীর সন্ন্যাসধর্মের প্রতি ধিক্কার ও বিরূপতা তেমন তীব্রভাবে কাহিনীর মধ্যে ফোটেনি। 'নিরাকরণ'-এ মানবজীবনের সংঘাত ও নির্লিপ্তি নিয়ে গল্প রচিত হয়েছে। কিন্তু এখানেও বিতর্কমূলক আলোচনার ফলে উপন্যাসের শিল্পরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে অনেক জায়গায়। এ কাহিনীর নায়ক নরহরি স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্তানদের দত্তক দিয়ে নির্বিকারচিত্তে বেরিয়ে পড়ে শান্তির সন্ধানে—এই হল 'নিরাকরণ'এর কাহিনী। এ উপন্যাস পড়তে পড়তে ডঃ শিবরাম কারন্তের লেখা 'অল্লিদা মেলে'* (মৃত্যুর পরে) বইটির কথা বার বার মনে পড়বে পাঠকের। সংক্ষেপে বলা চলে 'গ্রহণ' ও 'নিরাকরণ' এ দুটি উপন্যাস কন্নড়সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোজন নয়।

ভৈরপ্পার সাম্প্রতিক বৃহৎ উপন্যাস 'দাটু' আবার প্রমাণ করেছে যে, ডঃ কারন্তের পর ভৈরপ্পাকেই কন্নড় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সম্মান দেওয়া যায়। কন্নড়সাহিত্যের সমালোচকবৃন্দও এ উপন্যাসটি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। 1975 সালের সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার পেয়েছে এই উপন্যাস। এতে আমাদের বর্তমান সমাজের জাতিভেদ-বর্ণভেদ ইত্যাদি সমস্যাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করতে চেয়েছেন ভৈরপ্পা। বিপ্লব নিয়ে উপন্যাস লেখা যায়, আবার বৈপ্লবিক উপন্যাসও লেখা যায়। 'দাটু'কে সম্ভবত এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উপন্যাসের দলে ফেলতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বৈপ্লবিক মতামত বা যুক্তিতর্ক কাহিনীর সাহিত্যগুণকে খর্ব করেনি, এইটিই বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। অন্য জাতের ছেলেকে বিবাহ করতে চাওয়ায় এ কাহিনীর নায়িকা তার স্বজাতীয়দের দ্বারা পরিচালিত কলেজের চাকরী থেকে বিতাড়িত হয়। মন্ত্রী মেলেগিরিগৌড় হরিজনদের

মন্দিরে প্রবেশের অধিকার দিতে উৎসাহী আর তাঁরই পিতা বড়গৌড়জী হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশের পর গোময় ও গোমূত্র সহযোগে মন্দিরকে শুদ্ধ করতে মেতে ওঠেন। নিজেকে ব্রাহ্মণদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার বাসনায় ব্রাহ্মণদের চেয়েও বেশী আচার-বিচার মেনে চলেন তিনি। ওদিকে হরিজন নেতা বেট্টয়া হরিজন পাড়ায় গান্ধীজীর বাণী প্রচার করে কিন্তু বেঙ্কটরমন্যাকে সে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলার কথাও বলে। এই সব বিরোধাভাস সমগ্র কাহিনীকে বাস্তবমুখী করেছে।

মননশীল উপন্যাসেই পাত্র-পাত্রীর মনের চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটে, তাই 'দাটু' প্রশ্নই করে কেবল, সহমত হয় না কারো সঙ্গে। এই যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সমস্যাকে দেখা এবং তার ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা এটিকে কন্নড় উপন্যাসের ক্ষেত্রে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সমকালীন সমস্যার যথাযথ মূল্যায়ন করা বেশ কঠিন কাজ, উপন্যাসকারকে এক্ষেত্রে অনেক শক্ত শক্ত প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে জীবন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও তীক্ষ্ণ পর্য-বেক্ষণ শক্তির অধিকারী হতে হবে। লেখকের এই দুটি বস্তুই আছে এবং সেই কারণেই 'দাটু' উপন্যাসটি কন্নড়সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

'গৃহভঙ্গ'-এর পরবর্তী খণ্ড 'অন্বেষণে' নামে প্রকাশিত হতে চলেছে। এছাড়া গত পাঁচ বছর ধরে ভৈরপ্পা বর্তমান জীবনে মহাভারতের প্রভাব এবং তারই ভিত্তিতে নিজের জীবনদর্শনকে একটি বৃহৎ উপন্যাসের মাধ্যমে রূপ দেবার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছেন।

মাধব কুলকর্ণী

---

* ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া কর্তৃক এই উপন্যাসের নানা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

গৃহভঙ্গ

মহীশূর রাজ্যের তুমকূর জেলার একটি তহসিলের নাম তিপটুর, আর এরই অন্তর্গত এলাকা কম্বনকেরে। এই এলাকার রামসন্দ্র গ্রামের পাটোয়ারী ছিলেন রামন্নাজী। তিনি আজ আর ইহসংসারে নেই—রেখে গেছেন স্ত্রী গঙ্গম্মা আর দুই পুত্র চেন্নিগরায় ও অপ্পন্নায়াকে। রামন্নাজীর মৃত্যুর পর ছ' বছর কেটে গেছে, অর্থাৎ যে বছর বিশ্বেশ্বরায়া দেওয়ান বাহাদুর হলেন সেই বছরই রামন্নাজী স্বর্গে যান। তখন স্ত্রী গঙ্গম্মার বয়স মোটে পঁচিশ, বড় ছেলে চেন্নিগরায়ের বয়স তখন নয়, আর ছোটটি সাত বছরের। পাটোয়ারীর কাজটা রামন্নাজীদের বংশেরই বাঁধা কাজ, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে গ্রামের প্যাটেল শিবেগৌড়ের শালা শিবলিঙ্গে গৌড় এ কাজটা দেখাশোনা করছে কারণ আরো তিন বছর পরে চেন্নিগরায় যখন আঠার বছরে সাবালক হবে তখনই সে এই কাজের ভার নিতে পারবে। পাটোয়ারীর কাজ তো আর ছেলেখেলা নয়, তারজন্য প্রচুর শিক্ষার দরকার। অন্ততঃ 'জৈমিনী ভারত' খানা তো প'ড়ে বুঝতেই হবে, তা নাহলে খাতাপত্র, রায়শুমারী ইত্যাদির কাজকর্ম কিছুই বোধগম্য হবে না। তাই চেন্নিগরায় এখন গ্রামের পাঠশালার মাস্টার চাতালি (বৈষ্ণব) চেন্নাকেশবয়ার কাছে লেখাপড়া শিখছে।

অপ্পন্নায়ার বয়সও তেরো পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু সে এখনও পাঠশালার চৌকাঠ মাড়ায়নি। কাগজের ওপর 'শ্রীওম্'টুকুও লিখতে পারে না। তার উপনয়নও হয়নি এখনও। তার মা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, 'কিরে অপ্পন্না, পাঠশালা যেতে হবে না?'

'যদি না যাই তো তোর কি? গরু ছেনাল কোথাকার!'

মা বলে ওঠে, 'আমাকে ছেনাল বলছিস? তুই নির্বংশ হবি রে, হারামী!'

'তুই নির্বংশ হোস কিনা, তাই দেখ,' কথা শেষ না হতেই বাইরে থেকে এসে হাজির হল মুদ্দা। 'দেখ্ মুদ্দা, আমাকে গরু বলছে, ছেনাল বলছে! এই রাঁড়ের ব্যাটাকে ঘাড় ধরে চেন্নাকেশবয়ার কাছে বসিয়ে দিয়ে আয় তো,' হুকুম দিয়ে দিল গঙ্গম্মা। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই চম্পট দিল অপ্পন্নায়া। কিন্তু মুদ্দাও লম্বাচওড়া জোয়ান, কয়েক পা যেতে না যেতেই তেড়ে গিয়ে চেপে ধরল তার টিকির গোছা। মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিল সে, কিন্তু ছাড়া পাওয়া গেল না। গঙ্গম্মার সামনে এনে হাজির করল তাকে। গঙ্গম্মা হুকুম দিল, 'রাঁড়ের ব্যাটাকে দুই লাথি মেরে নিয়ে যা!'—কিন্তু বামুনের ছেলেকে মুদ্দা এখন লাথি মারে কি করে? এমন কাজ করলে তার পায়ে যে পোকা পড়বে সেটা কি আর সে জানে না? কাজে কাজেই মুদ্দা ওকে হাত ধরেই টানতে টানতে নিয়ে গেল।

ছোট ছেলেকে বিদায় করে এবার গঙ্গম্মার নজর পড়ল বড় ছেলের ওপর। সেও বাড়িতেই ছিল। 'হ্যাঁরে চেন্নিগা, হোন্নবল্লির সীতারামের কাছে খাতা লিখতে যাবার জন্য তোর কাছে আর কতবার মাথা খুঁড়তে হবে শুনি? কাল সকালে যাবি, না কি তোকেও দু ঘা দিতে হবে?'

'এই যে, এবার আমার পেছনে লাগলেন! রুদ্রন্না নাপিতকে ডেকে তোর মাথা মুড়িয়ে দেব বুঝলি?' থামের ওপাশ থেকে গর্জে উঠল বড় ছেলে।

'ওরে, যেদিন তোদের বাপ মরেছে সেই দিনই তো আমার মাথা মুড়োন হয়ে গেছে। নিজের মাকে এমন কথা বলিস, জিভে যে তোর পোকা পড়বে রে ছেনালের ব্যাটা!'

রামসন্দ্র থেকে হোন্নবল্লির দূরত্ব প্রায় আঠার মাইল। দুটি গ্রাম একই তহসিলের অন্তর্গত হলেও ভিন্ন ভিন্ন এলাকায়। রামসন্দ্র পড়ে কম্বনকেরে এলাকার মধ্যে। আর হোন্নবল্লি নিজের এলাকার একটি প্রধান কেন্দ্র, এককালে তো এটা একটা তহসিলই ছিল, তবে আজকাল তিপটুর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠায় এর গুরুত্ব অনেকটা কমে গেছে। চিক্‌মগলুর ও কডুরের উন্নতি হওয়ার পর থেকে তহসিল কার্যালয় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তিপটুরে। হোন্নবল্লি যখন তহসিল ছিল তখন থেকেই দক্ষ পাটোয়ারী হিসাবে সীতারামাইয়ার খুবই নামডাক। অঙ্কশাস্ত্রে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। তাছাড়া সরকারী আমলাদের পর্যন্ত বিপর্যস্ত করে দেবার মত ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। যারা তাঁর কাছে বসে খাতা লিখতে শিখেছে তারা সকলেই পাটোয়ারীর কাজ খুব ভালভাবে চালাতে পারে। অরসীকেরে, গণ্ডসী, জাবগল্‌লু ইত্যাদি সব জায়গার প্যাটেল আর পাটোয়ারীরা একথা একবাক্যে স্বীকার করে থাকে। কিন্তু সীতারামাইয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলা সহজ কাজ নয়। খাতার মাথার শীর্ষক থেকে শুরু করে লাল কালির লাইন টানা পর্যন্ত সব কাজ শিখতে শিখতেই অন্ততঃ দু'একশ ঘা রুলের বাড়ি খেতেই হবে। পাঠশালার পণ্ডিতমশাইদের মত তিনিও বলেন, 'হাতুড়ির হাজারটা ঘা না পড়লে কি আর কাঠের টুকরো থেকে মূর্তি তৈরী হয়?'

দুই ছেলের ব্যবহার দেখে গঙ্গম্মার বড় রাগ হয়েছে, দুচোখে জল ভরে এসেছে। 'অন্যের বাড়ির ছেলেপেলেরা মাকে কত ভয় করে। কিন্তু এই রাঁড়ের ব্যাটাদের কি যে রোগে ধরেছে! আমার কপালই এমনি…' বলতে বলতে সে কেঁদেই ফেলে। কিছুক্ষণ পরে উঠে সোজা চলে যায় রান্নাঘরে, চিমটেটা তুলে নিয়ে রেখে দেয় উনুনের ভিতরে। বেলা তিনটে বেজে গেছে, উনুনে আগুন নেই, নারকেলের ছোবড়া ইত্যাদি দিয়ে জ্বালানো আগুন প্রায় ছাই হয়ে এসেছে। এদিকে ছেলের বয়স পনের বছর, তারওপর 'জৈমিনী ভারত'খানাও পড়ে ফেলেছে, সুতরাং মা কেন চিমটে গরম করছে তা বুঝতে তার বিলম্ব হল না। এক নিঃশ্বাসে ছেনাল, রাঁড়, কুলটা ইত্যাদি গালাগালি দিতে দিতে সে বাড়ি ছেড়ে পালাল। গঙ্গম্মা বুঝল এখন আর ওকে ধরা যাবে না। কিন্তু সেও হার মানবার পাত্রী নয়। বসে বসে ভাবতে লাগল কি করে এই হারামজাদা দুটোকে শায়েস্তা করা যায়। ওদিকে নিভন্ত আঁচে চিমটে ক্রমেই তেতে উঠছিল।

গঙ্গম্মা তের বছর বয়সে এ সংসারে এসেছে। তখন তাঁর স্বামীর বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ। তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভেও দুটি সন্তান জন্মেছিল, কিন্তু দুটিই মারা যায়। তারপর তাদের মায়েরও মৃত্যু হল। সেই প্রথমা পত্নী ছিলেন গঙ্গম্মাদেরই গ্রাম জাবগল্‌লুর মেয়ে। সেই জন্যই গঙ্গম্মারও বিয়ে হয়ে গেল রামন্নাজীর সঙ্গে। তিনি তখন রামসন্দ্রসমেত তিনখানা গ্রামের

পাটোয়ারী। তাঁর ছ' একর ফসলের ক্ষেত, আট একর ফলের বাগান, তিনশ নারকেল গাছ, ঘরে প্রচুর সোনাদানা, বাসন তৈজসপত্র, এমন মানুষকে কে না মেয়ে দিতে চায়? সারা গ্রামের লোক বলাবলি করত রামন্নাজী অতি ভালমানুষ, একেবারে গরু-বাছুরের মত নিরীহ, কিন্তু গঙ্গম্মা নাকি একেবারে সাক্ষাৎ বাঘিনী। এসব কথা গঙ্গম্মার কানে গেলে সে গর্জে উঠত, 'এইসব লোকের মুখে বাঁ পায়ের ছেঁড়া জুতো গুঁজে দিতে হয়।' ছেলে দুটোর যদি একটু বুদ্ধিশুদ্ধি থাকত আর বাধ্যবশ হত তাহলে গঙ্গম্মা কারো তোয়াক্কা করত না। ঐসব লোকের মুখে সে তাহলে ঠিক জুতো গুঁজে দিয়ে তবে ছাড়ত। কিন্তু এই নচ্ছার দুটো একেবারে বেয়াড়া হয়ে গেছে। 'এদের শিক্ষা দিতেই হবে। না দিই তো আমি জাবগল্লুর মেয়েই নই। চিমটে উনুনেই থাক, আরো গরম হোক। সন্ধ্যেবেলা পিণ্ডি গিলতে তো আসতেই হবে, তখন বাছুরকে যেমন করে ছ্যাঁকা দেয় তেমনি করে দুটোর পায়ে দাগা দিয়ে দেব। ছ্যাঁকা না খেলে কি আর বাছুর কথা শোনে? কথার বাধ্য করার জন্যই তো ছ্যাঁকা দিতে হয়'—নিজের মনেই বিড় বিড় করতে করতে গঙ্গম্মা তার লাল শাড়ীর আঁচল দিয়ে ধরে চিমটেটা তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল, তারপর আবার রেখে দিল সেই নিভন্ত আঁচের মধ্যে।

এই সময় হঠাৎ মনে হল খাপরার চালের ওপর কে যেন চুপি চুপি হাঁটাচলা করছে। এই দিনদুপুরে আবার কোন শুয়োর জ্বালাতে এল? বাঁদর নিশ্চয়! রাঁড়ের ব্যাটারা বাগানের নারকেল ভেঙে খাওয়া ছেড়ে এখন গাঁয়ের মধ্যে এসে ঢুকতে শুরু করেছে! গঙ্গম্মা এইসব ভাবছিল, ইতিমধ্যে মনে হল আওয়াজটা ঠিক ওর মাথার ওপর এসে পেঁৗছেছে। সে এবার গলা ছেড়ে হাঁক দিল, 'তোদের গুষ্ঠিসুদ্ধ নিপাত যাক!' কিন্তু বলতে বলতেই খেয়াল হল, 'হায়, হায়, এঁদের আবার সাক্ষাৎ অঞ্জনেয়র বংশধর বলা হয়, গাল দিলে অভিশাপ দিতেও পারেন' সুতরাং জিভে লাগাম কষে এবার সে চেয়ে দেখতে লাগল ওপর দিকে। ওর মনে হল কারা যেন দুটো ডাণ্ডা দিয়ে খাপরাগুলোর ওপর একসঙ্গে বেদম পিটিয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে পনের-বিশখানা খাপরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ঘরের মধ্যে, ওর মুখের ওপর এসে পড়ল। 'তোদের গুষ্ঠির সর্বনাশ হোক' বলে গালিগালাজ করতে করতে কান্না জুড়ে দিল সে। এই সময় ওপর থেকে চেন্নিগরায়ের গলা শোনা গেল, 'ওরে অপ্পন্না, ওটা এইখানেই আছে, আরো দু-চার ঘা লাগা।' এরপর দুই ভাইয়ে মিলে হাতের ডাণ্ডাগুলোর সাহায্যে মায়ের ঠিক মাথার ওপরের খাপরাগুলোর ওপর নিজেদের বাহুবলের পরিচয় দিতে শুরু করল। 'রাঁড়ের ব্যাটারা, প্যাটেল শিবেগৌড়কে বলে, তোদের দুটোকে আমি ফাঁসিতে লটকাব', বলতে বলতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল গঙ্গম্মা।

'ও চন্নৈয়া, ঐ শোন্, বলছে শিবেগৌড়কে ডাকবে', বড় ভাইকে এবার সাবধান করে দেয় অপ্পন্নায়া! ডাণ্ডা দুটো সেইখানেই ফেলে রেখে খাপরার চাল থেকে দৌড়ে নেমে পেছন দিকের নালা পার হয়ে উধাও হয়ে যায় তারা।

২

শোনা যায় একসময়ে নাকি এই রামসন্দ্র গ্রামে পাঁচশ পরিবার বাস করত কিন্তু বর্তমানে, পাটো-য়ারীর রায়শুমারী অনুসারে, এখানে মাত্র একশ সাতচল্লিশটি পরিবারের বাস। গ্রামটি দুদিক

থেকে জলাশয় দিয়ে ঘেরা। এখানে যে ভাঙাচোরা কেল্লার ধ্বংসস্তূপ আছে তারই প্রাচীরের গায়ে প্রতি বর্ষায় জলাশয়ের জল এসে আছড়ে পড়তে থাকে। দক্ষিণ দিকে জলাশয়ের উঁচু পাড়ের ওপর চোলেশ্বর শিবের মন্দির, সেখানে মূল লিঙ্গ স্থাপিত আছে। গ্রামের মধ্যে মন্দিরের সামনের পথের শেষ প্রান্তে আছে ব্রহ্মদেব মণ্ডপ, তারই কাছে হনুমান-মন্দির। গ্রামের বাইরে তরুশ্রেণীর কাছে গ্রামদেবী মা কালীর মন্দির রয়েছে। গ্রামে বেনে, তাঁতী, তেলী, রাখাল সব জাতেরই এক একটা আলাদা গলি আছে। তবে এক জাতের লোক অন্য জাতের গলিতে যে একেবারে থাকে না তা নয়। তবে হ্যাঁ, মাংসাহারীদের পাড়ায় ব্রাহ্মণ, লিঙ্গায়ৎ, বৈষ্ণব এরা থাকে না বললেই চলে।

স্বর্গত পাটোয়ারী রামন্নাজীর বাড়ির দুটো গলির পরে প্যাটেল শিবেগৌড়ের বাড়ি। দুই বাড়ির মধ্যের জায়গাটায় আরো অন্ততঃ বিশ-বাইশখানা বাড়ি আছে। শিবেগৌড় বাড়িতেই ছিল। গঙ্গম্মা সোজা ভিতরে এসে ডাক দিল, 'শিবেগৌড় শীগ্‌গির উঠে এসে দেখ, আমার চেন্নিগ আর অপ্পন্না ছাদের খাপরাগুলোকে ডাণ্ডার বাড়ি মেরে মেরে ভাঙছে! এই দেখ না মাথায় খাপরা পড়ে আমার রক্ত বেরিয়ে গেছে!'

'কেন, কেন?'

'আমি শুধু বলেছিলাম পাঠশালায় যেতে। ব্যস, সে কথা তো শুনলই না, উল্‌টে খাপরা ভাঙতে শুরু করে দিল।' শিবেগৌড়ের স্ত্রী গৌরম্মা স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওরা একেবারে বিগড়ে গেছে। ধরে নিয়ে এস দুটোকে।' শিবেগৌড় একে মোটা মানুষ তার ওপর বিরাট ভুঁড়ি! সে হাঁটে যেন মদমত্ত হস্তী। পায়ে চটিটা গলিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। গিয়ে দেখে দুই ভাই ততক্ষণে ফেরার হয়ে গেছে। তবে ইতিমধ্যে মন্দির থেকে মহাদেবায়াজী ও আরো দশ-পনেরজন লোক সেখানে এসে জমা হয়েছে। রান্নাঘরের পেছন দিকের সমস্ত খাপরা ভেঙে শেষ হয়ে গেছে। গৌড় উপস্থিত লোকেদের অপরাধীদের ধরে আনবার জন্য দুই-চারজনকে হুকুম দিল।

রান্নাঘরের ছাদের অবস্থা দেখে গঙ্গম্মার চোখে জল এসে গেল। বলে উঠল, 'শিবেগৌড়, সেই রাঁড়ের ব্যাটাদের তুমি ঘাড় ধরে এখানে টেনে আন, ওদের ঠ্যাং ভেঙে ফেলে রাখা উচিত!'

ছেলেদের কিন্তু খুঁজে পাওয়া গেল না। রাত হয়ে গেল, তখনও তাদের পাত্তা নেই। গঙ্গম্মা সমানে গজ গজ করে চলেছে, 'সমূলে বিনাশ হবে এদের, কোথায় ভেগেছে কে জানে···।' বাড়িতে সে একেবারে একা। পেছন দিকের খাপরাগুলো সব ভেঙে গেছে কিন্তু একা থাকতে তার কিছু-মাত্র ভয় করে না। সে বলে, 'আমি যেখানে থাকি সেখানে ভূতেও আসতে সাহস করে না। কিন্তু এ হারামজাদা দুটো গেল কোথায়? প্রাণের মায়া এতটুকু নেই? কোথায় লুকিয়ে বসে আছে, কি খাবে তার ঠিক নেই। হয়ত বাগানে নারকেল ভেঙে খাচ্ছে। আর খেতের দিকে যদি গিয়ে থাকে তো নির্ঘাত আখ ভেঙে খাচ্ছে। কিন্তু এতক্ষণেও কি বাড়ি ফেরার হুঁশ হতে নেই? কাল সকালে পেটের জ্বালায় আসতেই হবে, তখন দেখে নেব আমি!'

এ বাড়ির ঠিক সামনেই চোলেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের প্রবেশদ্বার উত্তরমুখী আর এবাড়ির দরজা পূর্বমুখী, অর্থাৎ মন্দিরের বাঁ-দিকটা এদের বাড়ির সামনে থেকে দেখা যায়। মন্দির আর বাড়ির মাঝখানের জায়গাটায় একটা ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে সেখানেও কোন মন্দির ছিল, এখনও

তার চিহ্ন দেখা যায়। মন্দিরে মহাদেবায়াজী একা থাকেন, ডান হাতে একতারা আর বাম হাতে চুটকী বাজিয়ে ভজন গান করেন তিনি। এই তাঁর নিত্যকার কাজ। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ভজন গেয়েই চলেন, আবার ভোরে মোরগ ডাকার আগেই ভজন শুরু করে দেন। এঁর দেশ কোথায়, কোন গ্রামে বাড়ি সেসব কথা কেউ জানে না। লোকে বলে, প্রায় কুড়ি-একুশ বছর পূর্বে ইনি এ গ্রামে এসেছেন, অর্থাৎ গঙ্গম্মার বিয়ের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ইনি এ গ্রামে বাস করছেন। এখন তো চোলেশ্বরের মন্দিরই ওঁর আস্তানা। ভজন গেয়ে আর ভিক্ষা করে পেট চালান। দীর্ঘ শরীর, গোল ধরনের মুখ, ললাটে তিনটি বিভূতির রেখা আঁকেন তাছাড়া দুই ভুরুর মাঝখানে এবং কানের পাশেও থাকে বিভূতির টিকা। মস্তক মুণ্ডিত, পরিধানে গেরুয়া রঙের ধুতি আর জামা।

গঙ্গম্মা শুয়েছিল বটে কিন্তু ঘুম আসছিল না, কারণ ছেলেরা তখনও ফেরেনি। মহাদেবায়া-জীর ভজন প্রায় শেষ হবার সময় হয়ে এসেছে, এখন মঙ্গলারতির চরণগুলো গাওয়া হচ্ছে। গঙ্গম্মা উঠে পড়ল, তারপর বাড়ির দরজা বন্ধ করে চলে এল মন্দিরে। মন্দিরের সিংহদ্বার মণ্ডপাকৃতি, কিন্তু তাতে কোন দরজা নেই। মহাদেবায়াজী সেইখানেই বসে গান করেন। সন্ধ্যাবেলা গ্রামের আরো অনেকে ভজন শুনতে আসে, তারাও 'চুটকী' বাজিয়ে সবাই মিলে ভজন গায়।

এখন মধ্যরাত্রি। মন্দিরে মহাদেবায়াজী ছাড়া আর কেউ নেই। গঙ্গম্মা এসে তাঁর সামনে থামের পাশে বসে পড়ল। ভজন সমাপ্ত করে একতারা রেখে দেবার পর, গঙ্গম্মা প্রশ্ন করল, 'মহাদেবায়াজী, এই রাঁড়ের ব্যাটাদের আর কতদিনে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে বলুন তো ?'

'বুদ্ধিশুদ্ধি ধীরে ধীরেই হয় গঙ্গম্মা। কিন্তু তার আগে তোমাকে ভদ্র ভাষায় কথা বলতে শিখতে হবে।'

'আমি খারাপ কি বললাম ?'

' "রাঁড়ের ব্যাটা" বলছ কেন, বল, আমার ছেলেরা।'

ভদ্রভাবে কথা বলার জন্য এর আগেও মহাদেবায়াজী গঙ্গম্মাকে কয়েকবারই বুঝিয়েছেন। কিন্তু এ দোষ শুধরানো যাবে না জেনেও, এখনও তিনি সুযোগ পেলেই একথা গঙ্গম্মাকে মনে করিয়ে দেন। গঙ্গম্মা আবার ছেলেদের বাড়ি না ফেরার কথা তুলল।

'গঙ্গম্মা, নিজের ছেলেদের শাস্তি দেবার জন্য তুমি প্যাটেলকে ডাকতে গেলে কেন ?'

'কেন ? আমি ওদের ধরতে পারতাম নাকি ?'

'দোষ তোমারই গঙ্গম্মা,' মহাদেবায়াজী বোঝাতে থাকেন, 'বাড়ির গৃহিণী—স্বয়ং মা ছাড়া আর কেউ কি ছেলেপিলেকে সংশোধন করতে পারে ?'

পুরোন উপদেশ। আবার শুনে একটু থতমত খেয়ে যায় গঙ্গম্মা।

'তুমি অপ্পন্নায়াকে পাঠশালায় পাঠালে। সেখানে সে মাস্টারমশাইকে "রাঁড়ের বেটা" বলে গালাগাল দিয়ে পালিয়ে এল। কিন্তু এসব গালাগালি সে শিখল কোথা থেকে ?'

'আমার কপালই ওদের দিয়ে এমন কথা বলায়। ঐ গালাগাল শোনবার পর মাস্টার ঐ রাঁড়ের ব্যাটাদের কি আর এমনি ছেড়ে দেবে ?'

'সেখান থেকে ফিরেই তো দুই ভাই খাপরা ভেঙেছে, তাই না ?'

'যাক। হারামজাদাদের ঘরদোর ধুলোয় মিশে যাক! নতুন খাপরা কেনার পয়সা এখন আমি কোথা থেকে যোগাড় করব ?'

'গঙ্গম্মা, আবার ওসব কথা বলছ? তুমি ···' মহাদেবায়াজী আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু এই সময় বাইরে থেকে দশ-বারজন লোক ছুটে আসছে বলে মনে হল। তারা চিৎকার করছে, 'আখের খেতে আগুন লেগেছে, ছুটে এস, সবাই ছুটে এস।' দুজনে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন জলাশয়ের পেছন দিককার সমতলভূমিতে খেতের মধ্যে আগুনের শিখা লক্‌লক্ করে জ্বলছে, সেই আলোয় ধোঁয়াও দেখা যাচ্ছে।

'হায়, হায়, ওখানে তো আমারও আখ রয়েছে। কোন রাঁড়ের ব্যাটা আগুন লাগাল কে জানে' বলতে বলতে গঙ্গম্মা বাড়ির দিকে ছুটল। বাড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে সেও অন্য লোকেদের সঙ্গে জলাশয়ের পাড়ের দিকে দৌড়তে আরম্ভ করল।

গ্রামের সামনের দিকটা দুধার থেকেই জলাশয় দিয়ে ঘেরা, কাজেই জলাশয়ের ওপারের কিনারায় পৌঁছতে হলে অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হয়। গ্রামসুদ্ধ মানুষ তখন জলাশয়ের পাড়ের দিকে ছুটেছে, পাড়ের ওপরও অনেক লোক এদিকে ওদিকে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এই সমতল জমিটার প্রায় অর্ধেক আখের চাষ করা হয়েছে। পশ্চিমদিকে বাঁধের মুখের কাছে দুটো আখ-মাড়াইয়ের কল বসেছে। আগুন লেগেছিল পূর্বদিকে, এখন ক্রমশঃ সেটা পশ্চিম আর উত্তরদিকে এগিয়ে আসছে। খেতের আখ এখন একেবারে তৈরী। আখের ডাঁটার নিচের দিকের পাতাগুলো শুকিয়ে গেছে, ফলে সেগুলো এই আগুনে খুব ভালভাবেই ইন্ধন জোগাচ্ছে। বাতাস না থাকলে আগুনের দাপট হয়ত কিছুটা কমে আসত, কিন্তু এখন তো কখনও পশ্চিমে, কখনও দক্ষিণে এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আখ-মাড়াই কলের লোকেরা বলদগুলোকে খুলে বাঁধের দিকে সরিয়ে দিল। মজুররা সরাতে লাগল গুড়ের বস্তা-গুলো। গুড় বানাবার চাকিগুলো জোড়া জোড়া করে বেঁধে বাঁধের ওপর তোলা হল। মনে হচ্ছিল আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই গগনস্পর্শী অগ্নিশিখা চারপাশের বাঁশ, নারকেল পাতার রাশি এবং লোহার বড় বড় কড়াইগুলো ভস্ম করে ফেলবে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়া আগুনের উত্তাপ থেকে কোনমতে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে, 'হায় হায়' করছে খেতের মালিকরা। আগুনটা লাগল কি করে, কে লাগাল? এইসব নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছে লোকেদের মধ্যে।

আখ-মাড়াই কলের পাশেই গঙ্গম্মার এক একরের ফলের বাগান, এতে আছে প্রায় চল্লিশটা নারকেল গাছ। তার অন্য ফলের বাগানটা আরেক জায়গায়। এই বাগানটাকে আগুন চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। বাগানের পাশেই গুড় জ্বাল দেবার কড়াইগুলো পুড়ে গিয়ে অগ্নিশিখা আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে আকাশের দিকে। হঠাৎ শোনা গেল বাগানের মধ্যে থেকে কে যেন চিৎকার করছে---'ওরে বাপরে! বাঁচাও। ভগবান! বাঁচাও, আমি পুড়ে ম'লাম গো। বাঁচাও, বাঁচাও।' জ্বলন্ত আগুনের আওয়াজের মধ্যেও সেই স্বর স্পষ্ট শোনা গেল। সবাই ভীষণ রকম ঘাবড়ে গিয়ে ভয়চকিত দৃষ্টিতে, যে দিক থেকে শব্দটা আসছিল সেই দিকে চেয়ে রইল। এমন সময় চিৎকার করে উঠল গঙ্গম্মা, 'ওরে, এ যে আমার চেন্নির গলা। হারামজাদা এতক্ষণ বাগানের মধ্যে কি করছিল? ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, কেউ গিয়ে ওকে বাঁচাও।' কিন্তু ঐ আকাশ-ছোঁয়া আগুনের মধ্যে ঢুকবে কে? বাগানের বেড়ায় তখন আগুন ধরে গেছে। একটুক্ষণের মধ্যেই নারকেলের শুকনো পাতার রাশি জ্বলে উঠবে। এই সময় চেন্নিকে বাঁচাতে যাবার মত সাহস কেউই সংগ্রহ করতে পারছে না। কিন্তু মন্দিরের মহাদেবায়াজী নেমে এলেন বাঁধের ওপর

থেকে। তারপর, 'বাগানের ভেতরে আগুন লাগবে না, চলে এসো' বলে ডাক দিয়েই নিজে সেই জ্বলন্ত খেতের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত জলের নালাটা পার হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

'তোরা কেউ বাপের ব্যাটা ন'স, আমি মেয়েমানুষ, তবু আমিই যাচ্ছি', বলতে বলতে গঙ্গম্মাও নেমে পড়ে বাঁধের ওপর থেকে। এবার কোলী মুদ্দা, অছুত বেলুরা, ভজন-শ্রবণ-প্রিয় তোটিমর এবং আরো সাত-আটজন বাঁধ থেকে নেমে তার পেছন পেছন ছুটতে থাকে।

বাগানের মধ্যে একটা নারকেল গাছের মাথায় বসে চেন্নিগরায় প্রাণভয়ে চিৎকার করে চলেছে। মহাদেবায়াজী তাকে ডাক দিয়ে বললেন, 'চেন্নৈয়া, বাগানের মধ্যে এখনও আগুন লাগেনি চটপট নেমে এস।' কিন্তু সে নামতে ভয় পাচ্ছে, বলল, 'আমার ভয় করছে যে', বলতে বলতে কাঁদতেও শুরু করে দিল। ইতিমধ্যে মুদ্দা, বেলুরা, তোটিমর-রা সবাই এসে পৌঁছেছে, হাঁফাতে হাঁফাতে গঙ্গম্মাও হাজির। 'নেমে আয় বাবা, অপ্পনা কোথায় গেল?' বলতে বলতে কেঁদে ফেলে গঙ্গম্মা। এতক্ষণে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে চেন্নিগ বাঁদরের মত অবলীলাক্রমে নেমে এল গাছ থেকে। শুকনো নারকেল পাতার রাশিতে এবার আগুন লাগবে মনে হচ্ছে, তাই সবাই চটপট তাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাগান থেকে। যে নালাটার ধার দিয়ে ওরা ফিরছিল তার দুপাশে আখ পুড়ে গিয়ে এখন আগুন ক্রমশ: নিভে আসছে কিন্তু গুড়ের কড়াইগুলোর কাছে আগুন এখন লেলিহান শিখায় জ্বলছে এবং সেখানে স্তূপীকৃত আখের ছিবড়েগুলো সেই আগুনে ইন্ধন জোগাচ্ছে।

সবাই জলাশয়ের তীরে এসে পৌঁছল। মহাদেবায়াজী প্রশ্ন করলেন চেন্নিগরায়কে, 'এত রাত পর্যন্ত নারকেল গাছে বসে ছিলে কেন?'

'মা যে শিবেগৌড়কে ডাকতে গিয়েছিল!' ততক্ষণে সবাই সেখানে এসে পৌঁছে গেছে। প্যাটেল শিবেগৌড়ও এসেছে।

মহাদেবায়াজী আবার জেরা করেন, 'তোমরা দুই ভাইয়ে মিলে খাপরা ভেঙেছে কেন?'

'খাপরা চুলোয় যাক। অপ্পন্না গেল কোথায় রে?' এবার কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে গঙ্গম্মা।

'সে পালিয়েছে লিঙ্গাপুরের দিকে। আখের খেতে আগুন তো ওই-ই লাগিয়েছে।'

'ও কেন লাগাতে যাবে?'

'আমি বললাম, চল্ দুজনে নারকেল গাছে চড়ে লুকিয়ে থাকি, কিন্তু ওতো খাড়া লম্বা গাছে চড়তে পারে না, তাই ও বলল খেতের মধ্যেই থাকবে। কিন্তু গুড়ের উনুনের কাছের ঐ লোকগুলো পাছে দেখে ফেলে, সেই ভয়ে ও নালার দিকে পালাল। তারপর বিড়ি খাবার জন্য দেশলাই জ্বেলেছিল, সেই জ্বলন্ত কাঠি আখের পাতায় গিয়ে পড়েছে।'

এই পর্যন্ত শুনেই শিবেগৌড় গর্জে উঠল, 'কে আছিস, যা সেটাকে ধরে নিয়ে আয়।' কিন্তু মহাদেবায়াজী বললেন, 'এ বলছে বলেই বিশ্বাস করতে হবে নাকি? তুই জানলি কি করে যে ও বিড়ি ধরাতে গিয়েই আগুন লাগিয়েছে?'

'ভগবানের দিব্যি মশায়, আমি মিছে কথা বলছি না। ও নিজেই আমার কাছে ছুটে এসে বলল যে, এই কাণ্ড হয়েছে আর পুরদপ্পার খেতে আগুন লেগে গেছে। তারপর কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ লিঙ্গাপুরের দিকে পালাতে বলছিল। কিন্তু আমি বললাম, আগুন তো তুই লাগিয়েছিস, আমি কেন পালাতে যাব? পরে আমিই ওকে বললাম—পালা। তখন ও পালাল।'

শিবেগৌড় এবং অন্যান্য বিজ্ঞজনেরা তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলল এই স্বীকারোক্তির পরিণাম কি হতে পারে। গঙ্গম্মা কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না। মহাদেবায়াজী সব বুঝেও কোন-রকমে উদ্ধারের উপায় খুঁজছিলেন, তিনি বলে উঠলেন, 'এই ছেলেটার কথা বিশ্বাস করা যায় নাকি ?'

প্যাটেল বেশ দাপটের সঙ্গেই পাল্টা প্রশ্ন করে, 'কেন বিশ্বাস করা যায় না, শুনি ?'

চেন্নিগরায় নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য আবার জোরের সঙ্গে বলে বসল, 'প্যাটেলজী, আমি সব সত্যি কথা বলছি।' মহাদেবায়াজী এবার চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। যখন বড়ভাই-ই এইভাবে মূর্খতা প্রকাশ করছে, তখন সেখানে বেশী বুদ্ধি খেলাতে গেলে প্যাটেল এবং গ্রামসুদ্ধ লোক ওর ওপরেই চটে উঠবে।

৩

প্যাটেলের আদেশে গ্রামের চৌকিদার ও তার কর্মচারী বেরিয়ে পড়ল অপ্পন্নায়ার সন্ধানে। রাত্রের অন্ধকারে সে বেশীদূর পালাতে পারেনি। জলাশয়ের অপর প্রান্তে জলনিকাশী নালার পাশে একটা ভাঙা ভূতুড়ে মণ্ডপের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল। ডাকাডাকি শুনেও প্রথমটা সে ভয়ের চোটে বেরোতেই চায় না। কাছে যেতেই ওদের পায়ে পড়ে সে কাকুতি-মিনতি শুরু করে দিল। কিন্তু লোকে যেমন করে চার পা ধরে ছাগলছানাকে কাঁধে তুলে নেয় ঠিক সেইভাবে মুদ্দা নুয়ে-পড়া অপ্পন্নায়াকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে চলল।

গ্রামের লোকেরা তখনও বাঁধের ওপরেই রয়েছে। এতক্ষণে আখ-মাড়াইয়ের সব জিনিস-পত্রই পুড়ে শেষ হয়ে শুধু ভস্মাবশেষ চোখে পড়ছে। খেতের আখগুলো পুড়ে কালো হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না রাত্রি নয়, তবু সমস্ত আকাশটা কেমন যেন ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। সবার সামনে এনে অপ্পন্নায়াকে নামান হল। ভয়ে সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। মাথার টিকির জায়গাটা ছাড়া বাকি মুণ্ডিত অংশ ঘেমে উঠেছে। ছেলের মুখের চেহারা দেখে গঙ্গম্মা একটা বড় রকমের নিশ্বাস নিল। সে তো আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিল শিবেগৌড়ের হাতে ছেলেকে মার খাওয়াতে হবে। কিন্তু দেখা গেল, শিবেগৌড়ের সিদ্ধান্ত একটু অন্যরকম।

সে প্রশ্ন করল, 'আখের খেতে আগুন লাগালি কেন, বল্ ?'

অপ্পন্নায়া ভয়ে কোন কথাই বলল না। দ্বিতীয়বার আরও জোরে প্রশ্নটা করা হলে বলে উঠল, 'আমি কিছু জানি না, মশায়।'

'আরে! কিছুই জানে না! বিড়ি ধরাতে গিয়ে আগুন লাগাস্নি তুই ? আমি যখন নারকেল গাছে চড়েছিলাম, তুই নিজেই এসে বলিস্নি, সে কথা ?' চেন্নিগরায় অপরাধ প্রমাণ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। কিন্তু অপ্পন্নায়া মাথা নত করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওর পা কাঁপছে, খাটো ধুতির ভেতর থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে সে কাঁপুনি। পাণ্ডা অইয়াশাস্ত্রীজী দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে, তিনি বললেন, 'মৌনং সম্মতি সূচকং, অর্থাৎ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ও-ই আগুন লাগিয়েছে। অতঃপর কি করা হবে তাই বলো।'

যাদের খেত তারা সবাই এবার কথা বলতে শুরু করল।—'আমার খেতের আখে মিছরির মত মিঠে গুড় হত। এক আনায় দু ভেলি দাম ফেললেও বিষ্যুদবারের বাজারে সব বিক্রী হয়ে যেত। কম করেও তিনশ টাকা লোকসান হয়ে গেল',—এই বলে গজগজ করছিল রাখাল সন্নয়া। বেনে রেবন্না শেট্টি বলে উঠল, 'আমার গুড় তো তৈরীই হয়ে গিয়েছিল। খেতে আখের যে ডাঁটা-গুলো পড়েছিল সেগুলো বড় হলেও অন্তত চারশ টাকা ঘরে আসত।' এইভাবে সবাই একে একে নিজেদের লোকসানের হিসেব দিচ্ছিল।

পাণ্ডা অইয়াশাস্ত্রীজীর কোন খেত-খামার নেই। কিন্তু তিনিও জানিয়ে দিলেন, 'আমার নিজের খেত নেই বটে, কিন্তু গুড় বানাবার সময় সবাই গণপতির পুজো দেয় তো! প্রতি কড়াই থেকে আমি এক এক ভেলি গুড় পাই। হিসেব করলে আমার ভাগে অন্তত পাঁচশ ভেলি গুড় হয়, অর্থাৎ কিনা, আমারও প্রায় পঞ্চাশ টাকার মত লোকসান হয়েছে। তাছাড়া, আখের রস, কড়াই নামাবার সময় সেখানে হাজির থাকলে গরম গুড়, এসব তো আছেই!'

'শাস্ত্রীজী, আপনার হিসেবটা কিন্তু সুদে-আসলে বড়ই বেড়ে যাচ্ছে। যাদের আখ নষ্ট হয়েছে তাদের লোকসানের হিসেব ন্যায়সঙ্গত, কিন্তু এর ওপর আবার গণপতি পুজোর পাওনা গুড়ের ভেলির হিসেব জুড়বেন না',—কথার মাঝখানেই ঢুকে উঠলেন মহাদেবায়াজী, 'রেবন্না শেট্টির আখ-কেটে গুড় তৈরী হবার পর খেতে যে ডাঁটা পড়ে আছে তারই দাম নাকি চারশ টাকা, অথচ ওর খেত তো মোটে দেড় একরের, তার প্রথম ফসলের দাম একশ টাকাও হয়নি। তাহলে এখন কেবল ডাঁটা-গুলোর দাম চারশ টাকা হয় কি করে? ও নিজেই আমাকে একদিন বলেছে, ডাঁটাগুলো আর খেতে ছেড়ে রাখব না, জমিটা সাফ করিয়ে ফেলে সামনের বছর ধানের চাষ করব, আখের চাষে জমি খারাপ হয়ে যায়।'

লোকে হয়ত নিজের নিজের লোকসানের হিসেব আরো বাড়িয়ে বাড়িয়েই বলত, কিন্তু এখন মহাদেবায়াজীর মন্তব্য শোনার পর সবাই একটু ভেবে-চিন্তে কথা বলতে লাগল।

মহাদেবায়াজী আবার বলতে শুরু করলেন, 'গণপতি পুজোর জন্য যে ভেলি দেওয়া হয় তার মাপ অনেক ছোট, সেই রকম পাঁচশ ভেলির দাম পঞ্চাশ টাকা, কে দেবে? ও রকম হিসেব করলে তো এক টাকায় দশ ভেলি গুড় নিতে হয়। অথচ, বাজারে এক টাকায় চল্লিশ ভেলি গুড় পাওয়া যায়। কাজে কাজেই ঐ রকম ছোট ভেলির গুড় দেড় আনায় একখানা কখনও হতে পারে?'

পাণ্ডা অইয়াশাস্ত্রীজীর মুখে আর কথাটি নেই। এবার যাবার উদ্যোগ করতে করতে মহাদেবায়াজী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বললেন, 'লোকসানের হিসেব যদি করতে থাক তাহলে কেউই কিছু পাবে না। ছেলেমানুষ! ইচ্ছে করে তো আর কিছু করেনি। তবে হ্যাঁ, এইটুকু ছেলে বিড়ি খেতে শিখেছে, তার জন্য ওকে শাসন করা দরকার। ওকে চার ঘা বেত লাগাও আর নয়ত মাস্টারজীকে বলে ওকে বেঁধে রাখ।'

এবার অপ্পন্না কান্নাকাটি শুরু করল, 'না, মশায় না, আমাকে বাঁধবেন না, পায়ে পড়ি আপনার।' চেন্নিগরায় মাঝে থেকে অকারণেই বলে উঠল, 'আমার কিন্তু কোন দোষ নেই। ওকেই বেঁধে রাখুন।'

কিন্তু প্যাটেল শিবেগৌড় অন্য সুর ধরল—সে বললে, 'মহাদেবায়াজী, আপনি হলেন সন্ন্যাসী-মানুষ। আপনার তো না আছে ঘর-সংসার, না আছে ছেলেপিলে। ছেলেকে শাসন করে শিক্ষা

দেওয়া, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এই যে লোকসানটা হল, এর ক্ষতিপূরণ কে করবে? আমি এ গাঁয়ের প্যাটেল, আমাকে তো ন্যায়বিচার করতে হবে? আমার সিদ্ধান্ত শুনুন---সারা গ্রামের এই ক্ষতির জন্য একটা থোক টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে এবং সে টাকা, যাদের যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।'

অধিকাংশ লোকই এবার মাথা নেড়ে বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, এই তো উচিত কথা, ন্যায়বিচার।'

রেবন্না শেট্টি আর অইয়াশাস্ত্রী জোর গলায় বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, এইতো যোগ্য বাপের ব্যাটার মত কথা, একেবারে খাঁটি কথা।' ওদের উদ্দেশ্য ছিল মহাদেবায়াজীকে একটু তাতিতে দেওয়া, কিন্তু মহাদেবায়াজী এসব কথায় কান দিলেন না। এতক্ষণে গঙ্গম্মাও বুঝতে পারছে ব্যাপারটা কোনদিকে মোড় নিচ্ছে। সে এবার হাতজোড় করে শুরু করে, 'আমি অবলা বিধবা, এরা না বুঝে সুঝে এমনটা করে ফেলেছে ···' আরো কিছু সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু চেন্নিগরায় কথার মাঝেই বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'আমার কোন দোষ নেই মা, বলতে হয় অপ্পন্নার নামই বলো।' এ কথাটা যেন শুনতেই পায়নি এমনভাবে গঙ্গম্মা মিনতি করতে থাকে, 'দোষ করেছে তার জন্য ওকে শাস্তি দিন, কিন্তু জরিমানা দেবার মত আমার কাছে কিছুই নেই।'

ওদিকে অপ্পন্না কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'জরিমানাই করে দিন, আমাকে সাজা দেবেন না।'

গ্রামের বিজ্ঞলোকেদের মধ্যে এবার আলোচনা আরম্ভ হল। শেষ পর্যন্ত এই স্থির হল যে, সমস্ত ক্ষতিপূরণ করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে সবাইকে অন্তত কিছু কিছু টাকা ভাগ করে দেবার জন্য গঙ্গম্মাকে দু-হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে এবং অইয়াশাস্ত্রীজী, গণপতি পুজোর প্রাপ্য গুড় থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে তাঁকে দশ টাকা ও রেবন্না শেট্টির খেতের ডাঁটাগুলোর জন্য পঁচিশ টাকা দেওয়া হবে।

গঙ্গম্মা হাতজোড় করে অনেক কাকুতি-মিনতি করল কিন্তু কেউ তার অনুনয়ে কান দিল না। তার পক্ষ নিয়ে কথা বলতে গেলে কোন লাভ হবে না বুঝে মহাদেবায়াজীও চুপ করে রইলেন। গঙ্গম্মা জানাল, তার কাছে এক কানাকড়িও নেই। তাই শুনে শিবেগৌড় পরামর্শ দিল, 'তুমি যদি তোমার খেত, বাগান, ঘর-বাড়ি সব আমার কাছে বাঁধা রাখ, তাহলে জরিমানার টাকাটা আমি দিতে পারি। পরে আমার টাকা ফেরত দিয়ে নিজের সম্পত্তি ফিরিয়ে নিও।'

গঙ্গম্মা কি করবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। সে অইয়াশাস্ত্রীজীর মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু শাস্ত্রী তাঁর ভাগের দশ টাকা ছাড়বেন কেন? সুতরাং সেদিকে চেয়ে কোন লাভ হল না। গ্রামের আর এক পুরোহিতের নাম অন্নাজোইস। সে অইয়াশাস্ত্রীর আত্মীয়, দূর সম্পর্কের বড় ভাইয়ের ছেলে। খুড়োর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেও কোন কথা বলল না। সারা গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এই বিধান দিয়েছেন, এটা মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই। সুতরাং গঙ্গম্মাকে এই দণ্ড মেনে নিতেই হল। মহাদেবায়াজী অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হল না। তবু তিনি গঙ্গম্মাকে পরামর্শ দিলেন, 'জমি বাঁধা দিয়ে ঋণ করো না, তোমার যদি সোনা-রূপোর গহনা কিছু থাকে তো তাই বিক্রী করে দাও। তাতেও যদি সব টাকার জোগাড় না হয় তাহলে ঘরের ফসল, নারকেল ইত্যাদি বিক্রী করে টাকা যোগাড় কর। ধার করলেই তার সুদও বাড়তে থাকবে, এ সব ব্যাপার সম্বন্ধে তোমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই।'

প্যাটেল শিবেগৌড় বলে উঠল, 'এর জন্য আবার অভিজ্ঞতার কি দরকার? আমি কি সুদ চাইছি না-কি ওর কাছে? কেবল একটা প্রমাণপত্র লিখে দিক, তাহলেই হবে। বিয়ের সময় আর গুরুজনদের কাছ থেকে যে সব গহনাগাঁটি, কাপড়-চোপড় পেয়েছে তা যদি একবার বেচে দেয়, আর কি কখনও ফিরে পাবে? সন্ন্যাসীদের না হয় সোনা-রূপোর কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু তাই বলে গেরস্থ সংসারী মানুষেরও কি ওসবের দরকার নেই? গঙ্গম্মাজী ভাল করে ভেবে দেখো, সন্ন্যাসী মহাদেবায়াজীর পরামর্শ শুনবে, না গাঁয়ের দশজন বিজ্ঞলোকের কথামত কাজ করবে?'

সকলেই বলতে লাগল, প্যাটেলের কথা খুবই যুক্তিসঙ্গত। প্যাটেলের শালা, যে এখন পাটোয়ারীর কাজ করছে---সে বললে, 'আইনে বলে, বিবাহের সময় পাওয়া সোনা-রূপোর জিনিস স্বামীর মৃত্যুর পর বিক্রী করার অধিকার কোন স্ত্রীলোকের নেই। জমি বাঁধা দেওয়া চলতে পারে।' অইয়াশাস্ত্রীও কথাটা অনুমোদন করলেন। এতজনের অভিমতের বিরুদ্ধে যাবার মত আইনজ্ঞান মহাদেবায়াজীর ছিল না। আর থাকলেও, যখন সকলেই একত্র হয়ে জোট বেঁধেছে, তখন তারা ওঁর অভিমত মানবেই বা কেন? এদের কথাই গঙ্গম্মা মেনে নেবে কিনা, তাও ঠিক জানা নেই, এক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই তিনি শ্রেয় মনে করলেন।

ন্যায়বিচার যখন হয়ে গেছে, তা পালিত হতে বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। সুতরাং চটপট দু-খানা গরুর গাড়ি প্রস্তুত হয়ে এসে গেল। দুই পুত্রসহ গঙ্গাম্মাকে নিয়ে প্যাটেল ও আরো কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তিপটুর রওনা হয়ে গেলেন। সাবরেজিস্ট্রারের সামনে শিবেগৌড় দু-হাজার টাকা দিয়ে দিল এবং গঙ্গাম্মাদের পারিবারিক দুর্যোগের কারণ দেখিয়ে তার সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক লিখিয়ে নিল। পাটোয়ারী শিবলিঙ্গেগৌড় এই সব কাগজপত্র তৈরী করার মজুরী হিসেবে দাবী করল পঁচিশ টাকা। গঙ্গম্মাকে কথা দিতে হল, এ বছর দরটা একটু চড়লেই সব্‌জী বেচে এ টাকাটা সে দিয়ে দেবে। প্যাটেল নিজের আখের খেতের লোকসানের দরুন চারশ টাকা কেটে নিয়ে বাকিটা ভাগ করে দিল অন্যদের মধ্যে।

গঙ্গম্মা বিধবামানুষ, তিপটুরের হোটেলে তার খাওয়া চলবে না। লুচি যদিও ভাজা খাবার, কিন্তু ভাজবার পূর্বে ময়দাটা জল দিয়ে মাখা হয় তো, সুতরাং লুচিও খাওয়া নিষেধ। অগত্যা সে একটা পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে শুদ্ধাচারে দু'মুঠো গরম ছোলা আর গুড় খেয়ে গাড়িতে উঠে বসল। ছেলেদের সে দিল ছ'আনা পয়সা, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে গিয়ে তারা খেয়ে এল দোসা আর চাটনী।

গ্রামে ফিরে এসে লজ্জায় সঙ্কোচে গঙ্গম্মা দিনচারেক বাড়ি থেকে বেরোল না পর্যন্ত। তারপর তিন মাইল দূরে সন্নীনহল্‌লীর কুমোর বাড়িতে গিয়ে ষোল টাকায় পাঁচশ খাপরা কিনে এনে ছাদ মেরামত করাল।

প্রায় আটদিন পরে একদিন সে মন্দির থেকে ডেকে পাঠাল মহাদেবায়াজীকে। অনেক সুখ-দুঃখের কথা হল। এরপর কি করা যায় সেকথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি উপদেশ দিলেন, 'অপ্পন্নাকে আবার মাস্টার মশাইয়ের কাছে পাঠাও, একটু লেখাপড়া শিখলে ও শুধরে যাবে। চেন্নিগরায়কেও পাঠাও হোন্নবল্‌লীর পাটোয়ারীর কাছে। তুমি নিজে সঙ্গে যাও এবং তাঁকে অনুরোধ কর যাতে ছেলেটাকে ভাল করে তালিম দিয়ে দেন। এ বংশের পাটোয়ারী বৃত্তি এখন রয়েছে অন্যের হাতে,

এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে সে এ কাজের দায়িত্ব নিতে পারে। অবিলম্বে চলে যাও, আর দেরী করা উচিত নয়। ছেলের বয়স পনের হল তো?'

গঙ্গম্মা মেনে নিল কথাটা। চেন্নিগরায়কে হিসেব লেখা শেখাবার জন্য হোন্নবল্লীর পাটোয়ারী সীতারামাইয়ার কাছে পাঠান হচ্ছে, এ খবর পৌঁছে গেল প্যাটেলের কানে।

গঙ্গম্মাকে সে এসে বোঝাতে লাগল, 'কেন ছেলেটাকে অতদূরে পাঠাচ্ছ? আমাদের শিব-লিঙ্গের কাছে দাওনা পাঠিয়ে, বাড়ির কাছেই কাজ শিখতে পারবে, সেইটেই কি উচিত হবে না?'

কিন্তু গঙ্গম্মার দৃঢ় বিশ্বাস হোন্নবল্লীর সীতারামাইয়াজীর কাছে না শিখলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। পাটোয়ারীর কাজ তো অনেকেই করে, কিন্তু উপযুক্ত গুরু হবার মত যোগ্যতা আছে একমাত্র সীতারামাইয়াজীর। জাবগল্লুতে হলেবিড়ের বেঙ্কটেশায়াজী আছেন, তিনিও খুব সুদক্ষ, কিন্তু তিনি ঠিক এ অঞ্চলের নন। আর প্রত্যেক এলাকার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলো জানা থাকে কেবল সেই এলাকারই লোকেদের।

গঙ্গম্মা গরুরগাড়ির ব্যবস্থা করে দুই ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল হোন্নবল্লীর উদ্দেশ্যে। যাবার দুদিন আগে রুদ্রন্না নাপিতকে ডেকে চেন্নিগরায়ের মাথা কামানো হল, কপালে আঁকা হল চন্দনের রেখা। দ্বিতীয় দিনে হল তৈল স্নান। 'কোড়বলে' আর চালের গুঁড়োর নাড়ু প্রস্তুত করে বাঁধা হল পুঁটলিতে। কোট, টুপী পরে সেজেগুজে গাড়িতে ওঠার সময় মহাদেবায়াজী বললেন, 'বড় জায়গায় যাচ্ছ, এখন থেকে ভুলেও যেন মুখ দিয়ে খারাপ কথা না বের হয়। বুদ্ধিমান হয়ে ফিরে এস!'

হোন্নবল্লীর সীতারামাইয়াজী স্বর্গীয় রামন্নাজীর পরিচিত ছিলেন। গঙ্গম্মার আগ্রহ দেখে তিনি চেন্নিগরায়কে নিজের কাছে রেখে কাজ শেখাতে রাজি হয়ে গেলেন। বিদায়ের সময় মা আর ছোটভাইকে গাড়িতে উঠতে দেখে কেঁদে ফেলে চেন্নিগ, তারপর বলে ওঠে, 'মা, কারো হাতে আরো কোড়বলে আর নাড়ু পাঠিয়ে দিও কিন্তু।'

গ্রামে ফিরে এসে অপ্পন্নাকেও ভর্তি করা হল চেন্নাকেশবয়ার পাঠশালায়। রোজ দুই পকেট ভরে ছোলা, গুড় আর নারকেলের টুকরো দিয়ে তবে তাকে পাঠশালায় পাঠাতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চেন্নিগরায়ের শিক্ষার তিন বছর সমাপ্ত হল। এখন সে বেশ নিপুণভাবে বাঁ হাতে রুল ধরে ডান হাতের কলম দিয়ে সরলরেখা টানতে পারে। বাঁদিকের হিসেব সে এখন ভুল না করেই লিখতে পারে ; তাছাড়া ডান দিকের হিসেব কিভাবে লিখতে হয় তারও রীতিনীতি তার শেখা হয়ে গেছে। তবে শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা সেটা বলা কঠিন। গুরু সীতারামাইয়াজী বলেন, 'তোমার চারআনা শিক্ষাও হয়নি।' চেন্নিগরায় অবশ্য তাঁর সামনে এ কথার কোন উত্তর দেয় না ; কিন্তু মনে মনে সে একথা মোটেই বিশ্বাস করে না। ভাবে, 'উনি কি মনে করেন হিসেব শিখবার জন্য আমি এইখানেই বরাবর পড়ে থাকব ?'

বছরে দুই-তিনবার সে গ্রামে আসে, পায়ে হেঁটেই আসতে হয়। এসেই মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আর কতদিন ওখানে থাকতে হবে শুনি ? এবারে আমি এখানে এসে পাটোয়ারীগিরির চার্জ নেব।'

'হিসেবটা ভাল করে শিখেছিস তো ?'

'তা আর শিখিনি ? জিজ্ঞেস করে দেখো না—এই তো, এক নম্বর হল ব্যবহার খাতা, দু'নম্বর বঞ্জর খাতা, তিন মর্দশুমারী, চার নম্বর খাতা, তারপর হল পাঁচ নম্বর ভাড়া, ছয় নম্বর অন্তর, সাত তক্রার খাতা, আট ইনাম রেজিস্টার, নয় নম্বর জমাবন্দী গৌশওয়ারা, দশ খতৌনী, এগার রসিদ খাতা আর বার নম্বর হল গিয়ে রায়শুমারী। এই হল পাটোয়ারী কাজের বার রকমের খাতা। এরপর সে প্রভব, বিভব ইত্যাদি ষাট সম্বৎসরের নাম বলে গেল গড়গড় করে।

এতক্ষণে মায়ের বিশ্বাস হল, হ্যাঁ ছেলে বিদ্বান হয়েছে বটে। এবার ছেলে বলে ওঠে, 'তা তুমি যে দেখি একেবারে চুপচাপ বসে আছ, আমার বিয়ে-টিয়ে কি দেবে না কি ?'

'ওমা, তা কেন দেব না ? তা, পাটোয়ারীগিরিটা আগে হাতে নিয়ে নে ?'

'সে তো নিয়েই নিচ্ছি। আঠার বছর বয়স হয়ে গেল আমার, এখন আমি সাবালক। লোকে ষোল বছরেই ছেলের বিয়ে দেয়, এখনও যদি আমার বিয়ে না হয় লোকে বলবে কি ?'

ইতিমধ্যেই চেন্নিগরায়ের জন্য বিয়ের সম্বন্ধ আসতে শুরু করেছে। কিন্তু এতদিন গঙ্গম্মা এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। এখন ছেলের নিজেরই বিয়েতে মন হয়েছে, সুতরাং বিয়েটা দিয়ে ফেলাই উচিত। গঙ্গম্মা মহাদেবায়াজীর কাছে পরামর্শ নিতে গেল, কিন্তু তিনি উপদেশ দিলেন, ও আরো দু-এক বছর কাজ শিখুক, পাটোয়ারী কাজের দায়িত্ব নেবার পরই বিয়েটা দেওয়া উচিত হবে।

এ কথা শুনেই চেন্নিগরায় বেজায় খাপ্পা, চেঁচিয়ে উঠল, 'আহা হা, এখনও আরো দু'বছর বসে থাকতে হবে! আপনি কি বোঝেন ? চুপ করে থাকুন তো।' এর আগে কখনও চেন্নিগরায় ওঁর সঙ্গে এভাবে কথা বলেনি। মহাদেবায়াজী আর কোন কথা বললেন না।

হোন্নবল্লীতে আর ফিরল না চেন্নিগরায়। একদিন শিবলিঙ্গেগৌড়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হল সে এবং নিজেদের বংশের প্রাপ্য পাটোয়ারীগিরির দায়িত্ব ফিরে পেতে চাইল তার কাছে। শিবলিঙ্গেগৌড় জানাল, 'হ্যাঁ, দিয়ে তো দেবই, দাঁড়াও, ওপর থেকে হুকুমটা আসুক।' চেন্নিগরায় ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। কি করা উচিত এখন? ইতিমধ্যে বিয়ের কথাবার্তাও কানে আসতে লাগল; সুতরাং কাজকর্মের দিকে আর মনোযোগ রইল না তার।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, একটা সাদা ঘোড়া এসে দাঁড়িয়েছে বাড়ির সামনে। ঘোড়ার জিন আর লাগাম একেবারে ঝক্‌ঝক্ করছে। ঘোড়া থেকে নামলেন একটি মোটাসোটা গণ্যমান্য চেহারার ভদ্রলোক, পরনে সাদা রঙের কোট-প্যান্ট এবং পায়ে জুতো-মোজা। সাদা ঘোড়া এবং এই ভদ্রলোককে দেখলে যে কোন লোকেরই ধারণা হতে পারে যে ইনি ডেপুটি কমিশনার। গঙ্গম্মাও এই রকম কিছু আন্দাজ করে ভিতরে এসে ডাকল চেন্নিগরায়কে। সে তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরে এসে আভূমি প্রণত হয়ে সেলাম করে দাঁড়াল, তারপর কোনক্রমে তোৎলাতে তোৎলাতে বলল, 'আপনি মহানুভব, আমাকে অনুগ্রহ করুন।' তারও ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, পাটোয়ারী কাজের ভার তাকে দেওয়াবার জন্যই স্বয়ং ডেপুটি কমিশনার সাহেব এসে পৌঁছেছেন।

'শিবলিঙ্গেগৌড়কে ডেকে আনব কি?' জানতে চাইল সে।

'কিসের জন্য?'

'আঁজ্ঞে, পাটোয়ারীর কাজটা এখন সেই দেখাশোনা করছে কিনা! ওর কাছ থেকে কাজটা আমাকে পাইয়ে দিন ধর্মাবতার। আমার নাম চেন্নিগরায়, আমি এখানকার স্থায়ী পাটোয়ারী রামন্নাজীর বড় ছেলে।'

'পাইয়ে দেব। এখন ভেতরে চলো।'

সবাই ভেতরে এলেন। কিন্তু ঘরে বসতে দেবার জন্য কোন চেয়ার নেই। অন্নাজোইসজীর বাড়িতে একখানা চেয়ার আছে, তাছাড়া সারা গ্রামে আর কারো বাড়িতেই ও-সব জিনিস নেই। আগন্তুক মাদুরের ওপরই বসলেন। চেন্নিগরায় গঙ্গাজল এনে সামনে রাখায় তিনি বলে উঠলেন, 'এখন আমার জলপান করা উচিত নয়।'

এরা দুজনে ব্যাপারখানা কিছুই বুঝতে পারছে না। এরই মধ্যে আগন্তুক কথা শুরু করলেন, 'আপনারা নাগলাপুরের নাম শুনেছেন আশা করি। আমি সেখানকার স্থানীয় পুরোহিত। আমাকে লোকে কন্ঠীজোইস বলেই জানে। আমার একটি কন্যা আছে, নাম নন্‌জম্মা। রেবতী নক্ষত্রে দ্বিতীয় পাদে জন্ম। বার বছর চলছে, জন্মকুণ্ডলী আমি সঙ্গেই এনেছি। আপনার পুত্রের জন্মকুণ্ডলীটি আমাকে দেখতে দিন।'

এতক্ষণে গঙ্গম্মা বুঝল, ডেপুটি কমিশনার নয়, এ হচ্ছে নাগলাপুরের কন্ঠীজোইস এবং তাঁর ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতেই এখানে এসেছে। এদিকে আবার এতবড় এক ঘোড়ায় চড়ে ডেপুটি কমিশনার সাহেবের মত পোশাক পরে আসা হয়েছে! সে বলল, 'পাটোয়ারীর কাজটা হাতে এলে, তারপর আমি ছেলের বিয়ে দেব।'

'মা, তুমি কিছুই বোঝ না, তুমি চুপ করে থাক তো! উনিতো আগেই বলেছেন, আমাকে চার্জটা পাইয়ে দেবেন', মাকে থামিয়ে দিল চেন্নিগ।

'আপনার অধিকার আপনাকে পাইয়ে দিতে কতটা সময় লাগবে তা আমি জানি। আমি নিজে কথা বলব অফিসারের সঙ্গে। কিন্তু বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক।'

গঙ্গম্মা এবার এনে দিল ছেলের জন্মকুণ্ডলীর কাগজখানা। কন্ঠীজোইসজী নিজেই জ্যোতিষ জানেন, কোষ্ঠীপত্র হাতে পেয়েই মিলিয়ে দেখে বললেন, 'হুঁ, ঠিক মিলে যাচ্ছে। এবার তাহলে কথাবার্তা শুরু করা যাক।'

২

রামসন্দ্র গ্রামের বার মাইল পশ্চিমে নাগলাপুর। এ অঞ্চলে এমন কেউ নেই যে, কন্ঠীজোইসজীর নামডাক শোনেনি। রামসন্দ্র, তুমকুর জেলার তিপটুর তালুকের অন্তর্গত, আর নাগলাপুর হল হাসান জেলায় চন্নরায়পট্টন তালুকের মধ্যে। সেই কারণেই রামসন্দ্রের লোকের কাছে কন্ঠীজোইসজী ততটা পরিচিত নন, কিন্তু ওদিকে চন্নরায়পট্টন তালুক, শান্তিগ্রাম, হাসান, কৌশিক ইত্যাদি সমস্ত জায়গায় কন্ঠীজোইসজী সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি।

কন্ঠীজোইসজীর দীর্ঘ শরীর, বিশাল ললাট। দৃষ্টিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে। স্ত্রী যখন ঘর করতে এলেন তখন তাঁর বয়স বিশ বছর। দুবছর পরে জন্মাল প্রথম সন্তান, একটি ছেলে। আরো দুবছর পরে একটি শিশু জন্মের পরই মারা যায়। তারপর আরো দুটি সন্তান হয়েছিল কিন্তু তারাও বাঁচেনি। শেষবারে জন্মাল একটি কন্যাসন্তান, কিন্তু এবার তাদের মাকেই বিদায় নিতে হল পৃথিবী থেকে। কন্ঠীজোইসজীর মা মানুষ করতে লাগলেন শিশুকন্যাটিকে। আর দ্বিতীয় বিবাহ করেননি কন্ঠীজোইস। এখন তাঁর দুটিমাত্র সন্তান, বড় ছেলে কল্লেশ শ্রবণবেলগোলায় পুলিশে কাজ করে, আর মেয়ে এই নন্‌জম্মা, যার বিয়ে স্থির হচ্ছে চেন্নিগরায়ের সঙ্গে।

কন্ঠীজোইসজীর এত নামডাক এমনিতে হয়নি। তার যথেষ্ট কারণও আছে। প্রথমত তাঁর ভীমকান্তি শরীর একবার দেখলে কেউ ভুলতে পারে না। নাটক, যক্ষগান* ইত্যাদিতে তাঁর অভিনয় যারা দেখেছে তারাই মুগ্ধ হয়ে গেছে। কালিদাসের নাটকে রাজা ভোজের পার্ট তাঁর মত করে অন্য কেউ করতেই পারবে না। মহাভারতে দুর্যোধনের ভূমিকায় তো ওঁকে ছাড়া আর কাউকে ভাবাই যায় না। যক্ষগানে বীরবেশে নৃত্য করতে করতে পা দুখানা যখন একেবারে ভেঙে পড়তে চায় তখনই কেবল উনি নাচ বন্ধ করেন। উঁচু দরাজ গলায় এক নিঃশ্বাসে তিনি রাগ সহযোগে কন্দপদ্য গেয়ে যেতে পারেন। হারমোনিয়াম, তবলা ইত্যাদি বাজানোতেও হাত আছে। শুভ-অশুভ দুরকম কাজেই পৌরোহিত্য করে থাকেন। এছাড়া জ্যোতিষবিদ্যা, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদিও জানা আছে। সরকারী আমলাদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথাবার্তা বলতে পারেন ; আবার মুসলমানদের সঙ্গে বিশুদ্ধ উর্দুতে আলাপ করার ক্ষমতাও রাখেন।

এতরকম গুণাবলীর জন্যই এঁর এত প্রসিদ্ধি। লোকে বলে এককালে নাকি তিনি দু-একটা খুনের মামলাতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আদালতে জয় হয়েছিল তাঁরই। তবে এসব কথার

---

* কর্নাটকের এক বিশেষ ধরনের নৃত্য-নাটিকা

কতটা সত্যি, কতটা বানানো সেটা কেউই সঠিক জানে না। জোইসজী নিজে তো বলেন, ও-সব মিথ্যে রটনা। কারো সঙ্গে বিবাদ বাধলে তিনি যেভাবে হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন, 'খুন করে ফেলব একেবারে', তাতে যদি কেউ ভয়ে আঁতকে ওঠে তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অন্ধকারকে উনি ভয় করেন না, যত ঘোরাফেরা সব ওঁর রাতেই। ছোরাখানা কোমরে বেঁধে একাই বেরিয়ে পড়েন এবং ভাঙাচোরা এবড়ো-খেবড়ো চব্বিশ মাইল পথ পার হয়ে সূর্যোদয়ের আগেই পৌঁছে যান হাসানে। দিনের বেলা ঘোরাঘুরি ওঁর বিশেষ পছন্দ নয়। জটাধারী সাধু-সন্ন্যাসী আর কোল্লীদেবদের (পিশাচ) সঙ্গেও মুকাবিলা করবার মত সাহস যার আছে তাঁর কীর্তিকাহিনী যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে এতো জানা কথাই।

চেন্নিগরায়ের বিয়েতে রামসন্দ্র গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ, তাছাড়া এই পাটোয়ারী এলাকার মধ্যে যারা পড়ে, অর্থাৎ কুরুবরহল্লীর প্যাটেল গুণ্ডেগৌড় ও আরো বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছিলেন। দশখানা গরুরগাড়ি বোঝাই করে বরযাত্রীরা রওনা হল। নাগলাপুরের জলাশয়ের পাড়ে এগিয়ে এসে তুরীবাদ্য বাজিয়ে কন্যাপক্ষ স্বাগত জানাল তাদের। বরকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্য কন্ঠীজোইসজী স্বয়ং এসেছেন তাঁর সাদা ঘোড়া নিয়ে। চেন্নিগরায়ের কিন্তু অতবড় ঘোড়ায় চড়তে বেশ ভয় করছে। অথচ না চড়তে পারলে সারা রামসন্দ্র গাঁয়ের অপমান, এ কথাটাও মনে হচ্ছে তার। শেষ পর্যন্ত গঙ্গম্মা যখন 'ভীতু, কাপুরুষ কোথাকার' বলে ধিক্কার দিয়ে উঠল তখন সে চোখ কান বুজে কোন রকমে উঠে পড়ল ঘোড়াটার পিঠের ওপর। কনের ভাই পুলিশ কল্লেশ ঘোড়াটার লাগাম ধরে তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলল।

কন্ঠীজোইসজীর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেতে বেশী দেরী হলনা বরযাত্রীদের। খুব ধনী হয়ত নন, কিন্তু বিয়েতে ধুমধাম হচ্ছে প্রচুর। হাসানের এক উকিলসাহেবও এসেছেন বিয়েতে। অইয়াশাস্ত্রীজী এবং অন্নাজোইসজী দুজনেই এসেছেন বরপক্ষের পুরোহিত হয়ে। মাসিক শ্রাদ্ধ, পুণ্যাহ, গৌরীগণেশ ব্রত---এই জাতীয় পূজা-অর্চনা ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানেন না অইয়াশাস্ত্রী। তবে অন্নাজোইসজী বয়সে ছোট হলেও সিন্ধুঘট্টের সুরন্নজোইসজীর কাছে নিয়মিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এ অঞ্চলে নাম করেছেন। অনেক বিবাহ উপনয়ন ইত্যাদির কাজ করিয়েছেন তিনি। এখানেও তাঁর মন্ত্রোচ্চারণে বিরাম নেই। বরপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে বসে হোম করাতে করাতে অন্নাজোইসজী সরবে পাঠ করে চলেছেন, 'ওম্ ভূরগ্নিয়ে প্রাণায় স্বাহা। ইদমগ্নিয়ে স্বাহা ······ '।

কন্যাপক্ষের পাশের বাড়িতেই বরযাত্রীদের রাখা হয়েছে, কাজেই এই মন্ত্রপাঠ কনের বাড়িতেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কন্ঠীজোইসজীর কানে যেতেই তিনি হঠাৎ সেখানে এসে বলে উঠলেন, 'জোইসজী অগ্নি আহুতির মন্ত্রটা আর একবার বলুন তো।'

'কেন ?'

'শোনা দরকার। বলুন আপনি।'

'বেদমন্ত্র দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে নেই', এই বলেই অন্নাজোইসজী তাকালেন অইয়াশাস্ত্রীর দিকে।

'কে বললে উচ্চারণ করতে নেই ? আপনি ভুল বলতে তো পারেন।'

'আমি ভুল মন্ত্রপাঠ করছি ? সিন্ধুঘট্টের সুরন্নজোইসজীর শিক্ষা ভুল ? খুড়োমশায়,

আপনি বলুন এ বিয়ে দেব, না আমি উঠে যাব?' বলতে বলতে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন অন্নাজোইস।

'আপনার গুরুকে আমার জানা আছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত তিনি জানেন না। 'ভূরগ্নিয়ে' ভুল 'ভূরগ্নয়ে' বলা উচিত। আপনার ব্যাকরণের ভুল হচ্ছে বই খুলে দেখিয়ে দিতে পারি। বেদ-মন্ত্র অশুদ্ধ উচ্চারণ করলে মস্তক সহস্র খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ে, তা জানেন?'

অন্নাজোইসের মুখে আর কথা নেই। কন্ঠীজোইসজীর শাস্ত্রজ্ঞান দেখে বরযাত্রীরাও হতবাক। এরপর পাণিগ্রহণের সময় কন্যাদানের মন্ত্রও তিনি এত চমৎকারভাবে পাঠ করলেন যে, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনল। বিবাহের সব আচার-অনুষ্ঠান শেষ হবার পর বরযাত্রী বিদায় নেবার সময় অন্নাজোইসজী কন্ঠীজোইসজীর কাছে এসে বলে গেলেন, 'আমি কেবল মন্ত্রপাঠ করতে শিখেছি, কিন্তু ব্যাকরণের জ্ঞান আমার অসম্পূর্ণ। অধ্যয়ন সমাপ্ত হবার আগেই পিতার মৃত্যু হল, তাই শিক্ষা অর্ধ-সমাপ্ত থেকে গেছে, বাকিটা আমি নিজে পড়ে শিখেছি। যা ভুলচুক হয়েছে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।'

যাহোক, বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই বিবাহপর্ব শেষ হল। বধূর বাহুতে বাজুবন্ধ, কঙ্কণ, খোঁপায় ফুল, কোমরে রুপোর গোট আর পায়ে পাঁইজোর। বরপক্ষ থেকে রীতি অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে মঙ্গলসূত্র, ঝুমকো এবং নথ। বধূ তার পিতার মতই দীর্ঘাঙ্গী, প্রশস্ত ললাট এবং চোখ দুটি বেশ বড় বড়। বেশ সুলক্ষণা বধূ। রামসন্দ্রের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, 'চেন্নিগরায় অনেক পুণ্য করেছিল, তাই এমন বউ পেয়েছে। কথাটা অবশ্য গঙ্গম্মার পছন্দ হল না। চেন্নিগরায়কে শ্বশুর বাড়িতে যখন খেতে দেওয়া হয়েছিল, সে এমনভাবে চেটেপুটে খেয়েছে যে, পাতে এতটুকুও উচ্ছিষ্ট কিছু পড়ে ছিল না, এই ব্যাপারটা নিয়েও রামসন্দ্র আর নাগলাপুরের লোকেরা বেশ সমালোচনা করল—অমন হ্যাংলার মত খাওয়াটা উচিত হয়নি। কিন্তু চেন্নিগরায়ের মনে হল সে ঠিকই করেছে, অত ভাল ভাল খাবার কখনও পাতে ফেলে রাখা যায় নাকি?

৩

চেন্নিগরায় অনেকবার বলা সত্ত্বেও শিবলিঙ্গেগৌড় পাটোয়ারীর কাজটা কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছে না ওর হাতে। প্রথমে কিছু দিন তো 'এই দিচ্ছি, দেব' করে কাটিয়ে দিল। চেন্নিগরায় কিছুদিন অপেক্ষা করার পর আবার যখন জিজ্ঞাসা করল, তখনও সেই এক জবাব। অবশেষে একদিন সে বলল, 'এই বর্ষান্তের হিসেবটা শেষ করে তারপর দেখব'খন।' বর্ষান্তের হিসেব মানে এপ্রিল মাসের শেষ, অর্থাৎ এখনও পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হবে। গৌড় নানা রকম ভণিতা করে বলে, 'বছরের হিসেবটা চুকিয়ে না দিলে তুমি তো কিছুই বুঝতে পারবে না!' এ কথা মেনে না নিয়ে উপায় কি?

বাড়িতেও কিছু কাজকর্ম নেই। বধূ এখন ছোট, তাই দ্বিরাগমন হয়নি এখনও। সে আছে বাপের বাড়িতে। অপ্পন্নায়া গ্রামের পাঠশালায় যাওয়া আসা করছে আজ দুবছর, কিন্তু পাঠশালার মাস্টারমশাই তার দিকে একেবারেই মনোযোগ দেন না। কারণ, তাঁর ধারণা বিদ্যার্জন করতে

হলে পূর্বজন্মের যে সঞ্চিত পুণ্য থাকা দরকার তা ওর নেই, সুতরাং বিদ্যার্জন ওর দ্বারা হবে না। বাগানে মৌমাছির চাক ভাঙা, নারকেল গাছে চড়ে জলভরা নারকেল পেড়ে খাওয়া—এই সব কাজেই আজকাল সময় কাটে অপ্পন্নায়ার। ভাবী পাটোয়ারী চেন্নিগরায় সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানের পর মাথায় কপালে এমনভাবে বিভূতি মাখে যে দেখে মনে হয় যেন ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে। ভিজে কাপড়েই উপবীতের ব্রহ্মগাঁট হাতে নিয়ে এমন তারস্বরে 'ওম্ তৎসৎ ...' ক'রে এক হাজার আটবার গায়ত্রী জপ করে যে পাড়াসুদ্ধ লোক শুনতে পায়।

বছর শেষ হলে সে আবার গেল শিবলিঙ্গের কাছে পাটোয়ারীগিরি নেবার জন্য। এবার শিবলিঙ্গে জবাব দিল, ওপর থেকে হুকুম না এলে সে কিছুই করতে পারবে না।

'আমারই কাজ আমাকে ফিরিয়ে দেবে তাতে আবার ওপরের হুকুমে কি দরকার?'

'হ্যাঁ, তোর বাপের নামে লেখা আছে কি না! আমার এখন দশ বছরের অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। পারিস যদি তো কেড়ে নে দেখি আমার হাত থেকে।'

শুনে কান্না পেয়ে গেল চেন্নিগরায়ের। তার মুখে একটা খারাপ গালাগাল এসে গেল, কিন্তু সাহসের অভাবে উচ্চারণ করতে পারল না কথাটা। শিবলিঙ্গেগৌড়ের বোনাই শিবেগৌড়ের কাছে গিয়ে নালিশ করাতে সে স্পষ্ট বলে দিল, 'ওহে, পাটোয়ারীর কাজ সামাল দেওয়া তোমার কর্ম নয় বুঝলে? এত বড় দায়িত্ব, একি ছেলেখেলা ভেবেছ নাকি?'

এরপর আর কি বলা যায় ভেবে পেলনা চেন্নিগরায়। তাছাড়া প্যাটেলের মুখোমুখি কথা বলার সাহসই বা তার কোথায়? সেই ছোটবেলা থেকে গঙ্গম্মা এই প্যাটেলের নাম করেই তাকে ভয় দেখিয়ে এসেছে। সোজা মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে প্যাটেল আর শিবলিঙ্গে যা যা বলেছে সব সে জানাল গঙ্গম্মাকে। গঙ্গম্মা চুপ করে থাকার পাত্রীই নয়। প্যাটেলের দরজার সামনে পথের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করল সে, 'ওরে শিবেগৌড়, কার গু খাবার শখ হয়েছে তোর? তোর বৌয়ের হাতের চুড়ি ভাঙবে, ঘরদোর তোর মাটি হয়ে যাবে বুঝলি?'

শাপমান্যি শুনে প্যাটেলের বউ গৌরম্মা ভয় পেয়ে গেল। বিধবা ব্রাহ্মণীর অভিশাপ যদি সত্যি ফলে যায়? সে স্বামীকে বলে উঠল, 'ওদের চিতের কাঠ নিয়ে দরকারটা কি আমাদের? শিবলিঙ্গে ভাইয়াকে বলে দাও না ছুঁড়ে ফেলে দিক ওদের জিনিস।'

প্যাটেল এবার বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বলল, 'গঙ্গম্মা, এমন সব অলুক্ষুণে কথা কেন বলে যাচ্ছ? এসো, এখানে বসে যা বলবার বলো।'

গৌরম্মা বসবার জন্য দালানে মাদুর পেতে দিল; গঙ্গম্মা এসে বসল তার ওপর। প্যাটেলও বসল সেখানে একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। ভাবী পাটোয়ারী চেন্নিগরায় এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিল, প্যাটেলের ডাক শুনে সেও এসে বসল ভিতরে। বর্তমান পাটোয়ারী শিবলিঙ্গেও বসে পড়ল দালানের একপাশে, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে। এবার প্যাটেল কথা বলল, 'শিবা, এই মহিলাকে তুমি বুঝিয়ে বল কেন তুমি চার্জ দিতে চাইছ না।'

শিবলিঙ্গে এবার প্রশ্ন করল গঙ্গম্মাকে, 'আপনার ছেলের বয়স কত?'

'উনিশ চলছে এখন।'

'সে তো আপনি বলছেন। কিন্তু সরকারী রেকর্ডে বলে এখন ওর ষোল বছর বয়স। ও এখনও নাবালক। নাবালককে সরকারী কাজ কি করে দেওয়া যায়?'

'ছেলে যখন জন্মেছে তখন তো আমার স্বামীই ছিলেন পাটোয়ারী, তিনি কি ওর মিথ্যে বয়স লিখে রাখবেন? ঠিক করে দেখ দিকি তুমি!'

'জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্টার আমার কাছে থাকে না। সেটা দেখতে হলে সরকারকে টাকা দিতে হবে। পঞ্চাশ টাকা ফেলুন, এখনি তিপটুরে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

জন্ম-মৃত্যুর রেজিস্টার পাটোয়ারীর কাছে থাকে কি না, সেটা দেখতে হলে সরকারকে মাশুল দিতে হয় কি না, আর দিলেও পঞ্চাশ টাকাই দিতে হয় কি না, এত খবর গঙ্গম্মার কিছুই জানা ছিল না। সে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে চেন্নিগ, তুইও তো এসব শিখেছিস, তুই কি বলিস এ ব্যাপারে?' ছেলে তখন মুখ বিকৃত করে ভাবছে। মা আবার প্রশ্ন করে, 'কি রে, কিছু বল?'

ছেলে এবার জবাব দেয়, 'আমি জানি না মা!'

'তুই যে বলেছিলি সব কিছু শিখে এসেছিস?'

শিবলিঙ্গে এবার বলে ওঠে, 'আমিও তো শুনেছিলাম তুমি নাকি হোন্নবল্লি থেকে সব কিছু শিখে এসেছ। তা সেই বোকারাম নিজে যদি জানে তবে তো শেখাবে তোমাকে! যাক গে, এখন বছর চারেক একে আমার এখানে ময়লার ঝুড়ি বইতে পাঠিয়ে দাও, আমিই সব শিখিয়ে দেব এখন।'

প্যাটেল শিবেগৌড় বলল, 'যেতে দাও ওসব কথা। গঙ্গম্মা, তুমি একে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে দাও, ওপর থেকে তোমার ছেলের সঠিক বয়সটা লিখিয়ে নিয়ে আসবে।'

'টাকা দিতে হবে কেন শিবেগৌড়?'

'সরকারী নিয়ম, ছেলেখেলা তো আর নয়?'

গঙ্গম্মার আর কিছু করার নেই। পঞ্চাশ টাকা না দিলে ছেলের বয়সের হিসেব পাওয়া যাবে না। আর ওটা না পেলে পাটোয়ারীগিরিও থাকবে নাগালের বাইরে। কিন্তু এত টাকা তো ঘরে নেই। বাড়িতে এসে খুঁজে দেখে সব বাক্স-প্যাঁটরা। পাওয়া গেল তিরিশটা ভিক্টোরিয়ার মোহর। তার সঙ্গে আরো ছ'পল্লী মড়ুয়া। নিয়ে গিয়ে শিবলিঙ্গেকে দিয়ে সে বলল, 'যত তাড়াতাড়ি পারো বয়সের হিসেবটা আনিয়ে দাও। আমাদের বংশের পাটোয়ারীগিরি ছেলের হাতে এসে যায় যেন, এটা আমি দেখতে চাই।'

দেখতে দেখতে কেটে গেল তিনমাস, কিন্তু কোন খবর নেই। গঙ্গম্মা খোঁজ নিতে গেলে শিবলিঙ্গে বলে 'সরকারী ব্যাপার, অত তাড়া দিলে কি চলে? চিঠিখানা প্রথমে যাবে ডেপুটি কমিশনারের কাছে, সেখান থেকে যাবে দেওয়ান মির্জা সাহেবের কাছে, তারপর ফেরত আসবে। একটু ধৈর্য ধরে থাক, আসবে ঠিকই। গায়ে বাছুর লেপটে থাকা গরুর মত ছটফটিয়ে তো লাভ নেই, ক'দিন সবুর কর।'

নিরুপায়ভাবে বাড়ি ফিরে আসে গঙ্গম্মা। ছেলেকে ডেকে বলে, 'দেখ চেন্না, মনে হচ্ছে কাজটা ফিরিয়ে দেবার মতলব নেই ওর। তুই নিজেই তিপটুর চলে যা, অফিসারের পায়ে পড়ে নালিশ কর গিয়ে।'

কিন্তু অফিসারের সঙ্গে একা দেখা করার সাহস নেই চেন্নিগরায়ের। সে ভাবে, আমার ওপর যদি ক্ষেপে যায় তখন কি করব? যদি আমার আসল বয়স জিজ্ঞাসা করে তখন কি বলব? হয়ত আসলে আমার বয়স ষোলই হবে, জন্মপত্রিকায় হয়ত ভুল হয়েছে। 'মা, আমি বোধহয় সত্যিই এখন ষোল বছরের। আরো দুবছর না হয় অপেক্ষাই করি?'

'ওরে রাঁড়ের ব্যাটা, আমি তোকে জন্ম দিয়েছি, আমি যে এখনও বেঁচে আছি রে! তোর বয়স আমি জানিনে? এবার উনিশ পূর্ণ হতে চলেছে। সোজা গিয়ে অফিসার সাহেবের পায়ে পড়', রেগে বলে ওঠে গঙ্গম্মা।

'মা, আমার বড় ভয় করে।'

'লজ্জা করে না তোর, কাপুরুষ কোথাকার! চল্, আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি।' গঙ্গম্মা কথাটা বলল বটে কিন্তু তারপর চুপ করে ভাবতে লাগল, মেয়েমানুষের সরকারী কাজে নাক গলান উচিত হবে কিনা। লোকে বলে মেয়েমানুষে সরকারী কাগজপত্র ছুঁয়েছে খবর পেলেই নাকি পুলিশে ধরে নিয়ে যায়। অফিসারের সামনে গিয়ে যদি দাঁড়াই, তিনি কি আর সহজে রেহাই দেবেন?

সুতরাং কিছুই সুরাহা হল না, এ মাসটাও কেটে গেল। অবশেষে গঙ্গম্মা একদিন বলল, 'যা হবার হবে। নাগলাপুরে গিয়ে তোর শ্বশুরের পরামর্শ নে। তিনি নিশ্চয় কিছু উপায় করতে পারবেন।'

৪

বিয়ের পর দেড়বছর কেটে গেছে কিন্তু চেন্নিগরায় এখনও পর্যন্ত একবারও শ্বশুর বাড়ি যায়নি। যাবার ইচ্ছা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু তারা যদি আমন্ত্রণই না জানায় তবে যাওয়া যায় কি করে? নিজে থেকে সে এতদিন যায়নি বোধহয় লজ্জা বা সঙ্কোচের জন্যই। এখন পাটোয়ারীগিরির জন্য মা নিজে থেকেই যেতে বলছে দেখে সে খুশি হয়ে উঠল। একদিন ভোর ভোর উঠে স্নান করে তিন আচমনেই চটপট পুজোপাঠ সেরে ফেলল সে। তারপর আহার করল বরবটির রুটি, চাটনী আর দই। পথে খাওয়ার জন্য একটা পুঁটলিতে বাঁধা হল তিনখানা রুটি আর চাটনী। বিয়ের কোট, পাড়ওয়ালা ধুতি ইত্যাদি পরে সাজগোজ করল। পায়ে জুতো বা চটি পরার অভ্যাস নেই, সুতরাং খালি পায়েই সে নাগলাপুরের উদ্দেশ্যে পশ্চিমমুখে রওনা হয়ে পড়ল। বার মাইল পথ হাঁটতে হবে।

রামসন্দ্র থেকে তিন মাইল দূরে একটা টিলার ওপর উঠতে হয়, সেটা পার হবার পরে চৌলা টিলা। কালোপাথরের এই ছোট পাহাড়টা থেকে নেমে দেখা যায় একটা বেলেমাটির পুকুর, তার চারদিকে পলাশ গাছের বন। নাগলাপুরের পথে এই পুকুরটা পার হবার পর একটা বালি-কাঁকর ভরা ছোট কুয়োর ধারে বসে চেন্নিগরায় তার পুঁটলিতে বাঁধা রুটি আর চাটনী খেয়ে নিল, তারপর কুয়ো থেকে আঁজলা করে জল খেয়ে আবার শুরু করল পথ চলা। চৌলা টিলা ডান দিকে রেখে চড়াই থেকে নামার পর লাল মাটির পুকুর আর তারই ওপারে কটিগেহল্লী। এখান থেকে আর একটু এগিয়ে গেলেই হুবিনহল্লী, এটা নাগলাপুরের এলাকার মধ্যে পড়ে। এই গ্রাম থেকে আরো একমাইল পথ হাঁটলেই দেখা যায় নাগলাপুরের বিশাল জলাশয়। কেয়াঝোপের পাশে পাশে পাকদণ্ডির পথ দিয়ে করবী ফুলের বনের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছন যায় সেই জলাশয়ের কাছে। এরপর বাকি থাকে আর মাত্র মাইল দুই পথ। জলাশয়ের ধারে ধারে মাইলখানেক হাঁটলেই গ্রামের সীমানা, তারপর বাজার, ব্যস, ততক্ষণে নাগলাপুর এসে গেল।

গ্রামের জলাশয়ের তীরে পৌঁছে একটু ভাবনায় পড়ে যায় চেন্নিগরায়, যদি কেউ চিনে ফেলে? যদি জিজ্ঞাসা করে বসে, এ সময়ে এখানে এসেছ যে হঠাৎ? শ্বশুরমশায় স্বয়ং যদি এই প্রশ্ন করেন তাহলেই বা কি জবাব দেওয়া যাবে? 'সে' কেমন আছে, কে জানে! আমার সঙ্গে কথা বলবে কি না তাই বা কে জানে? কথা না বললে সে হারামজাদীকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে! কতদিনে যে আমাদের গ্রামে আসবে, শুনছি তো তের বছর বয়স হয়ে গেল, যুবতী হতে আর কত দেরী কে জানে? এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে বাঁধের ওপর দিয়ে হাঁটছিল—গ্রামের সীমানা এসে গেছে, এখানে পৌঁছে আবার সে ইতস্ততঃ করতে লাগল। যে রাস্তা দিয়ে বরযাত্রী গিয়েছিল সেই পথেই সে চলেছে—যদি কেউ চিনে ফেলে তাহলে···?

এ গ্রামের বাড়িগুলো সবই একেবারে গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে, গ্রামের প্রবেশ পথ একটিমাত্র—পাটোয়ারী মার্গ। এ গ্রামের পাটোয়ারী শ্যামন্নাজী খুব দাপটের সঙ্গে নিজের ক্ষমতা জাহির করে থাকেন। সেই জন্যই এ পথের এই নাম। এই পথ ধরে কিছুটা এগিয়ে গেলে, যেখানে রাস্তাটা মোড় ঘুরেছে সেই মোড়ের প্রান্তে চেন্নিগরায়ের শ্বশুর কন্ঠীজোইসজীর বাড়ি। সে বাড়িটি অন্য বাড়িগুলোর চেয়ে বড়।

চেন্নিগরায়ের বুক ধড়ফড় করছিল, কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে আধখোলা দরজা ঠেলে সে প্রবেশ করল ভেতরে। কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সাহস সঞ্চয় করে এবার সে ডাক দিল, 'বাড়িতে কেউ আছে নাকি?'

রান্নাঘর থেকে বৃদ্ধার সাড়া পাওয়া গেল, 'কে গা? কালেগৌড় নাকি?'

'না, আমি রামসন্দ্র থেকে আসছি। স্বর্গীয় রামন্নাজীর ছেলে চেন্নিগরায়।'

'এসো বাবা এসো···' বলতে বলতে ব্যস্ত হয়ে এবার বেরিয়ে এল বৃদ্ধা। তাড়াতাড়ি একখানা চাদর বিছিয়ে বসতে দিল নাতজামাইকে, তারপর তামার একটি বড় পঞ্চপাত্রে করে জল এনে রাখল তার সামনে এবং কুশল প্রশ্নাদি করতে আরম্ভ করল। এই সময় বাগানের দিক থেকে বাড়িতে এসে ঢুকল চেন্নিগের বউ। ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার, সেখানে কেউ বাইরের লোক আছে এটা তার নজরেই পড়েনি, সে তার সবুজ রঙের শাড়ি আর জামা ঝাড়তে শুরু করল।

'ওরে নন্‌জা, তোর বর এসেছে যে! ওখানে বসে রয়েছে, আঁধারে দেখতে পাসনি নাকি?' এই কথা শুনেই বউ এমন চমকে উঠল যে শাড়িতে পা বেধে হুড়মুড়িয়ে পড়ল আছাড় খেয়ে, পর মুহূর্তেই উঠে আবার ছুট লাগাল বাগানের দিকে।

ঠাকুমা ততক্ষণে জামাইকে হাত-মুখ ধোবার জল দিয়েছেন। এরপর কড়ি, পাঁপড়, আচার, দই ইত্যাদি পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে বসিয়েছেন তাকে। বৃদ্ধার উপরোধে পরে চেন্নিগরায় 'না, না, আর দেবেন না', ইত্যাদি বলতে বলতেও শেষ পর্যন্ত আকন্ঠ খেয়ে ফেলল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর জানা গেল শ্বশুরমশাই গ্রামে প্রায়ই থাকেন না। ঘোড়ায় চড়ে চন্নরায়পট্টন, নরসীপুর, হাসান এই সব জায়গায় ঘুরে বেড়ান। এবার প্রায় দিন-কুড়ি আগে বেরিয়েছেন, হয়ত আর দু-তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন। চেন্নিগরায় ভাবল, 'যখন এসেই পড়েছি, দেখাটা না করে চলে যাওয়া উচিত হবে না।' বৃদ্ধাও অনুরোধ করল থেকে যাবার জন্য, সুতরাং ক'দিন থেকেই গেল সে। পাড়া-পড়শীরা ওকে এদিক-ওদিক বেড়াতে নিয়ে গেল, কন্ঠীজোইসজীর খেত-খামার ইত্যাদিও দেখিয়ে আনল। দ্বিতীয় দিন সকালে বৃদ্ধা ওকে তেল

মাখিয়ে স্নান করালেন। কিন্তু নন্‌জম্মার চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সেদিন আবছা অন্ধকারে ভিজে শাড়ী ঝেড়ে শুকোতে দেবার সময় সেই যে এক ঝলক তাকে দেখা গিয়েছিল, ব্যস, সেই শেষ। তারপর আর তার দেখাই নেই। প্রতিবেশীদের বাড়ি বেড়াতে যেতেও চেন্নিগের লজ্জা করে, কাজে কাজেই সময় আর কাটতে চায় না। বাড়িতে যেমন করত এখানেও তেমনি ভোরে উঠে স্নান করে, তারপর মাথায় কপালে বিভূতির রেখা এঁকে সন্ধ্যাবন্দনা ও এক হাজার আটবার গায়ত্রী উচ্চারণ করে থাকে। তবে গ্রামে এটা করত ভিজে কৌপীন পরে, এখানে তার বদলে পরনে থাকে ভিজে গামছা। এসব দেখে শুনে বুড়ী ঠাকুমা ভারি খুশি।

চতুর্থ দিন প্রায় মাঝরাতে হঠাৎ শোনা গেল গলির কুকুরগুলো সমস্বরে ডাকছে। তার মধ্যেই কারো মুখে অস্ফুট গালাগালও শোনা গেল 'তোর বোনের ...'। বাড়ির কাছেই মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। এরপরই দরজায় কে যেন আঘাত করল, ডাক শোনা গেল, 'নন্‌জা, দরজা খোল।' চেন্নিগরায় বুঝল শ্বশুরমশাই ফিরে এসেছেন, কিন্তু উঠে গিয়ে দরজা খুলতে তার সঙ্কোচ বোধ হল। সে চুপচাপ চোখ বুজে পড়ে রইল কম্বল-মুড়ি দিয়ে।

রান্নাঘরে ঠাকুমার কাছে শুয়েছিল নন্‌জম্মা। সেও বুঝেছে বাবা ফিরে এসেছেন। কিন্তু ওদিকে সামনের ঘরেই যে স্বামী শুয়ে রয়েছেন, সেখানে গিয়ে দরজা খুলতেও যে লজ্জা করছে। অগত্যা বুড়ী ঠাকুমাকেই ঠেলে তোলে সে। বুড়ী উঠে আলো জ্বেলে গিয়ে খুলে দেয় বাইরের দরজা। কন্ঠীজোইসজী সেই দরজা দিয়েই ঘোড়াটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে পেছনের বাগানে নিয়ে গিয়ে বেঁধে দিলেন। তারপর ভেতরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন 'ওখানে শুয়ে কে?'

'চেন্নিগরায় এসেছে যে, আজ চারদিন হয়ে গেল। তোমারই অপেক্ষায় বসে আছে।'

'চেন্নিগরায়?' এমন জোর গলায় বলে উঠলেন কন্ঠীজোইসজী, যে মনে হল যেন কেউ মাথায় এক ঘা কষিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধা বলে উঠল, 'আহা ঘুমোচ্ছে বেচারা, এখন জাগিও না।' চুপ করে গেলেন কন্ঠীজোইস। খাওয়া-দাওয়া সেরেই এসেছেন সুতরাং এখন আর কিছু খাবেন না। তবে তামাকটা চাই। জুতো মোজা কোট প্যান্ট ছেড়ে ধুতি পরে ফেললেন, তারপর মেয়েকে আর না জাগিয়ে চুপচাপ জামাইয়ের পাশের ঘরখানায় শুয়ে পড়লেন একখানা চাদর বিছিয়ে।

সকালে ঘুম ভাঙল বেলা দশটায়। জামাইয়ের কুশল সমাচার নেওয়া হল। সে সমস্ত কথাই খুলে বলল। শিবলিঙ্গে কিভাবে তার মায়ের কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা আদায় করেছে, সে কথাও জানাল চেন্নিগরায়। শুনে কন্ঠীজোইসজী চটে বললেন, 'তোমার ঘটে কি বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই, মাথার মধ্যে কেবল গোবর পোরা? পাটোয়ারীগিরির নিয়ম-কানুন তো কিছুই জান না দেখছি, কাজটা করবে কি করে শুনি?'

চেন্নিগরায় কোন মতে ঘাড় নেড়ে শেষে মাথা নিচু করে বসে রইল। বুড়ীও বসে ছিল সেখানে।

এসব কথা বুড়ীর আগেই শোনা হয়ে গেছে। জামাইকে এভাবে ধমক দেওয়াটা তার মোটেই পছন্দ হল না। সে বলে উঠল, 'হ্যাঁরে কন্ঠী, তুইও এমনি করে কথা শোনাবি? ও বেচারী

ছেলেমানুষ, কি বোঝে এখন? কড়া কথা ছাড়া আর কিছু কি বলতে শিখিস নি? যা বাপু, কোন রকমে ওর কাজটা ওকে পাইয়ে দে।'

এরপর কন্ঠীজোইসজী আর কোন কথা বললেন না। স্নান ও সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপন করে অন্দরমহলে এলেন খাওয়ার সময়। চাল দিয়ে থালি-পিঠা আর বেগুন পোড়া রেঁধেছে নন্‌জম্মা। ঠাকুমা পরিবেশন করল, শ্বশুর আর জামাই একসঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া করলেন। খাওয়ার পর তামাক খেতে খেতে তিনি জামাইকে রামসন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। চেন্নিগরায়ের যা জানা ছিল যথাসাধ্য উত্তর দিল সে। জোইসজীর খেতে লাঙল দেয় হোন্না, তাকে ডেকে পাঠিয়ে তার হাতে একখানা চিঠি দিলেন তিনি। তারপর নির্দেশ দিলেন, 'সোজা চলে যাও শ্রবণবেলগোলা, সেখানে আমার ছেলে পুলিশের কন্‌স্টেবল কল্লেশকে এই চিঠি দিয়ে চটপট এর জবাব নিয়ে আসবে।' এরপর জোইসজী একেবারে চুপচাপ হয়ে গেলেন। আর কোন কথাবার্তা হল না জামাইয়ের সঙ্গে। জোইসজী ফিরেছেন এ খবর গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে, সুতরাং ভূত নামানো, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র পুজোপাঠ ইত্যাদির প্রয়োজনে অনেক লোক আসতে শুরু করল। বাইরের ঘরে ভীড় জমে গেছে দেখে ঠাকুমা বুড়ী জামাইকে ডেকে নিয়ে এলেন রান্নাঘরে। কারণ তাঁর মনে হচ্ছিল ভীড় দেখে জামাই হয়ত ঘাবড়ে যাবে। নন্‌জম্মা এবার রান্নাঘর ছেড়ে পালাল খামার বাড়ির দিকে।

পরদিন বেলা এগারটা নাগাদ হোন্না ফিরল শ্রবণবেলগোলা থেকে। এসে সে জোইসজীর হাতে দিল একখানা কাগজ। হোন্না চলে যাবার পর জোইসজী মাকে ডেকে বললেন, 'অক্কম্মা, ও আর আমি আজ রাতে রামসন্দ্র যাব।'

'ওমা সে কি? আজই চলে যাবে? এখনও তো একদিনও ভাল-মন্দ কিছু খাওয়ানোই হল না।'

'আজ সন্ধ্যায় খাইয়ে দাও। রাতে খাবার জন্য পায়েস রাঁধ না আজ!'

'তুই তো সাক্ষাৎ কোল্লিদেব,* রাত-বিরেতে ঘুরে বেড়াস। কিন্তু ওকে কেন এই অন্ধকারে নিয়ে যাবি?'

'ও কি কচি খোকা নাকি? পুরুষ মানুষ জেনেই তো ওর হাতে মেয়ে দিয়েছি আমি।' অন্ধকারকে অবশ্য বিশেষ ভয় পায় না চেন্নিগরায়, কিন্তু ভূত, পিশাচ এরাও তো আবার অন্ধকারেই ঘোরাফেরা করে, তাদের কথা ভেবে ওর বেশ ভয় করতে লাগল, বুকের মধ্যে ঢিবঢিব করতে শুরু করল। তা ছাড়া সবাই বলে চোলেশ্বরের টিলার কাছে নাকি বাঘের ভয়ও আছে। কিন্তু এসব কথা বলতে গেলে হয়ত শ্বশুরমশায়ের কাছে বকুনি খেতে হবে সেই ভয়ে সে চুপ করেই রইল।

বৃদ্ধা তাড়াহুড়ো করে তৈরী করল 'কোড়বলে'। চাক্‌লীর জন্য নন্‌জম্মা আগের দিন আটা পিষে রেখেছিল, সেগুলি আজ ভাজা হল। রাতের আহারে দেওয়া হল পায়েস। তারপর জোইসজী জুতো-মোজা, সাদা প্যান্ট, খাঁকি কোট ইত্যাদি পরে প্রস্তুত হয়ে মাথায় টুপীটা চাপালেন। সকাল বেলাই নাপিত এসে ক্ষৌরকর্ম করে গেছে. ঘন দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে মুখখানা প্রায় ঢেকে

---

* পিশাচ, যাঁরা রাতে মশাল হাতে পথ চলে।

গিয়েছিল। ঘোড়ার পিঠে জিন কষা হল, লাগাম পরানো হল। জামাকাপড় একটা থলির মধ্যে ভরে জিনের সামনের দিকটায় দু'পাশ থেকে ঝুলিয়ে দিলেন। রওনা হবার পূর্বে চেন্নিগরায় বৃদ্ধা ঠাকুমা ও শ্বশুরমশাইকে প্রণাম করল। ঠাকুমা নন্‌জম্মাকে ডাক দিল স্বামীকে প্রণাম করার জন্য; কিন্তু নন্‌জম্মা কিছুতেই সামনে এল না। শেষে জোইসজী নিজে যখন ডাকলেন, তখন এসে দূর থেকেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পালাল। বউয়ের মুখখানি দেখার খুবই ইচ্ছে ছিল চেন্নিগরায়ের, কিন্তু শ্বশুরমশাই সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাই সে লজ্জায় সেদিকে চোখ তুলে দেখতেই পারল না।

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ওরা রওনা হয়ে গেলেন। অমাবস্যার রাত। চারিদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। গ্রামের বাইরে এসে জোইসজী জামাইকেও ঘোড়ায় উঠে বসতে বললেন, কিন্তু সে রাজি হল না কিছুতেই, বলতে লাগল, ভয় করে, যদি পড়ে যায়। শ্বশুর বললেন, 'তিনি ধরে থাকবেন', কিন্তু তাতেও চেন্নিগ রাজি নয়, 'না না, আপনি যাই বলুন, ও আমি পারব না কিছুতেই' এই বলে কাটিয়ে দিল।

'বেশ তবে হেঁটেই চল'---বলে জোইসজী এমন জোর কদমে পা চালালেন যেন সামনের পথ একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘোড়াটা পিছন পিছন আসতে লাগল। তারও প্রায় দশ-বার গজ পিছনে চেন্নিগরায়। শ্বশুর চলেছেন নিঃশব্দে। নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে বাতাসের শন্ শন্ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

৬

বাঁধের চড়াই ভেঙে ওরা পুকুরটা পার হয়ে এল, তারপর পেরিয়ে এল হুবিনহল্লী আর কটিগেহল্লী। এখন চোলেশ্বর টিলার পশ্চিম দিকের উৎরাইটা নামার আগে যে লালমাটির পুকুরটা পড়ে তারই পাশ দিয়ে চলেছে ওরা। আট মাইল পথ অতিক্রম করা হয়ে গেছে।

কন্ঠীজোইসজী চলেছেন আগে আগে। তাঁর পেছনে চলেছে তাঁর টগবগে ঘোড়া। অন্ধকারে সাদা ঘোড়ার আকৃতিটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে মত দেখা যাচ্ছে, আর তারই পেছন পেছন ক্লান্ত পদক্ষেপে, কখন হেঁটে কখনও বা দৌড়ে ওদের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে চেন্নিগরায়। হঠাৎ শ্বশুরমশাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। আচমকা ঘোড়াটাও থেমে গেল এবং তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল জামাইও। এদিক ওদিক চেয়ে চোখে পড়ল কিছুদূরে পথের ডান দিকে আলো দেখা যাচ্ছে। শ্বশুরমশাই বললেন, 'একটু এগিয়ে এসো। ঘোড়াটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসতে শ্বশুর আলোর দিকে ইশারা করে বললেন 'ঐ দেখ'। সেদিকে ভাল করে চেয়ে দেখতে গিয়েই চেন্নিগরায়ের তো সারা গা দিয়ে দরদর করে ঘাম ছুটতে লাগল, হাত-পা কাঁপতে লাগল থর থর করে।

প্রায় কোমর সমান উচ্চতাবিশিষ্ট এক চণ্ডীপ্রতিমা বীরাসনে দণ্ডায়মানা, উন্মুক্ত মুখ-গহবরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে রয়েছে রক্তরঞ্জিত জিহবা। মনে হচ্ছে যেন রক্ত লেহন করছে। কণ্ঠে বিরাট এক করবী ফুলের মালা। দু'পাশে মশালের মত জ্বলছে দুটি মৃৎপ্রদীপ। সামনে পড়ে আছে ছিন্ন শির তিনটি মোরগ, তার পাশে দ্বিখণ্ডিত চালকুমড়ো, দুই-তিন গুচ্ছ কলা, চারদিকে ছড়িয়ে আছে কুঙ্কুম, প্রতিমার সর্বাঙ্গেও মাখান হয়েছে হলুদ ও কুঙ্কুম চূর্ণ। কাঁচা সুতো, তামার

পাত, তাবিজ-মাদুলী। মানুষ বা পশুর হাড়গোড় ইত্যাদি নানারকম জিনিস ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিমার আশেপাশে।

ঘন অন্ধকারের মধ্যে আলোর আভায় প্রতিমা যেন জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভূতা মনে হচ্ছে। শ্বশুর আবার বললেন, 'দেখছ তো' ?

বহু কষ্টে চেন্নিগরায় জবাব দেয় 'হুঁ', তার জিভ তখন ভয়ে অসাড় হয়ে গেছে।

'যাও, ওখানে গিয়ে ঐ মূর্তির বুকে লাথি মেরে ভেঙে দাও, আর তুলে নিয়ে এসো ঐ কলার গুচ্ছ, অনেক পয়সা পেয়ে যাবে।'

থর থর করে কেঁপে ওঠে চেন্নিগরায়, সভয়ে তোৎলাতে তোৎলাতে বলে ওঠে, 'না, না, না।'

'বেশ তবে ঘোড়াটার লাগাম ধরে এখানে দাঁড়াও, আমিই যাচ্ছি।' জামাইয়ের হাতে লাগামটা ধরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যান কন্ঠীজোইসজী। সোজা প্রতিমার সামনে গিয়ে তুলে নেন কলার গোছা। মিনিট দুই মূর্তিটির দিকে চেয়ে থাকেন পরখ করার ভঙ্গিতে, তারপর মূর্তির দুই বাহু, জিভ, মাথা হাঁটুর খাঁজ সর্বত্র হাত চালিয়ে খুঁজে খুঁজে কি যেন বার করতে থাকেন, সম্ভবতঃ রূপোর টাকা। অবশেষে জুতোসুদ্ধ বাঁ পা তুলে প্রতিমার বুকে সজোরে মারেন এক লাথি। প্রতিমা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। সেই সঙ্গেই ছড়িয়ে পড়ে আরো রৌপ্যমুদ্রা, মনে হল যেন কিছু আশরফিও আছে তার মধ্যে। সমস্ত টাকা-পয়সা খুঁজে কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ভরে এবার ফিরে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরেন তিনি, তারপর বলেন, 'চল'। আবার শুরু হয় পথ চলা।

এবারেও সবার আগে কন্ঠীজোইসজী, তারপর তাঁর ঘোড়া ও সবশেষে চলেছে চেন্নিগরায়। তার পেছনে পড়ে রয়েছে খণ্ডিতা চণ্ডীপ্রতিমা। পিছু ফিরে সেদিকে দেখতেও ভয় করছে। কিন্তু হঠাৎ পেছন থেকে এসে যদি গলা টিপে ধরে—সেই আতঙ্কে মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে না দেখেও থাকতে পারছে না। আগের মতই চারিধার নিস্তব্ধ। শ্বশুরমশাই তো বিনা বাক্যব্যয়ে পিশাচের মত তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছেন। কথাবার্তা বললে ভয়টা যদি কিছু কমে এই আশায় চেন্নিগ তোৎলাতে তোৎলাতে প্রশ্ন করে, 'ও, ওটা কি-ক্কি ছিল ?'

'আজ অমাবস্যা কি না !'

'ত্-তাতে কি ?'

'কারো জন্য তুক্ তাক্ করা হয়েছে আরকি। করিগেরে বীরাচারী নামে একটা লোক আছে, এই সব তারই কাজ। যে তুক্ করায় তার সামনে পুজোটা করে তখনকার মত তার সঙ্গেই সে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে প্রতিমার জিভ আর হাতের মধ্যে লুকোন টাকা-পয়সা আর কলা ইত্যাদি নিয়ে যায়। আজ বেচারা ফিরে এসে পাবে শুধু মাটির ঢেলা।'

'ও-ওটাকে ছুঁয়ে আ-আপনি যে কি সব বার করলেন ? এ-এখন আ-আপনার কিছু হবে না তো ?'

'নিজের বুকে হাত দিয়ে বুঝতে হবে ! যদি তুমি প্রকৃত সাহসী হও কেউ তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। তবে এমন কাপুরুষ অনেক আছে যারা আতঙ্কেই রক্তবমি করতে শুরু করে দেবে।'

এই শেষের কথাগুলো শুনে খুবই ভয় পেয়ে গেল চেন্নিগরায়। তবে ইতিমধ্যে ওরা টিলাটা পার হয়ে এসেছে। এখান থেকে সেই তুক্তাকের জায়গাটা আর দেখা যাচ্ছে না। এতক্ষণে

ভয়টা দূর হয়েছে কিছুটা। সাহস সঞ্চয় করে এবার সে পেছন ফিরে তাকাল, কিন্তু ঘন কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। উৎরাই আরম্ভ হয়ে গেছে, পলাশের জঙ্গলও প্রায় শেষ হয়ে এল। শ্বশুরমশাই এই উৎকট অন্ধকারের মধ্যেও এমন জোর কদমে এগিয়ে চলেছেন যে, মনে হচ্ছে সমস্ত পথ যেন ওঁর নখ-দর্পণে।

৭

রাত্রি প্রায় দুটোর সময় দুজনে বাড়ি এসে পৌঁছলেন। কণ্ঠীজোইসজীর ছেলে, পুলিশের কনস্টেবল কল্লেশ একজন হাবিলদার সঙ্গে নিয়ে এঁদের আগেই এখানে এসে পৌঁছে গেছে। গঙ্গম্মা ও অপ্পন্নায়া দুজনেই ওদের কুটুম্ব কল্লেশকে দেখে চিনতে পেরেছিল। প্রায় আধ ঘন্টা আগে তাঁরা এসেছে। দু'জনেরই পরনে খাঁকি উর্দি, পায়ে পট্টি জড়ানো মোজা ও জুতো পরা। দু'জনেরই অঙ্গে পুরোদস্তুর পুলিশের পোশাক, গায়ে গরম ওভারকোট এবং হাতে পুলিশের ছড়ি। এই সময় এঁরা কেন এসেছে তা গঙ্গম্মা কিছুই বোঝেনি এবং এঁরাও কোন কথা খুলে বলেনি। অতিথিদের গঙ্গম্মা গরম গরম থালি-পিঠা ভেজে খাইয়েছে। কফি তৈরী করতে সে জানে না, তাছাড়া এত রাতে দুধও পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই অতিথিরা নিজেদের সঙ্গে আনা কফিপাউডার গুড় দিয়ে গুলে তাই পান করেছে। এঁদের কাছেই খবর পাওয়া গেছে যে চেন্নিগরায়ও তার শ্বশুরের সঙ্গে রাত্রেই এসে পৌঁছচ্ছে।

ঘোড়া আর জামাইসহ এসে পৌঁছবার পর কণ্ঠীজোইসজী নিজের ছেলেকে পাটোয়ারীগিরি সংক্রান্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন। অবশেষে তিনি ঘোষণা করলেন, 'চল, এখনি গিয়ে চার্জটা একে পাইয়ে দেওয়া যাক।'

কল্লেশের সঙ্গী জমাদারটি এবার প্রশ্ন করল, 'কি করে চার্জ দেওয়াবেন ?'

'আপনি চুপচাপ শুধু আমার সঙ্গে এসে দেখুন কি হয়', এই বলে বাইরে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলেন কণ্ঠীজোইসজী, তারপর জামাইকে বললেন, 'চল, এবার তার বাড়িটা কোথায় দেখিয়ে দাও।'

ব্যাপারটা চেন্নিগরায়ের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না, বেশ ঘাবড়ে গেছে সে। বকুনী খাবার ভয়ে কোন প্রশ্ন করতেও সাহস হচ্ছে না। আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সে। তার পেছনে ঘোড়সওয়ার কণ্ঠীজোইসজী এবং তাঁর দুই পাশে দুই জাঁদরেল পুলিশ। শিবলিঙ্গেগৌড়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে বাজখাঁই গলায় বললেন জোইসজী, 'দরজায় ধাক্কা মেরে জাগাও লোকটাকে।'

চেন্নিগরায় দরজার কড়া নাড়তে ভিতর থেকে শিবলিঙ্গের বউ সাড়া দিল, 'কে ?'

'শিবম্মা, আমি চেন্নিগ। শিবলিঙ্গেগৌড়কে ডেকে দাও', চেন্নিগের কথা শেষ না হতেই শিবলিঙ্গে উঠে এসে দরজা খুলল এবং ঘুমজড়ানো গলায় ধমকে উঠল, 'কি ? হয়েছেটা কি ? এই অসময়ে ঘুম ভাঙাতে এসেছ, তোমাকে একটু আক্কেল বিবেচনা শেখাবার মত কি কেউ নেই ?' কথা বলতে বলতেই এবার ওর নজরে পড়ল ঘোড়ায় চড়া কণ্ঠীজোইসজী এবং তাঁর সঙ্গে দুই পুলিশ। তার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। মুখ দিয়ে আর কোন শব্দ শোনা গেল না। ঘোড়-সওয়ার বীরবিক্রমে হুকুম দিলেন, 'হাবিলদার একে গ্রেপ্তার করো।' দুপাশ থেকে পুলিশ

এসে তার দুই হাত চেপে ধরল। দরজার পাশ থেকে চিৎকার করে উঠল শিবম্মা, 'হায়, ভগবান! কি অপরাধ করেছে আমার স্বামী?' এবার গর্জে উঠল কল্লেশ, 'কথা বললে তোকেও নিয়ে গিয়ে নেকড়েদের মধ্যে ফেলে দেব। একদম চুপচাপ থাক।' এই কথা শুনে সে দু'হাত তুলে নিজের মুখ চাপা দিয়ে ফেলল।

ঘোড়া থেকে নেমে আদেশ দিলেন কন্ঠীজোইসজী, 'ভিতরে চলো।' শিবলিঙ্গেকে পুলিশ ধাক্কা দিয়ে নিয়ে এল ভিতরে। ভিতর থেকে দরজায় শিকল তুলে দিয়ে এবার কন্ঠীজোইসজী প্রশ্ন করলেন, 'আমার কাছে নাশিল এসেছে, জন্মতারিখ খোঁজ করাবার অজুহাতে তুমি পঞ্চাশ টাকা ঠকিয়ে নিয়েছ? হারামজাদা, বদমাশ, তোমার ফাঁসী হবে তা জান?'

'ও-ওকে এ-এ-এ বারটা ছেড়ে দিন', বলতে গেল চেন্নিগরায়, কিন্তু ঘোড়সওয়ার তাকেও প্রচণ্ড এক ধমক দিলেন, 'তুমি চুপচাপ থাক।' এবার সেও দুই হাতে নিজের মুখ চাপা দিল। শিবলিঙ্গের দিকে ফিরে আবার গর্জে উঠলেন, 'রাজার সরকার এটা, স্বয়ং দেওয়ান মির্জা সাহেবের হুকুম। কোনরকম জোচ্চুরি চলবে না এখানে। ব্যাটা বান্ ···, ভেড়ুয়া, ছেনালের ব্যাটা, সরকারের নাম করে নিজের পেট ভরাস, এত সাহস? ইংরেজ সরকার থেকে হুকুম হয়েছে তোর শূলদণ্ড হবে। এই, একে বেড়ি লাগিয়ে দাও।'

শুনতে শুনতে শিবলিঙ্গে থর থর করে কাঁপছিল। এবার তার স্ত্রী গিয়ে আছড়ে পড়ল ঘোড়-সওয়ারের পায়ে। তিনি বললেন, 'বার করো সেই পঞ্চাশ টাকা।'

শিবলিঙ্গে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে ওঠে 'ঐ লো-লোহার বাক্সে, তা-তালা খুলে বের করে দাও।'

বউ বিছানার নিচে থেকে চাবী নিয়ে বাক্স খুলে গুনে গুনে বের করে দেয় রূপোর টাকাগুলো।

'ইনস্পেক্টর, এই টাকা পকেটে রাখ, কাল খাজনায় জমা দিতে হবে।' ঘোড়সওয়ারের আদেশে হাবিলদার টাকা তুলে নেয়।

ঘোড়সওয়ার এবার এর পরের প্রসঙ্গে এলেন, 'শালা, বজ্জাত, ভেড়ুয়া কোথাকার, পাটোয়ারী-গিরির চার্জ একে দিতে এত দেরী হচ্ছে কেন?'

'আজ্ঞে, না——না' তোৎলাতে থাকে শিবলিঙ্গেগৌড়।

'ওর হাত ছেড়ে দাও', ঘোড়সওয়ারের হুকুম শুনে পুলিশেরা হাত ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। এবার হুকুম হয়, 'কাগজ কলম নিয়ে এসো।'

শিবলিঙ্গে কাগজ ও কলম আনবার পর ঘোড়সওয়ার আবার গর্জন করে ওঠেন, 'যেমনভাবে বলব ঠিক তেমনি লিখে যাবে ··· হুঁঃ। লেখ, সন উনিশ শ ··· মহীশূর রাজ্যের মহারাজ-সরকারের তুমকূর জিলা, তিপটূর তালুক, কম্বনকেরে বিভাগের অন্তর্গত রামসন্দ্র গ্রামের স্থায়ী পাটোয়ারী স্বর্গীয় রামন্নাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচেন্নিগরায় মহাশয়কে, আমি, অর্থাৎ উপরোক্ত জিলা ও তালুকের অন্তর্গত রামসন্দ্র গ্রামের বর্তমান পাটোয়ারী শিবলিঙ্গেগৌড় এই লিখিত চুক্তি অনুসারে কার্যভার সমর্পণ করিতেছি, কারণ এই কার্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই, এবং আমি এতদিন এই কার্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলাম। তিনি নাবালক হওয়া হেতু আমাকে এতদিন পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করিতে দেওয়া হইয়াছিল, বর্তমানে, প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে তিনি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় আজ ··· তারিখে উপরোক্ত কার্যের অধিকার তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছি। এই চুক্তিপত্র এবং এই কার্য সংক্রান্ত হিসাবের নথিপত্র বিধি অনুসারে তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিতে আমার

বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। পরিশেষে ইহাও জানাই যে, কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ায় এই সরকারী দায়িত্ব পালনে আমি অসমর্থ, সেই কারণে সরকারী হুকুমনামা আসিবার পূর্বেই আমি এই দায়িত্বভার তাঁহাকে সমর্পণ করিতেছি। তিনি অনুগ্রহপূর্বক এই কার্যভার গ্রহণ করুন।' যা যা বলা হল শিবলিঙ্গে ঠিক সেইভাবে সব কথা লিখে দিল। এরপর কাগজপত্রের তালিকা—অর্থাৎ এক নম্বর ব্যবহার খাতা, দুই নম্বর বঞ্জর খাতা ইত্যাদি বার রকম খাতাপত্রের নাম লেখা হল, সবশেষে নিচে শিবলিঙ্গেগৌড় নিজের নাম স্বাক্ষর করে দিল।

এই কাগজখানা হস্তগত ক'রে তারপর তাকে সমস্ত খাতাপত্র বার ক'রে দেবার জন্য আদেশ করা হল। বড় বড় পুঁটলি বাঁধা রেজিস্টারের গোছা সামনে নিয়ে আসার পর হুকুম হল, 'তুমি এবং তোমার স্ত্রী এগুলো বয়ে নিয়ে যাও চেন্নিগরায়ের বাড়িতে।"

শিবলিঙ্গেগৌড়, তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েরা সবাই মিলে কাঁপতে কাঁপতে সেই খাতার রাশি পৌঁছে দিয়ে এল। কন্ঠীজোইসজী শাসিয়ে দিলেন, 'ল্যাজ নাড়বার চেণ্টা করলেই খতম করে দেব। একদম মুখ বন্ধ করে দু'জনে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়। পুলিশ এইখানে এখন টহল দিয়ে বেড়াবে।'

শিবলিঙ্গেগৌড় নিঃশব্দে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বাড়ি ফিরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। স্বপ্নের মত এইসব অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটতে দেখে এখনও তার গায়ে যেন কাঁটা দিচ্ছে। কাঁপুনি তার আর থামতেই চায় না। অবস্থা দেখে তার স্ত্রী সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগল যে, তবু যা হোক এর চেয়ে বেশী কোন বিপদ ঘটেনি এই রক্ষা।

এদিকে পুলিশরা এসেই ঘুমিয়ে পড়েছে। গঙ্গম্মা, অপ্পন্নায়া আর চেন্নিগরায় শুয়েছে রান্না-ঘরে। চেন্নিগরায়ের চোখে ঘুম নেই, ভয়ের চোটে তার মনে হতে লাগল জ্বর আসছে। কন্ঠীজোইসজী ঘুমিয়েছিলেন কিনা কেউ দেখেনি, তবে রাত্রে তাঁর বোধ হয় ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। কারণ সকালে উঠে দেখা গেল সেই তুক পুজোর কলার ছড়ার মধ্যে দু-ছড়া কলার খোসা পড়ে রয়েছে থামের পাশে। সকাল সাতটার সময় তিনি অপ্পন্নাকে বললেন, গ্রামের চৌকিদারের কর্মচারীকে ডেকে নিয়ে আসতে। সে এসে পৌঁছবামাত্র হুকুম দিলেন, 'সারা গ্রামে নাকাড়া বাজিয়ে ঘোষণা করে দাও—চেন্নিগরায় এখন থেকে পাটোয়ারী, সবাইকে তার কথা মেনে চলতে হবে, অন্যথা করলে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।' পুলিশরা ভিতরে শুয়ে এখন ঘুমোচ্ছে, তাঁদের টুপী, জুতো ইত্যাদি বাইরে খুঁটির গায়ে ঝুলছে সেটাও দেখিয়ে দেওয়া হল লোকটিকে। কারিন্দা (কর্মচারী) আভূমি প্রণত হয়ে নমস্কার করে চলে গেল। আধ ঘন্টার মধ্যে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। কল্লেশের সঙ্গে যে হাবিলদার এসেছিল তাকে পঁচিশ টাকা দিলেন কন্ঠীজোইসজী। বাকি পঁচিশ টাকা নিজের পকেটে ভরে তিনিও ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিলেন। এখন কম্বনকেরে গিয়ে এলাকাদারের সঙ্গে দেখা করে পাটোয়ারীগিরি কাজটার বিধিমত ব্যবস্থা করতে হবে। কল্লেশ আর অন্য হাবিলদারটি খাওয়া-দাওয়ার পর ফিরে গেল শ্রবণবেলগোলায়।

কন্ঠীজোইসজী ফিরে এলেন রাত্রি দশটায়, চেন্নিগরায়ের তখন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। গঙ্গম্মা ছেলের কপালে ওষুধ দিয়ে পটি বেঁধে দিয়েছে। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে চেন্নিগরায়—'হায়, হায় আমি লাথি মারি নি মা। আমার ভুল হয়েছে মা!' কেউ কিছু বুঝতে পারছে না এসব কথার অর্থ কি। কন্ঠীজোইসজী ভিতরে এসে তার অবস্থা দেখেই ব্যাপার বুঝলেন। একটা

শরের কলম আনিয়ে তাতে একটা মণ্ডল এঁকে সেটা গোল করে পাকিয়ে তার ওপর কাঁচা সুতো জড়িয়ে সেটা বেঁধে দিলেন। তারপর একটা নারকেল ভেঙে তার জলটা তিনবার রোগীর সামনে উৎসর্গ করে তার মুখের ওপর সেই জলের ঝাপটা দিতে লাগলেন। তাবিজটাও উৎসর্গ করে বেঁধে দিলেন রোগীর গলায়। মন্ত্রপাঠ করতে করতে তার সর্বাঙ্গ ঝাড়লেন তিনবার, তারপর মাথায় স্পর্শ করলেন চারবার। গঙ্গম্মাকে বললেন লবঙ্গ, আদা, লঙ্কা ইত্যাদি একসঙ্গে ফুটিয়ে পাঁচন তৈরী করতে, সেই পাঁচন খাওয়ানো হল চেন্নিগরায়কে। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় দিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন দেখা গেল জ্বরটা গত রাত্রেই সম্পূর্ণ ছেড়ে গেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ননজম্মা ঋতুমতী হবার পর দ্বিরাগমনে শ্বশুর বাড়ি এসেছে। ইদানীং পত্নীর প্রয়োজন চেন্নিগরায় খুব বেশী করেই অনুভব করছিল, অর্থাৎ তার ওপর নিজের কর্তৃত্ব ফলাবার ইচ্ছেটা ক্রমশঃ মাথাচাড়া দিচ্ছিল। কর্তৃত্ব ফলানো মানে চেন্নিগরায়ের ধারণায় ধমক-ধামক মারধোর ইত্যাদি--- কিন্তু ঐ ব্যাপারগুলো আবার চেন্নিগরায়ের ঠিক আসে না। নিরীহ গরু-বাছুরকেও মারবার সাহস তার নেই। কেবল মুখের জোরেই সে স্ত্রীর ওপর যতটা সম্ভব দাপট দেখাবার চেষ্টা করে। ছিনাল, রাঁড় ইত্যাদি জঘন্য শব্দ সে অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারে। সুতরাং ঐগুলোর সঙ্গে আরো কিছু বিশেষণ জুড়ে দিয়ে সে পত্নীকে গালিগালাজ করেই আশ মেটায়। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, অকথ্য ভাষা প্রয়োগে চেন্নিগের কিছু শক্তির অভাব আছে ; কারণ, হাজার হোক সে তো গঙ্গম্মারই ছেলে। কিন্তু বেশী বাড়াবাড়ি করলে কথাগুলো যদি শ্বশুরমশাইয়ের কানে ওঠে সেই ভয়ে সে বউয়ের ওপর বেশী জুলুম করতেও সাহস করে না।

বউয়ের ওপর কর্তৃত্ব ফলানো এবং সাধ মিটিয়ে তাকে গালিগালাজ করার ইচ্ছাটা গঙ্গম্মারও কিছু কম নয়। কিন্তু বেহাই সম্বন্ধে তারও মনে যথেষ্ট ভয় আছে, সুতরাং চাপা তর্জন-গর্জন করেই তাকে ক্ষান্ত থাকতে হয়।

পাটোয়ারীগিরি হাতে নেবার পর প্রথম বছরের হিসেবপত্র, জমাবন্দী ইত্যাদি নিয়ে চেন্নিগরায় নিজেই গিয়েছিল, এগুলো ছিল তালুক-জমাবন্দী, হুজুর-জমাবন্দী নয়। ঘুষের টাকাও সে দিয়েছিল বিধিমত কিন্তু তা সত্ত্বেও হেডক্লার্ক ওর হিসেবে হাজারটা ভুল বার করে ফেলল। ব্যস, আটকে গেল ওর জমাবন্দী।

'তোর মায়ের ··· ' অকথ্য গালাগালটা মনে মনেই শেষ করল চেন্নিগরায়, চেঁচিয়ে কাউকে গালাগাল দেবার সাহস তার মোটেই নেই। হেডক্লার্ক সাফ বলে দিল, 'এ জমাবন্দী মঞ্জুর হবে না। দু'মাসের মধ্যে আবার নিজে তিপটুরে এসে সাহেবকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যেও।' মনে মনে সে ভাবল, যাক, সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে গাল খাওয়ার হাত থেকে এবারটা অন্তত রক্ষা পাওয়া গেছে।

তিম্লাপুরের পাটোয়ারী দাবরসায়াজীও এসেছিলেন নিজের জমাবন্দীর হিসেব নিয়ে। সবাই জানে ওর হিসেবে কখনও ভুলচুক হয় না। এই পাটোয়ারীগিরি ছাড়া তাঁর অন্য কোন উপার্জন নেই ; তাই দুঃখ করে বলছিলেন, আচার যেমন ভোজনের স্বাদ বৃদ্ধি করে এই পাটোয়ারীগিরিও ঠিক তেমনি, এ দিয়ে আহারকে আর একটু মুখরোচক করা যায় মাত্র, কিন্তু এর দ্বারা পেট ভরানো সম্ভব নয়! চেন্নিগরায় এই দাবরসায়াজীর শরণ নিল। তিনি জানালেন, বছরে পঞ্চাশ টাকা দক্ষিণা পেলে তিনি চেন্নিগরায়ের হিসেবটাও লিখে দিতে রাজি আছেন। তিনখানা গ্রাম মিলিয়ে

চেন্নিগরায়ের বার্ষিক আয় একশ বাইশ টাকা সাত আনা এগার পাই। এর মধ্যে সবুজ ছাপের নোটগুলো বাদে বাকি পয়সা তো কালি আর কাগজ কিনতেই শেষ হয়ে যায়। তারপর বছরের শেষে 'বর্ষাসন'-এর খরচ দেখাবার সময় সেরেস্তাদারকে দিতে হয় দশ টাকা (শোনা যায় তারমধ্যে ছ' টাকা নাকি আমলাদার পায় আর সেরেস্তাদারের ভাগে থাকে বাকি চার টাকা), হেডক্লার্কের প্রাপ্য দু' টাকা, বিভাগীয় কেরানী আরো দু' টাকা তারপর চাপরাশীদের আট আনা করে, অর্থাৎ প্রায় সতের-আঠার টাকার ধাক্কা। তাছাড়া তালুকে আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়ার খরচও তো আছে। এত সবের পরে আবার যদি হিসেব লেখানোর মজুরী পঞ্চাশ টাকা দিতে হয়, তবে চেন্নিগরায়ের আর থাকবেটা কি? অবশ্য, খাজনা আদায় করার সময়, যারা দশ টাকার বেশী খাজনা দেয় তাদের কাছে এক টাকা, যারা দশ টাকার কম দেয় তাদের কাছে আট আনা এবং যারা দেয় দু' টাকা তাদের কাছ থেকে চার আনা হিসেবে দস্তুরী নেওয়ার প্রথা চালু আছে। কিন্তু রামসন্দ্র গ্রামে এ দস্তুরীটা বরাবর প্যাটেল নিজেই মেরে নেয়। লিঙ্গাপুর থেকেও বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। কুরুবরহল্লী থেকে অবশ্য পাওয়া যায় প্রায় চল্লিশ টাকা। আসল কথা এই উপরি রোজগারটা নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে পাটোয়ারীর নিজের ক্ষমতার ওপর। বাঁটোয়ারা, খরিদ-বিক্রী, বন্ধকী, তক্‌রার, দরখাস্ত ইত্যাদি থেকে কিছু কিছু আয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে বটে কিন্তু চেন্নিগরায় তো নিজের খাতাপত্র এবং হিসেবগুলোই ঠিকমত সামলাতে পারে না। কাজেই ঐ সব কাজ-কারবার থেকে তার কিছুই উপার্জন হয় না।

তিম্লাপুরের দাবরসায়া এসে দিন-পনের থেকে গেলেন রামসন্দ্র গ্রামে। গঙ্গম্মা আর নন্‌জম্মা রেঁধেবেড়ে খাওয়াল, চেন্নিগরায়ও করল যথাসাধ্য সেবা-যত্ন। হিসেব লেখা শেষ করে তিনি নিজে চেন্নিগরায়কে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। হেডক্লার্ককে দু' টাকা এবং সেরেস্তাদারকে পাঁচ টাকা খাইয়ে শেষ পর্যন্ত জমাবন্দীতে স্বাক্ষর করানোর কাজটা হয়ে গেল। মাথায় পাগড়ী, গায়ে কোট পরে তার ওপর চাদর ঝুলিয়ে চেন্নিগরায় তালুক অফিস ঘুরে এল, জমাবন্দীতে সই করানোর সময় সে জোড়হস্তে দাঁড়িয়েছিল সাহেবের সামনে, তবে সৌভাগ্যক্রমে সাহেব তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি, হেডক্লার্কের নির্দেশিত জায়গায় চুপচাপ সই করে দিয়েছেন।

তিপটুর থেকে প্রথম গাড়ি ধরেই তিম্লাপুর এসে দাবরসায়াজীকে পৌঁছে দিয়ে চেন্নিগরায় ফিরে এল নিজের গ্রামে। দুপুরবেলায় সে হেঁকে ডেকে হুকুম করল স্ত্রীকে, 'এই ছেনাল, জমা-বন্দীর কাজ সেরে এলাম, সারা শরীরটা যেন মোচড় দিচ্ছে। চটপট রেড়ির তেল নিয়ে আয়, কপালে মালিশ কর আর গা-হাত-পা টিপে দে দেখি!'

নন্‌জম্মা মেয়েটি বেশ দীর্ঘাঙ্গী এবং স্বাস্থ্যবতী। বাড়ির পেছনের কুয়ো থেকে জল তুলে সে শুকনো নারকেল পাতা জ্বালিয়ে এক হাঁড়ি জল গরম করল। স্বামীর সর্বাঙ্গে ভাল করে তেল মালিশ করে স্নান করিয়ে দিল তাকে। তোয়ালে দিয়ে গা মুছে চেন্নিগ মাথায় একখানা গামছা বাঁধল, তারপর নন্‌জম্মার পেতে দেওয়া বিছানায় শুয়ে পড়ল আরাম করে। নন্‌জম্মা জোড়া কম্বল দিয়ে তাকে সযত্নে ঢেকে দিল। তারপর চেন্নিগরায়ের তৃপ্তি না হওয়া পর্যন্ত তার পাশে বসে আস্তে আস্তে টিপতে থাকল তার হাত-পা।

সময়মত বিয়ে দিলে দু-বছর আগেই অপ্পন্নায়ার বিয়ে হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তখন তো চেন্নিগরায়ের বিয়ে হল, তারপর সে পাটোয়ারীগিরি হাতে পেল। সুতরাং এতদিনে অপ্পন্নায়ার বিয়ের কথা উঠছে।

অপ্পন্নায়া বছর দুই চেন্নাকেশবায়ার পাঠশালায় যাতায়াত করেছে বটে কিন্তু মাস্টারমশাই বলেই দিয়েছিলেন যে, ওর কপালে বিদ্যা নেই। সুতরাং ওকে দোষ দিয়ে কি লাভ? বালির ওপর লিখতে লিখতে ওর আঙুলের ছাল চামড়া উঠে যেত কিন্তু অক্ষর তবু ফুটে উঠত না। তবে তা নিয়ে কারো বিশেষ চিন্তা ছিল না। পাছে আবার বিড়ি খেতে গিয়ে কারো আখের খেতে না আগুন ধরিয়ে দেয়, সেই ভয়েই তো তাকে পাঠশালায় পাঠান হয়েছিল!

কড়ুরু অঞ্চলের নুগ্গীকেরে গ্রামের পুরোহিত শ্যামভট্টের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল অপ্পন্নায়ার। গঙ্গম্মার বাপের বাড়ির গ্রাম জাবগল্লুর লোকেরাই বিয়ের সম্বন্ধটা স্থির করে দেয়। মেয়েটি মা-বাপের একমাত্র সন্তান, তার কোন ভাইও নেই। মেয়েটি সেলাই-ফোঁড়াই এবং ঘর-কন্নার কাজেও নিপুণ, আচার-বিচার সম্বন্ধেও জ্ঞান আছে। এমনকি অশ্বত্থ পাতার ওপর কৃষ্ণমূর্তি আঁকতেও জানে সে। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে, কিন্তু এ কথাটা শ্যামভট্ট গঙ্গম্মাকে জানতে দেননি, কারণ বেশী চালাক-চতুর মেয়েকে ঘরের বৌ হিসেবে গঙ্গম্মার পছন্দ হবার কথা নয়।

বিয়েটা হল বেশ ধুমধাম করে। কন্যাপক্ষ একসেরী রূপোর পঞ্চপাত্র, মুকুট, দামী ধুতি, জরীদার পাগড়ী ও আরো অনেক জিনিসপত্র দিয়েছে যৌতুকে। বরের মাতাপিতার পরিবর্তে পাণি গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাল ভাই ও ভাই-বৌ, অর্থাৎ চেন্নিগরায় ও নন্‌জম্মা। বিয়ের ছয় মাস পরেই ঋতুমতী হল সাতম্মা এবং তার ষোল দিন পরে দ্বিরাগমনে সে এল শ্বশুর বাড়ির ঘর করতে।

স্ত্রীকে কি করে শাসন করতে হয় সেটা নিয়ে অপ্পন্নায়াও প্রথমটা একটু সমস্যায় পড়েছিল। তবে এটুকু সে বুঝেছিল যে, দাদা যেভাবে বৌদিদির ওপর তম্বি করে তারও ঠিক ঐরকমই করা উচিত। সুতরাং বৌ এবাড়িতে এসে পৌঁছবার পরই সে একদিন হাঁক দিল, 'এই ছেনাল, এদিকে আয়, আমায় তেল মালিশ করে দিয়ে যা।'

সাতু প্রথমটা বুঝতেই পারেনি স্বামী কাকে এভাবে সম্বোধন করে কথা বলছে। সে ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। আবার হুঙ্কার শোনা গেল, 'তোকে বলছি, এই সাতি, বজ্জাত ছুঁড়ী, শুনতে পাসনা নাকি?' এবার সাতম্মা চোখ তুলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। গর্জে উঠল অপ্পন্না, 'অমন হাঁ করে দেখছিস কি? গাধা কোথাকার, কানে কম শুনিস নাকি?' কেঁদে ফেলল সাতু। ঝাঁটাগাছটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শাশুড়ীর কাছে এসে নালিশ করল, 'মা, আপনার ছেলের কথা শুনছেন? আমার সঙ্গে এমনি করে কথা কইতে কে শেখাল ওকে?'

বউমানুষ এমন করে নালিশ করবে? এত সাহস হবে তার? এ তো গঙ্গম্মা কল্পনাও করতে পারে না। বড় বৌ নন্‌জম্মাকে চেন্নিগরায় তো এমনিভাবেই সম্বোধন করে থাকে, কই সে তো কোনদিন আপত্তি জানায়নি? চুপচাপ শুনে যায় সে। কিন্তু এ পোড়ারমুখী খোদ শাশুড়ীর সঙ্গেই এমনি করে কথা বলছে?

'ভাতার নিজের বৌকে আবার কেমন করে ডাকবে রে, ছেনাল ? হারামজাদী কোথাকার !'

'আমি কেন ছেনাল হতে যাব ? যারা বলছে তারাই হবে হয়ত !'

কথাটা শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে গঙ্গম্মা, 'ওরে ভেড়ুয়া, কাপুরুষ, হারামজাদা, শুনলি ? তোর বৌ, তোর নিজের গর্ভধারিণী মাকে কি বলছে সেটা শুনলি তুই ? আমি হারামজাদী ? নিজের বৌকে নিজে টিট করতে পারবি কিনা বলে দে, শিখণ্ডী, ছেনালের ব্যাটা কোথাকার !'

গালাগাল খেয়ে পৌরুষ জেগে উঠল অপ্পন্নায়ার। উঠে গিয়ে বউয়ের ঘাড় ধরে কষিয়ে দিল এক মোক্ষম চড়। চড় খেয়ে সাতু ছিটকে পড়ল মাটিতে। 'ছেনালটাকে একেবারে শেষ করে ছাড়ব' গর্জাচ্ছে তখনও অপন্না, এরই মধ্যে রান্নাঘর থেকে ছুটে এল নন্‌জম্মা। সব কথাই তার কানে গেছে। এতদিন পর্যন্ত কখনও সে অপ্পন্নায়ার সঙ্গে উঁচুগলায় কথা বলেনি। আজ সে বলে উঠল, 'অপ্পন্না, ঘরের বৌকে যদি এমন করে জ্বালাও তো তোমার হাত খসে পড়বে। আক্কেলবুদ্ধির মাথা কি খেয়ে বসেছ একেবারে ?'

ভিতর থেকে জল এনে সে এবার সাতুর মাথায় জলের ঝাপটা দিতে লাগল। অপ্পন্নায়ার ইচ্ছা হচ্ছিল বৌদিদিকেও 'ছেনাল' সম্বোধনে আপ্যায়িত করে, কিন্তু কে জানে কেন, হয়ত বৌদিদির বাবা কণ্ঠীজোইসজীর কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ভয়ে চুপ করে গেল। সাতু এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি, তবু সে উঠে বসল। বলে উঠল, 'সদ্বংশে জন্ম হলে তবে তো মুখ দিয়ে ভাল কথা বেরোবে !'

'সাতু তুই আর কথা বাড়াস না, চুপচাপ আমার সঙ্গে চলে আয়', নন্‌জম্মা ওকে ডেকে নিয়ে সোজা ছাদে উঠে গেল। পেছন থেকে শাশুড়ীর মন্তব্য শোনা গেল, 'ঐ রাক্ষুসী এবার নিয়ে চললেন কানে ফুসমন্তর দিতে।' নন্‌জম্মা কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেলেও এমন ভাব দেখাল যেন কিছুই শোনেনি।

ছাদে একটা চাটাইয়ে বসে সাতু এবার প্রশ্ন করে, 'ব্রাহ্মণ হয়ে এরা এমনি ভাষায় কথা বলে, দিদি ?'

'তুই নতুন এসেছিস তাই অবাক হচ্ছিস। এ বাড়ির রীত-ব্যবহার এই রকমই।'

'ভাসুরঠাকুর তোমার সঙ্গেও কি এমনি ব্যবহার করেন ?'

'দু-বছর তো কেটে গেল। শুনতে শুনতে এখন আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'তুমি শুনেও চুপ করে থাক কিনা তাই এদের সাহস এত বেড়ে গেছে !'

এ কথার কোন উত্তর দিল না নন্‌জম্মা। সে চুপ করে কি যেন ভাবছিল। সাতু আবার বলে, 'দিদি, তোমার বাবা তো কতবড় নামডাকের মানুষ। আমার বিয়ের সময় এসেছিলেন, সবাই ওঁকে দেখে কত সমীহ করে চলছিল। আমার বাবাও বলছিলেন উনি বিখ্যাত লোক। ভাসুরঠাকুরকে পাটোয়ারীর কাজ তো শুনি উনিই পাইয়ে দিয়েছেন। তোমার বাবাকে বলে এদের একবার একটু ভয় দেখিয়ে দাও না, তাহলেই এদের এই মুখ ছোটান বন্ধ হয়ে যাবে। তুমি নিজেই তো এদের একটু বলতে পার, তাতেও হয় তো চৈতন্য হবে এদের।'

'সাতু তুই ছেলেমানুষ, তাই বুঝতে পারছিস না। নিজের স্বামীকে ভয় দেখানোর জন্য বাপের কাছে নালিশ করতে যাওয়াটা উচিত কাজ নয়।' এরপর নন্‌জম্মা তার বাবার স্বভাবের কিছুটা পরিচয় দিল সাতুর কাছে, বলল তার বাবার যখন কারো ওপর রাগ হয় তখন তিনি তার ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তার চুলের ঝুঁটি ধরে গালে এমন জোরে থাপ্পড় কষান যে দাঁতের

পাটি নড়ে ওঠে। মারটা দেবার পর তার সঙ্গে কথা আরম্ভ করেন। এ ছাড়া শাসন করার অন্য কোন পদ্ধতি তাঁর জানা নেই। মেয়ের সামনেও তিনি জামাইকে বিন্দুমাত্র খাতির দেখাবেন না। যে ধীরবুদ্ধি নয় তাকে তিনি একেবারেই সম্মান দেখান না, ঐ রকমই তাঁর স্বভাব। কিন্তু নিজের স্বামীর যাতে অপমান না হয়, এটা তো স্ত্রীকেই দেখতে হবে?'

সাতু এবার বলল, 'তাহলে তুমিই ওকে বলে দাও, আমার সঙ্গে যেন আর কখনও ঐ-ভাবে কথা না বলে।'

ইতিমধ্যে নিচে থেকে চেন্নিগরায়ের হাঁক শোনা গেল, 'সব গেল কোথায়? জাহান্নামে যাক গুষ্ঠিসুদ্ধ, এখনও পর্যন্ত রুটি আর চাটনীটাও হয়ে ওঠেনি নাকি?'

'শুনলি তো, তোর ভাসুরঠাকুরের কথার ছিরি? যাক্, আমি গিয়ে রুটি করছি, তুই চটপট চাটনীটা পিষে ফেল দেখি। চল্, ওঠ্। আচ্ছা থাক্, তুই বরং তোর বরকে গিয়ে তেলটা মালিশ করে দে', কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় নন্জম্মা।

'মালিশ করাতে হয় তো নিজের মাকে দিয়ে করাক, আমি যাচ্ছি চাটনী পিষতে' মনে মনে ঠিক করে ফেলে সাতম্মা।

চতুর্থ অধ্যায়

নন্‌জম্মা অন্তঃসত্ত্বা, সাত মাস পূর্ণ হয়ে গেছে। এই সময় ঘোড়ায় চড়ে একদিন কন্ঠীজোইসজী এসে দেখা দিলেন রামসন্দ্র গ্রামে। তাঁর আবির্ভাবের ঘন্টা দুই পরে একখানা নরম গদি দেওয়া গরুর গাড়ীও এসে পৌঁছল। এবার উনি দিনের বেলাই এসেছেন, মেয়েকে প্রসবের জন্য নিজের কাছে নিয়ে যেতে এসেছেন তিনি।

ওঁর ছেলে কল্লেশেরও বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, আর পনের দিন পরেই কন্যাপক্ষের গৃহে বিয়ে হবে। বৌটি হাসানের মেয়ে। কন্ঠীজোইসজী এ বাড়ির সকলকেই বিয়েতে নাগলাপুর যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। নাগলাপুর থেকে সবাই গাড়ীতে হাসানে বরযাত্রী যাবে, সে কথাও জানালেন। কিছুক্ষণ আলাপের পর কন্যাকে নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তত হলেন কন্ঠীজোইসজী। নন্‌জম্মা উঠে বসল গাড়ীর মধ্যে, আর তার বাবা আগে আগে সেনাপতির মত চললেন সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে।

নাগলাপুরের বাড়িতে একাই থাকেন বুড়ি ঠাকুমা। জন্মের পর থেকে নন্‌জম্মা মানুষ হয়েছে এঁরই হাতে। তাই অক্কম্মাকে দেখে নন্‌জম্মার কান্না আর থামেই না। এ অশ্রুর কারণ কি ঠাকুমার সঙ্গে এই দীর্ঘ বিচ্ছেদ, না আরো অন্য কিছু তা সে নিজেও ঠিক বুঝতে পারে না। নাতনী গর্ভবতী হবার আগেই তাকে একবার নিজের কাছে আনতে চেয়েছিল অক্কম্মা কিন্তু সে সাধ পূর্ণ হয়নি। কারণ কন্ঠীজোইসজী বহুদিন পরে সবেমাত্র গতকাল গ্রামে ফিরে এসেছেন। আর এসেছেন একেবারে ছেলের বিয়ের দিন-তারিখ সব কিছু স্থির করে। ছেলের বিয়েটা যে আরো অনেকদিন আগেই দেওয়া উচিত ছিল, এটা এতদিন ওঁর খেয়ালই হয়নি। হঠাৎ সেদিন এক কনস্টেবলের কাছে শুনেছেন কল্লেশের চালচলন নাকি আজকাল ভাল ঠেকছে না। ব্যস্, আর কথাবার্তা নেই, একেবারে দু-দিনের মধ্যে পাত্রী খুঁজে, বিয়ের দিন স্থির করে, সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন।

দাদার বিয়ের প্রস্ততিতে এবার নন্‌জম্মাও লেগে যায় মহা উৎসাহে। বাড়ি-ঘর পরিস্কার করিয়ে চুনকাম করানো, চাকর-বাকরদের নির্দেশ দিয়ে কাজ করানো ইত্যাদির সব দায়িত্ব সেই তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। নিজের গ্রামে একটানা বেশীদিন থাকা কন্ঠীজোইসজীর কোষ্ঠীতে নেই। এবার তিনি ফিরে এলেন প্রায় আটদিন পরে, বিয়ের তখন আর বাকি মাত্র ছ'দিন। কল্লেশ পুলিশী পোশাক পরেই গ্রামে এসেছে। সে বেশ করিতকর্মা ছেলে, নিজের বিয়ের প্রস্ততিতে বোন এবং ঠাকুমাকে সব কাজেই সাহায্য করছে সে। রামসন্দ্রের কুটুম্বরাই এখন এদের নিকট-তম আত্মীয়। তাই 'দেব সমারাধন' অনুষ্ঠানের একদিন পূর্বেই চেন্নিগরায়, অপ্পন্নায়া ও সাতম্মা গরুর গাড়ী করে এসে পৌঁছল। গঙ্গম্মা বলে পাঠিয়েছে—সে বিধবামানুষ, তাই শুভকর্মে যোগ

দেবে না। 'দেব ভোজনের' পর সেই রাত্রেই বরযাত্রী রওনা হবার কথা, কিন্তু নন্‌জম্মার জ্বর এসেছে দেখে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। বেশী খাটুনীর ফলে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, জ্বরটা এসেছে দুপুরবেলাই, রাত্রে দেখা গেল জ্বর খুব বেড়েছে, নন্‌জম্মাকে শুয়ে পড়তেই হল। এই অবস্থায় রাত্রে চব্বিশ মাইল পথ গরুর গাড়ীতে যাওয়া তার পক্ষে একেবারেই উচিত হবে না। তাই শেষ পর্যন্ত স্থির হল অক্কম্মা বাড়িতেই থাকবে নন্‌জম্মাকে নিয়ে।

ঠাকুমা আর নাতনী গ্রামের বাড়িতেই থাকবে এটা ঠিক হবার পরও নন্‌জম্মার কেমন ভয় করতে লাগল, প্রথম গর্ভের বিচিত্র অনুভূতিই বোধহয় তার কারণ। ওর মনে হতে লাগল স্বামীও এই সময় কাছে থাকলে ভাল হয়, তাই সে ডেকে পাঠাল চেন্নিগরায়কে। স্ত্রীর আহবান শুনে ভেতরে এসে সে চাপা গলায় অন্যের অশ্রুত স্বরে গর্জে উঠল, 'কি হয়েছে কি ?'

'আমার ভয় করছে। পুরুষমানুষ কেউ এখানে থাকবে না। অপ্পন্না আর সাতু বিয়েতে যাক্, তুমি এখানে থেকে যাও।'

'বাঃ, তা কি করে হবে ?' বলতে বলতে চেন্নিগরায়ের মুখের চেহারাখানা এমন হয়ে উঠল যেন বিয়ের ভোজটা এখনি কেউ তার সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

'কেন হবে না ? আমি কল্লেশ ভাইয়া আর বাবাকে বলে দিচ্ছি, ওঁরা তোমাকে এখানেই রেখে যান।'

'না, আমি থাকব না, চাও তো সাতুকে রেখে দাও।' এই দু-বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীকে বেশ ভাল করেই চিনেছে নন্‌জম্মা। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলে, 'থাক, কোন দরকার নেই। তুমি ঘুরে এস।'

চেন্নিগরায় তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে কেটে পড়ল, এবং বাইরে গিয়ে গদি বিছান গরুর গাড়ীতে উঠে বেশ ভাল জায়গা দেখে বসে পড়ল যাতে পথে ঠাণ্ডা না লাগে। এই জায়গাটার ওপর প্রথম থেকেই নজর ছিল ওর। সাতু নন্‌জম্মার কাছে এসে বলল, 'দিদি, আমি তোমার কাছে থাকি ?'

'না, না, তুই যা, ঘুরে আয়' নন্‌জম্মা বলে, কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে সাতু এবার অক্কম্মার কাছে গিয়ে বলে, 'আপনি বুড়োমানুষ, বাড়িতে আর কেউ নেই, আমি এখানেই থেকে যাই।'

'না, না, তুমি যাও। ওখানকার কাজ-কর্ম সামলে দেবার মত আমাদের তরফের মেয়ে তো কেউ নেই। বিয়ের মণ্ডপের পাশে হাজির থেকে অনেক কিছু যোগাড় দিতে হবে, তুমি গেলে সে কাজটা অন্তত করতে পারবে। আমি তো থাকছি নন্‌জার কাছে, ভয় পাবার কিছু নেই।'

অক্কম্মার এই কথার পর সাতুও চলে গেল বরযাত্রীদের সঙ্গে।

রাত্রি আটটা নাগাদ রওনা হয়ে গেল চারখানা গরুর গাড়ী। কন্ঠীজোইসজী যথারীতি কোট-প্যান্ট-জুতো-মোজা ইত্যাদিতে সজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে চললেন সবার আগে আগে। কল্লেশ তার বন্ধু-বান্ধব ও পুলিশের অন্য কয়েকজন হাবিলদারের সঙ্গে চলল তাঁর পেছনের গাড়ীতে। যতক্ষণ পর্যন্ত গাড়ীগুলো চোখের আড়ালে না চলে যায়, ততক্ষণ নন্‌জম্মা সেদিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির দরজায়।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অক্কম্মা বলছিল, 'দেখ্ ননজা, ছাগলের দুটো বাঁটের মতই তোরা আমার দুই সন্তানের মত। তোর বাপ জানে যে, তুই সাত মাস পোয়াতি, ঠিক এই সময় কিনা

ও গিয়ে কল্লেশের বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলল? ওর কি কোন কালেও আক্কেল হবে বলে তোর মনে হয়?'

'বাবার স্বভাবই ঐ রকম, সব কাজেই তাড়াহুড়ো।'

'তোকে জন্ম দিয়েই তো তোর মা মরল, সেই থেকে একলা হাতে আমিই তো সব সামলাচ্ছি। কল্লেশ, হাজার হোক পুরুষ ছেলে, তুই যখন জন্মাস ওর বয়স তখন সাত বছর। ছেলে তো যা হোক করে বড় হয়েই যায়। এদিকে, তোর বাবা তিন দিন যদি ঘরে থাকল তো তারপর তিন মাস উধাও। বিয়ের পর তুইও চলে গেলি, সেই থেকে একা একা এ বাড়িতে আমার আর মন টেকে না। তোর কোলজুড়ে দু-চারটে বাচ্চা কাচ্চা হবে, তাদেরও হাতে করে মানুষ-মুনুষ করব এ আমার অনেক কালের সাধ। এতকালে ভগবান সে সুযোগ দিলেন। মেয়েকে একবার পরের হাতে দিলে তারপর আর তো ইচ্ছে করলেই আনা যায় না!'

'এখন আর ভাবনা কি? কল্লেশ ভাইয়ার বউ আসছে, এবার তো দুজনে মিলে থাকতে পারবে।'

'ওরে, ও সব তোর ভুল ধারণা। ছেলের যে পুলিশের চাকরী, যখন যে গাঁয়ে বদলী হবে সেখানেই গিয়ে থাকতে হবে, আর বৌও যাবে ওর সঙ্গে সঙ্গে। তার ওপর সে আবার শহুরে মেয়ে। বিয়েটা পাকা করে ফেলবার আগে তোর বাপ তো আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করল না, যা মনে হল তক্ষুণি তাই করে বসল, ব্যস। কি-যে এক ব্রহ্মদৈত্য জন্মেছে আমার গর্ভে সে আমিই জানি।'

নন্‌জম্মাও মনে মনে ভাবছিল তার বাবার সৃষ্টিছাড়া স্বভাবের কথা। এই সময় অক্কম্মা হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'হ্যাঁরে, তোর শাশুড়ী তোকে যত্ন-আত্তি করে তো?'

'হ্যাঁ, খুব যত্ন করে।'

'যাক, তা হলেই হল। মেয়েদের তার চেয়ে বেশী আর কি চাই?' এই বলে চুপ করে যায় অক্কম্মা। একটু পরেই কিন্তু আবার কথা শুরু করে, 'দেখ্ খুকী, তোর সেই সীতা বনবাসের গান, লব-কুশের যুদ্ধের কথা, সে সব এখনও মনে আছে তো?'

'ওখানে যাবার পর থেকে তো আর একদিনও ওসব গান গাইনি। একদিন ভোরে উঠে মহুয়া বাটতে বাটতে গুন গুন করে গাইছিলাম, তা সবাই বকল, বলতে লাগল—ওতে নাকি ওদের ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। তারপর থেকে মুখ বুজেই বাটনা বাটি।'

'কাল থেকে তুই রোজ গাইবি, আমার খুব শুনতে ইচ্ছে করে ঐ সব গান', একটু পরেই আবার কি যেন মনে পড়ে যায়, বৃদ্ধা বলে ওঠে, 'থাক, থাক, এখন আবার তুই পোয়াতি মেয়ে, সীতা বনবাসের গান এখন গাইতেও হবে না, শুনতেও হবে না।'

মিনিট দুই চুপ করে থেকে বলে ওঠে, 'দেখ নন্‌জা, তুই যাবার পর থেকে এ গাঁয়ে গান গাইবার মত একটাও মেয়ে পাওয়া যায় না। কারো বাড়ি পুজো-আর্চা থাকলে সব যেন কেমন ফিকে ফিকে মনে হয়, সবাই এই কথা বলে। গানের বইগুলোও তো তুই এখানেই ফেলে গিয়েছিস, কন্ঠী একদিন কোথা থেকে বের করেছিল, সেই আবার কোথাও রেখে দিয়েছে। সকালে উঠে খুঁজে দেখিস তো, গান না গাইলে সব যে ভুলে যাবি শেষে!'

যেদিন কল্লেশের বিয়ে সেইদিনই নাগলাপুরের জেলেপাড়ায় ইঁদুর মরল। এর মানে হল এই যে প্লেগদেবী এবার গ্রামে দেখা দেবেন। যারা কোন কিছু মানত করে তা পূর্ণ করে না অথবা যাদের মনে ভয়-ভক্তির অভাব, তাদেরই পড়তে হয় তাঁর করাল গ্রাসে। এঁর আবির্ভাবের সূচনা দেখলেই গ্রামের লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে পালায়, লোকালয়ের বাইরে খেতের মধ্যে নারকেল পাতার কুঁড়ে তৈরী করে বাস করতে থাকে। মাস তিনেক পরে প্লেগের প্রকোপ শেষ হলে তবেই জন-মানুষ আবার গ্রামে ফিরে আসে।

দ্বিতীয় দিনই গ্রামের পথে ঝুড়ির মধ্যে বাহিতা মারীমাতার দর্শন পাওয়া গেল। হাতে একটা মজবুত লম্বা চাবুক, লোকটা কখনও সেটাকে সজোরে শূন্যে আন্দোলিত করছে, কখনও বা নিজের শরীরেই সপাৎ করে বসিয়ে দিচ্ছে এক ঘা, সর্বাঙ্গ তার হলুদ আর আবীরে লিপ্ত, মাথার ওপরে একটা ঝুড়ি, তারই মধ্যে আছেন মারীমাতা। লোকটার পিছন পিছন চলেছে তার স্ত্রী, দৈববাণীর মত করে সে ঘোষণা করে যাচ্ছে,---'আশে-পাশের চৌষট্টিখানা গাঁয়ে মা দর্শন দিয়েছেন, ধুলোয় পড়ে ছটফট করছে মানুষ, মাকে ফেলে ছেলেকে খাচ্চেন, কচি বাচ্চাদের মা টেনে নিচ্ছেন। গৌনা (দ্বিরাগমন) না হওয়া মেয়েদের পেটে পুরছেন, গৌনা হতে আসা ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন, পোয়াতি মেয়ের প্রাণ টেনে নিচ্ছেন ······' এরই ফাঁকে ফাঁকে দেবীর বাহক পুরুষটি নিজের নগ্ন দেহে নির্দয়ভাবে মাঝে মাঝে চাবুক চালিয়ে যাচ্ছে।

এইভাবে ঝুড়িতে চেপে মারীমাতার আবির্ভাব বা অলক্ষণ সূচক ঘোষণা শুনিয়ে যাওয়া কিছু নতুন ব্যাপার নয়, প্রচলিত প্রথা। কিন্তু 'পোয়াতি মেয়ের প্রাণ টেনে নেওয়া'র কথাটা শুনে অকস্মাৎ প্রাণটা যেন শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি করে সে একটা কুলোর ওপর হলুদ, আবীর, চাল, ডাল, নারকেল, তিন পয়সা দক্ষিণা ইত্যাদি সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে মারীমাতার পুজো দিল তারপর সেই প্রসাদী আবীর কুঙ্কুম এনে দিল নন্‌জুকে।

পরের দিন আরও বেশী ইঁদুর মরল। গ্রামের অন্যান্য পাড়াতেও মড়ক ছড়িয়ে পড়ছে। খবরটা রাষ্ট্র হতেই আশে-পাশের গ্রামের লোক গ্রাম ছাড়তে আরম্ভ করেছে। এখন এদেরও উচিত গ্রামের বাইরে কুঁড়ে তৈরী করা। এ গ্রামের পাটোয়ারী শ্যামন্নাজী সেদিন সন্ধ্যাবেলা প্রত্যেক পরিবার থেকে এক একজনকে ডেকে পাঠিয়ে পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন যে আগামী সোমবারের মধ্যে সবাইকে গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। পরদিন ভোর থেকেই লোকে নিজের নিজের খেতে বা গ্রামের বাইরের ফলের বাগানে কুঁড়ে তুলতে আরম্ভ করে দিল। যাদের নিজেদের বাগান বা খেত নেই তারাও অন্যের জমিতে কুঁড়ে তুলছে। ছোট-খাট কাজ-কারবার যাদের তারা রুজি-রোজগারের জিনিসপত্রও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।

কন্ঠীজোইসজী ছেলের বিয়ে দিয়ে গ্রামে ফিরলেন যখন, ততক্ষণে অনেক বাড়িই খালি হয়ে গেছে। বিয়ের ঝামেলা চুকিয়ে কোথায় দুদিন বিশ্রাম নেবেন তা নয়, এই এক নতুন উৎপাত। এই সম্প্রতি বাড়িতে চুনকাম হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়ি খালি করতেই হবে। সাধারণত এইভাবে গ্রাম ত্যাগ করার আগে পুরোহিত ডেকে শুভক্ষণ দেখে নেবার প্রথা আছে। ছোটখাট পৌরোহিত্য

কাজের জন্য কন্ঠীজোইসজী নিজেই এড়্তোরের গরীব ব্রাহ্মণ পুট্টভট্টকে নিযুক্ত করে দিয়েছেন, ঐ সব কাজের যা কিছু উপার্জন সব ঐ পুট্টভট্টকেই দেওয়া হয়। কিন্তু এবার পাটোয়ারী শ্যামন্নাজী, কন্ঠীজোইসজীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করেননি, এমন কি তাঁর অনুপস্থিতিতে পুট্টভট্টকে ডেকেও জিজ্ঞাসা করেননি। সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন একেবারে নিজে নিজেই। এঁদের দু'জনের শত্রুতা চলে আসছে বহুদিন ধরে। এই গত বছরও খেতের জল নিয়ে কলহ হয়েছে দু'জনের মধ্যে। সেই থেকেই এই ধরনের খুট-খাট চলেছে। এবার কন্ঠীজোইসজী স্থির করলেন পাটোয়ারীর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে হবে।

বিবাহ অনুষ্ঠান সেরে ফিরে আসার পর দ্বিতীয় দিনে মাসিক 'কম্বলীশাস্ত্র' (প্রথা) হয়ে যাবার পর শামিয়ানা খুলে ফেলা হল। চেন্নিগরায়, অপ্পন্নায়া আর সাতম্মা তিনজনেই গরুর গাড়ীতে ফিরে গেল তাদের নিজের গ্রামে।

এই শ্যামন্নাটাকে নিয়ে কি করা যায়? তার এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করাই উচিত। কিন্তু এখন তো গ্রামসুদ্ধ লোক জিনিসপত্র নিয়ে চলেই গেছে, ঘরে ঘরে তালা ঝুলছে। যারা লিখতে জানে তাদের মধ্যে অনেকে আবার দরজার ওপর লিখে দিয়ে গেছে 'কাল এসো'। একজন গ্রাম ছাড়লেই অন্যেরা সবাই ভয় পেয়ে পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধতে শুরু করে দেয়। কন্ঠীজোইসজী বললেন, 'আমি শাস্ত্র দেখেছি, এ গ্রামের কিছু হবে না, কারো যাবার প্রয়োজন নেই।' কিন্তু কেউই সে কথা শুনতে চায়না। শেষে একজন প্রশ্ন করল, 'তা, আপনি কি গ্রামের মধ্যেই থাকবেন ঠিক করেছেন?' ঝোঁকের মাথায় তিনি উত্তর দিয়ে বসলেন, 'হ্যাঁ, তাই থাকব'। নিজের জিদ বজায় রাখতে তিনি স্থির করে ফেললেন এই জনশূন্য গ্রামে একাই থাকবেন।

এ কথা শুনেই প্রচুর আপত্তি জানাল অক্কম্মা। 'নাতনী এই প্রথম প্রসবের জন্য এসেছে এখানে। এখন এই সাড়ে সাতী লাগা (শনির দশা) গ্রামে একলা একটা পরিবার কখনও থাকতে পারে? আমাদেরও চলে যাওয়া উচিত। নয়ত ওকে আবার শ্বশুর বাড়িই না হয় পাঠিয়ে দিই! আমরা আঁতুড় তুলতে পারলাম না বলে তারা হয়ত বদনাম করবে। তারা যদি বলে, আমি না হয় সেখানে গিয়েই ওর আঁতুড় তুলে আসব।'

'আমি জোর গলায় বলে এসেছি যে, "গ্রাম আমি ছাড়ব না", এখন সে কথা না রাখতে পারলে আমার ইজ্জত থাকবে না।'

'এতে আবার ইজ্জতের কথা আসছে কেন? চুপচাপ চলে গেলেই হল?'

কিন্তু কন্ঠীজোইসজী নিজের মান খোয়াতে রাজি নন কোনমতেই। সুতরাং বহুক্ষণ বাদ-প্রতিবাদের পর স্থির হল যে, অক্কম্মা আর ননজম্মা গিয়ে ওঁদের খেতের মধ্যে কুঁড়ে ঘরে থাকবে এবং সেইখানেই হবে ননজার প্রসব ও আঁতুড় ঘর। আর কন্ঠীজোইসজী থাকবেন এখানে, এই গ্রামের বাড়িতেই।

'আচ্ছা, তুই কি সাক্ষাৎ যমরাজ? একলাটি এখানে কেন পড়ে থাকবি বল দেখি? কেন আমাদের সঙ্গে ওখানে গিয়ে থাকা যায় না?'

'প্লেগমাতা আমার কাছ থেকে কিছুই ছিনিয়ে নিতে পারবেন না। আমি পুরুষমানুষ, এখানেই থাকব।'

সুতরাং আর কোন উপায় নেই। খেতের মধ্যে কুঁড়ে তৈরী হয়ে গেল। ঠাকুমা এবং

গর্ভবতী নাতনী গিয়ে আশ্রয় নিল সেখানে। পাটোয়ারী শ্যামন্নাজী পঞ্চায়েতের নির্দেশ জানিয়ে দিলেন, কন্ঠীজোইসজী গ্রাম থেকে বেরিয়ে নিজের মা ও মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতেও পারবেন না, কারণ তাঁর শরীরে প্লেগমাতার ছোঁয়াচ্ থাকতে পারে। সুতরাং নন্‌জুর প্রসব এবং সূতিকাগারের সমস্ত দায়িত্ব গিয়ে পড়ল বৃদ্ধা অক্কম্মার ঘাড়ে।

৩

সারা গ্রামে কন্ঠীজোইসজী এখন একেবারে একা। একটা গরু পাঠিয়ে দিয়েছেন খেতের কুঁড়েঘরে। অন্য গরু ও তার বাছুরটাকে রেখেছেন নিজের কাছে। রান্না-বান্না করছেন নিজের হাতে। প্রত্যহ ঘরদ্বার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তারপর বাঘছালের আসনখানা পেতে বসে জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে লেখাপড়া করেন, তালপাতার পুঁথি খুলে বিভিন্ন মণ্ডল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, পঞ্চকোণ আদি নানাবিধ চিত্র দেখেন, হ্রাং, ধীং, ওম্ ইত্যাদির মন্ত্রশক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করেন। কখনো বা উচ্চৈস্বরে মন্ত্রপাঠ করতে করতে পায়চারী করেন বাড়ির বাগানে। নেহাত মন মেজাজ খারাপ হলে ঘোড়াটার পিঠে চড়ে খানিকটা ঘুরে আসেন চন্নরায়পট্টনের দিকে।

একটানা এতদিন ওঁকে গ্রামে কখনো থাকতে হয়নি। থাকবার দরকারও ছিল না, কিন্তু ওঁর জিদ তো উনি ছাড়বেন না কিছুতেই। পাটোয়ারী শ্যামন্নার নির্দেশ, তাছাড়া, সারা গ্রামের লোক ওঁর নিষেধ সত্ত্বেও যে ভয় পেয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে, এই সব কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই ওঁকে থাকতে হবে। অন্ধকার, নিঃসঙ্গতা, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, সাপ, বিছে দুনিয়ার কোন কিছুতেই ভয় পাওয়া ওর কোষ্ঠীতে নেই।

একদিন একটি লোক এসে দেখা দিল গ্রামে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, মাথায় শিখাগুচ্ছটি ছাড়া বাকি সমস্ত অংশ পরিষ্কারভাবে কামানো, টিকির শুভ্রকেশ গ্রন্থিবদ্ধ। পরনে লাল জামা, ময়লা হয়ে যাওয়া কালো কোট এবং ফেরতা দিয়ে ধুতি পরা। সামনের দুটি দাঁত নেই এবং দেখলেই মনে হয় গালে তামাক পোরা। ডান হাতের মধ্যমাঙ্গুলিতে সোনার তারে গাঁথা মন্ত্রপূত আংটি। কন্ঠীজোইসজী আগন্তুককে দেখে প্রথমটা ঠিক চিনতে পারেননি। একটুক্ষণ পরে মনে পড়ল, বললেন, 'কি খবর বীরাচারী? এই জনশূন্য গ্রামে হঠাৎ এসে দেখা দিলে যে?'

আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য এই দু'বছরে চারবার এসেছি। আপনি গ্রামে কবে আছেন, কবে নেই সে কথা কেউই বলতে পারে না। আজও আপনার সঙ্গে দেখা করার আশাতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

'এসো এসো, ভিতরে এসে বস।'

ভিতরে এসে বসে বীরাচারী। কন্ঠীজোইসজীর আসনের পাশে খান-চারেক পুরোন চটি-জুতো পড়ে আছে দেখে বীরাচারী প্রশ্ন করে, 'হাতের কাছে পুরোন চটি রাখতে ভালবাসেন দেখছি?'

'হ্যাঁ, কারণ ওটা হাতে নিয়ে দাঁড়ালে লোকে চুপচাপ যা বলি মেনে নেয়।'

'সে কথা বলছি না। শুনেছি আপনি নাকি ভূত প্রেত পিশাচ ইত্যাদি তাড়াতে পারেন?'

'তাও ধরে নিতে পার, তবে উপস্থিত এগুলো তো মানুষ তাড়াবার জন্যই রাখা আছে।'

আরো কিছুক্ষণ এটা সেটা কথাবার্তার পর জোইসজী প্রশ্ন করেন, 'তা, কি জন্য এসেছ বল দেখি?'

'এই এমনিই চলে এলাম। বছর দুই পূর্বে একটা ঘটনা ঘটে। কটিগেহল্লীর লোকেদের জন্য চোলেশ্বরের টিলার কাছে একটা মন্ত্রপূত পূজা করিয়েছিলাম, রাতটা ছিল অমাবস্যা। মা কালীর মূর্তির মধ্যে রাখা দক্ষিণার টাকা-পয়সা, তিনছড়া কলা সব কিছু কেউ বার করে নিয়ে গিয়েছিল, তাই ভাবলাম ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনি হয়ত কিছু খোঁজ-খবর দিতে পারবেন।'

'যারা তুকতাক করতে জানে তারা শাস্ত্র পড়ে গুনতে জানে না নাকি? আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছ কেন? আমি কি তোমার চেয়ে ভাল গণনা করতে পারি?'

'এটা বোঝার জন্য শাস্ত্র দেখবার দরকার হয় না। সে রাতে ওখানে ফিরে এসে সব কিছু দেখে সেই মুহূর্তেই আমি বুঝেছিলাম যে, আমার পূজো করা মা কালীর প্রতিমা খণ্ডিত করে তার মধ্যে থেকে টাকা-কড়ি আর কলার ছড়া চুরি করার সাহস এ অঞ্চলে আর কারো নেই। অমাবস্যার রাত্রে ঐ জায়গায় যাবারই হিম্মত হবে না কারো, কন্ঠীজোইসজী ছাড়া আর কারো দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। সত্যি কথাটা বলুন তো জোইসজী।'

'তোমার বুদ্ধি আছে বীরাচারী। তা, এতদিন পরে কি সেই পয়সা ফেরত নিতে এসেছ?'

'পয়সা চুলোয় যাক, তার জন্য আসিনি আমি। শুধু আপনাকে হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, ভবিষ্যতে আর কখনও এভাবে আমার কাজে বাগড়া দেবেন না।'

'আচ্ছা বেশ, তাই হবে। এখনও আমার রান্না হয়নি, চল দু'জনের জন্যই রান্না করা যাক, এখানেই খেয়ে যাও।'

বীরাচারী রাজি হয়ে গেল। খেয়ে-দেয়ে সে চলে গেল বিকেল চারটে নাগাদ। রাত্রে শুয়ে শুয়ে মেয়ের জন্য চিন্তা হতে লাগল কন্ঠীজোইসজীর—'এবার তো প্রসবের সময় হয়ে এসেছে, আমি একবার যেতেও পারলাম না। হতভাগা শ্যামন্নাটা পঞ্চায়েতকে দিয়ে আমার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়েছে, সেই ভয়েই আমি ঘরে বসে থাকব নাকি? কাল ঠিক গিয়ে দেখে আসব, দেখি কি করতে পারে ব্যাটা! আমার কুঁড়ের পাশেই তো ওর কুঁড়ে। বুক ফুলিয়ে ওর সামনে দিয়েই যাব আমি। যদি একটুও চ্যাঁচামেচি করার চেষ্টা করে তো 'মা ······' ব্যাটার গায়ের চামড়া তুলে নেব। এতদিন না যাওয়াটা মোটেই উচিত হয়নি। ব্যাটা ভাবছে ওর নিষেধের ভয়েই আমি বুঝি ওদিকে যাচ্ছি না। সেই দেমাকে ব্যাটা বোধহয় গোঁফে তা দিচ্ছে বসে বসে। ব্যাটার গোঁফজোড়া মুড়িয়ে দিতে হয়।' চিন্তা করতে করতে বিছানায় পাশ ফিরলেন কন্ঠীজোইস, এমন সময় হঠাৎ মনে হল যেন ছাদের ওপর কিছু পড়ল। মিনিটখানেক পরই ঢিল পড়ার আওয়াজ হতে লাগল। এ কি বীরাচারীর কাজ নাকি? একথা ভাবতে ভাবতেই অন্ততঃ বিশ-তিরিশখানা পাথর পড়ল বাড়ির ওপর। 'না, এ বীরাচারীর কাজ নয়, মনে হচ্ছে গ্রামেরই লোক, আমাকে ভয় দেখাতে এসেছে। হারামজাদা ভীতুর দল! দেখাচ্ছি মজা।' নিঃশব্দে উঠে পিছনের দরজা খুলে বাগানে চলে গেলেন জোইসজী, নিঃশব্দেই পাঁচিল টপকে, পাশের বাড়িটার ওধার দিয়ে ঘুরে সামনের গলিতে এসে হুঙ্কার দিলেন, 'দেখি তুই কোন হারামজাদা? আজ খুন করে ফেলব তোকে।' চার-পাঁচটা লোক এদিক ওদিক পালাতে শুরু করল, ভয়ে থরথর করে কাঁপছে তারা একজনকে ধরে ফেললেন কন্ঠীজোইস, বাকিরা পালিয়ে গেল।

যে লোকটা ধরা পড়ল তার নাম জুট্টগ। সে শ্যামন্নার খেতের বাটাইদার, বেশ সাহসী লোক। কিন্তু এখন ধরা পড়ে থরথর করে কাঁপছে। কন্ঠীজোইসজী তো এখন সাক্ষাৎ প্লেগদেবীরই প্রতিরূপ। জুট্টগ বেচারা শুনেছে পরিত্যক্ত গ্রামে এখন প্লেগমাতা অধিষ্ঠান করছেন। এই গভীর রাতে, সঙ্গী-সাথী সবাই পালিয়ে গেছে, ও একলা বন্দী হয়েছে যার হাতে, অন্ধকারে তার গর্জন শুনে ও ঠিক বুঝতে পারছে না ইনি কন্ঠীজোইসজী না সাক্ষাৎ প্লেগমাতা। মানুষটা যে কন্ঠী-জোইসজী তা অবশ্য ও বুঝতে পারছে কিন্তু দেবীই স্বয়ং ওঁর মধ্যে দিয়ে আবির্ভূতা হয়েছেন কিনা কে জানে!

হাত জোড় করে সে কাকুতি-মিনতি শুরু করে, 'হু-হু···হুজুর, ছে···ছেড়ে···দিন আমায়···'

'কে তুই? শ্যামন্না পাঠিয়েছে তোকে, ঠিক কিনা?'

'হুঁ।'

'এখানে আসবার সাহস হল কি করে তোর?'

'ব···বলেছিল আ···আপনি গাঁয়ে নেই।'

'আমি যদি গাঁয়ে নাও থাকি, তবু আমার বাড়িতে পাথর ছোঁড়ার সাহস হয় কি করে তোর?'

'আমাকে ভয় দেখিয়েছিল, না এলে খেত কেড়ে নেবে।'

'আর কে কে ছিল তোর সঙ্গে?'

'তিম্মক্কদের বাড়ির গিড্ডা, ও পাড়ার গুল্লিগ আর চৌকিদার সিদ্দুর।'

'এদেরই বা এত সাহস হল কি করে?'

'সরকারী জমি দেওয়া হবে না বলে শাসিয়েছিল।'

'হুঁঃ, তা তোর কি ইচ্ছে যে, তোর বৌ বিধবা হোক?'

'না, না, হুজুর, দোহাই অমনটা করবেন না।'

'আমার বাড়িতে পাথর ছুঁড়ে তার পরেও বেঁচে থাকবি?'

জুট্টগের মুখে কথা নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে শুধু। কন্ঠীজোইসজীর ইচ্ছা হচ্ছিল গিয়ে শ্যামন্নার কুঁড়েটার ওপর তেল ছড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেন। কিন্তু ওর নিজের কুঁড়েও তারই পাশে, সেখানে রয়েছে ওঁর মা আর মেয়ে। পাটোয়ারীর কুঁড়ে থেকে আগুন ওঁদের কুঁড়েতেও ছড়িয়ে পড়বে, সুতরাং ঐ পরিকল্পনাটা বাতিল করতে হল। ঐ পোকাটাকে পরিষ্কার দিনের আলোয় শিক্ষা দিতে হবে, রাত্রে বদ্‌লা নিতে গেলে দু'জনের মধ্যে আর প্রভেদ রইল কোথায়? জুট্টগ তখনও দাঁড়িয়ে আছে জোড় হস্তে।

'আমাদের কুঁড়ের দিকে গিয়েছিলি?'

'কাছাকাছি গিয়েছিলাম, ভিতরে যাইনি।'

'মা কেমন আছেন?'

'শুনেছি আজ দুপুরে নন্‌জম্মাজার মেয়ে হয়েছে। পো···পোয়াতি---দু'জনেই ভাল আছে।'

খবর শুনে খুশি হলেন কন্ঠীজোইসজী। কাল সকালেই দেখতে যেতে হবে। সেই সময় শ্যামন্নার সঙ্গেও বাক্যালাপ করা যাবে এখন। জুট্টগকে বললেন, 'আচ্ছা, তুই যা এখন।'

কিন্তু সে আর নড়ে না, বলে, একলা যেতে ওর ভয় করছে, সঙ্গে করে যদি পৌঁছে দেন।

'বাঃ রে হারামজাদা, আসবার সময় ভয় করেনি? এখন ফিরতে ভয় করছে! চুপচাপ বিদেয় হবি না পিঠের ওপর ভাল করে হাতের সুখ করে নেব?'

'না, না, যাচ্ছি, যাচ্ছি' বলতে বলতে সে গ্রাম থেকে বাইরে যাবার পথে এগোতে থাকে। কিন্তু প্লেগমাতা কবলিত গ্রাম থেকে বেরোতে হলে এই সঙ্করী গলি ছাড়িয়ে আরো অন্ততঃ দু'তিনশ কদম হাঁটতে হবে। কোন রকমে সাহস সঞ্চয় করে সে জোইসজীর বাড়ির সামনের সঙ্করীগলি পার হয়। তারপরেই হঠাৎ শোনা যায় 'ও মাগো' বলে বিকট চিৎকার করে সে ছুটে পালাচ্ছে।

বাড়ির সামনের দরজা তো ভিতর থেকে বন্ধ। কাজেই জোইসজী আবার বাগানের পাঁচিল টপকে পিছন দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকলেন। এসে আবার শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু সহজে ঘুম এল না। কাল শ্যামন্নার সঙ্গে কিভাবে বোঝা-পড়াটা করতে হবে, সেই চিন্তাই ঘুরতে লাগল মাথার মধ্যে। ওঁদের বাপেদের আমল থেকেই দুই পরিবারে রেষারেষি চলে আসছে। শ্যামন্নার বাবা নরসিংহায়া বলতেন, পাটোয়ারীর কাজ হল রাজমহলের কাজ, আর পাটোয়ারী হচ্ছে রাজপ্রতিনিধি। 'এখন এই রাঁড়ের ব্যাটাও সেই কথাই বলে বেড়ায়, কিন্তু আমিই বা কম কিসে? ওর কাজ যদি রাজমহলের তো আমার কাজও গুরুমহলের। আগেকার দিনে রাজমহলের কর্মচারী গুরুমহলের মানুষকে ধমক-দাবড় করে ডাঁট দেখাত বটে, কিন্তু একালে আর ও সব চলবে না। ওঁরা লোকের কাছে আদায় করেন আর আশা করেন যে সবাই ওঁদের জী হুজুর বলে খাতির দেখাবে। কিন্তু ও-সব অভিনয় আমার সামনে চলবে না। কন্ঠীজোইসের সম্বন্ধে কি জানে ওরা? 'কন্ঠী' শব্দের অর্থ রণধীর কন্ঠীরাও, এই সব রাজমহলেরও অধিপতি তিনি। ---এই হারামজাদাদের কাল আচ্ছা করে মজা দেখাতে হবে---এই সব ভাবতে ভাবতে ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লেন কন্ঠীজোইসজী।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। শ্যামন্নার কাছে যাবার কথা ভাবতে ভাবতেই উঠলেন, পিছনের বাগানে গিয়ে আবার ফিরে এলেন। এসেই দেখেন বাড়ির সামনে এক পুলিশ দাঁড়িয়ে। প্রশ্ন করতে সে জানাল, 'আপনার ছেলে কল্লেশের প্লেগ হয়েছে। তার বাঁ দিকের বগলে উঁচু হয়ে ফুলে উঠেছে, আপনি এখনি চলুন।'

'তাই নাকি? কোথায় সে?'

'বেলগোল্লাতে আছে। এখনও জ্ঞান আছে। হাবিলদার আমাকে পাঠালেন আপনাকে নিয়ে যেতে। গ্রামে ডিউটিতে গিয়েছিল ফেরার সময় প্লেগদেবীর ছোঁয়াচ নিয়ে এসেছে। শীগগীর চলুন।'

বেশী কথা বলার সময় নেই। পিছনের বাগানে গরু আর বাছুরটা বাঁধা ছিল, গ্রামের বাইরে থেকে পরিচিত লোককে ডেকে তাদের তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন নিজেদের খেতের কুঁড়ে ঘরে। তারপর ঘরে তালা দিলেন। এবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে পুলিশের কনস্টেবলটিকেও বসিয়ে নিলেন নিজের পিছনে এবং বাতাসের বেগে ছুটে চললেন শ্রবণবেলগোল্লার পথ ধরে।

৪

এবারের প্লেগের আক্রমণে নাগলাপুরে কারো প্রাণহানি হয়নি। আশে-পাশের সমস্ত মানুষ গ্রাম ছেড়ে দূরে চলে গেছে। রামসন্দ্র গ্রামের অধিবাসীরাও গ্রামের বাইরে কুঁড়ে তৈরী করে বসবাস করছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে তিনজন মারা গেছে। অন্যান্য গ্রামেও বেশ কিছু প্রাণহানি ঘটেছে। অবশ্য প্লেগ দেবী নাগলাপুর থেকে একটিও বলি গ্রহণ করেননি একথা বলা চলে না। সেই রাত্রে কন্ঠীজোইসজীর বাড়িতে পাথর ছুঁড়ে বাড়িতে ফিরে এসেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয় সেই জুট্টগ নামের লোকটি। নিজের স্ত্রীকে সে তখন জানায় যে, সে পরিত্যক্ত গ্রামের ভিতরে ঢুকেছিল, ফেরার পথে তার মনে হয়েছিল অন্ধকার গলির মধ্যে যেন মোটামত কালো রং এক স্ত্রীলোক তার কালো শাড়ীর আঁচল ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দেখেই তার জ্বর এসে গেছে। সে জ্বর আর ছাড়ল না জুট্টগের, দ্বিতীয় দিন দুপুর থেকেই সে অচৈতন্য হয়ে পড়ল, সন্ধ্যার দিকে একটু জ্ঞান ফিরে এলে স্ত্রীকে সে বলল, 'কন্ঠীজোইসজীকে ডেকে ঝাড় ফুঁক ও পূজোর ব্যবস্থা কর।' স্ত্রী তার ছোট মামাকে পাঠাল গ্রাম থেকে কন্ঠীজোইসজীকে ডেকে আনার জন্য। কিন্তু দেখা গেল তাঁর বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে, এদিক ওদিক খুঁজেও কন্ঠীজোইসজীকে পাওয়া গেল না। পরের দিন সকালে আবার খোঁজ নেওয়া হল কিন্তু তখনও বাড়ি তালাবন্ধ। জুট্টগের আবার একবার চেতনা ফিরতেই সে জানতে চায়, 'জোইসজী এসেছেন?' তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনেই জুট্টগের চোখের পাতা বুঁজে যায়, তারপর আর জ্ঞান ফিরে আসেনি তার। দু'দিন পরে মৃত্যু হল জুট্টগের। অবশ্য তার শরীরে কোথাও কোন গাঁট ফুলে উঠেছিল কি না সেটা কেউ দেখেনি, তবে প্লেগমাতার কোপদৃষ্টিতে পড়ে যাকে প্রাণ দিতে হল তার শরীরে কোথাও গাঁট যে ফুলবেই এমন কথাও তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। জুট্টগ অনেক মিনতি করে বলেছিল কন্ঠীজোইসজীকে, তার স্ত্রীকে যেন বিধবা হতে না হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত জুট্টগের স্ত্রীকে বিধবা হতেই হল।

নন্জুর যে দিন প্রসব হয় তার পরের দিন দুপুর বেলা ওদের খেতের বাটাইদার হোন্নাকে অক্কম্মা বাড়িতে পাঠাল কন্ঠীজোইসজীকে খবরটা দিয়ে আসার জন্য। নন্জুর মেয়ে হয়েছে এবং নবজাতক ও প্রসূতি দু'জনেই ভাল আছে—এই সংবাদ নিয়ে এসে হোন্না দেখে বাড়িতে তালা ঝুলছে। ফিরে গিয়ে সেই কথাই সে জানাল অক্কম্মাকে।

গিড্ডা, গুল্লিগ, সিদ্দুর ইত্যাদি যারা সে রাত্রে কন্ঠীজোইসজীর বাড়িতে পাথর ছুঁড়েছিল, তারা কেউ ঘুণাক্ষরেও সে সব কথা কারো কাছে উল্লেখ করেনি। সুতরাং অক্কম্মা বা নন্জম্মা সে ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারল না। গরু আর বাছুরটা পাঠিয়ে দেওয়াতে অক্কম্মা ধরে নিল ছেলে আবার কোথাও ঘুরতে বেরিয়েছে এবং এখনও বাড়ি ফেরেনি। পুরোহিত পুট্টভট্টর স্ত্রী এসে অনেক সাহায্য করল অক্কম্মাকে। অক্কম্মা পুট্টভট্টকেই অনুরোধ জানাল যে, সে নিজে যেন রামসন্দ্র গিয়ে শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য চেন্নিগরায়কে নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসে। রামসন্দ্র গ্রামের লোকও গ্রাম ত্যাগ করে বাইরে চলে গেছে, সেই পরিত্যক্ত গ্রামে যাওয়া উচিত কিনা তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আঁতুড় ঘরে শোয়া নন্জম্মা দূর থেকেই বলে উঠল, 'তারাও সবাই নিশ্চয় গ্রাম ছেড়েছে। গ্রামের সামনের দিকে দেবমন্দিরের পিছনে যে বড় ডুমুর

গাছটা আছে তারই কাছে আমাদের ফলের বাগান, আপনি সেখানেই গিয়ে খোঁজ নেবেন।' এরপর পুট্টভট্ট পূবদিকের পথ ধরে রওনা হয়ে গেলেন।

কুঁড়ে ঘরেই সবরকম আচার-অনুষ্ঠান পালন করার আয়োজন করা হল। দশম দিনে হবে নামকরণ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটেই রওনা হল চেন্নিগরায়। গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে অপ্পন্নায়া আর সাতুকেও নিয়ে এলে ভালই হত, কিন্তু সাতু এখন গর্ভবতী। তার বেশ শরীর খারাপ, এখনও প্রায়ই বমি করছে। তার ওপর সে আজকাল নিজের স্বামী ও শাশুড়ীর সঙ্গেও বিশেষ কথাবার্তা বলে না। অবশ্য মাঝে একদিন সে কথায় কথায় জবাব দিয়ে বসেছিল এবং তারপর অনেক গালিগালাজও হয়। ভাসুরের সঙ্গে তো সে কোন দিনই বেশী কথা বলে না। ভাসুরও কখনও সাতুর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেনি। সুতরাং এ রকম পরিস্থিতিতে চেন্নিগরায়কে একাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হল।

বেলা এগারটা নাগাদ বেলে মাটির নালাটা এবং চোলা টিলা পার হয়ে কটিগেহল্লী পৌঁছে গেল সে। তারপর আরো একটু হেঁটে পৌঁছল হবিনহল্লী। তার নজরে পড়ল একটা দোকানে পাকা লাল এলাচী কলার কাঁদি টাঙানো রয়েছে। এক আনায় তিন ছড়া হিসেবে চেন্নিগরায় তিন ছড়া কলা কিনে ফেলল। আগামীকাল নামকরণের পুজোর সময় 'তাম্বুল থালি'তে কলা দিতে হবে, তখন এগুলো কাজে লাগবে। একটা খোলা টিনের মধ্যে ভুরা চিনিও রয়েছে দোকানে, তাও সওয়া সের কিনে একটা কাগজের ঠোঙায় ভরে রেখে নিল নিজের পুঁটলির মধ্যে।

আরো মাইল দুই পথ চলতে চলতে একটা চিন্তা এল ওর মনে---প্রসূতির তো খুবই যত্ন হয়, তিন দিনে একবার তেল মালিশ করিয়ে স্নান, খাওয়ার সময় চামচ ভরে ভরে ভাল ঘি ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার তার ওপর সারাক্ষণ আরাম করে শুয়ে থাকা। কিন্তু তাতে আমার কি লাভ? বৌ নাগলাপুর যাওয়ার পর থেকে আমাকে তো কেউ একটা দিনও তেল মালিশ করে গরমজলে স্নান করায় নি? আমার বুঝি গা-হাত-পায়ে ব্যথা হয় না? ঐ ঠাকুমাবুড়ি অক্কম্মা তো নিশ্চয় তাঁর আদুরে নাতনীটিকে নিত্য-নতুন মুখরোচক রান্না করে করে খাওয়াচ্ছেন। মা নেই বলে সেবা যত্নটা তো আরো বেশী করেই হচ্ছে। পুট্টভট্টর মুখে তো এ সব খবর ভাল করেই পাওয়া গেল, কিন্তু আমার জন্য তো কিছুই পাঠায়নি? এমন কথাও বলে পাঠায়নি যে, তুমি অবশ্য এসো, তোমার জন্য অনেক মিষ্টি-মিঠাই বানিয়ে রাখছি! লাগাতে হয় জুতোর বাড়ি!

এই সব ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল চেন্নিগরায়, এমন সময় দেখা গেল এক বিশাল বটবৃক্ষ এবং তার কাছেই একটি পুষ্করিণী। আমাদের পাটোয়ারীমশাই অন্যমনস্কভাবে হাতের পুঁটলি নামিয়ে বসে পড়লেন সেই বটের ছায়ায়। ও হারামজাদাদের বাড়ির জন্য কলা আর চিনি বয়ে নিয়ে যাওয়ার কি দরকার? কথাটা যেই মনে হওয়া, তৎক্ষণাৎ পুঁটলি খুলে বার করা হল কলার ছড়াগুলো, চিনির ঠোঙাটা খুলে রাখল সামনে, তারপর একটি একটি করে কলার খোসা ছাড়িয়ে চিনিতে ডুবিয়ে টপাটপ মুখে পুরতে শুরু করে দিল। এক একটা গ্রাস ভাল করে চিবোবারও যেন তর সইছে না, অর্ধচর্বিত অবস্থাতেই কলাগুলো কোঁৎ কোঁৎ করে গিলতে লাগল। ততক্ষণে আর একটা কলার খোসা ছাড়িয়ে চিনিতে ডুবিয়ে হাতের মুঠোয় প্রস্তুত করে রাখা হয়ে গেছে।

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল আটত্রিশটা কলা এবং সওয়া সের ভুরা চিনি। এবার পুকুরে নেমে জল খেয়ে এল চেন্নিগরায়। পুঁটলিটাকে বালিশ করে সেইখানেই শুয়ে পড়ল সে এবং সন্ধ্যা

পর্যন্ত নাক ডাকিয়ে তোফা একটি ঘুম দিল। ঘুম ভাঙতে ধড়মড় করে উঠে পা চালিয়ে চলল নাগলাপুরের দিকে। ওদের কুঁড়ে ঘরটা কোন দিকে তার হদিশ পুট্টভট্ট আগেই বুঝিয়ে দিয়েছিল, কাজেই খুঁজতে বিশেষ অসুবিধা হল না। অক্কম্মা তো জামাইয়ের জন্য পথ চেয়ে বসেই ছিল। দুপুর বেলা যা রেঁধে রেখেছিল, সে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ; তাই আবার নতুন করে খাওয়ার যোগাড় করতে সে ভিতরে চলে গেল। এই অস্থায়ী আস্তানাতেও নন্‌জম্মার আঁতুড়ের জন্য একপাশে আলাদা একটা ঘর করা হয়েছে, সেইখানে একটা খাটের ওপর নবজাত শিশুকে নিয়ে শুয়েছিল সে। চেন্নিগরায় সেই ঘরের দরজার কাছে যেতে সে বলে উঠল, 'দুপুর বেলা তোমার জন্য রাঁধা খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তুমি সোজা এখানে না এসে ঐ গাছের তলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলে কেন?'

খুব আশ্চর্য হয়ে গেল চেন্নিগরায়, 'তোমরা সে কথা জানলে কি করে?'

'হবিনহল্লীর দোকানদার চিন্নৈয়া আমাদের পুরোহিত, সেই তো এসে বলল, তার দোকান থেকে তুমি তিন ছড়া লাল কলা আর সওয়াসের ভুরা কিনেছ। সে এ গ্রামে এসেছিল কিছু জিনিস-পত্র কিনতে, আসার পথে সে দেখেছে তুমি বটতলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছ আর পাশে একরাশ কলার খোসা পড়ে আছে।'

'এই কথা বলেছে এসে? ব্যাটার মায়ের ···' গালাগালটা সম্পূর্ণ উচ্চারিত হবার আগেই নন্‌জু বলে ওঠে, 'মুখ-খারাপ করছ কেন? পথে খিদে পেয়েছিল তাই কলা কিনে খেয়েছ, অমন তো সবাই করেই থাকে, তাতে আর কি হয়েছে? তবে তাড়াতাড়ি যদি চলে আসতে তো খিদের মুখে বাড়িতে বসে ভাল করে খেতে পারতে!' এ কথার কোন জবাব যোগাল না, কোন গালাগালও আর দিতে পারল না চেন্নিগরায়।

পুট্টভট্ট এবং তার স্ত্রীর সাহায্যে গ্রামের আরো কিছু প্রতিবেশীকে আমন্ত্রিত করে নবজাতকের নামকরণ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করাল অক্কম্মা। পাটোয়ারী শ্যামন্নার পরিবারও এসেছিল। বাড়ির প্রথম কন্যাসন্তানের নাম ঠাকুমা গঙ্গম্মার নাম অনুসারেই হওয়া উচিত। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি জীবিত আছেন, সুতরাং নাম ধরে ডাকার সমস্যা দেখা দেবে---সেই কথা চিন্তা করে অবশেষে জন্ম-নক্ষত্র অনুসারে মেয়ের নাম রাখা হল পার্বতী। চেন্নিগরায় শ্বশুর বাড়িতে থেকে গেল আট দিন। অক্কম্মা রোজ তাকে ভাল ভাল রান্না করে খাওয়ালো, আদর যত্নেরও কোন ত্রুটি হল না। প্রসূতির পুষ্টির জন্য আনা হয়েছিল শুকনো নারকেল আর গুড়, বেশ পরিতৃপ্তি সহকারে তাতেও ভাগ বসাল চেন্নিগরায়। প্রসূতি নন্‌জম্মাও পান সেজে দিত ওর জন্য। নাতজামাইকে আরো ভাল ভাল সুখাদ্য প্রস্তুত করে খাওয়াবার খুবই ইচ্ছা ছিল ঠাকুমার, কিন্তু বার্ধক্যের ফলে আজকাল সাধ থাকলেও শক্তিতে কুলোয় না বেচারীর। তার ওপর ছেলে কন্ঠীজোইস যে কোথায় গিয়ে বসে আছে কে জানে, ভাল সুখাদ্য রাঁধতে হলে ভাল করে বাজারও করতে হয়, এদিকে বৃদ্ধার হাতে পয়সা-কড়িও ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছিল।

নন্‌জু একদিন স্বামীকে মনে করিয়ে দেয়, 'গ্রামে পাটোয়ারীর নিশ্চয় অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, এলাকাদারকে না জানিয়ে এখানে এতদিন থেকে গেলে কোন গোলমাল হবে না তো?'

স্বামী উত্তর দিল, 'তাহলে এলাকাদারকে একখানা চিঠি লিখে দিই না হয়?'

'আদায় উসুলের সময় এসে গেছে। এ সময় তুমি গ্রামে না থাকলে দাবরসায়াজী একলা

কি করে বসবেন কে জানে। তাছাড়া আদায়-উসুলের কাজটা তো তোমারই করা উচিত? আজ বোধহয় পনের-ষোল তারিখ হয়ে গেল। বর্ষাও এসে গেছে, গ্রামে জমিগুলোর অবস্থাও তো দেখা দরকার!

সুতরাং গ্রামে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। অগত্যা চেন্নিগরায় পাটোয়ারী মহোদয় পরদিন সকালে জলখাবার খেয়ে ঠাকুমা অক্কম্মার দেওয়া জিনিসপত্র পুঁটুলিতে বেঁধে বাড়ির পথে রওনা হয়ে গেল। সে চলে যাবার পর অক্কম্মা নাতনীকে প্রশ্ন করে, 'হ্যাঁরে নন্‌জু, এই কদিনে তোর বর কিন্তু একটিবারও বাচ্চাটাকে কোলে নেয়নি, মেয়ে হয়েছে বলে ওর রাগ হয়নি তো?'

কোন উত্তর দেয়না নন্‌জু, তার চোখে তখন জল এসে গেছে। তার ইচ্ছা হচ্ছিল সে বলে, 'ছেলে হলেও সে কোলে নিত না।' কিন্তু ও কথা বলা চলবে না, কাজেই এমন ভাব দেখাতে হল যেন সে ঠাকুমার প্রশ্নটা শুনতেই পায়নি। নিঃশব্দে সে চোখের জল আঁচলে মুছে ফেলল।

৫

কন্ঠীজোইসজী যখন গিয়ে পৌঁছলেন ততক্ষণে কল্লেশের বগলের ফুলো খুব বেড়ে উঠেছে, যন্ত্রণাও হচ্ছে দারুণ। সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার তাকে দেখে ওষুধ দিলেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে বড় ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাবার পরামর্শও দিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় রোগীকে নড়ানো মুশকিল। ডাক্তার অবশ্য বললেন তাঁর যতদূর সাধ্য তিনি চেষ্টা করবেন। কিন্তু কন্ঠীজোইসজী হাবিলদারকে অনুরোধ করলেন কোন রকমে একখানা গাড়ির ব্যবস্থা করতে।

হাবিলদার চেন্নপট্টন গিয়ে একখানা গাড়ি যোগাড় করে আনার পর কল্লেশকে তাইতে শুইয়ে হাসান শহরে নিয়ে যাওয়া হল। পথেই তার প্রাণটা বেরিয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তা ঘটল না। তাকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হল বড় হাসপাতালে। কল্লেশের শ্বশুর রঙ্গন্নাজী এই হাসানে পোষ্টম্যানের কাজ করছেন আজ পঁচিশ বছর। হাসপাতালের ডাক্তার তাঁর বিশেষ পরিচিত। ডাক্তার খুব যত্ন করেই চিকিৎসা করলেন। বগলের ফুলে ওঠা জায়গাটার পুঁজ-রক্ত ও বিষিয়ে ওঠা অংশটা অস্ত্রোপচার করে বার করে ফেলে ওষুধপত্র দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। জীবনের আশঙ্কা কেটে গেল। কিন্তু কল্লেশ খুবই দুর্বল হয়ে পড়ল, ডাক্তার তাকে বললেন আরো অন্তত পনের দিন হাসপাতালে থাকতে হবে। এই সময়টা কন্ঠীজোইসজীও থেকে গেলেন কল্লেশের শ্বশুর বাড়িতে, সেখানে থেকে কল্লেশের দেখাশোনা করতে লাগলেন।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার দিন দেখা গেল কল্লেশ বাঁ হাতখানা ভালভাবে নাড়াতে পারছে না, কারণ সেইদিকের বগলে আবার একটা ফোড়া উঠেছে। ডাক্তার বললেন, 'একে এখন এখানেই রাখুন, আমি চিকিৎসা করব।' সুতরাং রঙ্গন্নাজী জামাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখলেন এবং আরো দিন আষ্টেক পরে ঘোড়ায় চড়ে কন্ঠীজোইসজী রওনা হলেন নিজের গ্রামের উদ্দেশ্যে। গত পঁচিশ দিনে সত্যিই যদি কষ্ট কারো হয়ে থাকে তো সেটা হয়েছে ঐ বেচারা ঘোড়াটার। কন্ঠীজোইসজী তো কুটুম্বের বাড়িতে ছিলেন, হাসানের পোষ্টম্যান রঙ্গন্নাজীর বাড়িতে ঘি দুধের খুব একটা প্রাচুর্য না থাকলেও তাঁর খাওয়া-দাওয়া কিছু খারাপ হচ্ছিল না। কিন্তু তাঁর আদরের সাদা ঘোড়ার উপযুক্ত দানাপানি ঘাস ইত্যাদির ব্যবস্থা কে আর করবে?

এতদিনে গ্রামে প্লেগের প্রকোপ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আশে-পাশে দু'চার পশলা বৃষ্টিও পড়েছে। নাগলাপুরের অধিবাসীরা কুঁড়ে ঘর ছেড়ে ফিরে এসেছে নিজেদের গ্রামের বাড়িতে। অক্কম্মা এবং নন্‌জম্মা কদিনের মধ্যেই খবর পেয়ে গেল, কল্লেশের প্লেগ হওয়ায় কন্ঠীজোইসজী তাকে হাসানে নিয়ে গেছেন এবং সেখানে গিয়ে সে সেরে উঠেছে। এখন অক্কম্মা ভেবে দেখল কন্ঠীজোইসজীর জন্য অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই, হোন্না এবং পুট্টভট্টের সাহায্যেই জিনিষপত্র সমেত পো-পোয়াতিকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। প্রথমে সে নিজে বাড়িতে গিয়ে ছুতোর ডেকে তালা ভাঙাল। ভিতরে ঢুকে দেখে, ঘরের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়ে মাটির মেঝে কাদায় প্যাচপ্যাচে হয়ে রয়েছে। ছাদের কড়ি-বরগা সমস্ত ভিজে। কেউ বলে না দিলেও অক্কম্মা পরিষ্কার বুঝল কেউ বজ্জাতি করে পাথর ছুঁড়ে ছাদ ভেঙেছে। কিন্তু এ সব নিয়ে খোঁজ-খবর করার এখন সময় নেই। মই লাগিয়ে ছাদে উঠে হোন্না কোন মতে খাপরাগুলো আবার ঠিকঠাক করে সাজিয়ে ছাদ মেরামত করল। সমস্ত দরজা জানলা খুলে দেওয়া হল---যাতে হাওয়া লেগে মেঝেটা শুকিয়ে ওঠে, কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হল না, আবার নতুন করে মাটি ও বালি ফেলে মেঝে ঠিক করাতে হল। যাহোক, অন্যাদের থেকে চারদিন দেরী হয়ে গেলেও অক্কম্মা শেষ পর্যন্ত ভালভাবেই প্রসূতি ও শিশুকে বাড়িতে নিয়ে এল। নন্‌জুর প্রসবের পর একমাস কেটে গেছে। সে আজকাল একটু আধটু কাজ কর্ম করতে চায়, অক্কম্মা ওকে কিচ্ছুটি করতে দেবে না। ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া থেকে শুরু করে গরু দোয়া পর্যন্ত সমস্ত কাজ অক্কম্মা করে একলা হাতে।

এরা বাড়িতে ফিরে আসার চতুর্থ দিনে দুপুর তিনটের সময় ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে কন্ঠীজোইসজী বাড়ি এসে পৌঁছলেন। প্রথমেই অক্কম্মা ও নন্‌জুকে জানালেন কল্লেশ ভাল আছে। এরপর ওঁর নজর পড়ল ঘরের মেঝের দিকে। প্রশ্ন করলেন, 'এ আবার কি? নতুন করে মেঝে তৈরী হয়েছে দেখছি, কি দরকার পড়েছিল?'

'ওরে দেখ, কেউ নিশ্চয় ছাদে পাথর ছুঁড়েছিল, আর নয়ত চিল শকুনে টানাটানি করে খাপরা-গুলো ওলট পালট করেছে, তাইতে বৃষ্টির জল ঘরের মধ্যে পড়ে সারা ঘরের মেঝে একেবারে ধানের খেত হয়ে গিয়েছিল, পা রাখার উপায় ছিল না। হোন্নাকে দিয়ে মেঝে মেরামত করিয়ে, তবে তো জিনিসপত্র নিয়ে এখানে আসতে পারলাম।'

'ব্যাটার মা চাঁড়ালের ··· মজা দেখাচ্ছি ব্যাটাকে' বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন কন্ঠী-জোইসজী। কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারল না অক্কম্মা আর নন্‌জম্মা।

প্রতিদিন মধ্যাহ্নভোজনের পর গ্রামের কিছু প্রবীণ ব্যক্তি পাটোয়ারী শ্যামন্নার বাড়ির বড় বারান্দায় বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত দাবা খেলেন। বহুদিন থেকে এই রীতি চলে আসছে। কন্ঠীজোইসজী জানতেন শ্যামন্নাকেও ঐ সময় ওখানেই পাওয়া যাবে। সোজা গিয়ে তিনি বারান্দায় উঠে হুঙ্কার দিলেন, 'হারামজাদা ব্যাটা, রাতের বেলা অন্ধকারে লোক লাগিয়ে আমার বাড়িতে পাথর ফেলিয়ে-ছিস? যদি পুরুষ মানুষ হতিস তবে না দিনের বেলা সারা গাঁয়ের সামনে দিয়ে বুক ফুলিয়ে আসার সাহস থাকত? কি ভেবেছিস তুই আমাকে? আমি পুরুষ মানুষ, তোর মা খানকি তোর বোনকে··· '

এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব এবং গর্জন শুনে দাবার আসরের লোকেরা অবাক হয়ে চেয়ে রইল। শ্যামন্নাও বেশ ঘাবড়ে গেছে। কন্ঠীজোইসজী সোজা ঢুকে গেলেন ওর বাড়ির মধ্যে। দরজার

ওপাশে ছিল উদূখল এবং তার কাছেই দেওয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল উদূখলের মুষলটা। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি ডান হাতে মুষল এবং অন্য হাতে আর একদিক থেকে বাঁশের মইটা উঠিয়ে নিয়ে বাইরে এলেন। মই লাগিয়ে সোজা উঠে গেলেন ছাদে আর তারপর মুষলের বাড়ি মেরে মেরে খাপরাগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে আরম্ভ করলেন। চার-পাঁচ ঘা মুষল পড়তেই দাবা খেলুড়েদের মাথার ওপরে বারান্দার ছাদের সব খাপরা ভেঙে শেষ হল—তারপর তিনি অগ্রসর হলেন আরো ওপরের দিকে।

বারান্দার ওপরকার খাপরায় আক্রমণ শুরু হতেই খেলুড়েরা নেমে এসেছে বাইরে। সাক্ষাৎ ভীমসেনের ভঙ্গীতে কন্ঠীজোইস এদের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন এবং তারপর আবার গর্জন শোনা গেল, 'এই কাপুরুষের দল, শুনে রাখ, তোদের সবকটার বৌয়ের মাথা মুড়িয়ে গলার মঙ্গল-সূত্র খুলিয়ে তবে ছাড়ব।' বলতে বলতেই খান দুই খাপরা তুলে তাদের দিকে ছুঁড়লেন এবং সেগুলো গিয়ে দুজনকে আঘাত করল। একজনের মাথা ও অন্যজনের কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে দেখা গেল। সমবেত লোকেরা এদিক ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। শ্যামন্নাও ভীতুলোক নয়, সে একবার ভাবল ছাদে উঠে কন্ঠীজোইসকে একটু শিক্ষা দিয়ে দেবে, কিন্তু তাতে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে এটা বুঝে অন্য উপায় চিন্তা করতে লাগল।

কে জানে কতদিনের পরিশ্রমে কুমোর ঐ দশ হাজার খাপরা গড়েছিল, কিন্তু কন্ঠীজোইসজীর হাতের মুষল মাত্র আধঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে সারা বাড়িখানার ছাদের সমস্ত খাপরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলল। এবার ধীরে ধীরে নিচে নেমে মুষল ও মই যথাস্থানে রেখে তিনি বেরিয়ে এলেন। সামনের ঘরের বারান্দায় ছেলেমেয়ে নিয়ে আতঙ্কিত মুখে দাঁড়িয়েছিল শ্যামন্নার স্ত্রী, তার কাছে গিয়ে বললেন, 'দেখ বোন, তুমি হলে তুবিনকেরের তম্ময়াজোইসজীর মেয়ে, তাই তোমাকে এ কথা বলছি। তম্ময়াজোইসজী আমার গুরুর মতন। জনশূন্য গ্রামে আমি একা আছি ভেবে তোমার স্বামী চাকর-বাকর পাঠিয়ে মাঝরাত্রে আমার বাড়িতে পাথর ফেলিয়েছে। কিন্তু দেখছ তো আমি যা করার দিনের আলোতেই করলাম। কন্ঠী হচ্ছে পুরুষ মানুষ তোমার স্বামীকে বলে দিও আর কখনও যেন অমন কাপুরুষের মত কাজ না করে। এমন কিছু করুক যাতে লোকে বলে, 'হ্যাঁ পুরুষ বটে!' ঐ হারামজাদা আঁটকুড়ের ব্যাটা তোমার স্বামীটার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।' কথাগুলো বলেই তিনি চলে গেলেন নিজের বাড়ির দিকে। হতবাক শ্যামন্নার বৌয়ের মুখে একটি কথাও ফুটল না।

বাড়িতে ফিরেই কন্ঠীজোইসজী সোজা চলে গেলেন রান্নাঘরে। অক্কম্মা তখন উনুনে চড়ানো ভাতের হাঁড়িতে বাসমতী চাল ছাড়ছে। প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে আনা শাক রান্না করে রাখা রয়েছে একপাশে। পেছনের দরজা দিয়ে কুয়োতলায় গিয়ে দু'ঘড়া জল তুলে আরাম করে স্নান করলেন কন্ঠীজোইসজী। তারপর বিশুদ্ধ উচ্চারণে সন্ধ্যা-বন্দনার মন্ত্রপাঠ করতে করতে গা-মাথা মুছে একটি গামছা পরলেন। ঠাকুরের বেদীর কাছে রক্ষিত চন্দন পাটায় বেশ খানিকটা চন্দন ঘষে কপালে ও মাথায় লেপন করে, হাত ধুয়ে এবার খেতে বসে গেলেন তিনি। এক সের চালের গরম গরম ভাত রান্না হয়েছে, তার সঙ্গে আছে ঘরে তৈরী গাওয়া ঘি। প্রসূতির জন্য সেই ঘি প্রস্তুত করা হয়েছিল, তার অনেকটা এখনও অবশিষ্ট আছে। সুপারি গাছের বাকলের পাত্রে ভাত পরিবেশিত হলে মিনিট তিনেকের মধ্যেই শাক দিয়ে মেখে সে ভাত উদরস্থ করে ফেললেন

কন্ঠীজোইস। তারপর দ্বিতীয়বার দেওয়া ভাত আচার আর তেল দিয়ে মাখতে মাখতে অক্কম্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নতুন মায়ের জন্য গরুর দুধ কম পড়ছে না তো?'

'অনেক বেশীই হচ্ছে। হাঁড়ি ভরা ঘি তৈরী রয়েছে।'

'ও যখন শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবে ততদিনে অন্তত চার হাঁড়ি ঘি তৈরী করে সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে যাতে ওখানে গিয়েও কিছুদিন ধরে ভাল করে খেতে পারে। কি রকম রেড়ির তেল পিষিয়েছিলে, ছোট না বড়?'

'এত তাড়াতাড়ি পোয়াতিকে রেড়ির তেল মাখিয়ে কেউ স্নান করায় নাকি? ঠাণ্ডা লেগে যাবে না?'

'ও, আচ্ছা, তা নামকরণ হয়ে গেছে না কি?'

'হ্যাঁ। চেন্নিগরায় এসেছিল। নাম রাখা হয়েছে পার্বতী।'

পাতের দই-ভাতটুকু শেষ করে বড়সড় একটি ঢেঁকুর তুলে এবার উঠলেন কন্ঠীজোইসজী। প্রসূতি যে-ঘরে শুয়েছিল সেই ঘরে গিয়ে এবার বললেন, 'কই রে নন্‌জা, তোর খুকী কোথায়? দে দেখি আমার কোলে, ভাল করে দেখি একটু।'

শিশুকে কোলে নিয়ে গুছিয়ে বসলেন দরজার চৌকাঠের ওপর। শিশু বেশ গৌরবর্ণা হৃষ্ট-পুষ্ট। 'এ তো ঠিক তোরই মত দেখতে হয়েছে রে? ঠিক তোর মত বড় কপাল। কি নক্ষত্রে জন্ম তা বলেছে?'

'পুট্টভট্টজী কিছু বলেছেন বোধ হয়। কিন্তু জন্মপত্রিকা আপনাকেই তৈরী করতে বলেছেন, উনি বললেন, আপনি ওঁর চেয়ে অনেক ভাল জানেন।'

'ঠিক আছে, কাল আমাকে মনে করিয়ে দিস। জন্ম-সময়টা ঠিকমত লেখা আছে তো? এখন আমাকে একটু পান দে দেখি। সকাল থেকে তামাক খাওয়াও হয়নি।' এবার শিশুকে কোলে নিয়েই রান্নাঘরে গিয়ে উপস্থিত হলেন কন্ঠীজোইস, অক্কম্মাকে বললেন 'গোলমরিচ মশলা ইত্যাদির জন্য টাকার ব্যবস্থা করলে কোথা থেকে? এই সব ব্যবস্থার কথা তো আমার মনেই ছিল না। দাঁড়াও দেখি'—বলতে বলতে কোটের পকেট থেকে তিরিশটা টাকা বের করে অক্কম্মার হাতে দিয়ে বললেন, 'কারো কাছ থেকে ধার করে থাক তো ফিরিয়ে দিয়ে এস। এখন আমি ক'দিন গ্রামেই থাকব। পনের বিশ দিন পরে হাসানে গিয়ে যদি দেখি কল্লেশ পুরোপুরি সেরে উঠেছে তাহলে তাকে এখানে নিয়ে আসব।'

মেয়ের হাতের পানটা নিয়ে মুখে পুরে শিশুকে তার কোলে ফিরিয়ে দিলেন, তারপর কন্ঠীজোইসজী বাঁ-হাতের চেটোতে কিছু তামাকপাতা নিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে সেটা বেশ করে চটকে চালান করলেন মুখের ভিতরে। বাইরের নর্দমার কাছে গিয়ে কয়েকবার পিক ফেলে এসে তারপর খাটিয়া পেতে শুয়ে পড়লেন একটু বিশ্রামের জন্য। বিকেলের দিকে উঠে খেতখামারের দিকটা একবার ঘুরে এলেন, তারপর রাত্রে বেশ পরিপাটি করে গরম গরম ভাত রুটি তরকারী খেয়ে আরাম করে নিদ্রা দিলেন।

৬

মধ্য রাতে মনে হল কে যেন দরজায় ধাক্কা মারছে। কন্ঠীজোইস উঠে দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?' উত্তরে যা জবাব শুনলেন তাতে বেশ অবাক হতে হল—'তোমার শ্বশুর বাড়ির লোক, চট্‌পট্‌ দরজা খোল।'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন কন্ঠীজোইস, ছিটকিনি খুলতে খুলতে গর্জে উঠলেন, 'জানোয়ার কোথাকার! কে তুই, তোর মাথার ঠিক আছে তো?' দরজা খুলতেই চারজন পুলিশ হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে দু-পাশ থেকে বজ্র-মুষ্টিতে ওঁর দুই বাহু চেপে ধরল। এত জোরে ধরেছে যে ঝটকা মেরেও ছাড়াতে পারলেন না নিজেকে। হাবিলদার হুইস্‌ল বাজাতে ইতিমধ্যে পেছনের পাঁচিল টপকে আরো দুটো পুলিশ লাফিয়ে পড়ল উঠোনে।

'ব্যাপারখানা কি? আমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে কেন?' হাবিলদার জবাব দিল, 'যা কিছু জিজ্ঞাসা করতে হয় থানায় গিয়ে করবেন, চলুন এখন।' ইতিমধ্যে নন্‌জম্মা ও অক্কম্মা জেগে উঠেছে, বাইরে এসে ব্যাপার দেখে তারা কান্না শুরু করে দিল। কন্ঠীজোইসজী ওদের বুঝিয়ে বললেন, 'অক্কম্মা কেঁদোনা, মনে হচ্ছে এ সব ঐ ব্যাটা শ্যামন্নার কারসাজি। যা হোক, চেন্নরায়পট্টন থেকে একবার ঘুরে আসি। তোমরা সদর দরজাটা বন্ধ করে দাও। আমি যতক্ষণ থাকব না তার মধ্যে বাড়ির কাছাকাছি একটা কুকুরও যদি আসে তো ঝাঁটা মেরে তাড়াবে।' এরপর ওঁকে রওনা দিতে হল পুলিশদের সঙ্গে। গ্রামের বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, পুলিশ কন্ঠীজোইসজীকে নিয়ে চলল চেন্নরায়পট্টনের পথে। শ্যামন্না অবশ্য গ্রামেই রয়ে গেল।

সন্ধ্যার মুখে নিজেদের খেতের দিকে গিয়েছিল অক্কম্মা। ছেলে কিভাবে শ্যামন্নার বাড়ির ছাদের সমস্ত খাপরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এসেছে তার বিবরণ সেখানেই শুনল সে, কারণটাও জানতে বাকি রইল না। শ্যামন্নাই যে পুলিশে খবর দিয়ে তার ছেলেকে গ্রেপ্তার করিয়েছে এটা বুঝতে পেরে বেজায় রাগ হল অক্কম্মার। রাত্রে একলা গিয়ে হাজির হল শ্যামন্নার বাড়ির সামনে, তারপর পথের ধুলো মাটি মুঠো মুঠো তুলে তার বাড়ির দিকে ছুঁড়তে-ছুঁড়তে প্রচণ্ড গালিগালাজের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল—'হায় হায়, ছিঃ, ছিঃ তোর মত ছেলের যারা জন্ম দিয়েছে তাদের মুখে হেগে দিতে হয়। মাঝরাতে চুপি চুপি আমার বাড়িতে পাথর ফেলতে লোক পাঠিয়েছিস হতভাগা ভীতু, হারামজাদা কোথাকার! রাঁড়ের ব্যাটা, তুই কি একটা পুরুষ? আমার ছেলেকে আমি মানুষ করেছি পুরুষ ছেলের মত, বুঝলি? তাই সে পষ্ট দিন-দুপুরে এসে তোর বাড়ি ভেঙেছে। ভয় পেয়েছিস বলেই তো তোকে পুলিশ ডাকতে হল? তুই কি শাড়ি পরে থাকিস না-কি? সবংশে নাশ হোক, সগুষ্ঠি নিপাত যা তুই। তোর বৌ বিধবা হোক। বেটা রাঁড়ের পুত, দেখে নিস, তোর বৌকেও একদিন আমারই মত মাথা মুড়িয়ে লাল শাড়ী পরতে হবে। বিধবার মুখের শাপমান্যি সোজা কথা নয়, এটা মনে রাখিস ···।'

ইতিমধ্যে বেশ কিছু লোক জমে গেছে সেখানে। কলহের কারণটা সবাই জানে, কিন্তু কেউ এখন মুখ খুলল না। শ্যামন্নার বাড়ির দরজা বন্ধই রইল। এতক্ষণে অক্কম্মার খেয়াল হল, বাড়িতে নন্‌জু বাচ্চাকে নিয়ে একলা রয়েছে, তাই সে আরো বহুবিধ গালাগাল দিতে দিতে নিজের বাড়ির পথে ফিরে চলল।

এদিকে চেন্নরায়পট্টনের পুলিশথানায় পৌঁছে হাবিলদার মহোদয় জানালেন, 'আজ রাতটা এখানেই থাকুন, কাল সকালে সাব-ইন্‌স্পেক্‌টার সাহেব এলে আপনার বক্তব্য শোনা হবে।' কিন্তু কন্ঠীজোইসজী চুপচাপ এ কথা মেনে নেবার পাত্রই নন, তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, 'এক্ষুণি ডেকে পাঠাও তাকে। যা জিজ্ঞেস করতে হয়, এখুনই করতে হবে। আমি কিছু চুরি করিনি যে, আমাকে এনে থানায় আটকে রাখা হবে!' মারধোর করে তাঁর মুখ বন্ধ করাবার সাহস পুলিশদেরও নেই, কারণ তাঁর সম্বন্ধে তারাও সব কিছুই খবর রাখে। দেখতে দেখতে সাব-ইনস্পেকটার এসে হাজির হল। শ্যামন্না গ্রামের পাটোয়ারী, অর্থাৎ কিনা সরকারী কর্মচারী। সে নালিশ করেছিল যে, তার বাড়ির খাপরা ভাঙা হয়েছে এবং বাড়ির ভিতরে ঢুকে পাটোয়ারী কাজের হিসাবপত্রের খাতা লুঠ করা হয়েছে। শুধু খাপরা ভাঙার নালিশ শুনে পুলিশ এত চটপট তৎপর হত কিনা সন্দেহ, কিন্তু সরকারী খাতাপত্র গায়েব করা অতি গুরুতর অভিযোগ, কাজেই এ অভিযোগের তদন্ত করতে পুলিশ দেরী করবে না। শ্যামন্না এই নালিশের প্রতিলিপি তালুকের অমলদারের কাছেও পাঠিয়ে দিয়েছিল।

জোইসজী পরিষ্কার বলে দিলেন, 'আমি কিছুই জানি না। ওর বাড়িতে আমি যাই-ই নি। এ সব মিথ্যা কথা।' পরের দিন স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও অমলদারের সামনেও এই একই কথা জানালেন তিনি। পুলিশ মামলার বিবরণ লিখে নিয়ে স্থানীয় নগরপালিকা সমিতির সদস্য হনুমন্ত শেট্টির জামিনে কন্ঠীজোইসজীকে মুক্তি দিয়ে দিল। ফিরে এসে গোঁফে তা দিতে দিতে সারা গ্রামখানা একবার ঘুরে এলেন কন্ঠীজোইস।

শ্যামন্নাকে ধরে এনে একদিন আশ মিটিয়ে প্রহার করার ইচ্ছেটা খুবই হচ্ছিল, কিন্তু এখন মাথার ওপর মামলা ঝুলছে কাজেই মারপিট করা যুক্তিযুক্ত নয় এটা বুঝে কন্ঠীজোইস চুপচাপ রইলেন। কিছুদিনের মধ্যে সমন এসে হাজির হল হোলেনরসীপুরের আদালত থেকে। কন্ঠীজোইসজী মামলা লড়বার জন্য নিযুক্ত করলেন প্রসিদ্ধ উকিল ভেঙ্কটরায়কে। এরপর তিন মাস ধরে তাঁকে বহুবার হাসান আর হোলেনরসীপুর যাতায়াত করতে হল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে।

সাক্ষীদের সাক্ষ্য দেবার দিন সকালেই উকিলের সঙ্গে দেখা করার কথা, তাই রাত্রেই কন্ঠীজোইস ঘোড়ার পিঠে চড়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। চেন্নরায়পট্টন অতিক্রম করার পর দেখা গেল নদীতে জল বাড়ছে। এ সময় নদীতে জল বাড়াটা বেশ অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, কিন্তু ওঁকে তো যেমন করে হোক নরসীপুর পোঁছতেই হবে। তখন মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় বেশ বোঝা যাচ্ছে তীব্র স্রোত গর্জন করতে করতে ক্রমশই নদীর দুই তট প্লাবিত করে ফেলছে, এ অবস্থায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে নদী পার হওয়ার চেষ্টা খুব বিপজ্জনক। নদীর ধারেই ডাকবাংলো, সেখানে গিয়ে চৌকিদারকে ডেকে তুললেন কন্ঠীজোইসজী। সে খবর দিল, দু-দিন থেকে খেয়া পারাপার বন্ধ রয়েছে। নদীর এখন বেশ বেসামাল অবস্থা। কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন কন্ঠীজোইস, তিনি চৌকিদারকে একটা টাকা দিয়ে ঘোড়াটাকে দেখাশোনা করতে বলে দিলেন। নিজের কাছে যে রূপোর টাকাগুলো ছিল সেগুলো থলিতে ভরে বেশ মজবুত করে বেঁধে নিলেন কোমরে। কোট, প্যান্ট, সার্ট সব খুলে রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেললেন মাথার ওপর। তারপর

চৌকিদারের নিষেধের প্রতি কর্ণপাতও না করে গ্রামের বাইরে কিছুটা উজানের দিকে গিয়ে সাঁতার দিতে শুরু করলেন।

কোণাকুণি ভাবে সাঁতার দিয়ে প্রায় আধ মাইল ভাঁটির দিকে নেমে এসে শেষ পর্যন্ত ওপারে পৌঁছে গেলেন তিনি। কৌপীন ভিজে গিয়েছিল, মাথার ওপর বেঁধে রাখা জামা-কাপড়ও কিছুটা ভিজেছে। আধ মাইল পথ চলতে চলতেই দেহ এবং জামা-কাপড় শুকিয়ে গেল, এবার কোট-প্যান্ট ইত্যাদি পরে নিয়ে খালি পায়েই এগিয়ে চললেন জোর কদমে। আরও আট মাইল পথ বাকি এখনও। ভোরের মোরগের ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই কন্ঠীজোইস পৌঁছে গেলেন নরসীপুরে। নদীর তীরেই প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সেরে সন্ধ্যা-আহ্নিক সমাপ্ত করলেন, তারপর উকিলের বাড়িতে যখন গিয়ে পৌঁছলেন তখন সবে সূর্যোদয় হয়েছে।

সেদিন ছিল দুই প্রধান সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের দিন। তাদের মধ্যে একজন শ্যামন্নার পত্নী। বিচারকের সামনে যে-সব বস্তু স্পর্শ করে সত্যকথনের শপথ নিতে হয় সেগুলি স্পর্শ করানোর সময় উকিল তাকে বলল, মিথ্যা বললে তার স্বামী ও সন্তানের মৃত্যু হবে। কথাটা শুনেই অক্কম্মার অভিশাপের কথাও মনে পড়ে যাওয়াতে কেঁদে ফেলল শ্যামন্নার বৌ। উকিল যখন তাকে ঠিক ঠিক কি ঘটেছে বলতে বলল তখন সে ভয়ে ভয়ে বলল, 'কন্ঠীজোইসজী আমাদের বাড়িতে ঢুকে মুষল দিয়ে খাপরা ভেঙেছিলেন। শুনেছি নাকি, যখন গাঁয়ে লোক ছিল না সেই সময় আমাদের 'ইনি' গুল্লিগ, জুট্টগ ওদের দিয়ে কন্ঠীজোইসজীর বাড়িতে পাথর ফেলিয়েছিলেন; সেই জন্যই উনিও অমন করেছিলেন।'

শ্যামন্নাও আদালতে উপস্থিত ছিল। সে এমনভাবে তার স্ত্রীর দিকে তাকাচ্ছিল যেন এখনি পারলে তাকে গিলে খায়। জোইসজীর উকিল এবার বললেন, 'দেখ বোন, তুমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়েছ সব সত্যি কথা বলবে। এখন বল তো, জোইসজী তোমাদের বাড়িতে ঢুকে পাটোয়ারীর খাতাপত্র লুঠ করে এনেছেন একথা মিথ্যা কি না?'

'হিসেবের খাতাপত্র কিছুই নেননি। আমি সেখানেই দাঁড়িয়েছিলাম।'

শোনা যায়, সেদিন গ্রামে ফিরে এসে শ্যামন্না নাকি স্ত্রীর প্রায় দফা সেরে ফেলেছিল।

শ্রবণবেলগোলার পুলিশ হাবিলদার কন্ঠীজোইসজীর পক্ষ নিয়ে বলল, 'সেই দিন দুপুর তিনটের সময় আমি হাসান গিয়েছিলাম, সেখানে আমি কন্ঠীজোইসজীকে দেখেছিলাম।' শ্যামন্নার নালিশ ছিল এই যে, উক্ত দিন দুপুর তিনটের সময়ই কন্ঠীজোইস তার বাড়িতে এসে খাপরা ভেঙেছেন এবং খাতা-পত্র নিয়ে গেছেন।

আদালতের রায় বের হবার দিন শ্যামন্না এবং কন্ঠীজোইস দুজনেই হাজির। ঠিক বেলা একটার সময় বিচারক রায় পড়ে শোনালেন, 'বাদীর পত্নীই বলিতেছে পাটোয়ারীর কার্যের খাতা-পত্র প্রতিবাদী স্পর্শও করে নাই। বাদী, প্রতিবাদীর গৃহে রাত্রে পাথর বর্ষণ করায় তাহারই প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ নাকি প্রতিবাদী, বাদীর গৃহের খাপারা ভাঙে। কিন্তু এ মোকদ্দমার প্রধান অভিযোগ--সরকারী হিসাবপত্রের খাতা অপহরণ। এ বিষয়ে শ্রবণবেলগোলার হাবিলদারের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, যে সময় উক্ত ঘটনা ঘটে সে সময় প্রতিবাদী হাসানে ছিল। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোঝা যায় উক্ত অভিযোগের কোনরূপ সত্যতা নাই। বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে দ্বেষবশতঃ সামান্য কলহ হইয়া থাকিবে। সুতরাং এই মোকদ্দমা খারিজ করা হইল।'

৭

কন্ঠীজোইসজী পঞ্চাশ টাকা এনেছিলেন উকিলকে দেবার জন্য, কিন্তু উকিলবাবু অন্য কাজে ব্যস্ত তাই টাকাটা তাঁর বাড়িতে গিয়ে দিতে হবে। হোটেল থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে টাকাটা দিতে যাবেন এই কথা উকিলকে জানিয়ে কন্ঠীজোইস আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘোড়াটা বাঁধা ছিল কাছেই একটা গাছে, তাকে খুলে, সওয়ার হয়ে চলতে শুরু করলেন। এক ফার্লং পথ যেতেই নজরে পড়ল শ্যামন্না একলা হেঁটে চলেছে। তাকে দেখবামাত্র মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে উঠল কন্ঠীজোইসের।

'এইবার তোর মাকে ···, কই কি করতে পারলি আমার কোর্টে গিয়ে?' বলতে বলতে ঘোড়া থেকে নেমে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। শ্যামন্না বেশ ঘাবড়ে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জোইসজী নিজের ডান পা থেকে জুতোটা খুলে নিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিলেন তার মাথায়। শ্যামন্নাও হাত তুলল বটে কিন্তু জোইসজী তার ঘাড় ধরে পিঠের ওপর এমন প্রবল আঘাত করলেন যে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দেখা গেল সে অজ্ঞান হয়ে গেছে এবং মুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। কন্ঠীজোইসজীর এই সময় যেন নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তার বুদ্ধিও যেন ঠিক মত কাজ করছে না, একটু ঘাবড়ে গেলেন তিনি। এই সময় পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'মার্ডার কেস্, গ্রেপ্তার কর।' পিছন ফিরে দেখেন একটু আগে যাঁর মুখ থেকে মামলার রায় শুনেছেন, সেই বিচারক স্বয়ং দাঁড়িয়ে, তিনি পুলিশকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়েছেন। জোইসজী ঘেমে উঠলেন। পুলিশ ছুটে এল কিন্তু তার আগেই বিদ্যুৎ গতিতে ঘোড়ার পিঠে উঠেই চাবুক কষালেন কন্ঠীজোইস। ঘোড়া ছুটল তীরবেগে। পুলিশ যদি আর গজ দশেক কাছে থাকত তাহলে হয়ত ধরা পড়তে হত। এরপর জোইসজী আর একবারও পিছন ফিরে দেখেননি।

তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে পুল পেরিয়ে ডান দিকের জলাশয়ের দিকে বাঁক নিলেন, তারপর যেদিকে পথ পেলেন সেদিক দিয়েই পালাতে পালাতে সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছেলেন বরগুরের কাছে। পুলিশ নিশ্চয় এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে। সরকারের নিয়ম খুনীকে যেমন করে হোক খুঁজে বার করতেই হবে। এবারে নিশ্চয় ফাঁসী হবে। জজসাহেব স্বয়ং দেখেছেন কাজেই উকিলও আর কিছু করতে পারবে না। সুতরাং এ রাজ্যের বাইরে কোথাও পালাতে হবে, এই সিদ্ধান্ত করলেন কন্ঠীজোইসজী। তিনি জানতেন এই ঘোড়াটা ব্যবহার করাও এখন বিপজ্জনক, কিন্তু এটাকে নিয়ে কি করা যায় এখন? ডান দিকের পথে আরো চার মাইল গিয়ে নিজেদের গ্রামের দিকের পথে ক্লান্ত ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলেন। নাগলাপুর এখান থেকে মাত্র চার মাইল, এ পথও ঘোড়াটার পরিচিত, যা হোক করে ও বাড়ি পৌঁছে যাবে ঠিক। যে দেখতে পাবে সেই ওকে বেঁধে পৌঁছে দেবে। এবার তিনি ঘুরলেন বাঁ দিকের পথে, একটা গ্রামে পৌঁছলেন, নাম বেবীনহল্লী, এ গ্রামও পূর্ব-পরিচিত। একটা কাপড়ের দোকানও আছে এখানে। দোকান থেকে কিনে নিলেন একটা মোটা ধুতি। পাশের আর একটা ছোট দোকান থেকে কেনা হল এক আনার গুঁড়ো হলুদ ও একটা দিয়াশলাই। এবার গ্রামের বাইরে একটা বাগানের মধ্যে ঢুকে কুয়োর জলে ভিজিয়ে নতুন ধুতিটার কোর ছাড়ালেন। চূন আর হলুদ মিলিয়ে গেরুয়া রং প্রস্তুত করে ধুতিখানা ছোপান হয়ে গেল; তারপর সেটা মাথায় জড়িয়ে পাড়ি দিলেন উত্তর মুখে। প্রায় মাঝ রাত্রি পার হয়েছে, ধুতিখানাও

শুকিয়ে গেছে ইতিমধ্যে। একটা পুকুর দেখা গেল পথের পাশে। পুকুরপাড়ে কিছুটা বালি খুঁড়ে কন্ঠীজোইসজী একটা গর্ত করলেন, তারপর গেরুয়া ধুতিখানা পরে, অঙ্গের কোট-প্যান্ট-জামা ইত্যাদি সব কিছু খুলে, কাঠ-কুটো যোগাড় করে আগুন জ্বেলে তাইতে পুড়িয়ে ছাই করে গর্তের মধ্যে পুঁতে ফেললেন এবং আবার বালি মাটি দিয়ে জায়গাটা সমান করে দিলেন। সঙ্গের টাকা-কড়ি সব কৌপীনখানার সঙ্গে বাঁধা রইল। আরসীকেরে এখান থেকে আটমাইল দূর। পথে আর দেরী করলে বিপদ ঘটতে পারে, তাই এবার জোর কদমে চললেন কন্ঠীজোইস। আরসীকেরে স্টেশনে এসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল হুব্‌লী যাবার গাড়ি ভোরের আগে আসবে না। অগত্যা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতেই হল। সকাল বেলা ট্রেন আসতেই তাতে উঠে পড়লেন। হরিহর পর্যন্ত এ রাজ্যের সীমা, তারপরই ইংরাজ সরকারের এলাকা। 'তারপর আর কেউ আমার নাগাল পাবে না,' এই কথাই ভাবলেন কন্ঠীজোইসজী।

৮

আট মাস ধরে ক্রমাগত চিকিৎসার পরও কল্লেশের বাম হাতখানা কিছুতেই আর ঠিক হল না। হাতের কাঁপুনিটা সব সময় দেখা না গেলেও সেই হাতে জোর করে কোন কিছুই সে ধরতে পারে না। কেবল ডান হাত দিয়ে সাইকেলও ভাল করে চালান যায় না। অর্থাৎ বেশ বোঝা গেল পুলিশের চাকরী করা আর ওর পক্ষে সম্ভব নয়। শারীরিক অক্ষমতার জন্য কল্লেশের চাকরী গেল। যদিও পুলিশ বিভাগে তার চাকরীটা ছিল একেবারেই নিচু তলার, কিন্তু তবু সরকারী চাকরী, কাজেই তার আনুষঙ্গিক সুখ-সুবিধা, দাপট ইত্যাদি সব কিছুরই স্বাদ পেয়েছিল সে। কিন্তু এখন সে সবই খোয়াতে হল। অবশ্য গ্রামে তাদের যা খেত-খামার, ফলের বাগান ইত্যাদি আছে, সেগুলো ঠিকমত দেখাশোনা করলে যা আয় হয়, তাতে দুশ্চিন্তার কোনই কারণ নেই। তাই ও নিয়ে কল্লেশ আর বিশেষ চিন্তাও করল না।

এরই মধ্যে সে খবর পেল, নরসীপুরের আদালতে মামলায় তার বাবা জিতেছেন, কিন্তু তার পরেই শ্যামন্নাকে তিনি এমন প্রহার করেছেন যে, সে অজ্ঞান হয়ে যায় ও তার মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে, আর তাই দেখে তিনি কোথাও গা ঢাকা দিয়েছেন। এদিকে শ্যামন্নার কিন্তু প্রাণের হানি হয়নি, শুধু জুতোর আঘাতটা মুখের ওপর পড়ায় দাঁত ভেঙে রক্ত পড়ছিল এবং অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জজ সাহেব ডাক্তার ডাকিয়েছিলেন, কিন্তু ডাক্তার আসার আগেই তার জ্ঞান ফিরে আসে। আবার নতুন করে কন্ঠীজোইসজীর নামে মামলা করার ইচ্ছা শ্যামন্নার আর ছিল না। মামলা করলে হয়ত শাস্তি দেওয়ানো যেত, জেল খাটানোও যেত, কিন্তু জেল থেকে ছাড়া পাবার পর যদি কোন মাঝ রাতে এসে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে, তারপর বাড়ির ওপর কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়, তখন কে বাঁচাতে আসবে? এ রকম একটা ভয়াবহ সম্ভাবনার আশঙ্কা করে শ্যামন্না চুপচাপ থাকাই শ্রেয় বোধ করল।

কন্ঠীজোইসজীর ঘোড়াটা ঠিক বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। নন্‌জম্মাকে ডেকে অক্কম্মা ঘোড়াটা বাঁধাল। জোইসজী কোথায় গেছেন আর কেনই বা গেছেন সেটা ওরা দু'জনে কিছুতেই বুঝতে

পারছিল না। ইতিমধ্যে কল্লেশ বাড়ি এল। বাড়িতে এসে হাতের জন্য সে 'গৌরসার' চিকিৎসা শুরু করল। কন্ঠীজোইসজী কোথায় যে গেছেন, সেও কিছু জানে না।

এই সময় খবর এল কল্লেশের স্ত্রী কমলা প্রথম ঋতুমতী হয়েছে। এদিকে ছ' মাস কেটে গেছে, এখনও কন্ঠীজোইসজীর কোন সংবাদ নেই। অক্কম্মার অভিমত হল, তার জন্য আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। দ্বিরাগমন করিয়ে এবার বৌকে ঘরে আনা উচিত। আর দেরী করা চলে না। দিন স্থির হল। কল্লেশ রামসন্দ্রে গিয়ে বোন, ভগ্নীপতি ও তাদের শিশুটিকে নিয়ে এল। এদের সবাইকে নিয়ে গরুর গাড়িতে করে অক্কম্মা হাসানের পথে রওনা হয়ে পড়ল নাত-বৌকে নিয়ে আসবার জন্য।

কমলা কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে এসেও যেন স্বামীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে লাগল। সে রীতিমত জিদ ধরে সারা শরীর কুঁকড়ে এক পাশে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। কিন্তু কল্লেশ নর-নারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মোটেই নয়। সে অনেক মেয়ে দেখেছে। তাছাড়া সাত মাস সে কমলাদের বাড়িতেই ছিল, পরিচয় তো তখন হয়েই গেছে। কিন্তু এখন মিষ্টি কথায়, আদর করে, কোন কিছুতেই তাকে বশ করা যাচ্ছে না। কথা পর্যন্ত বলে না। বাপের বাড়িতে প্রথম রাত্রেই অবশ্য বলেছিল, 'ঐ পচা সেকেলে পাড়া-গাঁয়ে আমি যেতে চাই না।'

কমলার মনের অবস্থাটা বুঝতে কল্লেশের দেরী হয়নি। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুই করবার উপায় নেই। আদর করে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছিল, 'পাড়া-গাঁ তো কি হয়েছে? সেখানে দুটো বড় বড় গরু, কত দুধ দেয়। এই শহরের মত সেখানে ঘি-দুধের অভাব নেই। খেত ভরা ফসল হয়, দান-দক্ষিণাতেও কত জিনিস পাওয়া যায়।'

'আমি গাঁয়ে থাকতে পারব না।'

'আমি তো সরকারী চাকরীই করতাম, কিন্তু কি করব, কপাল খারাপ। কি আর করা যাবে। এখন গ্রামেই চাষ-বাস করতে হবে, তাতেই আমরা সুখে থাকব।'

'অন্য কোন সরকারী চাকরীর চেষ্টা কর না'—দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়েই জবাব দেয় কমলা।

'দেখতে হবে। এখানে মেডিকেলে "আনফিট" করে দিয়েছে যখন, অন্য কোথাও আর কাজ জুটবে কি না কে জানে।'

'ও সব আমি বুঝি না' এই বলে ও স্বামীকে আর কথা বলার সুযোগই দিল না। এই সময় কল্লেশের ডান হাতখানা স্ত্রীর মুখের কাছে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু সে সামলে গেল, কারণ ঘরের বাইরে শ্বশুর বাড়ির লোকজন, তাছাড়া ওর নিজের ঠাকুমা, বোন, বোনাই সবাই রয়েছে। এখানে কোন হৈ-হল্লা হওয়াটা ঠিক নয়। তাছাড়া আরো একটা কথা, সে যখন অসুস্থ ছিল তখন দীর্ঘ দিন ধরে এরা সবাই তার সেবা-যত্ন করেছে। বিশেষ করে শ্বশুর মশায় তো তাঁর জামাইয়ের বাম হাতখানা সারিয়ে তোলার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, কাজেই তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। এইসব ভেবেই চুপ করে রইল কল্লেশ।

পরের দিন যখন যাত্রার আয়োজন চলেছে সেই সময় কমলু তার মাকে গিয়ে বলল, 'মা, আমি ওখানে যাব না।'

'চুপ কর, লোকে শুনলে হাসবে। অমন কথা বলতে নেই।'

কমলার মা এই নিয়ে আর বিশেষ কথা বাড়ালেন না। তাঁর মনে হল সব মেয়েই তো প্রথম শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় এমন কথা বলে থাকে, ও নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। মা-বাবা-ভাই-বোন সবাই কমলার সঙ্গে নাগলাপুর এসে চার দিন থেকে ফিরে গেলেন। সেই দিনই ননজুও তার বাচ্চা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে তাদের গ্রামে ফিরে গেল।

সে রাতে কমলা আবার শুরু করল ঐ এক কথা। কল্লেশ বলে, 'দেখছ তো, এ বাড়িতে কোন অভাব নেই। এত ঘি, দুধ, দই, সব্জী হাসানে কোথায় পাওয়া যায়?'

'ও সব আমি কিছু জানি না' দেওয়ালের দিকে ফিরে আড়ামোড়া ভাঙল কমলা। এতদিন শ্বশুর-শাশুড়ীও এখানে ছিলেন, তাই কোন রকমে মেজাজ সামলে রেখেছিল কল্লেশ। আজ আর তার সহ্য হল না। উঠে বসে বৌয়ের গালে এক চড় কষিয়ে দিল। ফুঁপিয়ে উঠল বৌ, ফুঁসে উঠল—'চাকরী খোওয়ানো পুলিশের চাকর!' আবার দু-চার ঘা পড়ল পিঠে। অক্কম্মা শুয়ে ছিল বাইরে, সে বলে উঠল, 'এ সব হচ্ছে কি তোদের শুনি?'

'হারামজাদী, ছেনালের কথা শোন একবার। তোর মত মেয়ে যেন আর দেখিনি আমি কখনো?' বলতে বলতে নিজের বিছানা বাইরে এনে বিছিয়ে শুয়ে পড়ে কল্লেশ। ব্যাপার শুনে অক্কম্মা ঘরে গিয়ে বৌকে বোঝাতে বসে, 'এমন করছ কেন, এখানে কিসের অভাব তোমার? খাওয়া-পরার কোন কষ্ট হবে না এখানে। এমন করতে নেই বাছা, তোমাকে আমরা কোন কষ্ট দেব না, খুব সুখে থাকবে তুমি।'

'এই শ্মশানের মত অজ পাড়া-গাঁ আমার ভাল লাগে না', আবার ফুঁসে উঠল বৌ।

এ মেয়েকে কি করে বোঝান যায় ভেবে পেল না অক্কম্মা। শহরের মেয়ে আনলে এমনটা যে হবে, সে ভয় ওর প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু কন্ঠী তো কারো সঙ্গে কিছু পরামর্শ না করেই সব ঠিক করে ফেলল। যা হবার তা হয়েই গেছে। এখন কোন রকমে মানিয়ে নিতেই হবে এ কথাই ভাবল বৃদ্ধা।

কল্লেশ বাইরে থেকে বলে উঠল, 'ওর চুলকুনী হয়েছে। তুমি আর চুলকোতে যেও না, চলে এসো বাইরে।'

তবু অক্কম্মা যতদূর সাধ্য বোঝাবার চেষ্টা করল, অবশেষে বাইরে এসে সেও শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে ঘুম এসে গেল কল্লেশের। সকালে উঠে স্নান করে জলখাবার খেয়ে বাবার ঘোড়াটায় চেপে সে বেরিয়ে পড়ল শ্রবণবেলগোলার উদ্দেশ্যে, ওখানে তার পুরোন বন্ধুরা কেউ কেউ থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

সাতু পাঁচ মাস গর্ভবতী, তাকে তার বাবা এসে এর মধ্যেই বাপের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। এদিকে নন্‌জম্মা আবার অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে।

তিম্‌লাপুরের দাবরসায়া, যিনি পাটোয়ারীর কাজ-কর্মের হিসাব লিখতেন তাঁরও বয়স এখন ষাটের ওপরে। তাঁর নিজের এলাকার হিসাবপত্র লেখার পর আবার চেন্নিগরায়ের হিসাব লেখার কাজ সামলানো ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে তাঁর পক্ষে। এরজন্য চেন্নিগরায়ের কাছে তিনি অবশ্য পঞ্চাশ টাকা করে পারিশ্রমিক পান, কিন্তু তা ছাড়াও এই পরিবারের প্রতি তাঁর কেমন একটা স্নেহ জন্মে গেছে। এ বাড়ির মানুষগুলি প্রায় সকলেই মূর্খ, কিন্তু বধূ নন্‌জম্মা বড় গুণবতী মেয়ে, তার স্বভাবের জন্যই তাকে উনি বড় ভালবাসেন।

সেদিন বাড়িতে নন্‌জম্মা একাই রয়েছে। চেন্নিগরায় বাড়ির সামনের মন্দিরে বসে তামাক-পাতা চিবোতে চিবোতে মহাদেবয়াজীর ভজন শুনছে। অপ্পন্নায়া গেছে জেলে পাড়ায়, সেখানে মাটার বাড়িতে হয়ত বিড়ি ফুঁকছে বসে বসে। গঙ্গম্মা তেলিদের পাড়ায় ইরক্কার বাড়ির সামনে ঘানি থেকে তেল প্রস্তুত করিয়ে আনতে গেছে। এই সময় দাবরসায়াজী এসে বললেন নন্‌জম্মাকে, 'দেখ মা, আমার তো অনেক বয়স হয়ে গেল! আর বড়জোর বছর দুই এ সব কাজ কর্ম করতে পারব। এদিকে আমাদের চেন্নিগরায় তো হিসেব-পত্তর লেখার কাজ কিছুই শিখছে না। কি করা যায় বল দেখি?'

'মামাজী, আপনি নিজেই ওঁকে অবস্থাটা ভাল করে বুঝিয়ে বলুন।'

'এই হিসেব লেখা কি এমন শক্ত কাজ বল্‌ দেখি মা? হোন্নবল্লীর সীতারামাইয়াজীর কাছে তিন বছর থেকেও যখন কিছুই শেখেনি, তার মানে হল, ওর দ্বারা এ কাজ হবার নয়। এই যে এতদিন ধরে আমি এখানে হিসেব লিখে যাচ্ছি, তা ওর কোন চেষ্টাই নেই, সব ভার আমার ওপরেই ছেড়ে দিয়ে পড়ে পড়ে শুধু ঘুমোবে। একদিনও কি আমার কাছে বসে লেখার চেষ্টাও করেছে? কোন দিনও না। লিখতে লিখতেই তো শেখে লোকে। মাঝে মাঝে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে নেয়, তাহলেই তো হয়। নিজের কাজ নিজেই করা উচিত নয় কি? কত দিন আর এভাবে অন্যকে দিয়ে কাজ চালাবে?'

এ সব কথা নন্‌জম্মা দু'বছর আগেই ভেবেছে, কিন্তু কি-ই বা করতে পারে সে? 'মামাজী, আমার কপাল তো জানেনই আপনি! আপনিই বলুন আমি কি করব?'

'তুমি তো মা, লিখতে পড়তে পার। তোমার কবিতার খাতা আমি দেখেছি, মুক্তোর মত হস্তাক্ষর তোমার। আমি তোমাকেই শেখাব, তুমি হিসেব লিখতে শেখ। বাড়িতে বসেই লিখতে

পারবে। চেন্নিগরায় কোট-প্যান্ট পরে বাইরের জমাবন্দীর কাজটা করুক তাহলেই হবে। এ না করলে তোমাদের আর কোন উপায় দেখছি না।'

'কিন্তু মেয়েমানুষে সরকারী খাতাপত্র ছুঁলে দোষ হবে না?'

এ প্রশ্নটার জবাব অবশ্য দাবরসায়াজী চট করে দিতে পারলেন না। এ বিষয়ে সরকারী আইনে কি বলে তিনিও ঠিকমত জানেন না। তবুও তিনি বললেন, 'তুমি তো আর পাটোয়ারী-গিরির চার্জ নিচ্ছ না, শুধু ঘরে বসে হিসেবটা লিখবে। ওপরওয়ালা কর্মচারী জানবে কি করে যে, এ হিসেব মেয়েতে লিখেছে, না পুরুষে লিখেছে? কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, তুমি কাজটা চুপচাপ শিখে নাও।'

রেজিস্টারে লাইন টেনে এগিয়ে দিলেন দাবরসায়াজী, বললেন, 'এই নাও, প্রথমে এইভাবে চিহ্ন দাও। এই দেখ, মাথার ওপরের লাল রেখার সঙ্গে সমান্তরালভাবে রুল দিয়ে লাইন টেনে যাবে। বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে রুলটা সরাতে থাকবে। নিব থেকে কালির ফোঁটা কাগজের ওপর না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আচ্ছা, দেখি, আগে লাইন তো টানো।'

যেমন যেমন বলা হল সেইভাবেই ননজম্মা কাজ করতে লাগল। ওঁর মত অত চটপট হাত চলছে না বটে, কিন্তু লাইনগুলো বেশ সোজা এবং ঠিক জায়গা মতই টানতে পারছে সে।

'খুব ভাল হচ্ছে, দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে যাবে। সমস্ত খাতাখানায় এবার তুমিই লাইন টেনে ফেল'---এই কথা বলে উনি উঠে গেলেন পুষ্করিণীর দিকে। ননজম্মার কাছে এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা। ছোটবেলায় নিজের গানের খাতায় সে শ্লেটের সাহায্যে লাইন টানত বটে, কিন্তু রুল দিয়ে সরকারী হিসেবের খাতায় লাইন টানতে টানতে ওর মন একটা অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠছিল। তার ওপর প্রথম চেষ্টাতেই সে নির্ভুলভাবে কাজটা করতে পেরেছে। অনেকবার শুনেছে সে, পাটোয়ারীরা বলাবলি করে থাকে, 'পাটোয়ারীগিরি ছেলেখেলা নয়! ঠিক মত লাইন টানা শিখতেই তো লেগে যায় অন্ততঃ ছ' বছর, আর সেই সময় রুলের বাড়ি খেতে খেতে হাতের ছাল-চামড়া উঠে যায়।'

ননজম্মা লাইন টেনে চলেছে---এই সময় অপন্নায়া এসে পৌঁছল। বৌদিদির কাণ্ড দেখে প্রথমটা তো রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। তারপর দারুণ চটে গেল, সোজা তেলিপাড়ায় গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করল, 'ঐ দেখ গিয়ে, সমস্ত হিসেবের খাতার দফা শেষ করে ফেলল।'

'কে রে?'

'তোমার বড় বৌ, আবার কে? খাতায় লাইন টানছে বসে বসে।'

'সে আবার কি কথা? নিপাত যাক্ হতচ্ছাড়ি, ছেনাল কোথাকার!' বলতে বলতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বাড়ি চলে আসে গঙ্গম্মা। ততক্ষণে দাবরসায়াজীও পুকুর ধার থেকে ফিরে এসেছেন, বারান্দায় বসে নস্যি ঠুসছেন নাকের ফুটোয়। বৌ ঘরের মধ্যে বসে লাইন টানছে। গঙ্গম্মা ভিতরে এসে চিৎকার করে ওঠে, 'ওরে ছেনাল, তোর মাথার ঠিক আছে তো? করছিস কি তুই বসে বসে?' কথাগুলো কানে যেতে দাবরসায়াজী ভিতরে এসে জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন, কি হয়েছেটা কি?'

'এই যে হিসেবের খাতা-পত্তর ছুঁয়েছে, এটা কি উচিত হয়েছে?'

'ওকে আমিই লাইন টানতে বলেছি। আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না। হিসেব লেখা সময় মত

শেষ করতে হবে তো? চেন্নিগরায় তো কিছুই করবে না।'

'ছেনাল মেয়েমানুষকে দিয়ে কেউ হিসেব লেখায় না কি কোন কালে?'

'শুধু শুধু মুখ খারাপ করছ কেন বোন। ছুঁলে কোন দোষ হয় না।'

'এ কাজ ছিল আমার স্বামীর। তাঁর হাতে লেখা এইসব খাতা এর কি ছোঁয়া উচিত হচ্ছে?'

'এ তো তাঁরই পুত্রবধূ, পর তো আর নয়?' ইতিমধ্যে নন্‌জম্মা খাতা-কলম-রুল ইত্যাদি সেইখানেই ফেলে রেখে উঠে চলে গিয়েছে। তাকে ডেকে দাবরসায়াজী বললেন, 'নন্‌জম্মা, উঠে গেলে কেন? তুমি তোমার কাজ করে যাও। আমি তোমার শাশুড়ীকে বলে দিয়েছি।'

গঙ্গম্মা মন্দিরে গিয়েছিল ছেলেকে ডেকে আনতে। এসে দেখে নন্‌জম্মা আবার বসে বসে লাইন টেনে চলেছে। তাকে দেখিয়ে বলে ওঠে গঙ্গম্মা, 'ঐ দেখ্ তোর বৌকে। তোর সঙ্গে সঙ্গে পাটোয়ারীগিরি করতে বেরোবে এবার।'

দাবরসায়াজী নিজেই এবার বলেন চেন্নিগরায়কে, 'দেখ পাটোয়ারীজী, আমার শরীর ভাল নেই। বসে বসে রুল দিয়ে লাইন টানতে টানতে পিঠে যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। খাতা বাঁধাই, লাইন টানা, ডান দিকের হিসেব লেখা, এসব কাজের জন্য আমিই ওকে অনুমতি দিয়েছি। তোমার স্ত্রী দিব্যি সোজা লাইন টানে। সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতেও পারে। এখন সোজাসুজি বলে দাও যে ওকে একাজ তোমরা করতে দেবে, না তুমি নিজে করবে! না হলে আমি এবার চললুম আমার নিজের গ্রামে।'

মুশকিলে পড়ে গেল চেন্নিগরায়। মিনিটখানেক ভেবে বলল, 'ঐ ছেনালটাকে দিয়েই করিয়ে নিন কাজটা, আমি এখন ভজন শুনতে যাচ্ছি।' এরপর কেটে পড়ল সে। গালাগাল দিতে দিতে মাও ফিরে গেল আবার তেলি পাড়ায়। অপ্পন্নার মনে হল একলা বাড়িতে বসে থাকাটা তার পক্ষে অপমানজনক, সুতরাং সেও আবার বেরিয়ে পড়ল জেলে পাড়ার উদ্দেশ্যে।

দাবরসায়াজী নন্‌জম্মাকে বললেন, 'এ বাড়ির হালচাল আমি বহুদিন থেকেই জানি, মা। এটি তোমার শ্বশুরমশায়ের দ্বিতীয় বিবাহ, সে সময় তাঁর বয়স ছিল চল্লিশেরও ওপরে। সেই কারণেই তোমার শাশুড়ীর স্বভাবটা এই রকম হয়ে গেছে। ওদের যা খুশি করুক, কিন্তু তুমি হিসেবের কাজটা মন দিয়ে শিখে নাও। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তোমার শ্বশুর যখন পাটোয়ারী ছিলেন তিনি একবার আমাকে খুব সাহায্য করেছিলেন। তাই হিসেব-পত্তরের কাজ আমি যেটুকু জানি, সব আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। এখন যেমন যেমন বলব, ঠিক সেইভাবে কাজ করে যাও।'

২

আর তিন মাস পরে বৎসারান্তিক হিসাব সম্পূর্ণ করতে হবে। পাটোয়ারীদের কাছে এ কাজটির গুরুত্ব খুব বেশী, কারণ এই হিসেব যদি নির্ভুল হয় তবেই আগামী বছরের হিসেবেও ভুল হবার সম্ভাবনা বিশেষ থাকবে না। দাবরসায়াজী নিজের গ্রামে ফিরে গেছেন। যাবার আগে বলে গেছেন, 'ঈশ্বর তোমায় প্রচুর বুদ্ধি দিয়েছেন মা, অন্যেরা তো চার বছর কাজ শেখার পরও ডান দিক, বাঁ দিক ঠিকমত বুঝে লিখতে পারে না। কাজটা বেশ কঠিন, কিন্তু আমি যেমন বলে দিয়েছি

ঠিক সেইভাবে লিখে যাও। এরপর তোমাকে বৎসরান্তের হিসেব লিখতে শিখিয়ে দেব।' যা যা বলে গেছেন সেইসব হিসাব উনি গ্রাম থেকে ফিরে আসার আগেই লিখে শেষ করে রাখতে হবে। নন্‌জম্মা এখন ছ' মাস অন্তঃসত্ত্বা। এদিকে সাতম্মা প্রসব হতে বাপের বাড়ি গেছে। তার প্রসব হয়ে গেছে কি না সে খবর এরা কেউই জানে না। শরীরের এই অবস্থায় সংসারের সব কাজ-কর্ম সেরে এত হিসেব লেখার কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে নন্‌জম্মা। কিন্তু গঙ্গম্মা যেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে রান্নার কাজটুকুও সে করবে না। 'ছেনাল মেয়েমানুষ, পুরুষের মত বসে বসে হিসেব লিখবে, আর আমি করে মরব ঘরের কাজ?'—এই হচ্ছে তার মনোভাব।

একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নন্‌জম্মা বসে বসে লিখছে। সেই বারান্দারই এক পাশে শুয়ে চেন্নিগরায় আর অপ্পন্নায়া পাল্লা দিয়ে নাক ডাকিয়ে চলেছে। গঙ্গম্মা দরজার পাশে বসে তার রাত্রের ফলাহারের উসল্ (এক রকম খাবার) তৈরী করার জন্য মুগ বেছে পরিষ্কার করছে আর শিশু পার্বতী ঘুমিয়ে রয়েছে ঘরের মধ্যে। বাইরে বেঁধে রাখা গরুটিকে আজ কেউ চরাতে নিয়ে যায়নি, বেচারাকে একটু ঘাস-জলও দেওয়া হয়নি। গরুটা বার দুই জোর গলায় ডেকে খুঁটিটার চার পাশেই ঘুরপাক খেতে লাগল। নন্‌জম্মা স্বামীকে উদ্দেশ করে বলে উঠল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

স্বামীর ঘুম ভাঙল না, কিন্তু অপ্পন্নায়া পাশ ফিরল। নন্‌জম্মা এবার তাকেই বলল, 'অপ্পন্নায়া, তোমার ঘুম ভাঙল?'

'উঁ'—বলেই সে আবার চাদর মুড়ি দিয়ে ফেলল।

'আমরা সবাই পেট ভরে খেলাম, এদিকে গোমাতা উপোস করে আছেন। ওকে একটু চরিয়ে আনা উচিত না?'

আবার এক লম্বা নিঃশ্বাসের সঙ্গে শোনা গেল শুধু—'উঁ'।

মিনিট দশেক পরে নন্‌জম্মা আবার বলল, 'দিনে দুবার করে দুধের দরকার আছে, অথচ গরুর সেবা-যত্ন কেউ করবে না। এত অলস হলে ভগবান তাদের অন্ন যোগাবেন কি করে?'

গঙ্গম্মা রেগে গেল কথাটা শুনে,—'কি, বকছিস্ কি তুই?'

'কিছু অন্যায় কথা তো বলিনি। উপোসী গরুটা বাঁধা রয়েছে সেই কথাই বলছি।'

'তা, যা না তুই-ই চরিয়ে নিয়ে আয়!'

'তাহলে এই হিসেব লিখবে কে?'

'আ-হা-হা-হা মরে যাই, হিসেব লিখে উনি একেবারে রাজা হয়ে যাবেন। মাথায় চড়ে নাচছে একেবারে, হতচ্ছাড়ি, ছেনাল কোথাকার!'

কন্ঠীজোইসজী বহু দিন হল নিরুদ্দেশ, তাঁর ফিরে আসার সম্ভাবনাও বিশেষ দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং আজকাল বধূর প্রতি কটু ব্যবহার করতে গঙ্গম্মা আর বিন্দুমাত্রও ভয় পায় না। তাছাড়া 'ছেনাল', 'রাঁড়' ইত্যাদি সম্ভাষণ শুনতে শুনতে এতদিনে বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে নন্‌জম্মার।

মায়ের চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভেঙে গেল অপ্পন্নার। দুপুরের কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় পাশ ফিরতে ফিরতে ক্রুদ্ধ কন্ঠে সে প্রশ্ন করল, 'কি, হয়েছে কি?'

'তোরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে আছিস আর উনি হিসেব লিখে সুবেদারী করছেন, তাই হুকুম হয়েছে, যা গিয়ে গরু চরিয়ে আয়, বুঝলি রাঁড়ের পুতরা?'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল অপ্পন্নায়া। উঠে বসে বলল, 'বলেছিস্ এই কথা? মাথার ঠিক আছে তো তোর?'

'মিছে কথা কেন বলছেন মা? ভগবানের নামে শপথ নিয়ে বলুন তো, আমি কি ঐ কথা বলেছি?'

'দেখ্ অপ্পন্না দেখ্, আমাকে বলে কিনা ভগবানের দিব্যি খাও? মিথ্যে বলি তো আমি ভাত না খেয়ে গু খাই! তোদের মাকে মিথ্যেবাদী বলছে আর তোরা চুপ করে দেখছিস্? ছেনালটাকে দু'লাথি লাগাতে পারিস্ না?' গঙ্গম্মার কথা শেষ হতে না হতেই অপ্পন্নায়া উঠে বৌদিদির পিঠের ওপর সজোরে ডান পায়ের লাথি কষিয়ে দিল। সে লুটিয়ে পড়ল সেইখানেই। দ্বিতীয় লাথিটির জন্য পা উঠিয়ে গর্জে উঠল অপ্পন্না, 'আর কখনও আমার মাকে যদি এমন কথা বলতে শুনি তো গর্ত খুঁড়ে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।'

হঠাৎ এই সময় দেখা গেল কয়েকজন পুলিশ এসে হাজির। খাকি জামা, খাকি টুপী, পায়ে জুতো, হাতে চামড়ার ব্যাগ, কালো কোট, নিশ্চয় পুলিশের লোক। এদের সঙ্গে আরো দু'জন, তাদের পায়ে পট্টির মত জড়ানো খাকি মোজা, হাতে তাদের হাতকড়ি, লোহার শিকল ইত্যাদি আরো কি কি জিনিস রয়েছে। বুকের ভেতরটা ধড়াস্ করে উঠল অপ্পন্নায়ার। 'হায়, হায়, আর রক্ষা নেই' বলে এক চিৎকার দিয়েই সে ছুটে পালাল। পাশের গলিতে ঢুকতেই সেখানকার কুকুরগুলোও সমস্বরে চেঁচাতে শুরু করল তাকে দেখে।

এদের দেখে গঙ্গম্মাও দিশাহারার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। অপ্পন্নায়ার চিৎকারে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চেন্নিগরায় উঠে বসেছে তখন। ঘরের ভিতর শিশু জেগে উঠে কান্না জুড়েছে। নন্‌জম্মা বসে বসেই ঘাড় ঘুরিয়ে আগন্তুকদের দেখতে পেল। তারপর শিশুর কান্না শুনে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে অনুভব করল কোমরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। বোধ হয় মচকে গেছে অথবা কোন শিরায় টান ধরেছে। সে কোন রকমে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঘষতে ঘষতে ভিতরে চলে গেল। চেন্নিগরায় ভয় এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে বলে উঠল, 'মশাইরা, দ-দয়া ক-করে বসুন।'

'আচ্ছা, আপনারই নাম পাটোয়ারী চেন্নিগরায়?'

'হ্যাঁ, স্যার।

'ওটি কি আপনার ভাই, যে নিজের স্ত্রীকে লাথি মারছিল?'

'ও আমার স্ত্রী, স্যার।'

'আচ্ছা! তার মানে বৌদিদিকে লাথি মারছিল?'

'আজ্ঞে না স্যার।'

'কি ব্যাপার? সরকারী চাকরী করেও মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে? নিজের স্ত্রীকেও ঠিক মত দেখাশোনা করার ক্ষমতা নেই?'

ততক্ষণে গঙ্গম্মার সারা শরীরে ঘাম ছুটছে। আগন্তুকরা আর কোন কথাবার্তা বলছে না। চেন্নিগরায় বারান্দায় একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। এই ফাঁকে গঙ্গম্মা চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা মাটার বাড়িতে গিয়ে হাজির, তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে ফিস ফিস করে কানে কানে বলল, 'ছাদের ওপর নারকেল পাতার গাদায় ওকে লুকিয়ে রেখেছি।' গঙ্গম্মা মই লাগিয়ে উঠে এল ছাদের ওপর। ছেলের কাছে এসে খুব নিম্নস্বরে বলল, 'ওদের

হাতে কি আছে দেখেছিস? মোটা দড়ির মত শেকল! এতবড় কোদালের মত লোহার পাত! তোকে যদি একবার ধরতে পারে, ঐ শেকল দিয়ে বেঁধে গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেবে, নয় তো ফাঁসীও দিতে পারে। ওর ভাই তো পুলিশেই কাজ করত, ওই দিক থেকেই এসেছে মনে হচ্ছে। তুই চুপচাপ বাগানের দিক দিয়ে পালা। মাস পাঁচ-ছয় আর এদিক মাড়াস নে। বরং জাবগল্লুর দিকে চলে যা।

'এখন কি হবে মা?' ভীষণ রকম ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করে অপ্পন্নায়া।

'চটপট পালিয়ে যা বাবা। উঃ, কি অশুভ ক্ষণেই ঐ ছেনাল বেটী এ বাড়িতে পা দিয়েছিল। সেই থেকে আমাদের যেন সাড়ে সাতি* লেগেছে।' নারকেল পাতার গাদার মধ্যে থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল অপ্পন্নায়া, তারপর পিছনের দরজায় এসে দু' পাশটা একবার ভাল করে দেখে নিয়ে লম্বা লম্বা ঘাসবনের মধ্য দিয়ে নিচু হয়ে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জলাশয়ের বাঁধের ওপর থেকে নেমে চোখের আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত গঙ্গম্মা পিছনের জানলা দিয়ে উৎকন্ঠিত ভাবে চেয়েছিল। এতক্ষণে যেন একটু ভরসা হল তাঁর মনে।

ওদের বাড়িতে যারা এসেছিল তারা হল আসলে সরকারী আমীন। রেভেন্যু কমিশনার হুকুম দিয়েছেন রাজ্যের সমস্ত ব্যবসায়ী-জমি নতুন করে মেপে তার ম্যাপ ও তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। এই মাপজোকের জন্য যে কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি স্বয়ং এসেছিলেন আমীনদের সঙ্গে। এরা প্রায় তিন মাস রামসন্দ্র গ্রামে তাঁবু ফেলে থেকে গেল, কারণ আশে-পাশের সমস্ত গ্রামেই এদের জমি মাপতে হচ্ছিল। এদের থাকার ব্যবস্থা, চৌকিদার, চাকর-বাকর সব কিছু যোগাড় করে দেবার দায়িত্ব গ্রামের পাটোয়ারীকেই নিতে হল।

৩

অক্কম্মা নিজে গাড়ি নিয়ে এসে নন্‌জম্মাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল তার দ্বিতীয় বারের প্রসবের জন্য। এতদিনে কল্লেশের বাঁ হাতখানা অনেকটা ঠিক হয়ে গেছে। দু' হাত দিয়ে গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে সে এখন গাছে চড়তে পারে। খেত-খামারের কাজ-কর্মেও সে কিছু কিছু হাত লাগাতে শুরু করেছে। তার বৌ অবশ্য এই গ্রাম-জীবন একেবারেই পছন্দ করছে না, কিন্তু কল্লেশের পক্ষে সরকারী চাকরী পাওয়া আর সম্ভব নয়। কল্লেশ নিজেও আর চাকরী করতে চায় না। কমলা কিন্তু গ্রামের জীবন যাত্রার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না কিছুতেই। তার স্বভাবটাই এমন যে, বেচারা ঠাকুমা আর তাঁর নাতি দু'জনেই এক দণ্ড শান্তিতে থাকতে পারে না তার জ্বালায়।

এখন নন্‌জু এসেছে প্রসবের জন্য, সঙ্গে এসেছে তার আড়াই বছরের মেয়ে পার্বতী। কল্লেশ তাকে কোলে তুলে আদর করে প্রায়ই। সেদিন কল্লেশ খেতের কাজে চলে যাবার পর কমলা নিজের মনে অথচ বেশ সবাইকার শ্রুতিগোচর ভাবেই মন্তব্য করে, 'শুয়োরের মত ক্রমাগত বিইয়ে গেলে চলে কখনও! শ্বশুর বাড়ির লোকে আঁতুড় তুলতে পারবেই না যদি তো পোয়াতি

---

* শনির দশা

হওয়া কেন বাপু? বাপের বাড়িতে যত্ন-আত্তি পাওয়া যায়, তাই বলে কি কেবল তাদেরই চুষে খেতে হবে?'

কথাটা কানে যায় নন্‌জুর। সে ভাবে আমার ভাগ্যটাই এমন, না জুটল ভাল শাশুড়ি আর না পেলাম মনের মত ভাই-বৌ। এই তো মোটে সাত মাস চলছে, প্রসব হয়ে বাচ্চা অন্ততঃ তিন মাসেরটি না হলে তো যেতেও পারব না। তার মানে এখনও অন্ততঃ পাঁচ-ছ' মাস থাকতে হবে এখানে। ও গ্রামে ফিরে যাওয়াই উচিত বোধ হয়! কিন্তু সেখানেও তো শাশুড়ি যন্ত্রণা দেবে। প্রসব হতে বাপের বাড়ি এসে, এখন যদি এমনি করে ফিরে যাই, কত খোঁটা যে শুনতে হবে। স্বামীও তো তেমন নয় যে আমার হয়ে দুটো কথা বলবে! যাক্ গে, বাচ্চাটা তো হোক আগে।' ভাবতে ভাবতে চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রুর ফোঁটা ঝরতে থাকে নন্‌জুর।

কমলার কথাগুলো অক্কম্মার কানে গেছে। ভাল মানুষ নাতনী ঐ বাক্যবাণ নিঃশব্দে মুখ-বুজে সহ্য করল। কিন্তু তার চোখের জল দেখে অক্কম্মা আর চুপ করে থাকতে পারল না, সোজা কমলার সামনে গিয়ে বলে বসল, 'দ্বিরাগমনের পর বছর ঘুরতে চলল, এখনও তো তোর পোয়াতি হওয়ার কোন লক্ষণ দেখছি নে। তুই ওকে শুয়োর বলিস কোন্ আক্কেলে শুনি? সেই যে বলে না, "বাঁধেও জল নেই, পেটেও ছেলে নেই"। তোর মত পাপী মেয়েমানুষের পেটে সন্তান আসবে কেন?'

'দেখ বুড়ি, তোর নাতি তো যত ছেনালের বাড়ি শুতে যায়। তাহলে আর ঘরের বউয়ের পেটে ছেলে আসবে কোথা থেকে শুনি? যেমন হারামজাদা ছেলে তোমাদের, কেমন মা ওর জন্ম দিয়েছে কে জানে!'

'নির্লজ্জের মত কথা বলবি না বলে দিচ্ছি, ছেনাল কোথাকার! ঘরের বৌ যদি স্বামীর কাছে শোয় তাহলে কি আর পুরুষ মানুষ বাইরে যেতে চায়? তুই সত্যি মেয়েমানুষ কিনা তাতেই আমার সন্দেহ হয়!

নন্‌জম্মা এ সব কথা এই প্রথম শুনছে। সে তাড়াতাড়ি কাছে এসে বলে, 'অক্কম্মা, আস্তে বল, পাড়ার লোকে শুনতে পাবে যে?'

'আর পাড়ার লোক! এই ছেনাল মেয়েটার কীর্তি-কাহিনী জানতে কারো বাকি নেই এ গাঁয়ে। এখানে আসার এক মাসের মধ্যে ও আমাদের বাড়ির মান-ইজ্জত ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। পুকুরে জল আনতে গিয়ে ও গাঁ-সুদ্ধ লোকের কাছে ঘরের কথা ঢাক পিটিয়ে বলে আসে। সদ্বংশের মেয়ে হলে এমন করে কেউ কখনো?'

'এই ছেনাল বুড়ি! আমার বাপের বাড়ি তুলে খোঁটা দেওয়া হচ্ছে? সে বাড়ির নাইবার ঘরের নোংরা নালার জলে স্নান করলেও তোর পুণ্যি হবে বুঝলি?'

'অক্কম্মা, তুমি আর কথা বোল না, চলে এসো', নন্‌জু ঠাকুমার হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়, তারপর আবার বেরিয়ে এসে ভাজকে বলে, 'বৌদিদি, একটু নিচু গলায় কথা বলতে পার না? এ সব ঘরের কথা বাইরের লোক শুনলে আড়ালে হাসাহাসি করবে যে!'

'যাও, যাও, তুমি আর আমাকে শেখাতে এসো না। স্বামীর ঘরে পেট ভরে খাওয়া জোটে না তাই তো আঁতুড় তোলাতে এসেছ এখানে।'

আর কথা না বাড়িয়ে নন্‌জুও সরে যায় সেখান থেকে। এবার নিজের শোবার ঘরে ঢুকে

মাদুরের ওপর আছড়ে পড়ে কমলা। ঠিক যেন গোঁসা-ঘরে কৈকেয়ী—মাথার চুল এলোমেলো সিথিঁর সিঁদুর মোছা, ফোলা গাল আরও ফুলিয়ে মাদুরের ওপর পড়ে রইল সে। ব্যাপার দেখে কেউ আর ওর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল না।

কল্লেশ বাড়ি ফিরল বেলা একটা নাগাদ, এসে স্নান করল। স্ত্রীকে যে দেখা যাচ্ছে না ধারে-কাছে, এ ব্যাপারটা সে খেয়ালই করল না। কাজে কাজেই কমলার পক্ষেও আর সম্ভব হল না চুপচাপ থাকা। ঘরের মধ্যে থেকে সে বিড়বিড় করে গালাগালি শুরু করে দিল। এবার টনক নড়ল কল্লেশের, সে এসে দাঁড়াল আধখোলা দরজাটার সামনে। প্রতি মিনিটে প্রায় একশটা শব্দের বেগে গালিবর্ষণ চলেছে, বিড়বিড় করে বললেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, 'এই ছেনালের পুতেরা নিপাত যাক, বংশ লোপ হোক, ঘর-দোর ধসে পড়ুক! মরুক, মরুক ছেনালের পুতরা ···' এতক্ষণ দুপুর রোদে তেতে-পুড়ে কাজ করে এসে এইসব শুনে হেঁকে ওঠে কল্লেশ, 'এই ছেনাল, কাকে গাল দিচ্ছিস তুই?'

'ছেনালের পুত, ছেনালের পুত, ছেনালের পুত' ··· মন্ত্রপাঠের মত করে বলে চলেছে কমলা, আর সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতের আঙুলগুলো এমন সশব্দে মটকাচ্ছে যে মনে হচ্ছে যেন পটকা ফাটছে।

'ধ্যাৎতেরি শা···' বলতে বলতেই ডান হাতে একখানা মোক্ষম ঘুসি বসিয়ে দিল কল্লেশ স্ত্রীর পিঠের ওপর।

মুখ ফিরিয়ে সে বলে উঠল, 'ওরে ছেনালের পুত, আমাকে মারা হচ্ছে? বাঁ-হাতখানা যেমন পড়ে গেছে ডান হাতখানাও ওমনি পড়ে যাবে। আমার অভিশাপ না ফলে যাবে কোথায়!' আর এক ঘুসি পড়ল পিঠের ওপর। দম নিয়েই বৌ আবার চেঁচিয়ে আরম্ভ করল, 'অসুখের ছুতো করে আট মাস আমার বাবার অন্ন ধ্বংস করেছে, হ্যাংলা কোথাকার! আমাকে মারতে হাত ওঠে কি করে? ঐ হাতে পোকা পড়ুক।'

ইতিমধ্যে নন্‌জু ছুটে এসেছে। মারধোরের শব্দ শুনে কান্না জুড়ে দিয়েছে পার্বতী। ভাইয়ের হাত ধরে টানতে টানতে নন্‌জু বলে, 'ভাইয়া, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? বৌকে কেউ এমন করে মারে? যদি কিছু বিপদ ঘটে যায়? যাও এখন চুপচাপ গিয়ে খেয়ে নাও।'

'ছেড়ে দে আমার হাত, এই বেহায়া-বজ্জাত মেয়েকে আজ উচিত শিক্ষা দিতে হবে', এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নেয় কল্লেশ।

শায়িতা কমলা মুহূর্তে জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ায়, পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, 'মারতে চাও, দেখি কত মারতে পার! যতক্ষণ নিজের হাত না ভাঙে ততক্ষণ মেরে যাও। আজ তোমায় ফাঁসীতে লটকে তবে ছাড়ব আমি। যা হবার আজই হয়ে যাক, শুরু করে দাও মার!'

নন্‌জু প্রাণপণ শক্তিতে এবার ভাইয়ের হাত ধরে টানতে থাকে। সেও যথেষ্ট শক্তিশালিনী মেয়ে। এদিকে কল্লেশও দারুণ বলবান। দু'জনেই তো কন্ঠীজোইসজীরই সন্তান। হাত না ছাড়িয়ে কল্লেশ বাঁ পা তুলে এক লাথি কষিয়ে দিল কমলার কোমরে। লাথি খেয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। 'আর কখনও এমন করবি তো আবার শিক্ষা দেব', বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। ভেতর থেকে কমলার উত্তর শোনা গেল, 'তোমাকে ফাঁসীতে চড়িয়ে ছাড়ব।'

এতক্ষণে খেতে বসল কল্লেশ। এই ধরনের ঘটনা এ বাড়িতে নতুন নয়, তবে আজ একটু

বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। কি করে এই বউকে শায়েস্তা করা যায় সেই উপায় ভাবতে ভাবতে কল্লেশ রুটির টুকরো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তরকারীতে ডুবিয়ে দলা পাকিয়ে মুখে পুরছিল। নন্‌জু ওর সঙ্গে খেতে বসেনি। সে পরে খাবে বলে পেছন দিকে কুয়োতলায় কাপড় কাচতে বসেছিল। অক্কম্মা বসে বসে রুটির পাত্রে জল মাখাচ্ছিল যাতে রুটিগুলো শুকিয়ে না যায়। হঠাৎ বাড়ির পেছন দিক থেকে নন্‌জুর চিৎকার শোনা গেল, 'ভাইয়া, শীগগির এসো, বৌদিদি কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছে।'

মুখের গ্রাস ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে কল্লেশ ছুটে এল কুয়োতলায়। বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়া অক্কম্মাও যথাসাধ্য দ্রুত ছুটে এল। কুয়োর কাছেই ছিল দড়ি। দড়ির একটা প্রান্ত নন্‌জুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে অন্য প্রান্তটা কুয়োর মধ্যে ফেলল কল্লেশ, তারপর নন্‌জুকে শক্ত করে দড়িটা ধরতে বলে সড় সড় করে দড়ি বেয়ে কুয়োর মধ্যে নামতে শুরু করল সে। কুয়োর উঁচু পাড়ের গায়ে পা লাগিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দড়িটা টেনে ধরে থাকল নন্‌জু।

পাশের বাড়ির কপিনীপতয়াজীর স্ত্রীও শুনতে পেয়েছিল নন্‌জুর চিৎকার। সে নিজের স্বামীকে খবরটা দিয়ে তাকেও যেতে বলল এবং নিজেও ছুটে এল ঘটনাস্থলে। কপিনীপতয়াজীও চিৎকার করে ছুটে এসেছেন এবং আশে-পাশের আরো অনেকে সেই চিৎকার শুনে এসে জমা হয়েছে। খবরটা যেন বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে।

কমলা একবার ভেসে উঠেই আবার ডুবে গেল। যখন ভেসে উঠেছিল, বাঁচবার চেষ্টায় সে দুই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল ওপর দিকে। আসলে, মরবার জন্য তো আর সে কুয়োয় ঝাঁপ দেয়নি। স্বামীকে কোন মতে ফাঁসীকাঠে চড়াবে ভেবেই এই কাণ্ড করে বসেছে। বাঁচবার বাসনা তার যথেষ্টই ছিল। প্রথমটা ডুবে যাবার পরই ভেসে উঠে প্রাণভয়ে তাই চিৎকারও করে উঠেছিল, কিন্তু কেউ শুনতে পাবার আগেই আবার সে ডুবে গেল। এবার যেন অন্তিমবারের মত 'মা গঙ্গা' দয়া করে আবার তাকে ভাসিয়ে তুললেন এবং কল্লেশ সঙ্গে সঙ্গে তার চুলের গোছা চেপে ধরল। কুয়োর পাশে তখন কপিনীপতয়াজী ইত্যাদি অনেকেই রয়েছে। কল্লেশ চেঁচিয়ে বলল, 'দড়িটা একটু টানো'। বাঁ হাত দিয়ে সে দড়ি ধরে আছে, ডান হাতে কমলার চুলের গোছা। সে এখন বুক জলে রয়েছে, আর কমলার গলাটুকু শুধু জলের ওপর। বাঁ হাতে কল্লেশ দড়িটা বেশ শক্ত করে ধরতে পারছে না। এই অবস্থায় কেবল এক হাতে কমলার সমস্ত শরীরের ভার বেশী-ক্ষণ বহন করা খুব কঠিন। কুয়োর দেওয়ালে ওঠা-নামা করার জন্য ছোট ছোট গর্ত করা ছিল, সেইগুলো খুঁজে খুঁজে তাইতে পায়ের ভর রেখে সে নিজের অবস্থাটা কিছুটা নিরাপদ করার চেষ্টা করল। কমলা তখন বিড়বিড় করে বলছে, 'ও মাগো, আমার বড় ভয় করছে, তাড়াতাড়ি ওপরে তোল না!'

ইতিমধ্যে ওপরের লোকেরা একটা ছোট রঙীন দোলনা যোগাড় করে সেটা মজবুতভাবে দড়িতে বেঁধে কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দিয়েছে। দোলনাটা কাছে আসতে কল্লেশ কমলাকে উঠিয়ে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। এবার কল্লেশ বলল দড়ি টানতে। কিন্তু কমলা আবার ভয় পাচ্ছে, 'না না আমি পড়ে যাব, ভয় করছে'। কল্লেশ ভাবল, 'ভয়ের চোটে যদি দোলনা থেকে সত্যিই আমার ঘাড়ের ওপর পড়ে তো আমি সুদ্ধ মরব।' সে তখন নিজের পরনের ধুতিখানা খুলে তাই দিয়ে কমলাকে দোলনার সঙ্গে বেঁধে দিল এবং গায়ের গেঞ্জিটা খুলে পরে ফেলল কৌপীনের মত করে। এবার আস্তে আস্তে দোলনা ওপরে উঠতে শুরু করেছে, চারজন লোক মিলে টেনে তুলছে

দোলনাটা। যেসব গ্রামে পুকুর নেই সেখানে গৌরী উৎসবের দিনে 'গৌরম্মা'কে যেমনভাবে কুয়োয় ডুবিয়ে তোলা হয়, ঠিক সেইরকমভাবে, দোলনার মধ্যে ন'গজ ধুতি দিয়ে বাঁধা কমলাও ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল। তার পেছন পেছন উঠে এল কল্লেশ। কমলা প্রচুর জল খেয়েছে। ভয়, ভাবনা, লজ্জা সব মিলিয়ে ওর চোখ দুটো লাল টকটক করছে। কুয়োয় পড়ার সময় কুয়োর দেওয়ালে ধাক্কা লেগেছিল, তার ফলে হাত, পিঠ, মাথা ইত্যাদি থেকে রক্ত পড়ছে। তাকে উপুড় করে শোওয়ানো হল এবং কল্লেশ কোমরের ওপর চাপ দিতেই মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতে লাগল। যেসব জায়গা কেটে-কুটে গিয়েছিল সেগুলোর রক্ত মুছে ওষুধ লাগাতেই কমলা 'বাবারে মারে' করে বুক চাপড়াতে শুরু করেছে।

যারা ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল এবার কল্লেশ তাদের উদ্দেশ্যে বলে, 'আপনাদের এখানে তো আর কিছু করার নেই, সবাই বাড়ি যান।' কিন্তু কারোই বিশেষ নড়বার ইচ্ছা নেই। অবশেষে অক্কম্মা, কল্লেশ এবং আরো দু-একজন প্রতিবেশী মিলে সবাইকে বিদায় করলেন।

কপিনীপতয়াজীর স্ত্রী পুট্টম্মা বললে, 'গরম গরম এক ঘটি কফি খাইয়ে দাও ওকে।'

'ঐ ছেনালকে আবার কফি খাওয়াবে, ওর মাকে ধরে ···' বলতে বলতে ধুতি পরার জন্য ঘরের মধ্যে চলে যায় কল্লেশ। পুলিশের চাকরী করার সময় কফি খেতে শিখেছিল সে, তবে রোজ কফি পানের অভ্যাস ছিল না। কিন্তু হাসানের মত বড় শহরের পোস্টম্যানের মেয়ে কমলুর শ্বশুর বাড়িতে কফি জুটবে না এ কি হতে পারে? হ'লই বা পাড়া-গাঁ! বাড়িতে কফি পাউডার ছিল। নন্‌জু তাড়াতাড়ি এক ঘটি কফি তৈরী করে এনে রাখল বৌদিদির সামনে। এক চুমুক খেয়েই ঘটিটা ঠক্ করে মাটিতে নামিয়ে রেখে কমলা বলে উঠল, 'থুঃ! এইসব গেঁয়ো মেয়েমানুষ কফিটাও ঠিক করে বানাতে পারে না। কফি খেতে জানলে তবে তো শিখবে!' কল্লেশ কথাটা শুনতে পেয়েই বেরিয়ে এল এবং ঘটি সুদ্ধ কফি ঢেলে দিল কমলার মাথার ওপর। এবার আর কোন কথা বলল না সে। কল্লেশ আবার ভেতরে ঢুকে গেছে। এবার অক্কম্মা ডেকে বলে, 'ওঠো, উঠে শাড়ীটা বদলে নাও'। দুজন পুরুষ মানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, এখন তারাও চলে গেছে। শুধু কয়েকজন মহিলা রয়েছে। কিন্তু তবু কমলা উঠল না, ভিজে শাড়ীও ছাড়ল না, কুয়োতলাতেই গুটিসুটি হয়ে বসে রইল।

সে রাত্রে কমলা কিছু খেল না। কল্লেশ খেয়ে নিল। নন্‌জুও খেতে চাইছিল না, কিন্তু সে পোয়াতি মেয়ে তাই অক্কম্মা জোর করেই খাওয়াল তাকে। অক্কম্মা নিজে তো রাত্রে কিছুই খায় না। হজম হয় না বলে রাত্রের ফলাহারও সে ছেড়ে দিয়েছে প্রায় দশ বছর হয়ে গেল।

কমলা নিজের শোবার ঘরেই পড়েছিল। অক্কম্মা আর নন্‌জম্মা দুজনকেই কল্লেশ বলে দিয়েছে তারা যেন বাড়ির সদর আর খিড়কি দুই দিকের দরজা আগলে শোয়। সে এক কালে পুলিশের চাকরী করেছে সুতরাং কমলা মাঝ রাতে উঠে আবার কুয়োয় ঝাঁপ দিতে পারে এ রকম একটা আশঙ্কা তার মনে দেখা দিয়েছে। যা হোক, ওরা দুজনেই দুই দরজার সামনে শুয়েছে, এখন ঐ দরজা খুলে কারো বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। কল্লেশ নিজে ঘরের দরজার সামনে বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল কিন্তু চট্ করে ঘুম এল না তার। কত রকম চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। নিজের বাবার ওপরেও রাগ হচ্ছিল তার, উফ্, কি একখানা মেয়েই যে যোগাড় করেছেন তার জন্য! আরো কত কথাই মনে পড়ছিল। বহুক্ষণ পরে চোখের পাতা বুজে এল তার।

হঠাৎ চমকে জেগে উঠল কল্লেশ, রান্নাঘরে মনে হল যেন আলো জ্বলছে। শুয়ে শুয়েই মাথা তুলে ঘরের ভেতরটা দেখল, কমলা ঘরের মধ্যে নেই। বেড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে সে এসে হাজির হল রান্নাঘরের সামনে। উনুনের সামনে বসে আছে কমলা, মাথার অবিন্যস্ত কেশরাশি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠাকুরের বেদীর ওপর প্রদীপ জ্বলছে। মনে হচ্ছে কমলা যেন কিছু খাচ্ছে। নিঃশব্দে আরো এক পা অগ্রসর হতেই দেখা গেল, সন্ধ্যারাত্রে যে মেয়ে রাগ করে অনাহারে থাকবে ঘোষণা করেছিল, সেই এখন ভাতের হাঁড়ির মধ্যেই সম্বর ঢেলে গোগ্রাসে আহার করছে, মাঠার* ঘটিও রাখা রয়েছে পাশেই।

কোন শব্দ না করে ফিরে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ল কল্লেশ। ক'দিন ধরেই কমলা রাগ করে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করেছে দিনের বেলা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাত্রে সবাই ঘুমোলে সে বেশ খাওয়া-দাওয়া করে এবং তারপর যেন কিচ্ছুটি জানে না এইভাবে ঘুমিয়ে থাকে। সকালে উঠে হাতের আঙুল মটকে মটকে গাল দিতে থাকে, 'সারাটা রাত আমাকে উপোসী রেখেছে; এদের সর্বনাশ হোক, ইত্যাদি, ইত্যাদি।' রাত্রের ঢেকে রাখা খাবার অদৃশ্য হয়ে যাওয়াটাই কমলার 'নিশা ভোজনের' স্পষ্ট প্রমাণ। তাছাড়া আজ তো কল্লেশ নিজের চোখেই সব কিছু পরিষ্কার দেখল। মনে মনে ভাবতে লাগল সে,—এই নীচ, চোর, ইতর মেয়েটাকে দূর করে দিয়ে আরেকটা বিয়ে করে ফেলাই উচিত বোধহয়। এই সময় হঠাৎ বাইরে মোটরের আওয়াজ শোনা গেল। কে এল, কার বাড়িতে এল, এইসব ভাবতে ভাবতেই শোনা গেল গাড়ির আরোহীরা তাদেরই বাড়ির সামনে নেমে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। 'কে?' বলে হাঁক দিয়ে উঠে বসল কল্লেশ, তারপর প্রদীপ জ্বেলে দরজার সামনে শায়িতা অক্কম্মাকে উঠিয়ে দরজা খুলে দিল। দেখা গেল, কল্লেশের শ্বশুর-শাশুড়ী এবং তাঁদের আরো জন-চারেক আত্মীয় এসেছেন। ড্রাইভারটিকে চিনতে পারল না সে, তবে এঁদের দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল কল্লেশ।

'আমার কমলু কেমন আছে?' ডুকরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে শাশুড়ীঠাকরুণ ভেতরে ঢুকলেন।

'রান্নাঘরে গিয়ে দেখুন', জবাব দেয় কল্লেশ।

কিন্তু রান্নাঘরে গিয়ে কাউকে দেখা গেল না। তবে ঠাকুরের বেদীর প্রদীপটা যে এই মাত্র নেভানো হয়েছে সেটা গন্ধতে বোঝা যাচ্ছিল। 'আরে, গেল কোথায়?' বলতে বলতে ঘরে এসে কল্লেশ দেখে কমলা উপুড় হয়ে শুয়ে এমনভাবে ঘুমোচ্ছে যে, দেখলে মনে হবে যেন বহুকাল তার ঘুমই ভাঙেনি।

'দেখবেন আসুন! আপনারা যখন এলেন তখনও রান্নাঘরে ভাতের মধ্যে সম্বর ঢেলে খাচ্ছিল বসে বসে। এখন প্রদীপ নিভিয়ে চুপচাপ এসে শুয়ে পড়েছে যেন কিছুই জানে না। আপনারা নিজের চোখেই দেখে যান', প্রদীপ হাতে করে ওঁদের রান্নাঘরে নিয়ে যায় কল্লেশ।

'যাক গে, যেতে দাও। কি হয়েছিল কি? এখন ভাল আছে তো?' শ্বশুর মশাই প্রশ্ন করেন এবার। ভূতপূর্ব পুলিশ কনস্টেবল কল্লেশ এবার পাল্টা প্রশ্ন করে, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি? আপনারা হঠাৎ এলেন যে?'

---

* মাখন তোলা ঘোল।

'কমলা কুয়োয় পড়ে গেছে খবর দিয়ে আমাদের আসতে বলা হয়েছিল। তুমিই তো টেলিফোন করিয়েছিলে, তাই না ?'

'আচ্ছা, কে টেলিফোন করেছিল বলুন তো ? আমি তো তাড়াহুড়োতে ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'যেই করুক না কেন, তাতে হয়েছেটা কি ?' চড়া গলায় ঘরের মধ্যে থেকে বলে ওঠে কমলা।

এটুকু বোঝা যায় যে টেলিফোনটা কমলাই করিয়েছে, কিন্তু কাকে দিয়ে করালো সেটা কেউ বুঝতে পারে না। থাক্, সেটা জানতে বিশেষ অসুবিধে হবে না, এই ভেবে উপস্থিত কল্লেশও প্রশ্নটা নিয়ে আর মাথা ঘামাল না। সে সোজা গিয়ে প্রতিবেশীদের ডেকে তুলল। মোটরের শব্দে সবাইকারই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কপিনীপতয়া আর পুট্টম্মা এবং আরো এক প্রতিবেশী পরিবারকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে এল সে, তারপর বলল, 'আমার কথা হয়ত আপনারা বিশ্বাস করবেন না, তাই এঁদেরই জিজ্ঞাসা করুন। কপিনীমামা, আপনি এঁদের সমস্ত ঘটনা খুলে বলুন।'

প্রতিবেশীরা অবশ্য কিছু বললেন না, শেষ পর্যন্ত কল্লেশকেই সমস্ত বিবরণ দিতে হল। কমলাকে সে মেরেছে সে কথা অস্বীকার করল না, তবে লাথি মারার কথাটা চেপে গেল। প্রতি-বেশীরা সাক্ষ্য দিলেন কল্লেশ যা যা বলেছে সব সত্যি কথা। শাশুড়ী সব শুনে বললেন, 'তা যাই হোক, আমরা খাইয়ে পরিয়ে এত বড়টি করে আপনাদের গ্রামে মেয়েকে পাঠিয়েছি, আপনাদের তো উচিত ছিল ওকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে মানিয়ে নেওয়া ?'

শ্বশুর মশাই, অর্থাৎ পোস্টম্যান রঙ্গন্নাজী কিন্তু চুপ করে মাথা নিচু করে বসে রইলেন। কল্লেশ এবার তাঁকে বলল, 'আপনি এবার বলুন তো, কোন হারামজাদা আপনাকে টেলিফোন করেছিল ?'

'আমার মুখ থেকে মিথ্যা বেরোয় না। ফোনটা এসেছিল চেন্নরায়পট্টন থেকে। শুনলাম ওখানকার ইলেকট্রিক বিভাগের ক্যাম্প থেকে হাসানের ক্যাম্পে ফোন এসেছিল যে, পোস্টম্যান রঙ্গন্নাকে যেন অবিলম্বে খবর দেওয়া হয়। চিঠি বিলি করতে আমি রোজই ওদিকে যাই, তাই সবাই চেনে আমাকে। ইলেকট্রিকের ফোরম্যান এসে আমাকে এইসব খবর দিয়ে বললে, কল্লেশ নামে একটি লোক নাকি টেলিফোন করেছিল। কি ঝামেলা দেখ দিকিন্। শুনেই নগদ পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় গাড়ি ঠিক করে ছুটতে ছুটতে এসেছি।'

'যখন এসেই পড়েছেন, সঙ্গে গাড়িও রয়েছে, মেয়েকে নিয়েই যান আপনাদের সঙ্গে, ওর এখানে ভালও লাগে না।'

'তা বেশ তো, দু-চারদিন চলুক না, একটু জিরিয়ে আসবেখন', শাশুড়ীঠাকরুণ বলে ওঠেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর জবাব দেন, 'না, না, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যে মেয়েকে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। মন-মেজাজ যখন ভাল থাকবে তখনই আসা-যাওয়া করা ভাল।'

তাঁর স্ত্রী তর্ক করেন, 'আমার মেয়েকে আমি দু'দিন বাপের বাড়ি নিয়ে যাব, তাতে দোষটা কিসের শুনি ?'

স্বামী ধমকে ওঠেন, 'কি বোঝ তুমি ? চুপ করে থাক দেখি। এ সময়ে যাওয়া চলে না।'

'আমি যাবই যাব', বলতে বলতে কমলা উঠে এসে এবার মায়ের পাশে দাঁড়ায়।

বাপ বোঝাবার চেষ্টা করেন, 'আমার কথা শোন মা, এখন তোমার যাওয়া উচিত নয়।' কিন্তু মেয়ে কথাশোনার পাত্রীই নয়। রঙ্গন্নাজী বুঝলেন আর দেরী করা উচিত নয়, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের বললেন, 'চল সব, গাড়িতে উঠে বস, এবার ফিরতে হবে।' ওঁর স্ত্রী আবার

বলার চেষ্টা করেন, 'কিন্তু, আমার মেয়ে ···'। রঙ্গন্না রেগে বলেন, 'এতদিন তোমার কথা শুনেই এই অবস্থা হয়েছে। এখন মুখ বন্ধ কর দয়া করে।' সবাই গাড়িতে উঠে বসে। কমলুও গাড়িতে ওঠার চেষ্টা করে কিন্তু রঙ্গন্নাজী জোর করে হাত ধরে নামিয়ে দেন তাকে। নন্‌জু ততক্ষণে ভাইয়ের শাশুড়ীর সামনে সিঁদুর কুঙ্কুম নিয়ে এসেছিল, কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে ড্রাইভার গাড়িতে তখন স্টার্ট দিয়েছে। নন্‌জু শুনতে পেল রঙ্গন্নাজী বলছেন, 'শুধু শুধু পঞ্চাশটা টাকা জলে গেল, দেড় মাসের রোজগার! টাকা আসবে কোথা থেকে?'

প্রায় বিশ গজ এগিয়ে গাড়িটা থেমে গেল। শ্বশুর মশাই ডাকলেন, 'কল্লেশ, একবার শুনে যাও।' কল্লেশ এগিয়ে গেল গাড়ির কাছে। শ্বশুর গাড়ি থেকে নেমে এসে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মিনতির সুরে বললেন, 'দেখ, রাগ কোর না, লোকে দুষ্ট গরুকেও কোন রকমে চরায় আর গোয়ালে বেঁধে রাখে। ওর কথা না ভাবতে চাও, আমার কথা একটু ভেবে দেখো।' কথাগুলো বলতে বলতে ওঁর দুচোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল ঝরছিল।

এদিকে স্ত্রী, স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'তুমিও যেন ছেলে মানুষের মত কথা বলছ। সে কি এমন দোষ করেছে শুনি?'

'কথা বলে কোন লাভ নেই', বলতে বলতে আবার গাড়িতে ওঠেন রঙ্গন্নাজী। গাড়ি জোরে চালিয়ে দেয় এবার ড্রাইভার।

প্রতিবেশীরা যে-যার বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়েছে। কল্লেশের বাড়ির লোকেও শুয়ে পড়ল। কথা বললে তো এখন কথার পাহাড় হয়ে যেতে পারত, কিন্তু কেউই কিছু বলল না। শুধু অক্কম্মা দু-চারবার বলল, 'মুখপুড়ী, একেবারে মিটমিটে শয়তান!' নন্‌জু চিরদিনই মুখ বুজে থাকে। কল্লেশও একেবারে চুপ, কাজেই অক্কম্মা আর কথা বলার সুযোগ পেল না। শ্বশুর মশায়ের চোখের জল ঝরে পড়েছে কল্লেশের হাতের ওপর, সেই কথাটাই ওর মনকে বিচলিত করে তুলছে। সে যখন প্লেগের কবলে পড়ে, উনিই তখন নিজের সন্তানের মত স্নেহে তার সেবা যত্ন করেছিলেন। ওঁকে সে সত্যিই শ্রদ্ধা করে। নিজের স্ত্রীকে মেরে মেরে তার হাড়গোড় চূর্ণ করে দিতে ইচ্ছা করছিল কল্লেশের, কিন্তু শ্বশুরের চোখের জল যেন ওকে নিজের বিছানার সঙ্গে জোর করে বেঁধে রেখেছে। কিছুই সে করতে পারল না, চুপ করে শুয়ে রইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রায় ছ'মাস পরে এক মাঝরাতে গ্রামে ফিরে এল অংপন্নায়া। জেলে পাড়ার মাটার বাড়িতে এসে দরজায় ধাক্কা দিল সে। মাটা উঠে দরজা খুলেই অংপন্নায়াকে দেখে মহা আশ্চর্য হয়ে গেল, প্রশ্ন করল, 'হুজুর, আপনি কোথায় চলে গিয়েছিলেন?'

'পুলিশের লোক আমাকে খোঁজাখুঁজি করেছিল কি?'

'কোথাকার পুলিশ, হুজুর?'

'সেই যে, সে দিন ···।'

এতক্ষণে সমস্ত ঘটনা মাটার মনে পড়ল, সে বললে, 'তারা তো, শুনলাম পুলিশের লোক ছিল না। তারা সব জমি জরিপ করার আমিন। এ গাঁয়ে তারা তিন মাস ছিল। তা, আপনি এতদিন কোথায় লুকিয়েছিলেন হুজুর? ছেলে কোথায় চলে গেল বলে মা-জী তো ভেবে অস্থির।'

'তাহলে আমি এখন বাড়ি যাই?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন হুজুর।'

'ভয় করছে, তুমি এস আমার সঙ্গে।' সেই মাঝরাতে মাটাকে সঙ্গে নিয়ে এসে অংপন্নায়া অধীরভাবে নিজের বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করল। ভেতর থেকে প্রশ্ন হল, 'এত রাতে কে দরজা ধাক্কাচ্ছে রে?' মাটা সাড়া দিল এবার। তার গলা শুনে গঙ্গম্মা উঠে কেরোসিনের বাতি জ্বেলে দরজা খুলেই ছেলেকে দেখে অবাক, 'কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি বাছা এতদিন?' বলতে বলতে চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে তার। মাটাও এসে বসে ভেতরে। নন্‌জম্মা প্রসব হতে নাগলাপুর গেছে। চেন্নিগরায়ের ঘুম সহজে ভাঙবার নয়। গঙ্গম্মা ছেলেকে প্রশ্ন করতে থাকে, 'হ্যাঁরে, কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়ালি এতদিন? পেট চালাতিস্‌ কি করে?'

'আমার অত ভয়-ডর নেই। যেখানেই গেছি দিব্যি চালাকের মত থেকেছি।' বীর পুত্র এবার নিজের সাহসের গল্প শোনাতে থাকে, 'প্রথমে এখান থেকে গেলাম জাবগল্ল। পথে বিদরে সন্না-গৌড়ের বাড়িতে গিয়ে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিয়ে রান্নার বাসন চাইলাম। সে দু'সের চাল, বরবটি, লঙ্কার গুঁড়ো, মাখন ইত্যাদি দিল। খেয়ে-দেয়ে যা বাঁচল পুঁটলি বেঁধে নিয়ে পৌঁছে গেলাম জাবগল্ল। ওখানে ছিলাম এক মাস।' সেই পোড়ারমুখী বেঙ্কটরামের বৌ কেবলই জিজ্ঞাসা করে, 'এখন হঠাৎ এলে যে? গাঁয়ে ওরা সবাই কেমন আছে? ওরা এল না কেন?' খালি এইসব কথা। একদিন রাতে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম আরসীকেরের পথে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে বাণাবর, কড়ুরু হয়ে শেষে পৌঁছলাম শিবমোগ্গা। সেখানে নদীর ধারে আছে বেক্কিন কঠল্লন মঠ। সেখানে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

'খাওয়ার কি ব্যবস্থা করলি?'

'ওখানকার ইস্কুলের লোকেরাই বলল যে, তারা লিঙ্গায়েত, কাজেই আমি তাদের রান্না খেতে পারব না। তা, সে গাঁয়ে একটা পাড়া আছে, সেটা 'বড় ব্রাহ্মণ পাড়া'। সেখানে সব বড় বড় লোকেরা থাকে। সেখানে রোজ ভিক্ষা পাওয়া যেত। মা, তুমি যাই বল না কেন, যত ভাল রান্নাই হোক, ভিক্ষান্নের কাছে কিছুই লাগে না। ভিক্ষার ঝুলি ভরে ভাত আর পাত্র ভরে সম্বর নিয়ে এসে নদীতীরে একখানা পাথর ধুয়ে তারই ওপর ঢেলে দিব্যি খেয়ে নিতাম।'

'ভিক্ষান্ন কাকে বলে হুজুর?' মাটা জিজ্ঞাসা করে।

ঠিক খাওয়ার সময় সব বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলতে হয় 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি।' যে দেখবে সেই এসে ঝুলিতে ভাত, আর ভিক্ষার পাত্রে সম্বর, কড়ি, শাক, চাটনী যা হোক দিয়ে যাবে। ব্যস, সেইসব একসঙ্গে মেখে খাও, সে ভারি চমৎকার লাগে রে।

'তা চমৎকার তো লাগবেই, সেই কথায় বলে না, পরের বাড়ির কড়ি আর রাঁড়ের বেটি দু-ইই বেশী ভাল লাগে'—বলতে বলতে জিবে জল এসে যায় মাটার।

'সেই হতচ্ছাড়া শিবমোগ্গা গ্রামে দিনের পর দিন ভাত খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরে গেছে মা, আমাকে মড়ুয়ার রুটি করে দাও, পেটে যেন আগুন জ্বলছে।'

'এত রাতে?'

'আজ রাতে তো আমার খাওয়াই হয়নি।'

'সে ছেনাল দুটোর একটাও যদি এখানে থাকত তো করে দিতে বলতাম, এখন যে কেউ নেই। তোর বৌয়ের মেয়ে হয়েছে অপ্পন্না, নামকরণের সময় নিমন্ত্রণ এসেছিল, সে আজ চার মাস হয়ে গেল। যা, এবার গিয়ে বৌকে নিয়ে আয়, রাঁধতে রাঁধতে আমার প্রাণ গেল'—বলতে বলতে উঠে পড়ে গঙ্গম্মা।

২

প্রথম দিন-চারেক অপ্পন্নায়া বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ালো গ্রামের পথে পথে, তারপর স্ত্রী ও শিশু-কন্যাকে আনতে নুগ্গীকেরের উদ্দেশ্যে রওনা হল। পুঁটলিতে রুটি আর চাটনী বেঁধে নিয়ে, হেঁটে তিপটুর পর্যন্ত গিয়ে ট্রেন ধরে কড়ুর পৌঁছল, তারপর আবার ন'মাইল হেঁটে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল শ্বশুর বাড়ির গ্রামে। তার মেয়ের বয়স এখন চার মাস, তার নাম রাখা হয়েছে জয়লক্ষ্মী।

অপ্পন্নায়া যখন পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেখা গেল সাতু এখনও সূতিকাগৃহেই রয়েছে। শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করল অপ্পন্নায়া, স্ত্রীর সঙ্গেও কথাবার্তা হল। কিন্তু রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর মাঝের ঘরে শ্বশুরের বিছানার পাশে তার বিছানা পাতা হয়েছে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল বেচারার। বিছানায় এসে বসার পর শ্বশুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'নামকরণের সময় নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলাম, কোথায় গিয়েছিলে তখন?'

'শিবমোগ্গা, না, না জাবগল্ল।'

'ঐ সময় স্ত্রীর প্রসবের দিন পড়বে তা কি জানতে না? কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ গ্রাম থেকে কোথায় চলে গেলে?'

'একটু কাজ ছিল।'

আঁতুড় ঘর থেকে সাতু বলে উঠল, 'কি এমন কাজ ছিল, বাজে কথা বলছে কেন? সত্যি কথাটা বলুক না! বৌদিদিকে লাথি মেরে তারপর পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে গাঁ থেকে সরে পড়েছিলে, তাই না?'

কোন উত্তর না দিয়ে অপন্নায়া মাথা নত করে বসে রইল। সাতু আবার বলল, 'তোমার মায়ের কথাতে লাথি মেরেছিলে, তাই না? ঐ কুঁদুলে মেয়েমানুষটি মরলে তবে যদি তোমার আক্কেল-বুদ্ধি ঠিক হয়।'

নিজের মায়ের নিন্দা শুনে খুবই রাগ হচ্ছিল অপন্নায়ার, কিন্তু এ সময় কিছু করা সম্ভব নয়। বৌদিদির মত ভাল মানুষ শান্ত স্বভাবের মেয়ে সাতু মোটেই নয়। কাজেই উপস্থিত অপন্নায়া চুপ করে রইল। ঘরের মধ্যে থেকে সাতু আবার বলে ওঠে, 'তোমার মায়ের সঙ্গে, এক সঙ্গে আমি থাকতে পারব না, বাড়ির পেছনে যে খালি জায়গাটা আছে সেখানে ছোট-খাট একখানা ঘর তোল আগে, তারপর আমাকে আর বাচ্চাকে নিয়ে যেও। আমরা আলাদা থাকব।'

'সে কি করে হবে?' কোনমতে গলাটা সাফ করে বলে অপন্নায়া।

'না হবার কি আছে? খুব ছোট-খাট ঘর তোল, দুই ভাই সব কিছু ভাগ করে নাও। বিয়েতে যে বাসন-পত্র পেয়েছি তাতেই কাজ চলে যাবে, না হয় আরো কিছু নিয়ে যাব।'

অপন্নায়া কোন উত্তর দেয় না। সাতু এবার বলে, 'তোমাদের আলাদা হবারও দরকার নেই, দুই ভাই এক সঙ্গেই থাক। আমি দিদির সঙ্গে বেশ থাকব। কিন্তু তোমার মাকে আলাদা থাকতে হবে। ওঁর জন্য আলাদা একখানা ঘর করে দাও, তারপর এসে আমাকে নিয়ে যেও।'

মায়ের নিন্দা শুনতে শুনতে অপন্নায়ার মুখ-চোখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে দেখে তার শাশুড়ী-ঠাকরুণ এবার কথা বলেন, 'আমাদের অপন্নায়ার স্বভাবটা বড় ভাল। সাতু তো সর্বদাই বলে ও একেবারে খাঁটি সোনা। তা শাশুড়ী বৌতে যদি বনিবনা নাই হয় তাহলে তোমরা না হয় আলাদাই থাক। সাতু না হয় তোমার মায়ের ঘরের কাজকর্মেও কিছুটা সাহায্য করে দেবে।' কথাগুলো শুনে এবার অপন্নায়ার মুখটা খুশি খুশি হয়ে ওঠে।

এতক্ষণে শ্বশুর মশাই বলেন, 'আসল কথা হল, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সুখে-শান্তিতে থাকা দরকার। ভোর না হতেই উনি 'ছেনাল', 'রাঁড়' এইসব কুৎসিত গালিগালাজ যাতে শুরু না করেন তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে তারপর স্ত্রীকে নিয়ে যেও। আমার তো ঐ সবেধন নীলমনি একটিমাত্র মেয়ে। এখন তো আমার কাছে ছেলেও নেই মেয়েও নেই।'

অপন্নায়া আট দিন থেকে গেল শ্বশুর বাড়িতে। এ ক'দিন সে স্ত্রীকে গালিগালাজ করেনি বরং খুশি হয়ে শিশুকে আদর করেছে, খেলা দিয়েছে। কিন্তু তার উদ্ধত দাম্ভিক স্বভাব সবাইকার চোখেই বেশ বিসদৃশ লাগে। একদিন সাতু নারকেলটা ঠিক করে ভাঙতে পারেনি দেখে রেগে গিয়ে অপন্নায়ার মুখ দিয়ে 'তোর মায়ের ···' কথাটা বেরিয়েই গেল। আরেক দিন বাগানে গরুটা যেই শিং নাড়া দিয়েছে সে বলে বসল, 'দুত্তোর, তোর মায়ের ···'। শাশুড়ী কাছেই ছিলেন, কথাটা তাঁর কানে গেল। এ ছেলেকে শুধরে ফেলা অতি কঠিন তা তিনি বুঝেছিলেন। মেয়ের ভাগ্যের কথা ভেবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তাঁর।

গ্রামে ফিরে আসার দিন খাওয়া-দাওয়ার সময় সাতু আবার আলাদা থাকার কথাটা পাড়ল। অপন্নায়া সম্মতি দিয়ে ফেলল এবার। এরপর কড়ুর পর্যন্ত হেঁটে এসে ট্রেন ধরল। তিপটুরে

এসে নামল ট্রেন থেকে। এরপর বাড়ি পর্যন্ত আবার ষোল মাইল হাঁটা-পথ। আজকাল মুদালিয়র কোম্পানী অবশ্য বাস চালাতে শুরু করেছে, কিন্তু সেও দুদিনে একবার, অর্থাৎ সোম, বুধ আর শুক্রবারে চলে। বাসে চড়ার মজাটা কি রকম তা অপ্পন্নায়া ইতিমধ্যেই একদিন চেখে দেখেছে, তার একটুও ভয় করেনি। যে একলা ট্রেনে ঘোরাফেরা করে, মোটরে তার আবার ভয় কিসের? কিন্তু আজ শুক্রবারের সন্ধ্যা, কাজেই আগামী দুদিন মোটর চলবে না। অবশ্য পায়ে হাঁটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়, কিন্তু মোটরে চড়ার মজাটা তো মাটি হল!

সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখে অপ্পন্নায়া তিপটুরেই থেকে গেল। হোটেলে গিয়ে 'আলুকান্দা', সম্বর, বেগুনের তরকারী, পাঁপড়, কড়ী, মাঠা সব কিছু দু'তিনবার চেয়ে চেয়ে ঠেসে খাওয়া-দাওয়া করতে খরচ হল ছ'আনা। ধর্মশালার বারান্দায় রাত কাটিয়ে সকালে পুকুরপাড়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে সে আবার গেল হোটেলে, এবারে খেল একটা মশলা-দোসা। শিবমোগ্গাতেও সে দুদিন দোসা খেয়েছে কিন্তু তার স্বাদ এত ভাল ছিল না। কাঁচা লঙ্কা, নানা রকম মশলা, আলু, চাটনী ইত্যাদি দেওয়া ঝাল ঝাল এই দোসা তার এতই অপূর্ব লাগল যে, পর পর আরো ছ'খানা দোসা খেয়ে ফেলল সে। খরচ হল সাত আনা। এবার পাকদণ্ডীর পথ ধরে রওনা হয়ে পড়ল রামসন্দ্র গ্রামের উদ্দেশ্যে। মাইল দুই পথ চলতে চলতেই দারুণ পিপাসা বোধ করতে লাগল সে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল গালাগালি, 'দুত্তোর, তোর মায়ের ··· এ সেই দোসা খাওয়া তেষ্টা, এতক্ষণে জানান দিচ্ছে।' এবার সে রাস্তার ধারে কোন নারকেল গাছ আছে কিনা খুঁজতে লাগল, কিন্তু একটাও নজরে পড়ল না। অগত্যা চুপচাপ বেড়া টপকে কারো বাগানে ঢুকে একটা ছোট গাছ থেকে গোটা তিনেক ডাব পেড়ে নিল। একটা কাঠের টুকরো দিয়ে ডাব ফুটো করে চক্‌চক্ করে জল খেয়ে কোন মতে তৃষ্ণা মিটল। ভেতরকার কচি শাঁসটাও খাবার ইচ্ছা ছিল খুবই কিন্তু ধরা পড়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি বেড়া টপকে পথে এসে এবার জোর পায়ে বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করল সে। পথে গরু চরাচ্ছিল এক গোয়ালা, তার কাছ থেকে জুটে গেল একটা বিড়ি। অপ্পন্নায়া কখনো বিড়ি কিনে খায় না। আখের খেতে আগুন লাগাবার পর অনেকদিন বিড়ি খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু এখন বিনা পয়সায় বিড়ি জুটে গেলেই টান দিয়ে শেষ করে ফেলে।

৩

বিকেল চারটে নাগাদ গ্রামে পৌঁছল অপ্পন্নায়া। সে বাড়িতে পৌঁছবার কিছুক্ষণ আগেই প্যাটেল শিবেগৌড় ও তার শালা ভূতপূর্ব পাটোয়ারী শিবলিঙ্গে গৌড় এসে বসেছিল তাদের বাড়িতে। অপ্পন্নায়া বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই কথা শুরু করল সে। বলল, 'গঙ্গম্মা, দেখো অপ্পন্নায়াও ঠিক এমন সময়ে এসেছে যেন ওকে ডেকে আনা হয়েছে। তা যাক, আমার টাকাটার কি করলে? ভুলেই গিয়েছ নাকি?'

প্রথমটা মিনিট দুই গঙ্গম্মা তো বুঝতেই পারল না কোন টাকার কথা বলা হচ্ছে। শিবে-গৌড় এবার মনে করিয়ে দিল, 'মূলধন দু'হাজার, সাত বছরের সুদ এক হাজার আটশ' আশী। এতকাল ধরে সুদটাও তো দাওনি, সেই সবের হিসেব ধরলে আরো ছ'শ টাকা। সব মিলিয়ে মোট আমার পাওনা হল চার হাজার ছ'শ আশী টাকা। আজ থেকে এক মাসের মধ্যে আমার

টাকা দিয়ে দিও। সময় বহুদিন পার হয়ে গেছে। টাকা না পেলে এবার আমাকে কোর্টে যেতে হবে।'

'ছেলেমানুষ অসাবধানে কবে কি করে ফেলেছিল তারজন্য এখন আমি এত টাকা কোথায় পাব শিবেগৌড় ?'

'ছেলেমানুষে করেছে! আর আমি যে টাকাটা দিয়েছিলাম সেটা কি মিথ্যে ? কি বলতে চাও তুমি ? চেন্নৈয়া, তুমি তো পাটোয়ারীগিরি কর, তুমিই বল, আমি যে টাকা দিয়েছিলাম সেটা তো আর মিথ্যে নয় ?'

চেন্নিগরায় চুপ করে রইল। 'আজ থেকে আট দিনের মধ্যে টাকা না পেলে আমি কেস্ করব। তখন আমার আর কোন দায়িত্ব থাকবে না তা বলে যাচ্ছি কিন্তু, হুঃ ···' বলতে বলতে শিবেগৌড় শালাকে নিয়ে উঠে চলে গেল।

'এখন কি হবে চেন্নৈয়া?' জিজ্ঞাসা করে গঙ্গম্মা।

'আমি কি করে জানব মা?'

'তুই পাটোয়ারী, তুই কিছু জানিস না?'

অপন্নায়া বলে ওঠে, 'দেখা যাক কি করে ও টাকা নেয়। সোজা বলে দাও 'দেব না।'

'তাই বলে দেব ?'

'হ্যাঁ মা!'

'আগে খেতে দাও মা, বেজায় খিদে পেয়েছে। ও আমাদের কি কেড়ে নিতে পারে সে কথা পরে ভাবা যাবে।' অপন্নায়ার কথা শুনে গঙ্গম্মা উঠে ভেতরে যায় খাবার পরিবেশন করতে।

এই ব্যাপারে কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায় সেই কথাই ভাবছিল গঙ্গম্মা। হঠাৎ মনে পড়ল রেবন্নাশেট্টীর কথা। গাঁয়ের লোকে তো রেবন্নাশেট্টীকে উকিল বলেই ডাকে। কত রকম মামলা নিয়ে সে প্রায়ই তিপটুর যায়। লোকে বলে. বড় বড় উকিলরাও যেসব কথা বোঝেন না, রেবন্না তা পরিষ্কার বুঝে ফেলে। গঙ্গম্মা সোজা গিয়ে হাজির তাঁর বাড়ি। কিন্তু রেবন্নাশেট্টীর স্ত্রী বলে, 'উনি তো এখানে নেই, কোডীগ্রাম গিয়েছেন।'

'কি করতে গেছেন ?'

'ওঃ আপনি জানেন না বুঝি গঙ্গম্মাজী?'

'তাস খেলতে বুঝি?' আন্দাজে বলে গঙ্গম্মা।

'তা আপনি হঠাৎ এলেন যে ? বসুন বসুন, মাদুর পেতে দিই।'

গুছিয়ে বসল গঙ্গম্মা। শিবেগৌড়ের আগমন এবং জমি বাঁধা দেওয়ার ইতিবৃত্ত জানাল সে। সর্বক্কা শুনে বলে উঠল, 'জমি বাঁধা দেওয়ার কথা তো গাঁ সুদ্ধ লোক জানে। অনেক আগেই ও টাকা শোধ করে দেওয়া উচিত ছিল। এতদিন চুপচাপ বসেছিলেন কেন?'

'দু'চার টাকার ব্যাপার তো নয়? কোথা থেকে দেব অত টাকা?'

এরপর আর কি বলা যায় ভেবে পেল না সর্বক্কা। তার বয়স মোটে তিরিশ বছর, পাঁচটি সন্তানের মা হয়েছিল, তার মধ্যে তিনটি ইতিমধ্যেই গত হয়েছে। গত দু' বছর থেকে সে আর অন্তঃসত্ত্বা হয়নি। সেই যখন অপন্নায়া আখের খেতে আগুন লাগায়, সেই সময় তার স্বামী আখের খেতের ডাঁটাগুলোর জন্য পঁচিশ টাকা ক্ষতি পূরণ পেয়েছিল এটুকু তার মনে আছে। যে

লোকটা আগে বলেছিল, 'আর কখনও আখের ডাঁটগুলো খেতে ফেলে রাখব না, অন্য কিছু চাষ করব', সেই আবার যখন ঐ ডাঁটার জন্য পয়সা আদায় করে তখন সর্বক্কা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিল যে, এটা অন্যায় হচ্ছে। তার ফলে তাকে গালে চড় খেতে হয়েছিল তাও মনে আছে।

কিছুক্ষণ এটা সেটা নিয়ে আলাপ করার পর রেবন্নাশেট্টী এসে পৌঁছল। রেবন্নার পরনে বকের পালকের মত সাদা ধপধপে ধুতি, ইস্ত্রি করা কামিজ, পায়ে রবারের চটি, গলায় সোনার হার দেখা যাচ্ছে, হাতের আঙুলে ঝকঝক করছে তিনটে লাল পাথর বসানো আংটি, মুখের ওপর দিব্যি বাহার দেওয়া গোঁফ জোড়া—এইসব দেখে শুনে গঙ্গম্মার দৃঢ় বিশ্বাস হল শিবেগৌড়ের মামলাটা এ নিশ্চয় জিতিয়ে দিতে পারবে।

সব কথা শুনে রেবন্না বলে, 'এ তো মহা অন্যায় কথা! ব্যাটা কি ভেবেছে কি? কোর্টে যাব বলেছে? ওকে বলে দিন, 'যাও, গিয়ে দেখ আমার কাছে কি আদায় করতে পার।' তিপটুরের বড় বড় উকিলদের সঙ্গে আমার চেনা আছে।'

আশান্বিত হয়ে গঙ্গম্মা বলে, 'তবে তাই বলে দিই ওকে গিয়ে, ঠিক বলছ তো রেবন্না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ বলে দিন। কোন ভয় নেই। এরপর কি করতে হবে সে আমি দেখছি।'

'তুমিও চল না আমার সঙ্গে?'

'না, না, আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমাকে আড়াল থেকেই কাজ করতে হবে। আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? জানেন, লোকে বলে, গঙ্গম্মার মত সাহস আশে-পাশের চৌষট্টিটা গাঁয়ের কোন হারামজাদা পুরুষের নেই! ভয়টা কিসের আপনার?'

এই কথায় চমৎকার কাজ হল। 'আমি তেমন ভীতু ছেনাল মেয়েমানুষ নই' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল গঙ্গম্মা, তারপর সোজা শিবেগৌড়ের বাড়ির সামনে গিয়ে জোর গলায় শুরু করল, 'আমার স্বামী যখন পাটোয়ারী ছিলেন তখন তুমি তো ছিলে একটা পুঁচকে ছেলে, তাই না গৌড়? আর আজ তুমি আমার ঘাড়ে অন্যায় জরিমানা চাপিয়ে দিয়ে এখন কোর্টে যাবার ভয় দেখাচ্ছ! কোর্ট কেন, একেবারে দেওয়ানজীর দরবার পর্যন্ত চলে যাও। আমিও উকিল লাগাচ্ছি। এক পয়সাও তুমি পাবে না আমার কাছে! মেয়েমানুষ বলে আমি কি কাউকে ভয় করি নাকি?'

শিবেগৌড় বাইরে এসে প্রশ্ন করে, 'ব্যাপার কি গঙ্গম্মা? এইতো দু' ঘন্টা আগে দিব্যি ন্যায্য কথা বলছিলে, এর মধ্যে আবার উল্টো গাইছ কেন?'

'কেন গাইব না শুনি? বিপদে আপদে আমাকেও সাহায্য করার লোক আছে। আমি তো আর এ গাঁয়ে বিদেশী নই!' কথাগুলো শুনিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এল গঙ্গম্মা।

এসে দেখে রেবন্নাশেট্টী ইতিমধ্যেই এসে বসে আছে। গঙ্গম্মার মুখ দেখেই শেট্টী বুঝে ফেলল শিবেগৌড়ের সঙ্গে কি ধরনের বাক্যালাপ হয়েছে তার। সে বলল, 'গঙ্গম্মাজী, দুই ছেলেকে নিয়ে গরুর গাড়ি করে বার চারেক আপনাকে তিপটুর যাওয়া-আসা করতে হবে। জজ সাহেবের সামনে বেশ স্পষ্ট করে জানাবেন এটা কতখানি অন্যায়, তাহলেই মামলার রায় আপনার সপক্ষে হবে দেখবেন। সব মিলিয়ে শ'পাঁচেক খরচ পড়বে আপনার।'

অপ্পন্নায়া জানতে চাইল, 'তিপটুরে খাওয়া-দাওয়ার কি হবে?'

'কেন হোটেল নেই নাকি?'

হোটেলের নাম শুনেই জিভে জল এসে গেল অপ্পন্নায়ার। আহা, সেই আলুকান্দা, সম্বর,

ভাজা ছোলা মেশানো সুগন্ধী চাটনী, ঘোল তারপর জলখাবারে মশলা দোসা। সে চট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, 'রাজি হয়ে যাও মা, তিপটুরে গিয়ে কেস্ লড়া যাক।'

মা এবার জানতে চায়, 'পাটোয়ারীর কি মত?' চেন্নিগরায় জবাব দেয়, 'কোন বিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা করা উচিত'।

যাক, শিবেগৌড় তো মামলা ঠুকে দিল। এরা তিনজনে রেবন্নাশেট্টীর সঙ্গে তিপটুরে গিয়ে তার নির্দেশমতই উকিল নিযুক্ত করল মহান্তায়াজীকে। মামলাটা রেবন্নাশেট্টী তাঁকে এইভাবে বোঝাল যে,—'গ্রামের কিছু লোক মিলে আখের খেতে আগুন লাগিয়েছিল, তারপর এই অনভিজ্ঞ বেচারাদের ঘাড়ে জরিমানা চাপিয়ে দেওয়া হয়। এদের পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক রাখানো হয়, তাতে সই করেছে নাবালক পুত্র। বন্ধকের সমস্ত কাগজ-পত্র তৈরী করিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে এবং তার জন্যও পয়সা নিয়েছে ঐ অভিযোগকারীর নিজের শালা। এইসব মাল-মশলা থাকা সত্ত্বেও কি এ কেস্ জেতা যাবে না হুজুর?'

'না জিতে ছাড়ব নাকি?' জবাব দেন উকিল বাবু।

প্রথম দিনের খরচের জন্য সোনার গহনা বিক্রী করে এরা দু'শ টাকা যোগাড় করেছিল। রেবন্নাশেট্টী তারমধ্যে একশ' পঁচাত্তর টাকা চেয়ে নিয়ে গেল, কারণ উকিল বাবু নাকি সবাইকার সামনে পয়সা নেবেন না। সে একাই উকিলের বাড়ি থেকে হিসাব-পত্র মিটিয়ে ফিরে এল। অণ্ণপন্নায়া হোটেলে দুপুরে খেতে গিয়ে তার সঙ্গেই খেয়ে ফেলল তিনটে মশলা দোসা। আর পাটোয়ারী চেন্নিগরায়তো হোটেলের সম্বন্ধে সবই জানে। বছরে অন্তত চারবার দাবরসায়াজীর সঙ্গে তিপটুরে আসতে হয় তাকে। সে মৈশুর পাক, সুজির লাড্ডু ইত্যাদি মিষ্টি-মিঠাই খেল পেট ভরে। বিধবা গঙ্গম্মা গ্রাম থেকে এনেছিল ছাতু আর কলা, তাই দিয়েই সে সেরে নিল ফলাহার।

৪

নন্জুর এবার ছেলে হয়েছে। চেন্নিগরায় 'নামকরণ' উপলক্ষ্যে এসেছিল, সে তার স্বর্গীয় পিতার নাম অনুসারে ছেলের নাম রেখেছে 'রামন্না'। তার মা তাকে এই নামই রাখতে বলে দিয়েছিল। এবার কিন্তু বেশীদিন শ্বশুর বাড়িতে থাকল না চেন্নিগরায়। শালা কল্লেশকে দেখলেই ওর কেমন ভয় করে। তাছাড়া, কল্লেশের বৌ কমলাও ভারি খিটখিটে মেজাজের মেয়ে।

প্রসবের তিন মাস পরে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে এল নন্জু। এখানে আসার পরের দিনই প্যাটেল শিবেগৌড়ের সঙ্গে মামলা চলার খবরটা শুনল সে। শিবেগৌড়ের কাছে ধার নেওয়ার কথাটা সে আগেও শুনেছিল। আখের খেতে আগুন লাগানোর জন্য গাঁয়ের লোকেদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল। তারজন্য জমি বাঁধা রেখে দু' হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে, এসব কথা সে নতুন বৌ হয়ে আসার পরই গ্রামের পুকুর-ঘাটে বাসন মাজতে মাজতে প্রতিবেশিনীদের মুখে শুনেছে। বাড়িতে এসব কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করা সম্ভব ছিল না। একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছিল, 'বেশী ওস্তাদি মারতে এস না, একদম চুপচাপ থাকবে।'

পাটোয়ারীর হিসাব লেখা শুরু করার পর থেকে সে বেশ বুঝতে পারছিল এইভাবে জমি বাঁধা

দিয়ে ঋণ করার পরিণাম কি হতে পারে। এ সম্বন্ধে একদিন আলোচনা করা দরকার এটা তার প্রায়ই মনে হত। কিন্তু ঠিক এই সময়ই অপ্পন্নায়া তাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল। এরপর শাশুড়ী ক্রমাগত বলতে শুরু করলেন, 'ঐ হতচ্ছাড়ি, রাক্ষুসীর জন্যই আমার কোলের ছেলেটা বিবাগী হয়ে গেল গো।' সুতরাং এই সময় ওসব কথা তুললে আবার হয়ত প্রচুর গালা-গাল শুনতে হবে সেই ভয়ে সে চুপ করেই রইল। তারপর তো প্রসবের জন্য বাপের বাড়ি চলে যেতে হল। ফিরে এসে শুনল কোর্টে কেস্ চলছে। কি ব্যবস্থা হবে জিজ্ঞাসা করাতে স্বামী মহাদাপটের সঙ্গে জবাব দিল, 'ব্যাটাকে এক পয়সাও দেব না আমরা, উল্টে কোর্ট থেকে হুকুম করিয়ে ওর কাছ থেকেই পয়সা আদায় করব'।

'কিন্তু মামলায় তোমরাই যে জিতবে এমন কথা কে বলেছে?'

'বলেছে রেবন্নাশেট্টী।'

'রেবন্নাশেট্টীর কথায় বিশ্বাস করলে? তোমরা কি জান না সে কি ধরনের লোক?'

'লক্ষ্মীছাড়ি ছেনাল কোথাকার! তাকে গাল দিস তুই? দাঁড়া কালই ওকে বলে দেব, তুই এইসব কথা বলেছিস, তারপর দেখ্ কি হয়।'

স্বামীর যে বুদ্ধি-বিবেচনা নেই এটা নন্‌জু তো জানেই। কিন্তু তবু এই সীমাহীন অবিবেচনা দেখে তার দুই চোখ জলে ভরে ওঠে। আর কথা বাড়ায় না সে। কিন্তু মনে মনে চিন্তার শেষ থাকে না তার—'সবাই বলে রেবন্নাশেট্টী মদ খায়, তাস খেলে, পথে-ঘাটে মেয়েদের ওপর কুদৃষ্টি দেয়, ঘরে তার বৌ সর্বক্কা মোটেই সুখী নয়, এসব কথা তো সারা গ্রাম জানে।' পরের দিন পুকুর-ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে নন্‌জু দেখল রেবন্নাশেট্টীর বড় মেয়ে রুদ্রাণী ওর পাশের পাথরটায় বসেছে। জিজ্ঞাসা করল, 'রুদ্রাণী, তোমার মা বাড়িতে আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'আর, বাবা কোথায়?'

'বাবা কোডীহল্লী গেছে।' সবাই জানে, তার মানে সে গেছে জুয়া খেলতে।

'যা দেখি, চট করে একবার বাড়ি গিয়ে তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়। বলিস, আমি ডেকেছি, বাসনগুলো এখানে থাক, আমি নজর রাখছি। তুই বাড়িতে থাক্, আর মাকে এখানে পাঠিয়ে দে।'

মিনিট দশেক পরে সর্বক্কা এল। প্রথমে দু-একটা কুশল প্রশ্নের পর নন্‌জম্মা চারদিকে চেয়ে ভাল করে দেখে নিল কেউ কোথাও আছে কি না, তারপর চুপিচুপি বলল, 'শুনুন, একটা বিশেষ গোপনীয় কথা জানতে চাই, আপনি বলবেন কি?'

'কি কথা শুনিই না?'

'আপনার কর্তা তো আমাদের বাড়ির এঁদের মামলা লড়তে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু এ মামলায় সত্যিই কি জিত হবে?'

'নন্‌জম্মা, ওসব পুরুষ মানুষদের ব্যাপার, আমি কি ওসব বুঝি? আমাদের ও কথায় কাজ কি? ছেড়ে দাও ওসব চিন্তা।'

'না, না, আপনি যা কিছু জানেন আমাকে বলতেই হবে।'

সর্বক্কাও ঘাড় ঘুরিয়ে একবার চার-পাশটা দেখে নেয়, তারপর বলে, 'আমার বাড়ির লোক টের পেলে আমাকে খুন করে ফেলবে। তুমি মা গঙ্গার নামে দিব্যি কর যে কাউকে কিছু বলবে না?'

পুকুর থেকে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে নন্‌জম্মা বলে, 'মা গঙ্গার নামে শপথ করছি কাউকে বলব না।'

'বল্‌গেরল্লীর নিগপ্পাদের বাড়িতে যখন ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বাধে, ইনিই উকিল ঠিক করে দিয়েছিলেন। লোকে বলে তাদেরও জিতিয়ে দেবেন বলে অনেক পয়সা নিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলায় হার হল। তারপর তারা এসে একদিন আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বাপ মা তুলে গাল-মন্দ করে গেল, ছেলে-পেলেদের শাপমন্যি দিয়ে মুঠো মুঠো ধূলোমাটি ছুঁড়ল বাড়ির দিকে। তাস আর জুয়ার পয়সা জোটাবার জন্যই এইসব করে বেড়ান উনি।'

নন্‌জম্মা যা যা অনুমান করেছিল সেই কথাগুলোই শুনল সর্বক্কার মুখে। কোনরকমে কোর্ট-কাছারির কবল থেকে মুক্ত হয়ে বাকি জমিটুকু কি করে বাঁচানো যায় সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে নন্‌জম্মা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সর্বক্কা বলে, 'দেখ নন্‌জম্মা, তোমার আর আমার কপালটা ঠিক একরকম। আমার স্বামীর হল ঘর ভাঙানোর বুদ্ধি, আর তোমার স্বামীর তো বুদ্ধির বালাই-ই নেই। আমরা দু'জনেই তাই অসুখী। যা বললাম, কাউকে বোল না যেন, মা গঙ্গার নামে শপথ করেছ।' বাসনের গোছা তুলে নিয়ে এবার বাড়ির দিকে চলে যায় সর্বক্কা।

সারা রাত ঘুমোতে পারল না নন্‌জম্মা। সকালে উঠে একখানা কাগজ নিয়ে ভাইকে চিঠি লিখতে বসল। কুশল প্রশ্নাদির পর লিখল, 'এ বাড়ির সমস্ত জমি বাঁধা পড়েছে, এখন কোর্টে কেস্ চলছে। তুমি যত শীঘ্র পার একবার এস।' চিঠি আর বাসনের গোছা নিয়ে সে চলল পুকুর-ঘাটে। আশা করছিল পুকুর-ঘাটে কাউকে পেলে চিঠিখানা বাপের বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলবে, কিন্তু তেমন কাউকে দেখতে পেল না নন্‌জু। খানিক পরে দেখে মন্দিরের মহাদেবায়াজী পুজোর ফুল ও বিল্বপত্র ধুয়ে নেবার জন্য সে সব ঝোলায় ভরে নিয়ে এদিকেই আসছেন। নন্‌জম্মা ওঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। ইদানীং উনি ওদের বাড়িতে বড় একটা আসেন না, কিন্তু এই বড় বৌকে মহাদেবায়াজীও খুবই স্নেহ করেন। নন্‌জু ওঁকে ডাক দেয়, 'অইয়াজী, একবার এদিকে আসবেন?' এদিক ওদিক দেখে নিয়ে শাড়ীর আঁচলে বাঁধা চিঠির মোড়কটা এমনভাবে ফেলে দেয় যাতে সেটা ওঁর কাছে গিয়ে পড়ে। মুখে বলে, 'ওটা পড়ে দেখলেই সব বুঝতে পারবেন। যা হোক করে ঐ চিঠিটা আমার ভাইয়ার কাছে পাঠিয়ে দিন আপনি। কেউ যেন টের না পায়।' এরপর সে খুব মন দিয়ে বাসন মাজতে শুরু করে, যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে।

মহাদেবায়াজী দলা পাকানো কাগজটা তুলে নিজের গেরুয়া জামার পকেটে রেখে বলেন, 'ঠিক আছে মা', তারপর ঝোলার ফুল পাতা ধুয়ে শুদ্ধ করে নিয়ে চলে যান। সেদিন আর গ্রামের পথে ওঁকে ভিক্ষা করতে দেখা গেল না, কেউ কেউ বলে শিবগেরের দিকে দু-একটা গ্রামে নাকি ভিক্ষায় গিয়েছিলেন।

পরদিন দুপুরে কল্লেশ হেঁটেই চলে এল বোনের বাড়ি। বাড়িতে বসে ভাইকে সব কিছু খুলে বলা মুশকিল। কিন্তু পরে নন্‌জুর মনে হল আড়ালে গিয়ে কথা বলার চেয়ে সামনা-সামনি কথা হওয়াই ভাল। সে সবাইকার সামনেই কথাটা পেড়ে, সব কিছু বলার পর, এখন কি করা উচিত সে বিষয়ে পরামর্শ চাইল ভাইয়ের কাছে।

গঙ্গম্মা ঠিক সন্দেহ করেছে, যে নিশ্চয় কোন রকমে খবর পাঠিয়ে নন্‌জু ভাইকে আনিয়েছে। কিন্তু কল্লেশ আবার এককালে পুলিশে কাজ করত, তাই গঙ্গম্মা উপস্থিত চুপ করে থাকাই ভাল

মনে করল। বন্ধকী দলিলে কি লেখা হয়েছিল তা কল্লেশ জানে না। তাই পাটোয়ারী ভগ্নী-পতিকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, 'সে সব আমি জানি না। যা লেখবার শিবলিঙ্গে লিখেছিল।'

'কিছু না জেনেই আপনারা মামলা লড়তে চলে গেলেন কি করে?' এ প্রশ্নের উত্তরে জবাব হল, 'রেবন্নাশেট্টী আর উকিল সব জানে। তারা মিথ্যে বলবে কেন? কেস্ আমরা জিতবই।'

নন্‌জম্মা ধীরভাবে রেবন্নাশেট্টীর ইতিবৃত্ত সব জানিয়ে বলল, 'ওর ওপর বিশ্বাস করলে সপরিবারে ডুবতে হবে। এখন যা বুঝছি, নিজেদের কি করা উচিত ভেবে ঠিক করতে হবে, পরের পরামর্শে চললে চলবে না।'

কল্লেশ বলল, 'জামাই, চলুন তো আমার সঙ্গে, শিবেগৌড়ের বাড়িতে গিয়ে জানতে হবে দলিলে কি কি লেখা আছে।'

কিন্তু পাটোয়ারীমশায়ের সেখানে যেতে বেজায় ভয় করছে। সে যদি বলে বসে, 'এখানে এসেছ কেন? যা করতে হয় কোর্টে গিয়ে কর না, যাও'—তাহলে? কাজেই চেন্নিগরায় বলে, 'সে হারামজাদার বাড়ি কেন যাব শুনি? কেস্ আমরা জিতবই। আমি কি এটুকুও বুঝি না নাকি?'

কল্লেশ একাই গেল শিবেগৌড়ের বাড়ি। যা প্রত্যাশিত ছিল সেই জবাবই পেল শিবেগৌড়ের কাছে। নন্‌জম্মা ভাইকে বলল, তিম্‌লাপুরে গিয়ে দাবরসায়াজীর কাছে খোঁজ নিতে। সেই গ্রামের পথ-ঘাটের হদিশ নিয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ল কল্লেশ। সে চলে যাবার মিনিট দশেক পরে গঙ্গম্মা বউকে প্রশ্ন করল, 'কার হাত দিয়ে খবর পাঠিয়ে ও হতভাগাকে ডাকা হয়েছিল শুনি? আজ রাতে না হয় তার কাছেই শুতে যা!'

কথাটা শুনে নন্‌জম্মার অসহ্য রাগ হল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে অদ্ভুত একটা সাহস এসে গেল মনে। সে বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে আপনি বোধহয় ঐ রকমটাই করতেন। তাই আপনার মুখ দিয়ে এইসব কথা বেরোয়। মুখ সামলে কথা বলবেন। ছোটবেলায় ভাল শিক্ষা-দীক্ষা পেলে আপনিও এমন হতেন না, আপনার ছেলেরাও এইরকম হত না।'

'শুনলি চেন্নৈয়া শুনলি? ওঠ, উঠে ঐ হারামজাদীর কোমরে আচ্ছা করে কষে এক লাথি মার।'

'আমার পেছনে লাগবেন না শুধু শুধু। ভাইয়া সন্ধ্যাবেলাই ফিরে আসবে এখানে।'

স্ত্রীকে লাথি মারার ইচ্ছার অভাব বা আলস্য যে কারণেই হোক, দেখা গেল চেন্নিগরায় উঠল না। গঙ্গম্মা ছোট ছেলেকে আর ও আদেশ করল না। করলেও দ্বিতীয়বার ঐ কাজ করতে তার আর সাহস হত কিনা সন্দেহ।

কল্লেশ পরদিন আসতে পারল না। এল দু'দিন পরে, সঙ্গে দাবরসায়াজীও এলেন। গত পরশু রাত্রে সে দাবরসায়াজীর বাড়িতেই ছিল। তাঁকে নিয়ে তিপটুরে গিয়ে শিবেগৌড়ের উকিলের সঙ্গে দেখা করেছে। তিনি বলেছেন, এদের সমস্ত জমিই বন্ধক আছে। যদি সুদে-আসলে সমস্ত টাকা ও কোর্ট খরচ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তিনি বিরোধী পক্ষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আপস করিয়ে মামলা তুলে নেওয়াতে চেষ্টা করবেন।

গঙ্গম্মা, চেন্নিগরায় ও অপ্পন্নায়াকে একত্র বসিয়ে কল্লেশ বোঝাল, 'মূলধন বা আসল কেউ ছেড়ে দেবে না। কোর্টে যা খরচ হয়েছে তাও কেউ ছাড়বে না। সুদটা কিছুটা কমাবার জন্য

অনুরোধ করা যেতে পারে। যদি হাজার পাঁচেকে রাজি হয় তো একটা বড় খেত বিক্রী করে, বা ঐ পক্ষকেই খরিদ্দার হিসাবে লিখিয়ে নিয়ে অন্ততঃ বাকি জমিটা রক্ষা করা যেতে পারে। চলুন, ওদের বাড়ি যাওয়া যাক।'

পরামর্শটা গঙ্গম্মার পছন্দ হল না। কিন্তু কল্লেশও ছাড়বার পাত্র নয়। দাবরসায়াজীও অনেক বোঝালেন চেন্নিগরায়কে। অবশেষে মা, দুই ছেলে এবং কল্লেশ ও দাবরসায়াজী পাঁচজনে মিলে শিবেগৌড়ের বাড়ি রওনা হল। কিন্তু বিনা আমন্ত্রণে প্রতিপক্ষ এভাবে বাড়িতে আসায় শিবেগৌড়ের প্রতি কথায় দম্ভ যেন ফুটে বেরোতে লাগল। কল্লেশ আর দাবরসায়াজী যথেষ্ট ধৈর্যসহকারে তার কথাগুলো হজম করে নিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আপসের চেষ্টা করছিলেন। এরই মধ্যে শিবেগৌড় একবার গঙ্গম্মার দিকে ফিরে প্রতিহিংসার আনন্দে বলে উঠল, 'কি দিদি, বড় যে 'পুঁচকে ছেলে' বলে গাল দিয়েছিলে? এক পয়সাও আমাকে দেবে না বলে জাঁক দেখাচ্ছিলে? সেই তো আমার দরজায় এসে দাঁড়াতে হল? লজ্জা করছে না এখন?'

দাবরসায়াজী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'বোন, তুমি ধৈর্য হারিও না যেন'। কিন্তু গঙ্গম্মা ততক্ষণে দপ্ করে আগুনের মত জ্বলে উঠেছে—'হ্যাঁরে, গৌড়, তুই আমাকে অপমান করিস? কোথাকার কে তুই, কিসের এত তেজ তোর শুনি? কুত্তা, ছেনালের ···'

'তা পারিস্ যদি জমি আমার হাত থেকে এখন ছিনিয়ে নে না দেখি কত ক্ষমতা!'

'ভালয় ভালয় না দিস তো কোর্ট-কাছারি করেই ছিনিয়ে নেব। ছেনালের বেটা, তুই আমাকে তুই তোকারি করিস, এত আস্পর্ধা! এই চেন্নৈয়া, অপ্পন্না, ওঠ্, চল বাড়ি চল। উঠছিস্ না কেন শুনি? তোরা কি তোদের বাপের ব্যাটা ন'স?'

অপ্পন্নায়া চট্‌পট্ উঠে এবার মায়ের পাশে এসে দাঁড়ায়। চেন্নয়াকে ডেকে মা বলে ওঠে, 'তুই এখানেই বসে থাকবি নাকি? তোকে কি তোর বাপে জন্ম দেয়নি হতভাগা, জাত খোয়ানো রাঁড়ের পুত? ওঠ্, উঠে দাঁড়া বলছি এখুনি।'

পাটোয়ারী চেন্নিগরায়ও এবার উদ্ধতভাবে উঠে দাঁড়াল। শালা কল্লেশ, দাবরসায়াজী, প্রতি-পক্ষ শিবেগৌড়, তার ঘর ভরা লোকজন ইত্যাদির সামনে দেখাতে হবে তো যে সেও সত্যি সত্যিই 'বাপকা বেটা।' কাজেই সেও মা এবং ছোট ভাইয়ের সঙ্গে হাঁটা দিল বাড়ির পথে। কল্লেশ আর দাবরসায়াজী কিন্তু গেলেন না, ওঁরা আলোচনাটা চালাতে চাইছিলেন কিন্তু শিবেগৌড় ওঁদের সে সুযোগ আর দিল না, বলল, 'ঐ মেয়েমানুষটার যদি এতই তেজ, তো আমার ভারি বয়ে গেল। এই অকৃতজ্ঞ হারাম-খোরদের আমিও দোরে দোরে ভিক্ষে করিয়ে ছাড়ব, আমিও তেমনি বাপের ব্যাটা, হ্যাঁ! আদালতে যদি আমার জিত না হয় তখন আমায় 'শালা বাঞ্চোৎ' বলে গাল দেয় যেন, জুতো পেটা করে যেন! বড় আদালত পর্যন্ত যাক মামলা, একেবারে খোদ মহারাজের দরবার পর্যন্তই যাক না দেখি, মামলায় জয় আমার হবেই।' গলার মাদুলীটা ডান হাতে টেনে ধরে দিব্যি করে সে, 'ঐ বেটা চশমখোর রেবন্নার ভরসায় ওঁরা আমার পেছনে লাগতে গেছেন! আমাদের বংশের তেজ দেখিয়ে দেব এবার।'

এরপর মিটমাটের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত এটা বুঝে কল্লেশ এবং দাবরসায়াজী ফিরে এলেন। বারান্দায় বসে বসে গঙ্গম্মা তখনও নিজের মহিমা কীর্তন করে চলেছে। পাটোয়ারী বসে বসে পান, দোক্তা চিবোচ্ছে আর মাতৃভক্ত অপ্পন্নায়া আস্ফালন করে বলছে কি করে শিবেগৌড়ের

স্ত্রীর মাথা মুড়িয়ে দেওয়া হবে। কল্লেশ দারুণ চটেছে। বারান্দা থেকে নামতে নামতে সে বলে ওঠে, 'সব মুখ্যুর দল, কারো ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই। আমরা এসে একটা উদ্ধারের উপায় করছিলাম, তাতেও বাগড়া দেওয়া হল। দেখ বুড়ি, তুই না মরলে এদের আর নিস্তার নেই। আমার বাপেরও কর্মভোগ, তাই এই বাড়িতে মেয়ে দিয়েছিল!'

গঙ্গম্মা এমনিতেই খেপে ছিল। তার ওপর এই ধরনের কথা শুনে তাও আবার কুটুমের ছেলের মুখে, যে কখনও ভুলেও একটা প্রণাম পর্যন্ত করে না, সে একেবারে জ্বলে উঠল—'ওরে হাভাতে, রাঁড়ের পুত, আমাকে এতবড় কথা বলা? কে ডেকেছে তোকে এখানে? যে চুপিচুপি ডেকেছে, যা তার সঙ্গেই শো গিয়ে, সেইজন্যই তো এসেছিস তুই। এই অপ্পন্না, এটাকে ধরে দুই লাথি মার মুখে।'

কিন্তু অত সাহস অপ্পন্নায়ার মোটেই নেই। কল্লেশ আবার বলে, 'ইতর কোথাকার! যে মুখে ঐসব খারাপ কথা বেরোচ্ছে সেই মুখ বোবা হয়ে যাবে। শিবেগৌড়ের কাছ থেকে পাটোয়ারী-গিরি ছিনিয়ে নেবার তো ক্ষমতা ছিল না, তখন তো খুব খোসামোদ করা হয়েছিল, কোথায় ছিল তখন এত পৌরুষ?'

ভেতরে এসে বোনকে বলে কল্লেশ, 'হ্যাঁরে নন্‌জু, এই হতচ্ছাড়াদের সংসারে তুই থাকিস কি করে? ছেলেমেয়েদের নিয়ে চল আমার সঙ্গে। ঈশ্বর যা দিয়েছেন আমাদের তাই ভাগ করে খাবি।'

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে নন্‌জু। কল্লেশ আবার বলে, 'দাঁড়িয়ে আছিস যে? চল্ আমার সঙ্গে।'

'ভাইয়া, রাগের মাথায় কিছু করে বসা উচিত নয়, এস, শান্ত হয়ে বস একটু।'

'এই রাক্ষুসীর বাড়িতে এক ঘটি জলও ছোঁব না আমি। খুঁটির গায়ে ঝোলানো থলিটা পেড়ে নিয়ে, চটিটা পায়ে গলিয়ে রওনা হয়ে পড়ে কল্লেশ। বোন ডাক দিয়ে বলে, 'ভাইয়া, এ কি করছ তুমি?' কিন্তু সে আর দাঁড়ায় না। শিবেগৌড়ের বাড়ির ঘটনা নন্‌জম্মাকে শোনাতে গেলে এখন বারান্দায় যারা বসে আছে তারা আবার খেপে উঠবে এটা আন্দাজ করে দাবরসায়াজীও চুপচাপ নিজের গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।'

৫

নন্‌জম্মা যেন মূর্তিমতী ধৈর্যের-প্রতিমা। আবার একটা আশার আলো দেখতে পায় সে। সাতুর বাবাকে যদি একটা খবর পাঠানো যায় তিনি হয়ত এদের বোঝাতে পারবেন। কল্লেশ তো মায়ের পেটের ভাই, তাকে চট্ করে চিঠি লিখে ফেলেছিল, কিন্তু এঁকে লেখা যায় কি করে? তা, ইনিও তো তার পিতৃতুল্য, এই ভেবে একদিন দুপুরে সবাই ঘুমোচ্ছে দেখে সে বসল কাগজ-কলম নিয়ে। পার্বতী বাইরে খেলা করছে। ঠিকানা জানাই ছিল, কড়ুর জেলা, কসবা তালুক, গ্রাম নুগ্গীকেরে, শ্যামভট্ট। কম্বনকেরে থেকে পোষ্টম্যান বাসপ্পাজী সপ্তাহে একবার এ গ্রামে আসে এবং তার আগমনের প্রমাণস্বরূপ পাটোয়ারী চেন্নিগরায়কে দিয়ে কাগজে সই করিয়ে নিয়ে যায়। নন্‌জম্মার সঙ্গে তাই পরিচয় আছে তার।

এবার বাসপ্পা যখন এল তখন বাচ্চারা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল না। নন্‌জম্মা তাকে ডেকে বলল, 'বাসপ্পাজী আমার একটা লেফাফা চাই, পয়সা তো নেই, দু'টুকরো নারকেল দেব, তাতে হবে?'

'যখনই আসি, তোমার এখানে খেয়ে যাই বোন। তোমাকে একটা লেফাফা দিয়ে তার বদলে আবার নারকেল নেব? আমি কি এমনই মুখ্যু? এই নাও।'

'এ কথা কাউকে বলবেন না যেন। এ বাড়ির মামলা চলছে তা তো জানেন, সেইজন্যই আমার দেওরের শ্বশুর মশাইকে আসতে লিখেছি' ব্যাপারটা বুঝিয়ে চিঠিটা বাসপ্পার হাতে দিয়ে দেয় নন্‌জু। চিঠি ডাকে ফেলে দেবে এই আশ্বাস দিয়ে নিজের খাকি কোটের পকেটে ভরে নেয় বাসপ্পা। পাটোয়ারীজী এখন নিশ্চয় গ্রামের বাইরে বীরাচারীর ধুনির পাশে আর নয়ত মহাদেবায়াজীর মন্দিরে বসে দোক্তা চিবোচ্ছে। সেইখানেই তার সইটা নিয়ে নেবে এই বলে বিদায় নেয় বাসপ্পা।

সে চলে যাবার পর মনে হয় নন্‌জুর—কাজটা বোধহয় ঠিক হল না। অপ্পন্নায়া গ্রামে ফিরে এসেই মাকে জানিয়েছিল, শ্বশুর বলেছেন, 'স্ত্রী-কন্যাকে যদি নিয়ে যেতে চাও তো মাকে আলাদা করে দিতে হবে।' শুনে গঙ্গম্মা বেশ কিছু দিন ধরে গজরে ছিল, 'কড়ুরের ঘর ভাঙানে পুরুত ব্যাটা আমার সংসার ভাঙবার চেষ্টায় আছে।' তারপর তো তিপটুর যেতে হল এবং অন্য ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হল, কাজেই বেয়াইয়ের কথাটা আর খেয়াল ছিল না। কিন্তু রাগটা তো মনে মনে আছেই, এই সময় তিনি এখানে এলে, ইনি কখনই মুখ বুজে থাকবেন না। এইসব কারণে নন্‌জম্মার মনে হতে লাগল, সে ভদ্রলোককে খবর পাঠিয়ে হয়ত আবার একটা কলহের কারণ সৃষ্টি করে বসল। কিন্তু তা হলেও, ও তো অন্যায় কিছু করেনি, এই ভেবেই নিজের মনকে বোঝাল নন্‌জু।

বাসপ্পাজীর হাতে চিঠি পাঠাবার প্রায় বারো দিন পরে একদিন বিকেল চারটের সময় শ্যামভট্ট একাই এসে পৌঁছলেন। গঙ্গম্মা তখন পুকুর পাড়ে গিয়েছিল শাক তুলতে। গরুর পেছনে বাছুরটির মত অপ্পন্নায়াও গিয়েছিল মায়ের পিছু পিছু। চেন্নিগরায় বাড়িতেই ছিল। অতিথিকে হাত-পা ধোবার জল দিল নন্‌জম্মা। তারপর তাঁকে খেতে বসিয়ে মামলা-সংক্রান্ত সমস্ত কথা খুলে বলল। কল্লেশের আসার কথাও বাদ দিল না। স্ত্রী সব কথা বলে দিচ্ছে দেখে পাটোয়ারী মশায়ের রাগ হচ্ছিল খুবই, কিন্তু কুটুম্বের সামনে তাকে গালমন্দ করতেও সাহস হচ্ছিল না, সঙ্কোচও বোধ করছিল একটু। উঠোনে বসে বসে তামাকপাতা চিবোতে চিবোতে পিকটা বাইরে না ফেলে মুখের মধ্যেই রাখার চেষ্টা করছিল সে।

আহারাদি সেরে শ্যামভট্ট তখন হাতের মধ্যে নস্যি ডলছেন, গঙ্গম্মা ঝুড়ি ভরা শাক নিয়ে বাড়িতে এসে ঢুকল। গরুর দড়ি ধরে তার পেছন পেছন এল অপ্পন্নায়া। বেয়াইকে দেখেই মেজাজ চড়ে গেল গঙ্গম্মার—'আমার ছেলেকে ভিন্ন হবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে! ঘর ভাঙানে, রাঁড়ের পুত, বেহায়া আবার এখানে এসে হাজির হয়েছে! দেখাচ্ছি মজা', বলতে বলতে রান্নাঘরে শাকের টুকরীটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বেয়াইয়ের সামনে এসে ফেটে পড়ল সে,—'বলি, হ্যাঁরে পুজুরী বামুন, আমার ছেলেকে ভিন্ন করাতে এসেছিস বুঝি?'

বেয়ান ঠাকরুণের জিভের কোন লাগাম নেই এটা জানা ছিল শ্যামভট্টর, কিন্তু তাঁর সঙ্গেও

এইভাবে আলাপ শুরু করবেন বেয়ান এটা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। মিনিট দুই তিনি একেবারে অবাক হয়ে গঙ্গম্মার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'একটু ভেবেচিন্তে কথা বলুন। আপনার ছেলে আপনার সঙ্গেই থাক, আমার তাতে কিছুই বলবার নেই। কিন্তু কোর্ট-কাছারি করে আপনারা পৈতৃক সম্পত্তি খোয়াতে বসেছেন, সেটা যাতে রক্ষা পায় সেইজন্যই বিশেষ করে আমি এসেছি। এখন খুব বিবেচনা করে কাজ করতে হবে ...'

কথাটা শেষ হবার আগেই গঙ্গম্মা, এঁর আগমনের পেছনে কার হাত আছে সেটা মুহূর্তে বুঝে ফেলে খেপে আগুন হয়ে উঠল। রান্নাঘরের দরজার দিকে মুখ করে বধূর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠল, 'ওরে বাজারী মেয়েমানুষ, কদিন আগে তো নিজের ভাইটাকে ডেকে পাশে শুইয়েছিলি, এবার এই পুরুত বামুনটাকে আনিয়েছিস? আজ এর সঙ্গেই মাতন চলবে না কি? লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিস দেখছি!'

বারান্দার কোণে এসে পচ্ করে পানের পিক্ ফেলেই ছেলের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে রাঁড়ের পুত, তুই কি বাপের ব্যাটা ন'স? তোর বৌ একে চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছে। তুই আজ বারান্দায় শুয়ে থাকিস, ঘরে খাটের ওপর একে শুতে দিস্ ওর সঙ্গে।'

শ্যামভট্ট এইসব শুনতে শুনতে দুই কানে হাত চেপে রাম নাম জপতে জপতে বেয়ানের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু গঙ্গম্মা আর দাঁড়াল না, অপ্পন্নায়াকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে গেল রেবন্নাশেট্টীর বাড়িতে।

শ্যামভট্ট এতক্ষণে কান থেকে হাত সরিয়ে চেন্নিগরায়কে বললেন, 'আপনি বাড়ির কর্তা, তাই আপনাকেই বলছি। এতখানি বয়স হয়েছে এখনও যদি ইনি এইভাবে যা তা কথা বলেন তাহলে সংসার টিকবে কি করে? সাতুর কাছেই শুনেছি আপনার স্ত্রী নন্জম্মা গুণবতী, বুদ্ধিমতী। মেয়ের বয়সী, তার ওপর বাড়ির বড়-বৌ, তাকেই আমার সামনে এইভাবে বললেন, আমার ছেলে-মানুষ মেয়েটাকে আরো কত কি শুনতে হয় তা তো আন্দাজেই বুঝতে পারছি। জাবগল্লের এক আত্মীয়ের কথায় আমি এ বাড়িতে মেয়ে দিয়েছিলাম। এখন তো কোন মতে সবাইকে মানিয়ে চলতেই হবে, আমার কথাটা বুঝছেন তো?'

'আর দুটো পান দিয়ে যা দেখি' বৌকে হুকুম করেন পাটোয়ারী মশাই। নন্জম্মা পান এনে দিলে চুন লাগিয়ে মুখে পুরে দোক্তাসহ চিবোতে চিবোতে বলেন 'হুঁ'।

'আপনাদের পৃথগন্ন করতে আমি চাই না। কিন্তু বাড়ির পুরুষদের অন্ততঃ বুঝে-সুঝে চলা উচিত। মহাজনের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলুন। নন্জম্মা যেমন বলছে সেইভাবে দু'একখানা খেত বিক্রী করে ঋণমুক্ত হোন, এবং বন্ধকী-দলিলে সাক্ষী ডেকে সে কথা লিখিয়ে নিন। যা অবশিষ্ট থাকবে তাই দিয়েই কোন মতে সংসার চালাতে হবে।'

পাটোয়ারী মশায়ের মুখে পান দোক্তাটা বেশ মজে এসেছে। এদিকে শ্যামভট্ট উত্তরের প্রতীক্ষা করছেন, তাই তিনি আবার বলেন, 'ঠিক কথা বলছি কি না বলুন?' চেন্নিগরায় এবার উর্ধ্বমুখ হয়ে কোন মতে উত্তর দেবার জন্য মুখ খোলে কিন্তু মুখ ভর্তি পানের রসের জন্য কথা বেরোয় না। তার পিক্ ফেলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে শ্যামভট্ট আবার বলেন, 'এবার কিছু একটা বলবেন তো?'

কিন্তু কোন কথা বলতে চেন্নিগরায়ের ভয় করছে। শেষে বহু কষ্টে একটা সিদ্ধান্ত করে

বলে ফেলে, 'আমি কিছু জানি না, আপনি আছেন আর আমার মা আছেন', এইটুকু বলেই সে বাইরে পালায়।

শ্যামভট্ট এবার নন্‌জম্মাকে ডেকে বলেন, 'কথা শুনলে তো মা?'

নন্‌জম্মা বাইরে এসে বলে, 'এঁর স্বভাব তো আপনি জানেন না। আপনার জামাইকেই না হয় বলুন। সে যদি জিদ ধরে বলে নিজের নিজের অংশ আলাদা করে নেওয়া হোক, তাহলে দু'জনেই অর্ধেক করে ঋণ চুকিয়ে দিতে পারবে, এইভাবে হয়ত একটা উপায় হতে পারে।'

'সে যোগ্যতা ওর আছে কি? তুমি তো চেন ওকে। কোর্টের ব্যাপার আমার জানা ছিল না কিন্তু এর আগেই আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার একমাত্র মেয়ে, ভগবান যা দিয়েছেন তাই খেয়ে-পরে থাকবে। কিন্তু এই শাশুড়ীর কাছে মেয়েটাকে পাঠাব কোন প্রাণে? সেইজন্যই তো প্রসবের পর এতদিন রেখে দিয়েছি।'

কি বলবে ভেবে পেল না নন্‌জম্মা, সে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় বাড়িতে ঢুকল গঙ্গম্মা, বৌকে দেখেই খিঁচিয়ে উঠল, 'বেজম্মাটার সঙ্গে মজা লোটা হচ্ছে, ওদিকে তোর স্বামী গিয়ে বসে আছে মন্দিরে।'

নন্‌জম্মার রাগের মাথায় সাহস এসে গেল মনে, সেও বলে উঠল, 'আপনি ঐ রকমই করেন বোধহয়, তাই ভদ্র ঘরের মেয়েদের কুকথা বলতে মুখে আটকায় না। মুখে পোকা পড়বে শেষে, এখন একটু চুপ করে থাকুন দেখি।'

'লক্ষ্মীছাড়ি ছেনাল, আমাকে কথা শোনাচ্ছিস তুই? দাঁড়া, ছেলেদের বলে তোর গলা থেকে আমি মঙ্গলসূত্র খুলে নেব, তবেই আমি জাবগল্লর মেয়ে!' গঙ্গম্মা ছুটতে ছুটতে মন্দিরে গিয়ে হাজির, ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল সে, 'যদি সত্যি বাপের ব্যাটা হোস তো চল্, বৌয়ের দাঁতের পাটি ভেঙে গুড়ো করে দিয়ে মঙ্গলসূত্রটা কেড়ে নে। কুলটা মাগী বলে কিনা আমার মুখে পোকা পড়বে!'

মহাদেবায়াজী একতারা বাজিয়ে গাইছিলেন, 'সাপে কাটার আগেই জেগে ওঠ ভাই ···'। কথাগুলো কানে যেতেই গান থামিয়ে ফেললেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বার গর্জন হল, 'সত্যি করে বল তোর বাপ তোকে জম্ম দিয়েছে কি না? যদি সত্যি হয় তো উঠে গিয়ে মঙ্গলসূত্রটা কেড়ে নে।' নিজের জন্মের পবিত্রতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্যই বোধহয় চেন্নিগরায় মিনিট দুই ভাবল, তারপর সাহস করে দাঁড়িয়ে উঠল। মহাদেবায়াজী পাশেই ছিলেন, হাত ধরে টেনে তাকে ফের বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'পাটোয়ারীজী, এতদিন ধরে ভজন শুনেও বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই হল না?'

কিছু না বুঝেই চেন্নিগরায় বলে ফেলল, 'যাক গে থাক, ভজন শুরু করুন, শুনি।' মহাদেবায়াজী একতারাটা তুলে নিয়ে ঐ গানটা আবার শুরু করতেই গঙ্গম্মা তেড়ে উঠল, 'ওরে রাঁড়ের পুত, ভিখিরির কথা শুনে চলিস তুই? ছেনাল বৌয়ের ভেড়া-পুরুষ, নিজের বাপের ইজ্জতটাও রাখতে পারিস নে তুই?' বলতে বলতে সে চলে গেল রেবন্নাশেট্টীর বাড়ির দিকে।

এদিকে শ্যামভট্টজী নন্‌জম্মাকে বললেন, 'আমার এখানে আসায় কোন লাভ হল না মা। আমি এখন যাই। আঠারোটা গ্রামে পৌরোহিত্য করি আমি। মেয়ে আর নাতনীকেও দেখাশোনা করতে হবে।' পুঁটলি আর ছাতাটা তুলে নিলেন হাতে। কিছু ভেবে না পেয়ে নন্‌জু বলে উঠল,

'ঠিক আছে, যা হবার হবে। তা সাতুকে পাঠিয়ে দেবেন তো?' উত্তরে শ্যামভট্ট বললেন, 'কি করে পাঠাব? সবই তো জান তুমি।'

আর কিছু না বলে নন্‌জু প্রণাম করল। 'দীর্ঘ সুমঙ্গলী ভব, সকল সন্মঙ্গলানি ভবন্তু' আশীর্বাদ করে রওনা হয়ে গেলেন শ্যামভট্ট। দরজার কাছ থেকে নন্‌জম্মা বলল, 'তিপটুরের কাছে তিম্‌লা-পুর গ্রামে পাটোয়ারী দাবরসায়াজী থাকেন, রাতটা তাঁর বাড়িতে কাটিয়ে সকালে বাড়ি যাবেন। অন্ধকার হবার পর তিপটুর যাবেন না, পথে বুক্কার টিলায় চোর-ডাকাত থাকে। তারা দু-দুটো গাড়ি একসঙ্গে থাকলেও হামলা করতে ছাড়ে না। মেরে ধরে সব কিছু ছিনিয়ে নেয়।'

সপ্তম অধ্যায়

ছেলে রামন্না দেড় বছরেরটি হয়েছে, এইসময় নন্‌জম্মা আবার গর্ভবতী হয়ে পড়ল। এতদিনে সে মনে মনে বেশ বুঝেছে যে, এই সর্বনাশা মামলায় সমস্ত জমি-জেরাত খোয়াতে হবে। 'নিজেদেরই দুঃখের শেষ নেই, এরমধ্যে আবার বাচ্চা কেন ?' এই চিন্তায় বেচারীর মনটা হতাশায় ভরে ওঠে। কিন্তু আবার মনে হয়, ভাইয়ার বিয়ে হয়েছে এত বছর হয়ে গেল, তার তো একটিও সন্তান হল না এখনও, কাজেই এ সবই ভাগ্যের লিখন। ঈশ্বরের দান, এতে আপত্তি করলে চলবে কেন ? এই-সব ভেবে মনকে সান্ত্বনা দেয় সে।

এই সময় দুটো ঘটনা ঘটে গেল গ্রামে। প্রথমে এল প্লেগের মড়ক, এটা অবশ্য এ অঞ্চলে কিছু নতুন ব্যাপার নয়। প্রতি দু-তিন বছর অন্তর গ্রাম ছেড়ে বাইরে কুঁড়ে তৈরী করে থাকা এদের অভ্যাস আছে। কিন্তু দ্বিতীয় ঘটনাটার একটু বিশেষত্ব আছে। সেটা হচ্ছে, কাশিমবদ্দি নামে একটি লোক এসে গ্রামে মহাজনী ব্যবসা শুরু করল, সে সোনা, রূপো, তামা, পিতল ইত্যাদির জিনিস বাঁধা রেখে টাকা ধার দিয়ে, প্রতি টাকায় প্রতিদিন এক পয়সা করে সুদ নেওয়া আরম্ভ করল। এই ধরনের মহাজনরা মালাবার প্রদেশের মানিল্লা মুসলমান। এরা যাযাবর বেদেদের ঘাঘরার মত পাড়ওয়ালা লুঙ্গী ও মাথায় ঝালরওয়ালা টুপী পরে। এই লোকটির বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ বছর। শিবেগৌড় এর জন্য সবাইকার কাছে সুপারিশ করে বলল, 'এক পয়সা সুদ এমন কিছু বেশী নয়, দরকারের সময় টাকাটা পাওয়া যায়, সেটাও তো দেখতে হবে।' শিবেগৌড়ই এই বিদেশীকে থাকার আস্তানাও দিল। এ গ্রামে তার তিনখানা বাড়ি। তার মধ্যে রাস্তার ধারের বাড়িটায় মস্ত বড় এক লোহার সিন্দুক বসিয়ে মহাজন শুরু করে দিল তার কাজ-কারবার। শোনা গেল সে নাকি মাসে পঞ্চাশ টাকা বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে। শিবেগৌড় সবাইকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল, এই মহাজনী কারবারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

কাশিমবদ্দি মহাজন গ্রামে এসে বসার দু-এক মাসের মধ্যেই দেখা গেল প্রায় গ্রামসুদ্ধ লোক তার কাছে টাকা ধার করেছে। লোকে বলে, দরকার পড়লে শিবেগৌড়ও ওর কাছ থেকেই ধার নিয়ে থাকে। লোকটা কথার খেলাফ করে না, মিথ্যা বলে না, ঠকাবার চেষ্টা করে না। সুদের হিসাব রাখতেও কোন অসুবিধা নেই—প্রতিদিন প্রতি টাকায় এক পয়সা! এইভাবে সারা গ্রামের লোকের কাছে মহাজন এক অপরিহার্য ব্যক্তি হয়ে পড়ল। প্লেগের প্রকোপের সময় কাশিমবদ্দিও বাড়ি ছেড়ে শিবেগৌড়ের বাগানে গিয়ে কুঁড়েতে বাস করতে লাগল। লোহার সিন্দুক-টাও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকেই কারবার চালাবে বলে।

গঙ্গম্মাদের পরিবারও অন্যান্য বারের মতই গ্রামের বাইরে নিজেদের বাগানে কুঁড়ে বেঁধে ফেলল। নন্‌জম্মার এখন তিন মাস চলছে, খুব বমি হচ্ছে তার। তা সত্ত্বেও বাড়ির সমস্ত

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করে নিয়ে যাবার কাজটা তাকেই করতে হল। মহাদেবায়াজীকেও যেতে হল গ্রামের মন্দির ছেড়ে। জলাশয়ের ঢালু পাড়ের ওপর পাথরের তৈরী পুরোন মন্দিরে স্থাপিত ছিল চোলেশ্বর শিবের মূল লিঙ্গ। লোকে বলে এ মন্দির গড়েছিলেন জকণাচারী*। এ মন্দিরে নাকি অনেক সাপ আছে একথাও শোনা যায়। 'সাপ আবার কি? সাপ তো মহাদেবের গলার হার, সাপ আমার কি করবে?' এই কথা বলে মহাদেবায়াজী তাঁর ভিক্ষার ঝুলি, তানপুরা, একতারা, পাদুকা, সামান্য ধানের সঞ্চয় ইত্যাদি নিয়ে সেই পুরোন মন্দিরেই গিয়ে আশ্রয় নিলেন। গঙ্গম্মাদের কুঁড়ে এ মন্দির থেকে বেশ কিছুটা দূরে, তাই চেন্নিগরায় ঘন ঘন এখানে আসতে পারে না। কাশিমবদ্দি মহাজনও তামাকপাতা চিবোয় তাই চেন্নিগরায় তার কুঁড়েতেই গিয়ে হাজির হয়। মাঝে মাঝে শিবেগৌড়ের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেত সেখানে। বাক্যালাপ তো বন্ধ ছিল না, হাজার হোক, একজন হল গ্রামের প্যাটেল অন্যজন পাটোয়ারী। তাছাড়া আসল লড়াইটা তো গঙ্গম্মা আর শিবেগৌড়ের মধ্যে। কিন্তু গঙ্গম্মা এদের সাক্ষাতের খবর পেলেই ছেলেকে বেধড়ক গালাগাল দিতে ছাড়ত না।

লোকে গ্রাম ছাড়ার আগে এ বছরের প্লেগে খুব বেশী প্রাণহানি হয়নি, মোটে দুটি শিশু আর ছ'জন বয়স্ক লোক প্লেগের কবলে প্রাণ হারিয়েছে। গ্রামবাসীরা তাড়াতাড়ি মারীমাতার পুজো দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে। রোগ আর মৃত্যু ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে বটে কিন্তু এভাবে গ্রামের বাইরে পড়ে থাকায় অসুবিধাও যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এভাবে বাইরে কুঁড়ে বেঁধে থাকতে কেউ আপত্তি করে না।

শোনা যাচ্ছে গঙ্গম্মা আর শিবেগৌড়ের মামলা নাকি সমাপ্তির পথে। দুই তরফের উকিলই নিজের নিজের বক্তব্য শেষ করেছেন। 'আমার উকিলের বক্তৃতা শুনে জজ সাহেব পর্যন্ত মাথা নেড়েছেন'—রেবন্নাশেট্টীর এই মন্তব্য গ্রামের কারো শুনতে বাকি নেই। প্রতিবাদ জানিয়ে শিবেগৌড় বলেছে, 'আমার উকিলের যুক্তি শুনে গঙ্গম্মার উকিলের একেবারে মুখ চুন হয়ে গেছে।' দুই পক্ষই মহা-উৎসাহে তিপটুর যাতায়াত করছে। অপ্পন্নায়া তো সবার আগে গাড়ি থেকে নেমেই হোটেলের দিকে ছোটে। চেন্নিগরায়ও ছোট ভাইয়ের থেকে খুব বেশী পিছিয়ে থাকে না। শিবেগৌড় সঙ্গে নিয়ে যায় মড়ুয়ার রুটি আর তিলের শুকনো চাটনী, তাই খেয়ে কাজ শেষ হলেই ফিরে আসে।

জজের রায় বেরোবার দিন দু' পক্ষই গরুর গাড়িতে তিপটুর গেল। নিজের বুকে হাত রেখে গঙ্গম্মা শুনল মামলার ফলাফল,—'শিবেগৌড়ের কাছে অপর পক্ষ টাকা নিয়েছিল। সেই টাকার সুদ, সেই সুদের সুদ আর কোর্টের খরচ, সব মিলিয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা আদালতে জমা দিতে হবে। না দিলে আদালত থেকে এদের জমি নিলাম করিয়ে মহাজনের ঋণ শোধ করা হবে।'

'তোর বৌয়ের হাতের চুড়ি ভাঙুক, ওরে রাঁড়ের পুত'—জজের উদ্দেশ্যে গালাগালটা গঙ্গম্মার জিভের আগায় উঠে এসেছিল কিন্তু কোর্টের দরজায় দাঁড়ানো পুলিশ দুটোর দিকে চেয়ে কোন মতে সে মুখ বুঝেই রইল।

---

* কর্ণাটকের অমর শিল্পী

কোর্টের বাইরে এসে মহান্তায়াজী উকিল বললেন, 'তুমকুরের আদালতে আপীল করা যায়, তবে তাতে খরচ আছে। পয়সা-কড়ি কিছু এনেছেন কি?'

'উকিল সাহেব, বাড়িতে সোনা, রূপো, বাসন-কোসন যা কিছু ছিল সব বাঁধা পড়েছে। আমি বিধবা মানুষ আর টাকা কোথায় পাব?' ইতিমধ্যে শিবেগৌড়ের উকিলও সেখানে এসে হাজির। দুই উকিলে কিছুক্ষণ ইংরিজীতে বার্তালাপ হবার পর গঙ্গম্মাকে তার উকিল বলেন, 'দেখ বোন, শিবেগৌড়ের কাছ থেকে তোমাদের আরো কিছু টাকা পাইয়ে দিচ্ছি, তাই দিয়ে ধারগুলো শোধ করে দাও। 'আমাদের কিছুই নেই' এই বলে সমস্ত জমি-জমা শিবেগৌড়ের নামে লিখে দাও। তোমাদের প্রতি যাতে অন্যায় না হয় তা পরে দেখা হবে।'

গঙ্গম্মা প্রশ্ন করে, 'সব জমি দিয়ে দিলে পেট চলবে কি করে উকিল সাহেব?' চেন্নিগরায় কোন কথা বলে না, তার মুখ পানের রসে ভরা।

'তা না হলে ওপরের কোর্টে যেতে হবে, তার জন্য এখন হাজার টাকা চাই। টাকা যদি যোগাড় করতে পার তো ভাল কথা।'

সুতরাং বোঝা গেল আর কোন উপায় নেই। শিবেগৌড়কে সেখানে ডেকে আনা হল। সে আরো দু'হাজার টাকা দিতে রাজি হল। তার ভয় ছিল যে, যদি কোর্ট থেকে নিলাম করানো হয় তাহলে গ্রামের অন্য লোকেও নিলামে ডাক দিতে পারে। গঙ্গম্মা একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। শিবেগৌড় তৎক্ষণাৎ স্থানীয় নারকেলের দোকান থেকে এনে দিল দু'হাজার টাকা। দুই উকিলে বসে তৈরী করে ফেলল কাগজপত্র। মহান্তায়াজী উকিল জানালেন তাঁর আরো একশ' টাকা পাওনা আছে। কারণ রেবন্নাশেট্টী নাকি তাঁকে শেষবারের 'ফি'টা দেয়নি।

গঙ্গম্মা শপথ করে বলল, 'আপনাকে দেবার জন্য আমি তো আট'শ টাকা দিয়েছি।'

উকিল জানালেন, 'আমি তো পেয়েছি মোটে দেড়শ' টাকা।'

রায় বেরোনর দিন রেবন্নাশেট্টী বলেছিল সে সকালের মোটর-বাসে চলে আসবে, এরা যেন গরুর গাড়িতে আসে। দেখা গেল সে আসেইনি। কাজেই উকিলকে দিতে হল আরো একশ' টাকা। দ্বিতীয় দিন দলিল রেজিস্ট্রী করিয়ে সবাই ফিরে এল গ্রামে। এক হাজার ন'শ টাকার পুঁটলি কোলের কাছে চেপে ধরে গঙ্গম্মা গাড়িতে বসেছিল, সারা পথ সে একবারও চোখ বোজেনি।

মামলার ফলাফলের কথা গঙ্গম্মা কাউকে না বললেও, শিবেগৌড় তো চুপ করে থাকার পাত্র নয়। কাজেই মামলার খরচের জন্য যারা যারা গঙ্গম্মাকে টাকা ধার দিয়েছিল সবাই ছুটে এল গঙ্গম্মার কুঁড়ে ঘরে। এদের ধার শোধ করতে খরচ হল আটশ' টাকা। বাকি টাকা গঙ্গম্মা এখন নিজের বিছানার নিচে রেখে শোয়। এর মধ্যে একদিন সে রেবন্নাশেট্টীর বাড়িতে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ রেবন্না, উকিল সাহেব যে বললেন তুমি নাকি ওঁকে সব টাকা দাওনি? উনি আমার কাছে আরো একশ' টাকা নিলেন।'

'কে বলেছে এ কথা?'

'উকিল সাহেব নিজেই বলেছেন।'

'ব্যাটা বেজম্মা কোথাকার! চলুন তো, আমার সামনে কেমন বলে দেখি, জুতো পেটা করব না ব্যাটাকে?' রেগে লাল হয়ে চোখ ঘোরাতে থাকে রেবন্নাশেট্টী। আর কিছু বলতে সাহস

হয় না গঙ্গম্মার। ভয়, হতাশা অথবা রেবন্নার সততার প্রতি বিশ্বাস, কিসের জন্য কে জানে, গঙ্গম্মা চুপ করে থাকে।

'আচ্ছা রেবন্না, উকিল সাহেব তো বলেছিলেন নিশ্চয় জিতিয়ে দেবেন। তবে হার হল কেন?'

'শুনছি নাকি ঐ হারামজাদারা জজকেও ঘুষ খাইয়েছিল, শিবেগৌড় আগের দিনই গিয়ে দু'হাজার টাকা দিয়ে এসেছিল। আমি আগেই খবর পেয়েছিলাম. আমার কাছে দু'হাজার টাকা থাকলে আমিও ঘুষ দিয়ে আসতাম। কিন্তু আমি তো জানি আপনাদের কাছে আর কিছু নেই, তাই রায় বেরোনর দিনটা আর যাইনি।'

গঙ্গম্মা আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরে আসে।

২

অনেকেই গঙ্গম্মার কুঁড়েতে এসে শিবেগৌড় আর জজ সাহেবকে গালমন্দ করে গঙ্গম্মার প্রতি সহানুভূতি জানাতে লাগল। অইয়াশাস্ত্রীজীও এলেন এক দিন। শিবেগৌড়ের উদ্দেশ্যে কিছু গালি দেবার পর তিনি বললেন, 'গঙ্গম্মা, আমার স্ত্রীর কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে, তুমি একবার আমাদের কুঁড়েতে চল।' গঙ্গম্মাকে নিয়ে গেলেন অইয়াশাস্ত্রী, সেখানে তাঁর স্ত্রীও শিবেগৌড়কে অভিসম্পাত দিতে শুরু করল। অইয়াশাস্ত্রী পাঁজি-পুঁথি দেখে ঘোষণা করলেন উক্ত জজ সাহেবের নাকি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সবাইকার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

'গঙ্গাবোন, তুমি রেশমের কাপড় পরে এখানেই খাওয়া-দাওয়া কর, কে কি বলবে তোমায়?' শাস্ত্রীজীর স্ত্রী সুব্বম্মার এই মন ভেজানো কথা শুনে গঙ্গম্মা এবার প্রাণ খুলে ছেলের বৌয়ের নিন্দা শুরু করল—'ঐ ছেনাল রাক্ষুসী যেদিন আমার বাড়িতে পা দিয়েছে সেদিন থেকেই যত কষ্টের শুরু। এখন জমি-জিরেত সমস্তই গেল। কথাতেই আছে, নবজাত শিশু আর বাড়ির নতুন বৌ যে ভাগ্য নিয়ে আসে তা কখনও মিথ্যে হয় না!'

গঙ্গম্মা স্নান করে রেশমের কাপড় পরে কপালে বিভূতি লাগিয়ে তিনবার আচমন করল। ততক্ষণে শাস্ত্রীজী অপ্পন্নায়াকেও ডেকে এনেছেন। শাস্ত্রীজীর জ্যাঠামশায়ের নাতি অন্নাজোইসও এসেছে। সুব্বম্মা এদের সবার জন্যই রান্না করেছিল—চালকুমড়োর কড়ি, মড়ুয়ার রুটি, ভাত আর মাঠা। সবাইকে খাবার পরিবেশন করার পর অইয়াশাস্ত্রী কথা শুরু করলেন, 'এ সময় রামন্নাজী বেঁচে থাকলে কি ভালই হত! আহা, তাঁর ব্যাপারই ছিল আলাদা। এদের জিজ্ঞাসা কর, এখনও তাঁর জন্য আমার মনটা কি রকম উতলা হয়ে পড়ে। তিনি চলে গিয়ে পর্যন্ত এ গ্রামের যেন সমস্ত গৌরবই শেষ হয়ে গেছে।'

'যা হতচ্ছাড়ি ছেনাল সব বৌ জুটেছে আমার কপালে—তাতে আর তিনি থাকবেন কি করে?'

এবার সুব্বম্মা প্রশ্ন করে, 'গঙ্গম্মা, তোমার মাসিক ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে আজ প্রায় দু-বছর হয়ে গেল, তাই না?'

'তিন বছর হয়ে গেছে।'

শাস্ত্রীজী বললেন, 'দেখছ তো, তোমারও কত বয়স হয়ে গেল। তুমি তো সব রকম দান-ধ্যান,

ব্রত-নিয়ম সবই করেছ, তা এই সময় স্ত্রীলোকদের ঋষিপঞ্চমীর ব্রত করতে হয়। এতে তোমার সর্ব প্রকার দুঃখমোচন হবে।'

অন্নাজোইসের শাস্ত্র জ্ঞান তার কাকার চেয়ে বেশী। সে সিন্ধঘট্টের সুরণাজোইসজীর শিষ্যগিরি করেছে, কাজেই শাস্ত্র থেকে মন্ত্র পাঠ করে সে ঋষিপঞ্চমী ব্রতের মহিমা বোঝাতে লাগল।

'যাহোক করে এ ব্রতটা তুমি করেই ফেল। না হয় এই কুঁড়ে ঘরেই হবে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। যা সাহায্য দরকার সব আমরা করে দেব। এখানেই একটা চালা তুলে দেওয়া যাবে এখন; ঐ অরণীতলার কুঁড়ের সামনে বড় দেখে একটা চালা বাঁধলেই হবে। তোমাদের কুঁড়ের সামনে নানা রকম উপদ্রব, ওখানে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচানো যাবে না' মন্তব্য করল সুব্বম্মা।

রুটি শেষ করে মাঠা আর কড়ি দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে গঙ্গম্মা, 'কি রে অপ্পন্না, ব্রতটা করব না কি?' চেন্নেনহল্লীর বেঙ্কটচলায়াজীর মায়ের ঋষিপঞ্চমী ব্রতে নিমন্ত্রণ খেয়েছিল অপ্পন্নায়া। কড়ি, পুরণপোলি, কাঁচা আম দিয়ে ভাত, এমন চমৎকার সব রান্না হয়েছিল সেখানে যে, ভাবলেই জিভে জল এসে যায়। সেই ভোজের কথা মনে পড়তেই অপ্পন্না তার সামনে রাখা মাঠা আর কড়ির জায়গায় সেই কাঁচা আম আর মশলা দেওয়া ভাত এবং পুরণপোলির স্তূপ যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পেল।

'করেই ফেল মা, বেঙ্কটাচলের চেয়ে আমরাই বা কম কিসে?'

সুতরাং স্থির হয়ে গেল ব্রত করা হবে। সুব্বম্মা বলে উঠল, 'গঙ্গম্মাকে তোমরা কি ভেবেছ কি? ওর যে কথা সেই কাজ। স্বয়ং ব্রহ্মদেবের বাপ এলেও ওকে ওর কথা থেকে টলাতে পারবে না।'

কাজেই গঙ্গম্মা অটল রইল। না থাকলে ওর নাম থাকে কি করে? খাওয়া-দাওয়ার পর অন্নাজোইস পাঁজি দেখে এবং দুই হাতের কররেখা ইত্যাদি বিচার করে দিন স্থির করে ফেলল। চেন্নেনহল্লীর বেঙ্কটচলায়ার মায়ের ঋষিপঞ্চমী ব্রতের চেয়ে এখানে ধুমধাম যদি কম হয় তাহলে গঙ্গম্মার মান থাকবে না, সুতরাং জিনিসপত্র বেশী করে আনাতে হবে। অইয়াশাস্ত্রী কাগজ-কলম নিয়ে তখনই ফর্দ করে ফেললেন। গ্রামের দুই পুরোহিতের জন্য রেশমের চাদর, মেলুকোটের পাড়ওয়ালা ধুতি এবং তাঁদের স্ত্রীদের জন্য পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকার শাড়ী। বাড়িতে যে গরু আছে তাতেই গোদানের কাজ চলে যাবে। এছাড়া মিহি চাল, ডাল, চিনি, সুজি ইত্যাদি চাই, এসব আনতে গরুর গাড়ি নিয়ে তিপটুর যাওয়া দরকার। স্থির হল অন্নাজোইস এবং অইয়াশাস্ত্রী দু'জনে মিলে যাবেন বাজার করতে। এই সুযোগে অপ্পন্নায়াও আরেকবার তিপটুর ঘুরে আসার সম্ভাবনায় ভারি খুশি।

৩

মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হল ঋষিপঞ্চমী ব্রত। স্থির করা হয়েছিল যে, নিমন্ত্রিতেরা সব আট দিন পরে নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যাবে। ব্রতের জিনিসপত্রের মধ্যে সুজি, চিনি, ঘি ইত্যাদি কিছু কিছু তখনও অবশিষ্ট ছিল। এরই মধ্যে একদিন পুত্রবধূকে জানিয়ে দিল গঙ্গম্মা, 'তুই এ সংসারে পা দেওয়ার পর থেকেই আমাদের দুর্দশা শুরু হয়েছে। জমি-জমা সব খোয়াতে হল। এবার গ্রামে ফিরে তুই তোর ছেলে-পিলে নিয়ে আলাদা থাকবি, আমরা থাকব বাড়িতে।'

'তুই আর তোর ছেলে-পিলে' কথাটা ঠিক বুঝল না নন্‌জম্মা, তাই সে প্রশ্ন করল, 'কোন বাড়িতে থাকবেন ?'

'কোন বাড়িতে আবার ? আমার স্বামী যে বাড়ি তৈরী করে গেছে সেই বাড়িতে !'

নন্‌জুর ইচ্ছা হল বলে, শিবেগৌড় তোমাদের সে বাড়িতে ঢুকতে দিলে তবে তো ! কিন্তু কিছু বলল না সে। মনে মনে সে অনেক আগেই বুঝেছিল যে, সমস্ত সম্পত্তিই মামলার ফলে হাতছাড়া হয়ে যাবে। শিবেগৌড়ের কাছে আরো দু'হাজার টাকা পাওয়া যাবে এটা নন্‌জু আশা করেনি। কিন্তু এ টাকাটা পাওয়া গেছে জানার পরও সে কোন পরামর্শ দেবার চেষ্টা করেনি ; কারণ জানত যে, কোন কথা বলতে গেলেই অনর্থক ঝগড়া হবে। অনেক খারাপ কথা শুনতে হবে তাকে। এখন সে ছ'মাস অন্তঃসত্ত্বা। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছে এ সময়ে খারাপ কথা শুনতে নেই, খারাপ চিন্তা করতে নেই। সর্বদা সৎ-প্রসঙ্গ শুনতে হয়, মন প্রফুল্ল রাখতে হয়। প্রথম দু'বার গর্ভাবস্থায় এসব কথা বিশেষ মনে আসেনি, কিন্তু এবার এটা বেশী করে মনে পড়ছে যেন। প্রত্যহ তাই সে কোন না কোন সময়ে ধ্রুবচরিত, ভক্ত প্রহ্লাদ, রামের রাজ্যাভিষেক প্রভৃতির গানগুলো নিজের মনেই গুনগুন করে গায়। ঐসব কাহিনীর মধ্যেই মনকে নিবিষ্ট রাখতে চেষ্টা করে।

সেদিন দুপুরে স্বামী যখন শুয়েছে শাশুড়ীর আদেশটা তাকে জানিয়ে নন্‌জু জিজ্ঞাসা করল, 'উনি তো বলে দিলেন আলাদা থাকতে, তা কোথায় থাকবে, কি করবে সে সব ভেবেছ কিছু ?'

'তোর গুণের বহর দেখেই তো ওকথা বলেছে মা। তোর ছেলে-পিলেদের নিয়ে তুই যা খুশি কর-গে যা।'

'আমার আবার কি গুণের বহর ! সারা গ্রাম আমাকে জানে। এখন ওসব কথা থাক, এবার কি করা উচিত তাই বল।'

'আমি তো বলেই দিয়েছি, আমি আমার মায়ের সঙ্গে থাকব।'

নন্‌জুর ভারি রাগ হল এবার,—'কি বলছ কি তুমি ? মাথার ঠিক আছে তো ?'

'দূর হয়ে যা এখান থেকে হতচ্ছাড়ি ছেনাল কোথাকার। আমাকে ঘুমোতে দে এখন।'

আর কথা বলল না নন্‌জম্মা। আলাদা থাকতে তার আপত্তি ছিল না, কিন্তু শাশুড়ী যে তাঁর ছেলেকেও নিজের কাছে রেখে নেবেন এটা সে কল্পনা করতে পারেনি। 'যাক, এখন তো জমি-জমাও নেই আর, দেখা যাবে কতদিন ছেলেকে কাছে রাখেন,' মনে মনে ভাবে নন্‌জু। ছেলে-পিলে নিয়ে তাকেই শেষ পর্যন্ত সমস্ত পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হবে এটা সে আগেই আন্দাজ করছিল, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিল না কিভাবে সেটা করবে। কিন্তু মনে মনে এটুকু সে স্থির করে নিয়েছিল যে, যত কষ্টই হোক না কেন কাঁদবে না সে, কিছুতেই মনকে বিচলিত হতে দেবে না, কারণ সে যে এখন গর্ভবতী।

স্বামী ঘুমোলে সে রামন্নাকে কাঁধের ওপর তুলে, মেয়ে পার্বতীর হাত ধরে জলাশয়ের উঁচু পাড়ে উঠতে শুরু করল। জলাশয়ে জল নেই এখন, মিহি মাটির গুঁড়ো বাঁধের ওপরের পথটাকেও ধূলি-ধূসর করে তুলেছে, তার ওপর প্রখর রৌদ্র। ধীরে ধীরে সে মন্দির প্রাকারের দরজার কাছে এসে পৌঁছল। দেখা গেল মহাদেবায়াজী এইমাত্র স্নান সেরে এসে গেরুয়া ধুতিখানা রৌদ্রে মেলে দিচ্ছেন। ইটের উনুনে মাটির হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। নন্‌জম্মাকে দেখে বলে উঠলেন, 'এস

মা এস, তোমাদের কুঁড়ের দিকে যাব ভাবছিলাম, কিন্তু তোমার শাশুড়ী আবার কি বলে বসবেন তাই ইতস্ততঃ বোধ করছিলাম!'

'শাশুড়ী আর কিছুই বলতে পারবেন না। আমি নিজেই চলে এসেছি' জবাব দিল নন্‌জু।

এই পরিবারের এমন কোন ব্যাপার নেই যা শুধু মহাদেবায়াজী কেন, সারা গ্রামসুদ্ধ লোক জানে না। কাজেই নতুন করে বলার কিছু ছিল না। তবে তাকে আলাদা করে দিতে শাশুড়ীর আদেশ, এবং এ প্রসঙ্গে স্বামীর জবাব দুই-ই সে জানাল মহাদেবায়াজীকে।

'যে দু'হাজার টাকা পাওয়া গেল তাতে ধার শোধের পরেও তো হাজার টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। জোইসজীর কথায় নেচে সে টাকাটাও নষ্ট করে ফেলল, তুমি চুপ করে সব দেখলে কেন বল তো?'

'অইয়াজী, সবই গেছে, তাই ওটুকুও গেল। আমি বারণ করলেও উনি শুনতেন না, শুধু শুধু খানিকটা ঝগড়া হত।'

'সে কথা অবশ্য ঠিক।'

মহাদেবায়াজী একটা এল্যুমিনিয়মের থালায় ভাত ও বরবটির বিচির ডাল ঢেলে আহার করে নিলেন। রোজ মধ্যাহ্নে লিঙ্গায়েতদের বাড়ি থেকে ভিক্ষান্ন এনে আহার করেন। মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে আর ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। আজ সোমবার দূর গ্রামে ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। ফিরতে দেরী হয়ে গেছে, তাই এসে রান্না করতে হল। নন্‌জম্মা আর পার্বতীকে একটু গুড় আর নারকেল খেতে দিয়ে মহাদেবায়াজী চিন্তামগ্নভাবে বসে রইলেন।

'অইয়াজী, আমার বাপের বাড়ির সব খবর আপনি জানেন কি না জানি না। নিজেদের ঘরের কথা বাইরে বলে লাভ কি? তাই কাউকে কিছু বলি না আমি। আমার বৌদিদির স্বভাব ভাল নয়। প্রসব হবার জন্য বা অন্য কোন কারণেই আর আমি সেখানে যাব না। ভেবেছিলাম, ঠাকুমাকেই এখানে আনিয়ে নেব, তিনিই আমার সেবা-যত্ন করতে পারবেন। অবশ্য তাঁরও বয়স হয়েছে পঁচাত্তরের ওপর, বেশী খাটতে পারেন না এখন, তবু হাত-পা বেশ শক্ত আছে। কিন্তু থাকার একটা আশ্রয় আর দু'মুঠো অন্ন তো চাই। এই সময় স্বামী যদি ত্যাগ করে তাহলে কি করব আমি বলুন তো?'

একটু চিন্তা করে মহাদেবায়াজী বললেন, 'চেন্নৈয়া তো দু'দিন পরেই ছুটে আসবে, ওর জন্য কোন চিন্তা নেই। কুরুবরহল্লীর প্যাটেল গুণ্ডেগৌড়জীকে জান তো? তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারেন। এ গ্রামে কোন হিতৈষী পাবে না তুমি।'

কুরুবরহল্লী এদেরই পাটোয়ারী এলাকার অন্তর্গত। সে গ্রামের চল্লিশ ঘর অধিবাসী সবাই জাতিতে মেষপালক। গুণ্ডেগৌড় গত চল্লিশ বছর ধরে সে গ্রামের প্যাটেলের পদে আছে, আশে-পাশের গ্রামের লোক তার নাম দিয়েছে 'ধর্মরাজ'। নন্‌জম্মাও শুনেছে এঁর কথা। লোকে বলে, তিনি যেদিন থেকে প্যাটেল হয়েছেন সেদিন থেকে সে গ্রামে চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার কিছুই হয়নি, আর ক্ষুধার জ্বালায় গ্রাম ছেড়ে কাউকে চলে যেতেও হয়নি।

অইয়াজী বললেন, 'পেছনের পাড়ায় ওঁর একটা খালি বাড়ি পড়ে আছে। সেখানে থাকতে দেবার জন্য যদি অনুরোধ জানাও তো উনি "না" করবেন না।'

নন্‌জম্মারও মনে পড়ে গেল, রামসন্দ্র গ্রামে গুণ্ডেগৌড়ের একখানা বাড়ি আছে বটে, কেউ থাকে না সেখানে। সে বাড়িটা পেলে আশ্রয়ের চিন্তাটা অন্ততঃ দূর হয়। তাঁকে সে দেখেছে বটে তবে

বিশেষ পরিচয় নেই। তাদেরই পাটোয়ারী এলাকার মধ্যে থাকেন বলে প্যাটেল হিসাবেই কাজের জন্য তাদের বাড়ি কয়েকবার এসেছেন। নন্‌জম্মা প্রতিবারই পরিবেশন করে খাইয়েছে তাঁকে। ঘন-পাকা গোঁফ, লম্বা-চওড়া চেহারা, ডান হাতের কবজীতে মোটা সোনার ব্যাণ্ড লাগানো ঘড়ি। কোট পরেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে পরেন মুচির হাতের তৈরী চপ্পল ও গোড়ালি ঢাকা মোজা।

'কাল বেলা নটা-দশটার মধ্যেই কুরুবরহল্লী চলে যাও। আমিও ভিক্ষা করতে যাব। গিয়ে গৌড়জীর সঙ্গে কথা বল, আমি নিজেও বলব। উনি কখনই আপত্তি করবেন না। চেন্নৈয়া মায়ের সঙ্গে থাকবে, সে কথা ওখানে বলার দরকার নেই।' মহাদেবায়াজীর উপদেশ নিয়ে নন্‌জম্মা কুঁড়েতে ফিরে আসতেই গঙ্গম্মা গালাগাল দিয়ে উঠল, 'রাঁড় কোথাকার, পাড়া বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল।' নন্‌জম্মা কোন উত্তর দিল না সে কথার।

পরদিন সকালে উঠে নন্‌জম্মা স্নান করল। বাচ্চাদের ফরসা জামা-কাপড় পরাল। রুটি তৈরী করে বাচ্চাদের খাইয়ে নিজেও খেয়ে নিল। তারপর চুল বেঁধে কপালে আঁকল সিঁদুরের টিপ। রামন্নাকে কাঁধে তুলে পার্বতীর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল সে। কুঁড়ের সামনেই গাছতলায় বসেছিল গঙ্গম্মা, চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'কোন পিরীতের নাগরের কাছে যাওয়া হচ্ছে শুনি?' কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল নন্‌জম্মা। কিছু দূর গিয়ে সে একবার পেছন ফিরে দেখে নিল শাশুড়ী, স্বামী বা দেওর কেউ পিছু নিয়েছে কি না।

রামসন্দ্র গ্রাম থেকে কুরুবরহল্লীর দূরত্ব দু'মাইল। পথে একটা টিলায় উঠে আবার নামতে হয়। একলা যেতে নন্‌জম্মার কোন ভয় ছিল না, কিন্তু শরীরের এই অবস্থায় ছেলেকে কাঁধে নিয়ে টিলায় চড়তে তার হাঁফ ধরে গেল, বুক ব্যথা করতে লাগল। চার বছরের শিশু পার্বতীও হাঁফিয়ে পড়েছে, তবু সে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে মায়ের হাত ধরে। হঠাৎ নন্‌জম্মারও খুব কান্না পেয়ে যায়, ছেলেকে নামিয়ে সে বসে পড়ে মাটিতে। প্রাণভরে কিছুক্ষণ কেঁদে সে আঁচলে চোখ মুছে ফেলে। মুহূর্তের জন্য একবার তার মনে হয়েছিল, বাচ্চা দুটোকে কোন পুকুর বা কুয়োতে বিসর্জন দিয়ে সেও যদি ডুবে মরতে পারত! কিন্তু না না, এসব কু চিন্তা মনে আসতে দেওয়াই উচিত নয়! কথাটা মনে পড়তেই সাহস ভরে উঠে পড়ল সে। ছেলেকে এবার অন্য দিকের কাঁধে তুলে, পার্বতীর হাত ধরে আবার এগিয়ে চলল। টিলার ওপর থেকে দেখা যায় কুরুবরহল্লী। গ্রামের মাঝখানে নন্দীর মন্দিরও দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের পাশেই নাকি শুণ্ডেগৌড়ের বাড়ি। টিলা থেকে নামতে নামতে নন্‌জম্মা মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকে, 'হে ঠাকুর, শুণ্ডেগৌড়জীর মনে আমার প্রতি একটু করুণা জাগিয়ে দিও ঠাকুর!'

গৌড়জী বাইরের দালানে বসে তামাক খাচ্ছেন, তাঁকে দেখতে পেয়ে বাড়ি চিনতে আর অসুবিধা হল না নন্‌জম্মার। গৌড়জী ওকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এসো এসো, মা লক্ষ্মী এসো। আহা, এই রোদে এতটা পথ ছেলে নিয়ে এসেছ?' বাড়ির ভেতর দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাক দিলেন, 'ওরে ও লড়গ্যা আমাদের পাটোয়ারিন্ এসেছেন যে, তাড়াতাড়ি মাদুরটা পেতে দে।' বলতে বলতে তিনি ভেতরে নিয়ে গেলেন এদের। ছেলেমেয়েদের নিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল নন্‌জম্মা। গৌড়জী বসলেন বারান্দার থামের পাশে। তাঁর স্ত্রী লক্কম্মা রোরুদ্যমানা পার্বতীর হাতে একটু গুড় আর নারকেল দিয়ে তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন।

'আমাদের বাড়ির সব ব্যাপার শুনেছেন কি আপনি?'

'সবই জানি মা। হাত থেকে ছুটে যাওয়া মশালের মতই তোমাদেরও সর্বস্ব হাতছাড়া হয়ে গেছে। সম্পত্তি যতক্ষণ থাকে, মশালও ততক্ষণই জ্বলে, মশাল হাতছাড়া হলেই সব গেল! তা সেই মশালই যদি কেউ হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তাহলে তার আর বাকি রইল কি? তোমার শ্বশুরমশাইও এই আমার মতই বোকা ছিলেন। ওটিকে ঘরে এনেই নিজের সর্বনাশ করলেন, তোমাদের সংসারের ভিত উপড়ে দিল একেবারে। এখন যেটুকু আছে তা তোমাকেই রক্ষা করতে হবে মা।' নিজের স্ত্রীর দিকে ফিরে এবার বলেন, 'পাটোয়ারী কাজের সমস্ত হিসেব-নিকেশ এই মা লক্ষ্মীই লেখেন, তা জান তো? এসব কি ঐ চেন্নৈয়ার দ্বারা হয় কখনো? ওটা তো একটা ধর্মের ষাঁড়। জিজ্ঞেস কর, ও ষাঁড়, ঘাস খাবে? তা বলবে "হুঁ", জল খাবে? তাতেও "হুঁ", চরতে যাবে? তাতেও "হুঁ" বলে ঘাড় নাড়বে। কিন্তু যদি বল "খেতে লাঙল চষতে হবে" তক্ষুনি "না না" করে শিং নেড়ে পিট্‌টান দেবে! তোমার স্বামীর গুণ-কীর্তন করছি, রাগ কোর না মা।'

নন্‌জু বলে, 'রাগ করব কেন? ঐ রকমই তো করেন উনি।'

এইসব আলাপের মধ্যেই একবার ভেতরে গিয়ে লক্কম্মা তিনটি ঘটিতে করে নিয়ে আসে গরম দুধ, তাতে উৎকৃষ্ট গুড় আর ঘি গলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে। নন্‌জম্মা আপত্তি জানিয়ে বলে, 'আমি এখন দুধ খাব না।' লক্কম্মা বলে ওঠে, 'পোয়াতি-মেয়ে দুধ খেতে "না" বলতে নেই, খেয়ে ফেল ওটুকু।'

'গৌড়জী, আপনার বাড়িতে দুধ খেতে আপত্তি করব না, কিন্তু আপনি কথা দিন আমাকে সাহায্য করবেন?'

'কি ব্যাপার, বলত মা?'

'আমার শাশুড়ী কাল আমাকে বলেছেন আলাদা থাকতে। এখন আমার কোন আশ্রয় নেই।'

'আরে, আশ্রয়ের ভাবনা কি? আমার বাড়ি তো পড়ে আছে, সেখানেই থাকবে। নাও এখন দুধটুকু খেয়ে নাও।'

যে প্রার্থনা নিয়ে এসেছিল, চাওয়ার আগেই তা পূর্ণ করে দিলেন গুণ্ডেগৌড়। একটা কটু-কথা নয়, একটু তর্ক নয়, এমনভাবে দান করলেন যে, বেশ বোঝা গেল ওঁর মনে এ বিষয়ে এক-বিন্দুও দ্বিধা নেই। বাচ্চাদের দুধ খাইয়ে নন্‌জম্মাও পান করল গরম দুধ। গৌড়জী নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দেখছ তো, আমি তোমাকে বলেছিলাম কিনা, এই মা-লক্ষ্মীর মুখখানি দেখলে চোখ ফেরে না, যেন সাক্ষাৎ সীতাদেবী, তাই না?'

ইতিমধ্যে মহাদেবায়াজীও ভিক্ষা করতে এসে পৌঁছলেন, নন্‌জম্মাকে দেখে তিনিও বসলেন এসে। লক্কম্মা পাটি পেতে দিল। তিনি যেন কিছু জানেন না এইভাবে নন্‌জম্মার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তার থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে শুনে মহাদেবায়াজী বললেন, 'আশ্রয় তো আপনি দিলেন গৌড়জী, কিন্তু এদের পেট চলবে কি করে? ঘরের মধ্যে অনাহারে পড়ে থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত।'

'কেন পাটোয়ারী কাজটা আছে তো? একটু খাটতে পারলে পাটোয়ারী কাজের মত ভাল উপার্জন আর কিছুতে আছে নাকি?'

'সে কেমন পুরুষ মানুষ তা তো জানেন?'

'ওটা তো একটা শিখণ্ডী—কিন্তু গাড়ির এক জোড়া বলদের মধ্যে একটা দুর্বল হলেও অন্যটা যদি সবল হয় তাহলেই কাজ চলে যায়!' গৌড়জী নন্‌জম্মার দিকে ফিরে বলেন, 'ঐ ধর্মের ষাঁড়টাকে বলে দাও, তুমি যেমন বলবে সেইভাবে চলতে হবে ওকে। ব্যস, তাহলেই পেট চালাবার কোন ভাবনা থাকবে না।'

মহাদেবায়াজী বললেন, 'সে কথা চেন্নৈয়া শুনলে তবে তো!'

'কপালে যা আছে ভুগতে হবেই', বলে লক্কম্মা।

বেলা দ্বিপ্রহর পেরিয়ে গেছে। এদের না খাইয়ে ছাড়তে চান না গৌড়জী ও লক্কম্মা। বাড়ির ভেতর থেকে পিতলের বাসন ও দুটি ঘড়া আনা হল, মন্দিরের সামনের কুয়োতলায় বসে মহাদেবায়াজী ও নন্‌জু নিজের নিজের বাসন মেজে নিল তেঁতুল দিয়ে। মন্দিরের আঙিনাতেই গৌড়জীর ছেলে তিনখানা করে পাথরের টুকরো দিয়ে উনুন তৈরী করে ফেলল দেখতে দেখতে। তারপর নন্‌জম্মা আর মহাদেবায়াজী নিজের নিজের ভাত ফুটিয়ে নিলেন। নারকেল আর নুন মেশানো মাঠা দিয়ে খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হল, বাচ্চারাও আবার দুধ খেল একটু। গরুর গাড়ির ব্যবস্থা করে গৌড়জী গর্ভবতী নন্‌জু আর তার শিশুদের গাড়িতে করে বাড়ি পাঠালেন। ভিক্ষার ঝুলিটা নিয়ে মহাদেবায়াজীও উঠে বসলেন সেই গাড়িতে।

৪

কুঁড়ে ঘর ছেড়ে গ্রামে ফিরে এল গঙ্গম্মা। নিজেদের বাড়িতে তালা খুলে ঢুকে অপ্পন্নায়াকে নিয়ে সবেমাত্র মাঝের ঘরখানার ধুলো ঝাড়তে শুরু করেছে এমন সময় শিবেগৌড়ের চাকর মূরুব এসে হাজির, হাতে তার মস্ত এক তালা-চাবি। সে জানাল, 'গৌড়জী বলেছেন, আপনাদের জিনিসপত্র এখান থেকে নিয়ে যান। এ বাড়িতে তালা লাগিয়ে দিতে পাঠালেন আমাকে।'

'কোন রাঁড়ের পুত একথা বলেছে শুনি?'

'শিবেগৌড়জী বলেছেন।'

'হা কপাল! ভিটে থেকেও উচ্ছেদ করবে? জমি-জমা তো নিয়েই নিয়েছে, এখন বাড়িখানাও ছাড়তে বলছে, এ কি ওর বাপের ভিটে নাকি?' গঙ্গম্মা এবার শিবেগৌড়ের বাড়ির সামনে গিয়ে চেঁচাতে আরম্ভ করে, 'হ্যাঁরে গৌড়, ওটা কি তোর বাপের ভিটে? আদালতে তো জমি দেবার কথাই হয়েছিল!'

'ইচ্ছে হয় তো তিপটুরে গিয়ে জেনে এস। তুমি আর তোমার ছেলেরা যে খরিদ-পত্রে সই করেছ সেটা লোহার সিন্দুকে তোলা আছে, বার করে এনে দেখাব নাকি?' বলতে বলতে গৌড় বাইরে বেরিয়ে আসে।

'হা কপাল, সগুষ্টি নিপাত যা তুই' এছাড়া আর কিছু বলতে পারে না গঙ্গম্মা। একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করে, 'তা গাঁয়ের প্যাটেল তুমি, তুমিই বলে দাও কোথায় থাকব আমরা?'

'যাদের চাল-চুলো নেই তাদের জন্য বাড়ি তৈরী করা তো প্যাটেলের কাজ নয়? চুপচাপ সরে পড় এখান থেকে।' দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয় শিবেগৌড়।

'ওর ঘর-দোর ধসে পড়ুক, তার ওপর আমি রেড়ির চাষ করব। ধাপ্পা দিয়ে সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়ে রাঁড়ের ব্যাটার বড় তেল হয়েছে। আমার কি কেউ নেই নাকি? গজরাতে গজরাতে গঙ্গম্মা রেবন্নাশেট্টীর বাড়িতে গিয়ে হাজির। সব ঘটনা তাকে জানিয়ে বলে, 'তোমাদের গোয়ালের উঠোনে একটু জায়গা আছে, সেখানে একটা চালা তুলে আমি আর আমার দুই ছেলে থাকব, থাকতে দেবে তো?'

গঙ্গম্মাজী আমার মোষটা বিয়োলে তাকে বাঁধবারই জায়গা থাকবে না, তা ওখানে আপনারা কোথায় থাকবেন? আপনাদের অইয়াশাস্ত্রীজীকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না?'

'এই রাঁড়ের পুত কেবল আমার টাকাগুলো খাবার তালে ছিল' বলতে বলতে সে এবার চলল অইয়াশাস্ত্রীর কাছে। কিন্তু তাঁর গোয়ালেও জায়গা নেই।

'যখন আমার বাড়ি পেটপুজোর সুবিধে ছিল তখন আমার কথা খুব মনে পড়ত, এখন চার গজ জমিও ছাড়তে পারছে না ভিখিরি পুরুত বামুন' ব্যঙ্গতিক্ত স্বরে বলে গঙ্গম্মা।

শাস্ত্রীজী একটু অস্বস্তি বোধ করেন বটে কিন্তু গঙ্গম্মার কথার ফাঁদে পড়ে তাকে আশ্রয় দেবার বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নেই তার। কাজেই তিনি তাঁর ভাইপো অন্নাজোইসের কাছে খোঁজ নিতে বলেন। গ্রামের পূর্বকোণে হনুমান মন্দির আছে, ইট-পাথরে গড়া গোটা-চারেক কামরাও আছে তাতে, দরজায় তালাও লাগানো চলে। সেখানকার পুরোহিত অন্নাজোইসজী। সেখানে থাকতে মা এবং ছেলেদের কোন আপত্তি নেই, কিন্তু থাকার জন্য গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদের অনুমতি প্রয়োজন। গ্রামের প্যাটেল, পাটোয়ারী, পঞ্চায়েত-এর অধ্যক্ষ এবং সদস্যেরা, এঁদেরই বলা হয় প্রধান ব্যক্তি। অন্য সবাইকে রাজি করানো কিছু কঠিন নয় কিন্তু শিবেগৌড়ই হল প্যাটেল এবং পঞ্চায়েত অধ্যক্ষ, সে কি সম্মতি দেবে? অইয়াশাস্ত্রীজী এবার বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'তুমি একটু জিভে লাগাম টানো গঙ্গম্মা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এভাবে ওকে হারামখোর, রাঁড়ের ব্যাটা এ-সব বলে গাল-মন্দ কোর না।' উত্তরে তেড়ে উঠল গঙ্গম্মা, 'কোনো ব্যাটা রাঁড়ের পুতকে ভয় করি আমি? ছেড়ে দিন ওসব কথা!'

দুই পুরোহিত মিলে শিবেগৌড়ের কাছে আবেদন করতে গেলেন। শিবেগৌড় রাজি হত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তার স্ত্রী গৌরম্মার প্রাণে ভয় ঢুকেছে। গঙ্গম্মার মুখ বড় খারাপ, লোকে বলে ওর জিভে নাকি কালো তিল আছে। ক্ষণে-অক্ষণে ওর মুখ দিয়ে শাপমন্যি বেরোয়, পথে দাঁড়িয়ে ধুলো-মুঠি ছুঁড়ে ছুঁড়ে অভিসম্পাত দেয় আবার! তাছাড়া হনুমান মন্দির তো ব্রাহ্মণদেরই, ওদের নিজের জাতের কাউকে আশ্রয়ে আপত্তির কি আছে? গৌরম্মা স্বামীকে বাড়ির মধ্যে ডেকে এনে কথাগুলো চুপি চুপি বলে। শিবেগৌড় রাজি হল কিনা ঠিক বোঝা যায় না। তবে বাইরে এসে সে পুরোহিতদের বলে, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে যান।'

এরা হনুমান মন্দিরে আসার ফলে অন্নাজোইসজীর একটু সুবিধা হল। পুজারীর জন্য মন্দির সংলগ্ন পাঁচ একর বাগান এবং এক একর খেত আছে। অন্নাজোইস এই জমি ভোগ করে। কিন্তু একা হাতে রোজ মন্দির ধোয়া-মোছা, হনুমানজীর স্নান-পুজো ইত্যাদির সব কাজ সে করে উঠতে পারত না। যে দিন সে দান-দক্ষিণা আদায়ের জন্য

অন্য গ্রামে যেত সেদিন তো হনুমানজীর স্নানই হয়ে উঠত না। দিনের পর দিন ঘর-গুলোয় ঝাঁট না পড়ায় পাখির বিষ্ঠা জমে দুর্গন্ধ বেরোত। কয়েক বার প্যাটেল পুরোহিতের কাজের গাফিলতির জন্য ওপরে নালিশও লিখেছে। মন্দিরের সামনের জানলা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায় ঠাকুরের বেদী। যেদিন হনুমানজীর মূর্তিতে ফুল-জল পড়ে না সেদিন গ্রামের লোক পুজো হয়নি দেখে পুরুতকে গালাগাল দিতে থাকে।

এখন অন্নাজোইস, অপ্পন্নায়াকে বলল, 'দেখ, মন্দিরে তোমাদের আশ্রয় দিয়েছি। রোজ দেওয়াল ঘরের মেঝে সব ভাল করে ঝাঁট দিয়ে ধুতে হবে, কোথাও যেন এতটুকু ময়লা না থাকে। হলুদ করবীর ফুল তুলে, মূর্তিকে স্নান করিয়ে শুদ্ধাচারে পুজো করবে, কিন্তু খবরদার কাউকে বলবে না যে, তুমি পুজো করেছ। যদি বলেছ, সেই দিনই মন্দির থেকে দূর করে দেব। মাঝে মাঝে আমিও পুজো করব অবশ্য।

রাজি হয়ে গেল অপ্পন্না। ভগবানের পুজোয় গঙ্গম্মারও কোন আপত্তি নেই, দেবতার প্রতি তার অগাধ ভক্তি। তা ছাড়া চেন্নিগরায় তো পুজো-পাঠ মন্ত্র ইত্যাদি কিছু কিছু জানেও।

৫

বিয়ের সময় নন্জম্মা বাপের বাড়ি থেকে পেয়েছিল বাজুবন্ধ, কোমরের গোট, একজোড়া চুড়ি আর রূপোর পাঁয়জোর। পাটোয়ারীর হিসাবের খাতা রাখার বাক্সটায় একেবারে নিচে এক কোণের দিকে রাখা থাকত গহনাগুলো। এখন এগুলো অন্ততঃ ফেরত চায় নন্জম্মা। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে কোন স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করায় সে বলে উঠল, 'বাপ দিয়েছিল তো কি হয়েছে, সে তো এখন আর তার সম্পত্তি নয়? সে খরচ হয়ে গেছে!'

'কিসে খরচ হল? কি করেছ সেগুলো দিয়ে?'

'মামলায় খরচ হয়েছে।'

'কি করেছ সেগুলো?'

'কাশিমবদ্দির কাছে পঞ্চাশ টাকায় বাঁধা দেওয়া হয়েছে। চাও তো ছাড়িয়ে আন টাকা দিয়ে।'

'কত দিন আগে বাঁধা দিয়েছ?'

'গতবছর দেওয়ালির সময়।'

অর্থাৎ প্রায় সাত মাস কেটে গেছে। সুদই হয়েছে পঞ্চাশ টাকার ওপর। এখন এক'শ টাকা সংগ্রহ করে সে গহনা ছাড়িয়ে আনা এক রকম অসম্ভব ব্যাপার।

'আমাকে না জানিয়ে আমার বাপের বাড়ির গহনায় হাত দিলে কেন?'

'মা বলল, তাই আমি বাঁধা দিয়ে এলাম।'

'কিছুতেই ধৈর্য হারাব না' এ প্রতিজ্ঞা নন্জু আর টিকিয়ে রাখতে পারল না। বাসন-পত্রও কিছুই দেননি শাশুড়ী। তার বিয়ের সময় পাওয়া হাঁড়ি কড়াই থালা বাটি ইত্যাদি কিছুই তাকে দেবেন না সোজা বলে দিয়েছেন। অন্ততঃ এই সোনাটুকু থাকলেও দুর্দিনে

কাজে লাগত। নতুন করে সংসার পাতবার জন্য এখন একটা ঘটি-বাটি পর্যন্ত নেই। বাচ্চাদের দু'খানা রুটি গড়ে দেবার মত এক মুঠো মড়ুয়ার আটাও নেই ঘরে। তার ওপর পেটে রয়েছে সন্তান। প্রসবের জন্য বাপের বাড়ি যাওয়ার কথা সে চিন্তাও করে না। যা একখানি বৌ এসে জুটেছে সে বাড়িতে!

রাগে আগুন হয়ে সে এবার স্বামীকে ধিক্কার দিয়ে বলে, 'পুরুষ মানুষে রোজগার করে নিজের বৌকে গহনা গড়িয়ে দেয়। সে সব তো দূরের কথা, আমার বাবার দেওয়া গহনাটুকুও মা-বেটায় মিলে চুপি চুপি ভোগা দিয়ে নিয়ে নিলে, লজ্জা করল না তোমাদের?'

স্বামীদেবতার মুখে কথাটি নেই। ভেড়ার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে।

'এখন ছেলে-পিলে খাবে কি তাই বল? হাজার-বার বারণ করা সত্ত্বেও তো সর্বস্ব, জমি-জেরাত কোর্টে গিয়ে খুইয়ে এলে!'

এসব কথার কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে চটে গেল চেন্নিগরায়। কষে গাল দিতে ইচ্ছা হল, কিন্তু নতুন কোন খারাপ কথাও মনে এল না, অগত্যা ভেংচি কেটে বার বার 'ছেনাল ছেনাল' বলতে বলতে সেখান থেকে কেটে পড়ল সে। রাগ নন্‌জম্মার হয়েছিল খুবই। মিনিট দশেক কেঁদে সে আঁচলে চোখ মুছে ফেলল। আস্তে আস্তে মনটা শান্ত হয়ে এল তার।

সেই দিনই মন্দিরে গিয়ে মহাদেবায়াজীর কাছে পাঁচটা টাকা ধার চেয়ে আনল সে। দ্বিতীয় দিন স্বামীকে বাচ্চাদের দিকে একটু নজর রাখতে বলে তাঁতিপাড়ার পুট্টব্বাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল সন্নেনহল্লী। রামসন্দ্র থেকে মাইল তিনেক দূরের এই গ্রামটায় কেবল কুমোরদের বাস। পুট্টব্বা যে বাড়িতে নিয়ে গেল সেখান থেকে নন্‌জম্মা রান্নাঘরের জন্য কিছু দরকারী বাসন-পত্র কিনে ফেলল—জল তোলার ঘড়া, জল গরম করার হাঁড়ি, রুটি সেঁকার তাওয়া ইত্যাদি। পুট্টব্বা অনেক দর-দস্তুর করায় সমস্ত জিনিস-পত্রের জন্য বারো আনার বেশী খরচ হল না। বাসনগুলোর কিছুটা পুট্টব্বা আর কিছুটা নন্‌জম্মা বহন করে নিয়ে এল। চড়া রোদের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ওরা যখন গ্রামে ফিরে এল দ্বিপ্রহরের সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপর। জিনিস-পত্র গুণ্ডেগৌড়জীর বাড়িটায় নামিয়ে দরজায় তালা দিয়ে কুঁড়ের কাছে ফিরে গেল। শাশুড়ী আর দেওর ততক্ষণে নিজেদের জিনিস-পত্র হনুমান মন্দিরে নিয়ে গেছে। রামন্না কান্না জুড়েছে ঘরের সামনে বসে, পার্বতীকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আর চেন্নিগরায় যে কোথায় তা কেউ জানে না। ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে নন্‌জু পাশের ডোবাটায় গিয়ে হাত পা ধুয়ে এল। ভাগ্যে ছেলেটা ডোবায় গিয়ে পড়েনি! কিন্তু পার্বতী গেল কোথায়? সবাই এখন কুঁড়ে থেকে গ্রামের বাড়িতে জিনিস-পত্র নিয়ে যেতে ব্যস্ত। মেয়েটা কোথায় গেল কে জানে? জন্মদাতা বাপ, নিজের ছেলে-মেয়ের জন্য তার কি এতটুকুও হুঁশ থাকতে নেই? রামন্নাকে নিয়ে আবার ফিরল বেচারী গ্রামের দিকে। মহাদেবায়াজীও জিনিস-পত্র নিয়ে আসছেন পূর্বের আস্তানায়। দেখা গেল চেন্নিগরায় সেখানেই মন্দিরের বারান্দায় বসে মুখ ধুচ্ছে মুখের তামাক পরিষ্কার করার জন্য। নন্‌জম্মা তার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, 'পার্বতী কোথায়?' মুখের পান ফেলতে ফেলতে উত্তর হল, 'আমি কি জানি? খুঁজে দেখ্ না গিয়ে।'

'অইয়াজী দেখুন, ছেলে-মেয়েদের দিকে একটু নজর রাখতে বলে আমি সন্নেনহল্লী গিয়েছিলাম বাসন কিনতে। এসে দেখি পার্বতী নেই। জিজ্ঞাসা করছি তো বলছে "আমি কি জানি?" দেখছেন তো আপনি!'

'কি হে, সকাল থেকে তো এখানেই বসে আছ, মেয়েটা গেল কোথায়?' অইয়াজীর প্রশ্ন শুনে চেন্নিগরায় বলে, 'কে জানে কোথায় গেছে পোড়ারমুখী, এক জায়গায় চুপ করে বসবে না তো কিছুতে।'

এক দিকে নন্‌জম্মা খুঁজতে বেরোল, আর এক দিকে গেলেন মহাদেবায়াজী। একজন খবর দিল তাঁতি পাড়ার দিকে নাকি দেখেছে। নন্‌জম্মা ছুটল সেখানে। সৌভাগ্যক্রমে দেখা গেল একজনদের বারান্দার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে মেয়েটা। সবাই নিজের নিজের জিনিস-পত্র এনে গোছগাছ করতে ব্যস্ত, তাই কার বাচ্চা, কেউ খেয়ালই করেনি।

মেয়ের হাত ধরে বাড়ি ফিরল নন্‌জম্মা। বাড়ির অবস্থা তো জানা আছে, কাজেই মহাদেবায়াজী একটা কুলোয় করে দু'সের মড়ুয়ার আটা, কিছুটা বরবটির বিচি, লঙ্কা, লবণ, তেঁতুল, নারকেলের চূর্ণ ইত্যাদি দিয়ে গেলেন। দুটো বাচ্চাই খিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করছে। নন্‌জম্মার নিজেরও খিদে পেয়েছে খুব। এই রোদে ছ'মাইল পথ হেঁটে ক্লান্তও হয়ে পড়েছে। সে যথেষ্ট শক্তিমতী হলেও এতটা পথ হাঁটেনি আগে কখনো। তাছাড়া শরীরের এই অবস্থায় পথ চলা বেশ কষ্টকর।

ক্লান্তি যতই থাক, বসার উপায় নেই। নতুন ঘড়ায় জল ভরে আনল কুয়ো থেকে। ঘরের মধ্যে উনুন পাতা ছিল, তাতে দিল জল-ছড়া। মহাদেবায়াজী কিছু শুকনো নারকেল পাতার ডাঁটা ইত্যাদি এনে দিলেন। মাটির দুটো হাঁড়ি ধুয়ে একটাতে বরবটির ডাল, অন্যটায় মড়য়ার আটা মেখে দলা পাকিয়ে সিদ্ধ করতে বসিয়ে দিল, নতুন হাঁড়ির রান্নায় হয়ত মাটির গন্ধ হবে, কিন্তু উপায় কি? রান্না শেষ হতে বেজে গেল বিকেল চারটে। খিদের জ্বালায় পার্বতী কোনরকমে সেই মড়ুয়ার ডেলার আধখানা ডাল দিয়ে গিলে ফেলল কিন্তু রামন্নার পছন্দ হল না এই খাবার। সে বেচারার বয়স এখনও দু'বছর পূর্ণ হয়নি। এক টুকরো মুখে নিয়ে ভাল করে চিবোতে না পেরে 'আর খাব না' বলে কান্না শুরু করে দিল। আধসের আটা তখনও রাখা ছিল, তার থেকে দু'মুঠো নিয়ে নন্‌জম্মা তাড়াতাড়ি একটু নুন দিয়ে মেখে একখানা রুটি সেঁকে তাই ডাল দিয়ে খাওয়াল ছেলেকে। আধখানা রুটি খেয়ে কান্না থামল ছেলের।

এইসময় দেখা গেল স্বামী এসে ঢুকছে এ বাড়িতে। মিনিটখানেক রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তারপর উঁকি মারল ভিতরে। কার বাগান থেকে কে জানে, বড় একখানা কলাপাতা কেটে এনেছে। উনুনের সামনে বৌয়ের কাছে পাতাখানা পেতে দিব্যি বসে গেল চেন্নিগরায়। রান্না করার সময় নন্‌জম্মা ভাবতেও পারেনি স্বামী এখানে খেতে আসবে। ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়ের চিন্তাই ছিল তার সমস্ত মনটা জুড়ে। এখন ছেলে-মেয়ে শান্ত হয়েছে, কিন্তু স্বামী এসেছে কেন? ওর তো নিজের মায়ের কাছে থাকার কথা ছিল। মায়ের বাড়িতে কি আজ উনুন জ্বলেনি নাকি? না, মা বলে দিয়েছে, 'যা বৌ-এর কাছে খেয়ে আয়'! হয়ত নিজে থেকেই এসেছে! কিন্তু আজ সকাল থেকে একবারও

তো খোঁজ নেয়নি বেঁচে আছি না মরেছি! ছেলে-পিলেকেও দেখেনি। মহাদেবায়াজী আটা, ডাল এনে দিলেন, তখন তো রান্নার জন্য এক ঘড়া জল তুলে দিয়েও সাহায্য করেনি। এখন খাবার আশায় পাতা কেটে এনেছে, তাও কেবল মাত্র নিজের জন্য এক-খানা। ওকে খেতে দেবে কিনা ভেবে ঠিক করে উঠতে পারল না নন্‌জম্মা। বাচ্চাদের তুলে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল। দুটো বাচ্চাই ঘুমে ঢুলছে, ওদের শোয়াবার মত একটা মাদুরও নেই। নিজের একখানা পুরোন শাড়ি পেতে ছেলে-মেয়েকে শুইয়ে দিল। তার নিজেরও শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে। বাহুতে মাথা রেখে রামন্নার পাশে নন্‌জম্মাও শুয়ে পড়ল এবার। একবার মনে হল উঠে গিয়ে স্বামীকে খাবার বেড়ে দেয়, আবার ভাবল, 'থাক, ডাকলে তখন দেখা যাবে।' শুয়েই থাকল সে। সারা সকালের খাটুনী, তারপর খাওয়াও হয়নি, ক্লান্তিতে ঘুম এসে গেল চোখে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বাইরে রোদ পড়ে গেছে। অর্থাৎ এক ঘন্টার ওপর ঘুমিয়েছে সে। স্বামী শেষ পর্যন্ত খেয়েছে, না রাগ করে চলে গেছে কে জানে? রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, রান্নার বাসন গুলোর ওপর বিকেলের মরা রোদ এসে পড়েছে, এঁটো পাতাখানাও পড়ে আছে। সবসুদ্ধ পাঁচখানা মড়ুয়ার ডেলা বানিয়েছিল, তার মধ্যে আধখানা মাত্র পার্বতী খেয়েছে, সাড়ে চারখানা ছিল হাঁড়ির মধ্যে, এখন পড়ে আছে আধখানা মাত্র। অন্য হাঁড়িটার তলায় মাত্র হাতা-খানেক ডাল অবশিষ্ট আছে। নন্‌জম্মা ভাবতে লাগল, 'ওটুকু কি আমার জন্য দয়া করে ছেড়ে গেছে, না পেটে আর জায়গা ছিল না বলে?' তার নিজেরও এখন পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে যেন, সেই আধখানা মড়ুয়ার ডেলা খাওয়ার জন্য হাঁড়ির মধ্যে হাত দিয়েই মনে পড়ল, বাচ্চারা রাতে কি খাবে? কাজেই কিছুটা রেখে অল্প একটু বার করে নিল। একটু মড়ুয়ার আটা এখনও আছে রুটি সেঁকার মত, কিন্তু শরীরে এখন আর শক্তি নেই। বাইরে গিয়ে থামে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল সে।

বাচ্চারা ঘুমোচ্ছে এখনও। সূর্যাস্তের সময় শুয়ে থাকতে নেই, তাই ওদের ডেকে তুলল নন্‌জম্মা। এতক্ষণে মনে পড়ল, আজ সারাদিনে বাচ্চাদের এবং তার নিজেরও স্নান করা হয়নি। সন্নেনহল্লী থেকে ফিরে এসে মুখ হাত ধুয়েছিল কিন্তু সিঁদুর পরা হয়নি। সিঁদুরের থালাটাও রয়েছে শাশুড়ীর কাছে, তিনি আবার সেটা দেবেন কিনা কে জানে! রাত্রে আলো জ্বালাবার জন্য তেল, বাতি কিছুই নেই। সম্বল তো মাত্র সওয়া চার টাকা। দরজায় তালা দিয়ে ছেলে-মেয়েকে নিয়ে আবার বেরোল সে, চেন্নশেট্টীর দোকান থেকে দুটো বাতি, এক বোতল কেরাসিন তেল ও এক বাক্স দিয়াশলাই কিনল, খরচ হল সাড়ে তিন আনা। বাচ্চাদের কিনে দিল ছ'পয়সার বাতাসা। বাড়িতে ফিরে নিজের শাড়ী ছিঁড়ে সলতে বানিয়ে বাতিতে লাগিয়ে তেল ভরল সন্ধ্যার আবছা আলোয়, তারপর বাতিটা জ্বেলে ঘরের মধ্যে এনে সেই আলোতে অন্য বাতিটাতে সলতে পরিয়ে তৈরী করে রেখে দিল। এবার কি করতে হবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না, শরীরেও যেন শক্তি নেই আর এতটুকু। বারান্দার থামে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল নন্‌জম্মা। দুই ছেলে-মেয়ে তার দুই উরুতে মাথা রেখে আবার শুয়ে পড়ল। নতুন জায়গায় এসে তারাও যেন আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে।

একটু পরে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে ঘরের মধ্যে এল সে। দুপুরের অবশিষ্ট আধখানা রুটি রামন্নাকে আর আধখানা মড়ুয়ার ডেলা পার্বতীকে দিল খেতে। দু'জনের কেউই পুরোটা শেষ করতে পারল না, ওদের ভুক্তাবশিষ্ট রুটি ও মড়ুয়ার ডেলার টুকরোগুলো হাঁড়ির তলানি ডালটুকু দিয়ে খেয়ে নিল নন্‌জম্মা। এখনও একটু মড়ুয়ার আটা বাকি আছে, তাই দিয়ে রুটি গড়ে খেয়ে নেওয়া যায় অবশ্য, কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছা করছে না তার। অদ্ভুত একটা বিষাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে মনটা। বাতিটা তুলে নিয়ে মাঝের ঘরে এসে ভাবছে কোথায় শোয়াবে ছেলে-মেয়েকে, এমন সময় দেখা গেল বিছানার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে স্বামী এসে ঢুকছে। যাক, বিছানার চিন্তাটা অন্ততঃ দূর হল, মনটা একটু প্রফুল্ল হল তার। বিছানার বাণ্ডিল খুলে দেখা গেল তার দ্বিরাগমনের সময় বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া দু'খানা কম্বল, দুটো সতরঞ্চি, দু'খানা বালিশ ও কালো শালখানা এসেছে। কম্বলের মধ্যে একখানার তো পার্বতী আর রামন্না ভিজিয়ে ভিজিয়ে প্রায় দফা শেষ করে ফেলেছে। অন্যটাও বেশ জীর্ণ হয়ে এসেছে। বাচ্চাদের একটা কম্বল পেতে শুইয়ে, ওদের পাশেই নিজের জন্য একটা সতরঞ্চি ও বালিশ বিছিয়ে নিল সে। স্বামীর বিছানা পেতে দিল পাশের ঘরে।

চেন্নিগরায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব, সে এবার বেশ রাগত স্বরে বলে উঠল, 'আমার বিছানাটা এখানে করা হল না কেন শুনি?'

কোন উত্তর দিল না নন্‌জম্মা, সে রামন্নাকে থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়াচ্ছিল।

'এত কষ্ট করে বিছানাগুলো বয়ে আনলাম কি আলাদা শোবার জন্য নাকি?'

এ কথারও কোন উত্তর হল না।

'এই ছেনাল, চুপ করে আছিস যে বড়?'

কিছুতেই ধৈর্য হারাবে না এই প্রতিজ্ঞা করে নন্‌জম্মা শান্তভাবে বলল, 'আমার ছ'মাস পূর্ণ হয়ে গেছে।'

'তাতে হয়েছে টা কি শুনি?' বলতে বলতে চেন্নিগরায় পাশের ঘর থেকে নিজের বিছানা তুলে এনে ফেলল স্ত্রীর সতরঞ্চির পাশে। তারপর বাতি হাতে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'আমার জন্য কিছুই রাখা হয়নি, না?'

'দুপুরে কিছু বাকি রেখেছিলে কি?' ঘরের থেকে জবাব দিল নন্‌জম্মা। চেন্নিগরায় এবার আর কথা না বলে ডালায় তখনও যে আটাটুকু ছিল সেটা নুন দিয়ে মেখে ফেলল, তারপর উনুন জ্বেলে কোন রকমে সেঁকল মোটা মোটা দুখানা রুটি। গরম গরম রুটি উদরস্থ করে বেশ খানিকটা জল খেয়ে, বাতি হাতে মাঝের ঘরে যখন ফিরে এল ততক্ষণে বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। স্ত্রীরও দু'চোখ মুদ্রিত। চেন্নিগরায় শুয়ে পড়ল নিজের নরম বিছানায়। নন্‌জম্মা ঘুমোয়নি, ঘুম আসা সম্ভবও নয়। সকাল থেকে কিছুই প্রায় খাওয়া হয়নি, তীব্র ক্ষুধার আগুন জ্বলছে পেটে। নিজের অসহায় অবস্থার চিন্তায় মন ভারাকান্ত, নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করে সে, মোটে একদিন রসদ না যোগালেই পোড়া পেট এমনভাবে জ্বলে কেন? এত ক্ষুধা, তা সত্ত্বেও পেটের ভার যথেষ্ট। পোয়াতিদের উপোষ করতে নেই। আমি না হয় না খেলাম, কিন্তু গর্ভের খোরাক তো যোগাতেই হবে। দুপুরে সেই

আধখানা মড়ুয়ার ডেলাটা আমার খেয়ে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহলে রাত্রে পার্বতী কি খেত? খাইনি, ভালই হয়েছে। বাকি আটাটুকুর রুটি সেঁকে যদি খাই তো সকালে উঠে বাচ্চারা কাঁদলে কি খেতে দেব? ওদের কথা ভেবেই রেখে দিলাম, তা এখন ওদের জন্মদাতা বাপই সেটুকু খেয়ে শেষ করলেন! এই তো বিকেল বেলাই চারখানা মড়ুয়ার ডেলা খেয়ে গেছে, এত তাড়াতাড়ি খিদে পায়ই বা কি করে? কারো কারো হজমশক্তি খুব বেশী হয়। দুপুরবেলা তো পাতা পেতে নিজেই খাবার বের করে খেয়েছে, তখন কি একবার মনেও পড়েনি, 'বৌটা কি খাবে?' এখন রুটি গেলবার সময়ও মনে পড়ল না? খেয়ে-দেয়ে দিব্যি পাশে এসে শুয়ে পড়ল! আমার শরীর কেমন আছে, ক'মাস চলছে, সকাল থেকে খাওয়া হয়েছে কি না, শরীরে শক্তি আছে কি না এসব কিছুই কি জানার দরকার নেই? সোজা বলে দিতে ইচ্ছে করে, 'আমার কাছে আসতে হবে না, দূরে গিয়ে শোও।' আবার ভাবে, এই স্বামীই বলেছিল মায়ের কাছে থাকবে, কিন্তু দুপুরেও এখানে খেয়েছে, রাতেও এখানে রুটি খেয়ে এখন বিছানা নিয়ে এসেছে আমার কাছে শোবে বলে। যদি কাছে ঘেঁসতে না দিই তাহলে বাচ্চাদের ও আমাকে হয়ত ত্যাগ করে মায়ের কাছেই চলে যাবে। বোধহয় এই দিকটা ভেবেই মহাদেবায়াজী বলেছিলেন, ও মায়ের কাছে দু'দিনের বেশী থাকবে না, এখানেই ছুটে আসবে। সুতরাং নিজের সন্তান-দের বাঁচাতে হলে মুখ বুঁজে এই স্বামীর আবদার সহ্য করতেই হবে। সন্নেনহল্লী যাতায়াতের পরিশ্রম, সকাল থেকে সংসারের খাটুনী, খিদের জ্বালা, তার ওপর গর্ভের ভার, সব মিলিয়ে নন্‌জম্মার দেহটা পড়ে রইল অর্ধমৃতের মত। কিন্তু তাই বলে চেন্নিগরায়ের তো ক্লান্ত হবার কোন কারণ ঘটেনি!

আজ হঠাৎ নিজের বাবাকে মনে পড়ে গেল নন্‌জম্মার। বাবার ছিল দৈত্যের মত স্বভাব. একেবারে বেপরোয়া। রেগে গেলে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, মা কারো সম্বন্ধে কোন হুঁশ থাকত না, চোখ কান বুজে প্রহার করে বসতেন। কিন্তু আবার কারো কষ্ট দেখলে মন গলে যেত তাঁর। লোকে বলে কল্লেশের যখন প্লেগ হয়েছিল, সারারাত তিনি ছেলের মাথা কোলে নিয়ে বসেছিলেন। তা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি তো হতেই পারে, কিন্তু স্ত্রী খেতে পেয়েছে কি না, ছেলে-মেয়েদের খাওয়ার ব্যবস্থা ঘরে আছে কি না, এটুকু জানার ইচ্ছাও যে স্বামীর নেই তার সঙ্গে কি ঘর করা যায়? এমন সংসারে কি বাঁচতে ইচ্ছা করে? অক্কম্মার কথা মনে পড়ল। জন্মের পর মায়ের দুধও জোটেনি ভাগ্যে। তাকে জন্ম দিয়েই চোখ বুঁজেছে মা, অক্কম্মাই তো মানুষ করে তুলেছে। সত্যি যদি কারো প্রাণের টান থাকে তো সে ঐ অক্কম্মারই আছে। পঁচাত্তরের ওপর বয়স হয়ে গেল তার ওঁকেই এখানে আনিয়ে নেওয়া উচিত। কিন্তু নিজেদেরই তো খাওয়া জোটে না, অক্কম্মাকে এনে খাওয়াবে কি? কিন্তু তাহলে প্রসবের সময় দেখবেই বা কে? এখন নাগলাপুর যাওয়া আর সম্ভব নয়। অক্কম্মা এলে মাসখানেক অন্তত তার ও বাচ্চাদের একটু সেবা-যত্ন হবে। কিন্তু বাড়িতে যে খাবার কিছুই নেই! একফোঁটা রেড়ির তেল, এতটুকু সিকাকাই-এর গুঁড়ো পর্যন্ত নেই। এইসব ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল, হাঁড়ি তো খালি, সকালে উঠেই বাচ্চাদের কি দেওয়া যায়? নিজেরও পেটের ভিতরটা যেন জ্বালা করে

উঠল। একপাশ ফিরে শুয়ে-শুয়ে শরীরের ডান দিকটা ব্যথা করছে। বাঁদিকে পাশ ফিরতেই চোখে পড়ল স্বামীদেবতা হাত-পা ছড়িয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। দৃশ্যটা অসহ্য মনে হল তার। অন্ধকারেই নিজের সতরঞ্চি আর বালিশ তুলে নিয়ে বাচ্চাদের ওপাশে গিয়ে পার্বতীর গায়ে একখানা হাত রেখে শুয়ে পড়ল নন্‌জম্মা।

৬

সকালে উঠে ঘড়ার জলে মুখ হাত ধুয়ে বাচ্চাদের মুখ ধোয়াল নন্‌জম্মা, তারপর শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল তাদের। রান্নাঘরে গিয়ে উনুনের ছাই বার করে পোড়া কয়লা আলাদা করে নিয়ে সেই ছাই দিয়ে আগের দিনের রান্নার বাসনগুলো মেজে ফেলল। রুটির পাত্রটায় রাত্রে জল ঢেলে রাখা হয়নি, তাই আটা শুকিয়ে রয়েছে, জল ঢালল তার মধ্যে। মাঝের ঘরে স্বামী তখনও পথের দিকের দরজা জুড়ে পা ছড়িয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। কোনরকমে দরজাটা আধখোলা করে সামনেটা মুছে নিল। রঙ্গোলীর গুঁড়ো নেই বাড়িতে, প্রতিবেশিনী চেন্নাশট্টীর বৌয়ের কাছ থেকে একটু গুঁড়ো চেয়ে নিয়ে দরজার সামনে 'মঙ্গল-চিহ্ন' এঁকে তারপর চুপচাপ বসে রইল। কেউ কোথাও নেই। আজ সবাইকার পেটের জ্বালা শান্ত করার কি ব্যবস্থা হবে কিছুই ভেবে পেল না সে।

পথে একটা মোষের ডাক শুনে ঘুমটা ভেঙে গেল চেন্নিগরায়ের—'দুত্তোর, তোর মায়ের ······' বলতে বলতে উঠে বসল সে। বিছানায় বসে বসেই দু হাত ঘষতে ঘষতে 'কোশল্যা সুপ্রজা রাম' ইত্যাদি বলে তারপর 'পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং' উচ্চারণ করে শয্যা-ত্যাগ করল এবং চলে গেল বাঁধের দিকে। নন্‌জম্মা বিছানা তুলছে, এমন সময় মহাদেবায়াজী এসে হাজির, কাঁধে এক মস্ত ঝোলা। থামের পাশে ঝোলাটা নামিয়ে বললেন, 'আমি দূরে ভিক্ষায় যাচ্ছি আজ। এতে বিশ সের মড়ুয়া আর চার সের বরবটির ডাল রইল।' আজকের জন্য ঘরে কোন সংস্থান ছিল না, এখন খাদ্যের ব্যবস্থা হল দেখে মনটা খুশি হলেও নন্‌জম্মাও বলে উঠল, 'অইয়াজী, আপনি কালও দিয়েছেন, আজকেও এত জিনিস এনেছেন। আপনিও তো গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করেন, এ সব আমি শোধ করব কি করে?'

'আমার আর কিসের খরচ মা, তুমি তো জান সবই। গ্রামে আমার মত কোন সাধু-সন্ন্যাসী এলে তাঁদেরই কিছু কিছু দিই। এতে তোমাদের আট-দশ দিন চলে যাবে। রান্না শুরু করে দাও।' এরপর ঈশ্বর একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করবেন।' মহাদেবায়াজী ভিক্ষায় বেরিয়ে পড়েন।

গতকাল মহাদেবায়াজী যে কুলোখানা এনেছিলেন সেটা বাড়িতেই রয়েছে, সের দুই মড়ুয়া তাইতে করে ঝেড়ে বেছে পিষতে বসে যায় নন্‌জম্মা। জাঁতা একটা রয়েছে এ বাড়িতে। কিন্তু একটু পিষতে না পিষতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে, কাল সারাদিন তো পেটে কিছু পড়েনি। মিনিট পাঁচেক জিরোতে থাকে। ইতিমধ্যে স্বামী ফিরেছে। মড়ুয়া এল কোথা থেকে? কে আনল? এসব সম্বন্ধে তার কোন আগ্রহই নেই। বেশ নিশ্চিন্ত মনে বারান্দায় বসে পকেট থেকে পান ও তামাকের কৌটো বার করল সে।

ননজম্মা বলে উঠল, 'আমি পিষতে পারছি না, এই মড়ুয়াটা পিষে দেবে একটু?'

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দ্বিতীয়বার বলায় চেন্নিগরায় খিঁচিয়ে উঠল, 'ছেলেরা জাঁতা ঘোরায় কখনো? আমাকে কি মেয়েমানুষ পেয়েছিস?'

কিছুতেই ধৈর্য হারালে চলবে না, সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে আর কথা বাড়াল না ননজম্মা। তাঁতীপাড়ায় গিয়ে ডেকে আনল পুট্টব্বাকে। দু পয়সায় এক কুলো ভর্তি মড়ুয়া পিষতে রাজি হয়ে জাঁতার সামনে বসে পড়ল পুট্টব্বা। ননজম্মা গেল চেন্নাশেট্টীর দোকানে, লঙ্কা, ধনে, নুন, তেল ইত্যাদি মোট এক টাকার জিনিসপত্র কিনে ফিরে এল। তারপর রাঁধতে বসল সে। বেলা এগারটা নাগাদ বরবটির ডাল, মড়ুয়ার ডেলার 'লোন্দা' আর রামন্নার জন্য রুটি তৈরী হয়ে গেল। গতকাল কারো স্নান হয়নি। আজ কুয়ো থেকে জল তুলে বাচ্চাদের স্নান করিয়ে, নিজে নেয়ে ধুয়ে শাড়ী বদলে ভিতরে এসে দেখে স্বামী আজও কেবল নিজের পাতাটি পেতে লোন্দা ভোজনে বসে গেছে। বাচ্চাদের ও তার নিজের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখবার কথা ননজম্মা মুখ ফুটে বলল না। সাতখানা লোন্দা করেছিল সে, দেখা গেল তিনখানা মাত্র পড়ে আছে। ননজম্মা পার্বতীকে নিয়ে, ডাল বের করে খেতে বসল। পার্বতী আধখানা মাত্র খেল, সে নিজে কোনমতে সেই মড়ুয়ার ডেলা দেড়খানা খেল। ওদিকে রামন্না আর রুটি খেতে চাইছে না, 'ভাত খাব' বলে কান্না জুড়েছে। 'দোকান থেকে দেড় আনায় এক সের চালও আনা উচিত ছিল', ভাবতে ভাবতে খাওয়া শেষ করল ননজম্মা। মড়ুয়ার ডেলা খেয়ে কেমন যেন বমি পাচ্ছে তার, বারান্দায় সতরঞ্জিটা পেতে শুয়ে পড়ল সে।

রাত্রের রান্নার জন্য কাঠ নেই। কাল মহাদেবায়াজী যা এনে দিয়েছিলেন শেষ হয়ে গেছে। চেন্নিগরায় আড় হয়ে শুয়ে পড়ে আছে। ননজম্মা তাকে বলল, 'উঠে একটু কাঠ এনে দাও।'

'কোথায় এখন কাঠ খুঁজব আমি? পারব না।'

'এমন করলে চলে কখনো? কারো বাগানে গিয়ে একটু নারকেলের শুকনো ডাঁটা, পাতা চেয়ে একটা বোঝা বেঁধে নিয়ে এস।'

'অত যদি দরকার থাকে, নিজেই যা না। আমার দ্বারা হবে না ওসব', মড়ুয়ার লোন্দা হজম করার চেষ্টায় নিদ্রাদেবীর আরাধনা শুরু করে চেন্নিগরায়। কারো বাগানে কাঠ খুঁজতে গেল না ননজম্মা। প্রতিবেশিনী চিন্নৈয়ার বৌকে বলতেই সে একটা ঝুড়ি ভরে নারকেলের ডাঁটা, পাতা, বেশ কয়েকটা ছোবড়া ইত্যাদি দিল। এবার চেন্নাশেট্টীর দোকানে গেল সে চাল কিনতে—

'চালের দর কত চেন্নাশেট্টী?'

'মিহিচাল টাকায় ন'সের, মোটা চাল টাকায় বারো সের।'

চার আনায় তিন সের মোটা চাল কিনে বাড়ি ফিরে এল। রাত্রের জন্য আধ সের চালের ভাত হল। পার্বতী আর রামন্না ভারি খুশি। চিন্নৈয়ার বৌ রঙ্গম্মা আধ হাঁড়ি মাঠাও দিয়েছে। বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর এল চেন্নিগরায়। কি ভাগ্য যে ওদের খাওয়ার আগেই সে এসে হাজির হয়নি।

মহাদেবায়াজী যা দিয়েছেন তাতে আট-ন' দিন চলে যাবে, কিন্তু তারপর? ভেবে কোন কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। আগামী কাল রামসন্দ্রের হাট বসবে। নন্‌জম্মা স্থির করল কিছু বাসন-পত্র কেনা দরকার। পরদিন খাওয়া-দাওয়া পর ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সে চলল হাটের উদ্দেশ্যে। গ্রাম থেকে প্রায় পৌনে মাইল দূরে বড় গাছ গুলোর তলায় তিপটুরের মুসলমান ব্যাপারীরা এল্যুমিনিয়মের বাসন বেচতে আসে, কথাটা শোনা ছিল। একে ওকে জিজ্ঞাসা করতে করতে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেল সে। খাবার থালা, চারটে গেলাস, একটা হাতা, স্নানের ঘটি ইত্যাদি কিনতে খরচ হল মোট সওয়া টাকা। বাচ্চাদের কান্না থামাতে পাই পয়সা দিয়ে চিনির মিঠাই আর একটা করে ঝুমঝুমি কিনে দিল। ফেরার পথে প্যাটেল গুণ্ডেগৌড়জীর সঙ্গে দেখা, জিজ্ঞাসা করলেন, 'খবর ভাল তো মা?'

'সব ভাল। চলুন, বাড়িতে চলুন।'

গৌড়জী বাসনের বোঝা নিয়ে নিলেন ওর হাত থেকে। রামন্নাকে কাঁধে তুলে ওঁর পিছু পিছু বাড়িতে এসে তালা খুলল নন্‌জম্মা। এদিক ওদিক দেখে গৌড়জী বললেন, 'পেট চালাবার মত কিছু ব্যবস্থা হয়েছে কি?'

'সেই কথাই তো বলতে চাই আপনাকে।'

'সে দিনই বললে না কেন? বিশ-পঁচিশ সের মড়ুয়া দিয়ে দিতাম।'

'কিন্তু সে রকমভাবে ক'দিন চলতে পারে?' একটু ভেবে নন্‌জম্মা আবার বলে, 'ওভাবে সাহায্য করবেন না। আমি একটা উপায় বলি? তাতে আপনারও অসুবিধা নেই, আমাদেরও উপকার হবে।'

'কি উপায় বল তো মা?'

'আপনার দেয় খাজনা তো আশি টাকা, তাই না?'

'হ্যাঁ, তাতে কি?'

'এক কাজ করুন, 'এ বছরের খাজনার পঞ্চাশ টাকা পেয়েছি' এই মর্মে এঁর কাছে একটা রসিদ লিখিয়ে নিন। সেই পঞ্চাশ টাকায় আমাকে মড়ুয়া, বরবটির ডাল, লঙ্কা আর সম্ভব হলে কিছুটা ধান দিন, তাতেই আমাদের সংসার চলে যাবে।'

'রসিদ লিখিয়ে নেব, কিন্তু তারপর সরকারী খাজনার টাকা পুরো করবে কি করে?'

বর্ষাসনের একশ কুড়ি টাকা আমরা পাই তো? তার থেকেই সরকার কেটে নেবে ঐ টাকাটা।'

গৌড়জীর বেশ পছন্দ হল কথাটা, খুশি হয়ে বললেন, 'তোমার তো একেবারে দেওয়ান-গিরি করার মত বুদ্ধি আছে দেখছি।' স্বামী এখন নিশ্চয় মহাদেবায়াজীর মন্দিরে বসে আছে, পার্বতীকে দিয়ে নন্‌জম্মা খবর পাঠালো, বাড়িতে গুণ্ডেগৌড়জী এসেছেন, চেন্নিগরায়কে ডাকছেন। এলো চেন্নিগরায়, এসেই গৌড়জীর কাছে তামাকপাতা নিয়ে চিবোতে শুরু করল। গৌড়জী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার খাতাপত্র কোথায়?'

'সে সব তো এখানে নেই।'

'তবে কোথায় আছে?'

'সে সব তো মায়ের কাছে।'

'কি মুশকিল! পাটোয়ারী কাজটা কি ছেলেখেলা পেয়েছ না কি? তুমি যেখানে আছ, খাতাপত্রও সেখানে থাকার কথা। খাতাপত্র রাখার জন্যই তো বাড়িখানা দিয়েছি তোমায় —সরকারী আইন জান তো? যাও চটপট গিয়ে খাতাগুলো নিয়ে এস।'

পাটোয়ারীজীকে যেতে হল হনুমান মন্দিরে। কিন্তু গঙ্গম্মা খাতার বোঝা কিছুতেই দেবে না। প্যাটেল গুণ্ডেগৌড়জী খাতা নিয়ে যেতে বলেছেন শুনে সে নিজেই চলে এল এ বাড়িতে। সরকারী আইনের কথা বলতেই গঙ্গম্মা বলে উঠল, 'তাহলে আমিও এখানে এসে থাকব।'

'তা থাকুন না, আমার কি!' গৌড়জী বলেন।

কিন্তু এবার আপত্তি জানায় নন্‌জম্মা, সে বলে, 'তা হবে না। আপনিই আগে আমাদের আলাদা করে দিয়েছেন, তাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন আপনি আলাদাই থাকুন, আমরাও আলাদা থাকব।

'দেখছ গুণ্ডেগৌড়জী, শুনছ তো এই ছেনালের কথা?'

'দেখ গঙ্গম্মা, পাটোয়ারী কাজের সমস্ত হিসাব লেখে এই মেয়ে, সরকারী রেকর্ড রাখার জন্য এ বাড়ি আমি একেই ব্যবহার করতে দিয়েছি, অন্য কাউকে নয়। তুমি শুধু শুধু মুখখারাপ কোর না।' গৌড়জীর এই কথাগুলো শুনে আরো উচ্চৈঃস্বরে গালাগাল দিতে দিতে গঙ্গম্মা ফিরে যায় হনুমান মন্দিরে। চারবার যাতায়াত করে খাতার বোঝা মাথায় চাপিয়ে এ বাড়িতে নিয়ে এল চেন্নিগরায়, কিন্তু যে বাক্‌সটায় খাতাগুলো রাখা থাকত সেটা কিছুতেই হাতছাড়া করল না গঙ্গম্মা। সব খাতা এসে পৌঁছবার পর গৌড়জী বললেন, 'ওহে বোকারাম, এত বছর পাটোয়ারীগিরি করছ আর এটা জাননা যে সরকার কুলি খরচা দেয়?'

পাটোয়ারী কোন উত্তর দিল না। প্যাটেল আবার বললেন, 'এই এতগুলো খাতা তুমি মাথায় করে বয়ে নিয়ে এলে? কুলির মাথায় চাপিয়ে আনতে পারতে তো? নিজের অধিকার কতটা তাও খবর রাখ না! নাও, এখন কাগজ-কলম নিয়ে বস। হ্যাঁ, কি কি লেখাতে চাও মা, তুমিই বলে লিখিয়ে নাও।'

কলম হাতে নিল পাটোয়ারী। স্ত্রী বলে গেল, 'রামসন্দ্র উপবিভাগ কুরুবরহল্লীর প্যাটেল গুণ্ডেগৌড়জীর নিকট হইতে তাঁহার বার্ষিক রাজস্বের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা পাইয়াছি। আদায়ের সময় এই অঙ্ক বাদে বাকি রাজস্ব আদায় করিয়া আপনার হিসাবে লিখিয়া দিব। —পাটোয়ারী চেন্নিগরায়। তারিখ ......।' যা যা বলা হল সব লিখে পাটোয়ারী গৌড়জীর হাতে দিল কাগজখানা। কি লেখা হল এবং কি তার মানে, সেটা বুঝতে চেন্নিগরায়ের প্রায় দশ মিনিট সময় লাগল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হল, 'তা টাকাটা কই মশাই?'

'টাকা ঠিক আছে, সে তোমায় ভাবতে হবে না, এখন চুপ করে থাক।' গৌড়জীর জবাব শোনার পরও চেন্নিগরায় অনেকক্ষণ ধরে গজ গজ করল মনে মনে।

পরদিন গাড়ি ভরে জিনিসপত্র এনে বাড়িতে নামিয়ে দিলেন গুণ্ডেগৌড়। নন্‌জম্মাকে ডেকে বললেন, 'এই দেখে নাও মা, চার খণ্ডি মড়ুয়া চব্বিশ টাকা, বরবটি আট টাকা, এক মন লঙ্কা তিন টাকা, কত হল মোট?'

'পঁয়তিরিশ টাকা।'

'এই নাও আরো পাঁচ টাকা, চল্লিশ হল তো? আর বাকি দশ টাকার নারকেল দিয়ে যাব। ধান এবার আমার থাকবে না কিছু, তুমি দোকান থেকে চালটা কিনেই নিও।'

খুব খুশি হল নন্জম্মা। এই পাঁচটা টাকা, আগেকার দু'টাকার সঙ্গে মিলিয়ে ন্যাকড়ায় বেঁধে কড়িকাঠের ফাঁকে লুকিয়ে রেখে দিল।

৭

গর্ভের আটমাস চলছে এখন। দুপুরবেলা নন্জম্মা বসে বসে মর্দুমশুমারীর খাতায় লাইন টানছিল। পেটটা এত বড় হয়ে পড়েছে যে, উপুড় হয়ে বসে রেখা টানা মুশকিল। বেচারা বার বার বসার ভঙ্গি বদলে বদলে বহু কষ্টে কাজ করে যাচ্ছে, ওদিকে পাশের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে চেন্নিগরায়ের নাসিকা গর্জন।

হঠাৎ গঙ্গম্মা এসে হাজির। সেই যেদিন গুণ্ডেগৌড়জী খাতাপত্র আনিয়েছিলেন তারপর থেকে আর কোনদিন এ বাড়িতে আসেনি সে। আজ হঠাৎ এসেই, বলা নেই, কওয়া নেই, চটপট একটা পাত্রে থলি থেকে মড়ুয়া বের করে ভরতে শুরু করে দিল। মিনিট-খানেক দেখার পর নন্জম্মা বলল, 'এটা কি করছেন মা?'

'কি আবার করব, মড়ুয়া নিচ্ছি। তুই জিজ্ঞেস করবার কে শুনি?'

'আগে থলি রাখুন, তারপর ওদিকে দাঁড়িয়ে কথা বলুন। আমাকে না বলে আমার ভাঁড়ারে হাত দিয়েছেন কেন?

'এটা কি তোর বাপের তৈরী বাড়ি? এই শিখণ্ডী, রাঁড়ের পুত, শুনতে পাচ্ছিস নে তুই? আজ ঘরে কিছু নেই, তাই উনুন জ্বলেনি আমার। একটু মড়ুয়া নিতে এসেছি তাইতে কথা শোনাচ্ছে! যেন ওর বাপের দেওয়া জিনিস। কুরুবরহল্লীর গুণ্ডেগৌড় আমাদের প্যাটেল। বিনা পয়সায় দিয়ে গেছে বলেই তোর মড়ুয়া হয়ে গেল নাকি?'

ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙে উঠে চেন্নিগরায় বলে, 'যাক গে, নিচ্ছে তো নিক। দুত্তোর তোর মায়ের···

'গুণ্ডেগৌড়জী বিনাপয়সায় দেননি। খাজনা থেকে পয়সা কেটে নেবেন বলে কথা দিয়ে আমি আনিয়েছি।'

'পাটোয়ারীর কাজটা আমার স্বামীর ছিল, তোর বাপের নয়, বুঝলি রে হতচ্ছাড়ি ছেনাল?' শাশুড়ী বলে।

'ঘোড়ায় চড়ে এসে আমার বাবাই সেটা পাইয়ে দিয়েছিল। না হলে কোনদিনও এ-কাজ হাতে আসত না, তাও জেনে রাখবেন। চোখে তেল দিয়ে দিয়ে রাত জেগে হিসেব লিখি আমি। আমার বাড়ির ভাঁড়ারে হাত লাগালেই আমি গুণ্ডেগৌড়জীকে খবর পাঠাব।'

'সকাল থেকে আমার খাওয়া হয়নি, এখন কি করব বলতে পারিস ছেনালের বেটি?'

নন্জম্মা বলে ওঠে, 'কেন শিবেগৌড় নয়ত কাশিমবদ্দির কাছে যান না। নয়ত রেবন্নাশেট্টীর কাছে চেয়ে দেখুন।'

কথাটার ব্যঙ্গ ধরতে পারে না গঙ্গম্মা। সে গিয়ে হাজির হয় শিবেগৌড়ের বাড়ি। এদিকে শাশুড়ী চলে যাবার পর অস্বস্তি বোধ করে নন্‌জম্মা। সকাল থেকে উপোষ করে আছেন শুনেও খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়াটা উচিত হয়নি তার। একটা কুলোয় তিন সের মড়ুয়ার আটা ঢেলে, স্বামীকে বলে শাশুড়ীকে দিয়ে আসতে। চেন্নিগরায় কুলোটা নিয়ে চলে যায় মায়ের আস্তানার দিকে।

এদিকে গঙ্গম্মা সোজা শিবেগৌড়ের বাড়িতে এসে ঘোষণা করে, 'আজ সকাল থেকে আমার উনুন জ্বলেনি। পঁচিশ সের মড়ুয়া দাও আমাকে।'

'মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোমার? হঠাৎ পঁচিশ সের মড়ুয়া দেব কোথা থেকে?'

'ওরে রাঁড়ের পুত, তোর সর্বনাশ হোক। আমার সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে এখন এই কথা? দেখে নিস, বংশ-লোপ হবে তোর।'

'তোমার সম্পত্তির জন্য পয়সা খরচ হয়নি আমার? মুখ সামলে কথা না বললে ঘাড় ধরে দূর করে দেব।'

এবার শিবেগৌড়ের স্ত্রী গৌরম্মা মধ্যস্থতা করতে আসে। স্বামীকে বলে, 'ও ঐ সব বলছে বলে তুমি শুদ্ধ মুখখারাপ করছ কেন? তুমি চুপ করে যাও।'

গৌরম্মার আশঙ্কা ঐ বুড়ি পথে দাঁড়িয়ে মাটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে শাপ-শাপান্ত করবে এবং তার ফলে তার সংসারে কিছু না কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে নিশ্চয়। প্যাটেলেরও গঙ্গম্মার সঙ্গে কলহের বাসনা ছিল না। সে স্ত্রীর কথামত চুপ করে গেল। চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে বাড়ির পিছন দিকে ঘুরতে গেল সে। গৌরম্মা দু'কুলো ভর্তি মড়ুয়া একটা চুবড়িতে ঢেলে গঙ্গম্মার সামনে এনে রেখে বলল, 'ওঁর কথায় কিছু মনে করবেন না, এটা নিয়ে যান আপনি।'

রাগের মাথায় গঙ্গম্মা ঠিক করতে পারছিল না মড়ুয়াটা নেবে কি না। কিন্তু গৌরম্মার দ্বিতীয়বার অনুরোধের পর সে চুবড়ীটা মাথায় তুলে নিয়ে হনুমান মন্দিরে নিজের আস্তানার দিকে রওনা দিল।

চেন্নিগরায় ততক্ষণে মড়ুয়ার আটা ভরা কুলোটা অপ্পন্নায়ার কাছে দিয়ে মহাদেবায়াজীর মন্দিরে গিয়ে বসে পড়েছে। নন্‌জম্মা আবার মাথা নিচু করে খাতায় লালকালির রেখা টেনে চলেছে, এমন সময় কার যেন ছায়া পড়ল দরজার কাছে। মাথা তুলে দেখে মড়ুয়ার আটার কুলোটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গঙ্গম্মা। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে আটার রাশি বৌয়ের মাথার ওপর ঢেলে দিয়ে কুলোটা সজোরে ছুঁড়ে মারল তার মুখে— 'তুই কি ভেবেছিস, তোর দেওয়া ভিক্ষের আটা খাব আমি? ছেনাল কোথাকার, কি মনে করিস তুই গঙ্গম্মাকে?' চেঁচাতে চেঁচাতে চলে গেল সে।

মাথা, হাত, পা, খাতা, লালকালির দোয়াত সব আটায় মাখামাখি। নন্‌জম্মার একবার ইচ্ছা হল শাশুড়ীকে ধরে আনে, তারপর পাঁচজনকে ডেকে দেখায় অবস্থাটা। কিন্তু না, ঘরের কলহ বাইরে বলতে নেই। শুধু শুধু গ্রামের লোকের হাসির খোরাক যোগানো হবে। আজও হয়ত কত লোক হেসেছে। চুপচাপ থাকাই ভাল। উঠে শাড়ি-খানা ঝাড়ল সে। ভাগ্য ভাল যে, সমস্ত আটা তালপাতার চাটাইটার ওপরেই পড়েছে,

সেই চাটাই পেতে ও বসেছিল। খাতাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করল। সমস্ত আটা একত্র করে তুলে ফেলল। তারপর কালির দোয়াত আর কলম ধুয়ে রেখে নিজেও স্নান করল। চেন্নাশেট্টীর দোকান থেকে তিন পাইতে দুটো লাল কালির মোড়ক কিনে এনে আবার নতুন করে কালি গুলে নিয়ে বসে গেল লাইন টানতে।

৮

এই ঘটনার দিন তিনেক পরে সকালবেলা নন্‌জম্মা রান্নায় ব্যস্ত, বেলা প্রায় দশটা হবে, এমন সময় হঠাৎ বাইরে ডাক শোনা গেল 'নন্‌জু'। মনে হচ্ছে যেন অক্কম্মার গলা? ছুটে বাইরে এল নন্‌জু—যা ভেবেছে ঠিক তাই, মাথায় একটা শাড়ীর পোঁটলা নিয়ে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অক্কম্মা। তার পিছনে দু'জন মুটে, তাদের ঘাড়েও মস্ত মস্ত বস্তা। নাতনীকে দেখেই অক্কম্মা মুটেদের বোঝা নামিয়ে রাখতে বলে। তারপর অভিযোগ করে; 'হ্যাঁরে নন্‌জু, ছেলে-পুলে হবে, তা আমাকে একটা খবর দিতে নেই? এসব সুখ-দুঃখের কথা কি লুকোতে আছে রে?'

'এই তো খবর পাঠাব ভাবছিলাম। চলো চলো ভেতরে এসো। কাপড় বদলাবে তো?'

'সে সব পরে হবে'খন। তোর রান্না হয়েছে কি? তাহলে এদের দু'জনকে খেতে বসিয়ে দে। ওরা আবার গ্রামে ফিরে যাবে।'

ডাল ফুটছিল। আটার ডেলার লোন্দা তখনও হয়নি। রান্নাঘরে গিয়ে উনুনের আঁচটা জোর করে দিল নন্‌জু। মিনিট পনের পরেই খাবার তৈরী। মুটেরা ততক্ষণে পুকুর থেকে হাত-পা ধুয়ে এসেছে। নন্‌জু তাদের পরিবেশন করতে লাগল। অক্কম্মা বলে, 'মাঠা নেই বুঝি?'

'কোথা থেকে আসবে?' জবাব দেয় নন্‌জু।

লোক দুটির খাওয়া হয়ে যাবার পর অক্কম্মা তাদের একজনকে ডেকে বলে দেয়, 'দেখ হোন্ন, লক্কাকে যা বলতে হবে মনে করিয়ে দিস। আর গিয়েই কল্লেশ বলবি, এখানে দুধের দরকার, গরু নেই। পোয়াতির জন্য দুধ চাই। বাড়িতে যে সাদা গরুটা আছে না? যেটার একমাস আগে বাচ্চা হয়েছে, সেই গরুটা যেন পাঠিয়ে দেয়। নন্‌জুর বিয়ের সময় ঐ গরুটার মাকে দান করা হয়েছিল, কিন্তু তখন এখানে পাঠানো হয়নি। কল্লেশকে বলবি যে, আমি বলেছি, এখন অন্তত সেই গরুর সন্তান নন্‌জুর কাজে লাগুক।'

মুটেরা চলে যাবার পর ঠাণ্ডা জলে স্নান করে ভিজে লাল শাড়ী পরেই কপালে বিভূতি লাগায় ও তিনবার আচমন করে নেয় অক্কম্মা। তারপর ভিজে শাড়ীখানা শুকোবার জন্য রান্নাঘরে গিয়ে উনুনের সামনে বসে পড়ে। নন্‌জু জিজ্ঞাসা করে এবার, 'তুমি খবর পেলে কি করে?'

আমাদের গাঁয়ের তাঁতী তম্ময়া শেট্টীর বাড়িতে এ গ্রামের একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। সাত-আট দিন আগে পুকুর ঘাটে তিরুমলম্মার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। তার কাছে গল্প করেছে, তোরা নাকি এখন কুরুবরহল্লীর প্যাটেলের বাড়িতে রয়েছিস, সাত-আট মাস

পোয়াতি। শাশুড়ী নাকি একখানা বাসন-কোসনও দেয়নি তোকে? কল্লেশ তো আগেই বলেছিল আমাকে যে, জমি-জেরাত সবই যাবে।'

'গ্রাম থেকে কবে রওনা হয়েছ তুমি?'

'কালই বেরিয়েছি। বিকেলবেলা ঝড়-জল এল, তাই টিলার ওপারে হুবিনহল্লীর প্যাটেলের বাড়ির বারান্দাতেই শুয়ে রাত কাটিয়েছি তিন জনে। প্যাটেলের বউ ওদের দু'জনকে রাত্রে খাইয়েছে, আর আমাকেও নারকেল কোরা আর গুড় দিয়েছে।'

বাচ্চারা এতক্ষণ বাইরে খেলছিল, এবার ভিতরে এল দু'জনে। রামন্নার মনে থাকার কথাও নয়, কিন্তু পার্বতীর বেশ মনে আছে অক্কম্মাকে। দেখতে দেখতে আধ ঘন্টার মধ্যে বাচ্চাদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল অক্কম্মার। চেন্নিগরায়ের দেখা পাওয়া গেল খাবার সময়। 'ভাল আছেন তো?' এইটুকুর বেশী আর কিছু বাক্যালাপ হল না দিদিশাশুড়ীর সঙ্গে। অক্কম্মাও বিশেষ আমল দিল না তাকে। খাওয়ার পর আজ আর বাড়িতে না শুয়ে মহাদেবায়াজীর মন্দিরের বারান্দায় চলে গেল চেন্নিগরায়। অক্কম্মা এবার সঙ্গে আনা বস্তাগুলো খুলে ফেলল। একটাতে তামা ও পিতলের বাসন ভরা— চারটে বড় ও ছোট পরাত, পিতলের দুটো ঘটি, একটা ঘড়া, তামার পঞ্চপাত্র, দুটো ডেকচি, হাঁড়ি সব আছে। একটা লোকে যতখানি বয়ে আনতে পারে ততটা বাসন এনেছে অক্কম্মা। অন্য গাঁঠরিতে চিঁড়ের পোহা, মুড়ি, গুড়ের ভেলি ইত্যাদি আহার্য। তা ছাড়া আছে পনের সের ভাল বাসমতী চাল।

'এত সব কেন আনলে, অক্কম্মা?'

'কল্লেশ বলল, 'ছেলেপিলের বাড়ি, চিঁড়ে, মুড়ি সব ভেজে নিয়ে যাও। তাছাড়া খেতে গুড় তো তৈরীই হচ্ছে। গণেশ-ভেলিতে বাড়ির তিনটে বড় বড় ঘড়া ভরে গেছে। ওই-ই তো চাল আর গুড় বেঁধে দিল।'

'আর এই এত বাসন?'

কল্লেশ যখন পুলিশে চাকরী করত, সেই সময়ে দানে যে বাসন পেয়েছিল, সেগুলো আমি পিপের মধ্যে ভরে ছাদের ঘরে রেখে দিতাম, কেউ জানতে পারেনি। তোর এই অবস্থা শোনার পর থেকে রোজ কমলা যখন ঘাটে যায় সেই সময় একটু একটু করে বাসন বার করে হোন্নার বৌয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতুম। এখন আসার পথে সবাইকার নজর বাঁচিয়ে লক্কাকে দিয়ে চৌডেনহল্লীর পথে হোন্নার কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে বলেছিলাম।'

'কিন্তু এসব তোমার আনা উচিত হয়নি অক্কম্মা। টের পেলে কল্লেশভাইয়া কখনো চুপ করে থাকবে না।'

'সে টেরই পাবে না, তুই চুপ করে থাক। কন্ঠীও দানে বাসন পেয়েছিল' বলতে বলতে ছেলের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় বুড়ির দু'চোখে জল ভরে আসে। সে বলে ওঠে, 'হতভাগাটা কোথায় যে চলে গেল! কি যে করে বসল! চিরকালটা এই করে বেড়ালো, ঘরে দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসে ভগবান যা দিয়েছেন তাই নিয়ে খুশি থাকবে, তা তো হবার নয়!'

বাবার কথা মনে পড়তে নন্‌জুরও মন কেমন করে ওঠে,—'বাবার কি কোন খবরই পাওয়া যায়নি?'

'কিচ্ছু না, লোকে বলে, সে কি আর আছে? হয়ত মরেই গেছে। কিন্তু সে কখনো মরতে পারে? সে যে ভোজরাজের মত বীরপুরুষ।'

'কক্ষণো মরেনি, ওসব বাজে কথা' নাতনীর এ কথায় অক্কম্মা একটু ভরসা পায়।

অক্কম্মা বেশ ক্লান্ত। কিন্তু ঘরে তো মাদুর নেই। আচার পরায়ণা অক্কম্মা আবার তালপাতার চাটাইতে শোবে না। অগত্যা মেঝেতেই শুয়ে পড়ল সে। নন্জু জিজ্ঞাসা করল, 'বৌদিদির খবর কি?'

'স্বভাব কখনো বদলায়? তোর বাপের অযথা তাড়া-হুড়োর ফলে এইটি হল। কি আর বলব! অগ্রপশ্চাৎ কিছুই চিন্তা করলে না, কোথাও একটু খোঁজখবর পর্যন্ত করলে না। এখানে এল আর হুট করে তোর বিয়ে দিয়ে ফেলল। ওখানে গেল আর হুট করে ঐ বৌ নিয়ে এল। সে খেয়ে-দেয়ে বেশ আছে। দুধ দুয়ে রাখি, চুরি করে দুধ খায়। চুরি করে মাখন গেলে এত এত। হপ্তায় একবার খুব কষে তেল মাখে, নিজেই জল তুলে মাথায় ঢালে, আমাকে ঢালতে দেয় না। তা এত সব করেও ছেনাল মেয়েটার পোয়াতি হবার তো কোন লক্ষণই নেই।'

'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা আছে তো?'

'বনিবনা! ছোটঘরে শুয়ে সমানে গাল দেয়। মাঝে মাঝে ধরে খুব ঠ্যাঙায়। বৌ তখন আমাকেই শাপান্ত করতে থাকে, আমি নাকি নাতিকে মারতে শিখিয়ে দিয়েছি। ছেলেটাকে যদি বলি, "হ্যাঁরে, বৌকে অমন করে মারধোর করাটা ঠিক নয়।" তা আমাকেই খিঁচিয়ে ওঠে "ঐ ছেনালকে না পিটিয়ে টিট করা যাবে না। তুমি চুপ করে থাক।" সেই কেম্পীকে মনে আছে তোর? সেই যে অচ্ছুতকালার মেয়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন?'

'লোকে বলাবলি করছে কল্লেশ নাকি তার সঙ্গে আখের খেতে মেলামেশা করে। তাঁতীপাড়ার মায়গ মরে গেছে আজ তিন বছর হল। তার বৌ আর দুটো ছোট ছোট বাচ্চা আছে। সেখানে গিয়েও বসে থাকে শুনি। আরো কত কথাই বলে লোকে। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এ সব কি হচ্ছে?" তাতে খেপে উঠল, "কোন রাঁড়ের ব্যাটা বলেছে তোমায়? এমন জুতোপেটা করব তাকে যে, মাথার চুল পর্যন্ত উড়ে যাবে।" আমি আর খোঁচাতে যাইনি বাপু, চুপ করেই থাকি।'

'ঘরে তো বৌ আছে, তবু এমন করে কেন?'

'ওটা যে একটা মহা পাজী মেয়েমানুষ। বিয়ে হয়েছে, স্বামীর সঙ্গে ভালভাবে থাকলে সে কখনো অমন করে বেড়ায়? তুই-ই বল না?'

ঠাকুমা এবার নাতনীর সুখ-দুঃখের খবর নেন। আসার পর থেকে রান্নার ভারটা তিনিই নিয়েছেন। নন্জুর আটমাস পূর্ণ হয়ে গেছে। রাত্রে সে অক্কম্মার কাছে চাটাই বিছিয়ে শোয়। দুই ছেলেমেয়েও দু' পাশ থেকে সেঁটে থাকে অক্কম্মাকে। যতক্ষণ ঘুম না আসে, নানারকম গল্প চলতে থাকে ঠাকুমা আর নাতনীর মধ্যে। বাড়ির বিছানা চেন্নিগরায়ের কাছে যেন কন্টকশয্যা হয়ে উঠেছে। একদিন রাত্রে খাওয়ার পর সে নিজের বিছানাটা উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল মন্দিরের বারান্দায়।

অক্কম্মার আসার আট দিন পরে কল্লেশ নিজেই সাদা গরু ও তার বাছুরটাকে নিয়ে এল এবং দু'দিন বোনের বাড়িতে থেকে ফিরে গেল গ্রামে। ন'মাস পূর্ণ হবার পর নন্জম্মার একটি পুত্রসন্তান জন্মাল, শিশু বেশ হৃষ্টপুষ্ট এবং সুলক্ষণ। নামকরণের উৎসব করার মত সংস্থান নেই, কিন্তু নিয়মরক্ষা করতে হবে তো! চাল আর গুড় অক্কম্মা নিয়ে এসেছে, তাছাড়া পাঁচটা টাকাও আছে। তাই দিয়েই গ্রামের দু'-চার জন ব্রাহ্মণ ও দুই পুরোহিত পরিবারকে নিমন্ত্রণ করে শাস্ত্রবিধি অনুসারে শিশুর নাম রাখা হল 'বিশ্বনাথ'। নামকরণের দিন গঙ্গম্মা আর অপ্পন্নায়া গ্রামে ছিলই না, আগের দিনই তারা চলে গিয়েছিল অন্য গ্রামে।

অষ্টম অধ্যায়

দীর্ঘ চার মাস ধরে নাতনীর সেবাযত্ন করল অক্কম্মা। নাতনীকে সে কোন কাজকর্মই করতে দিতনা। কিন্তু দ্বিতীয় মাসেই আঁতুড় ছেড়ে উঠে পড়েছিল নন্‌জম্মা কারণ রায়শুমারীর খাতায় লাইন টেনে হিসেব লেখার কাজ তো শেষ করতে হবে। যে সব খেতে সেচ ব্যবস্থা নেই তার খবরাখবর চেন্নিগরায় ঘুরে ঘুরে যোগাড় করে এনেছে, মর্দুমশুমারী খাতায় তার বিবরণ লিখে রাখার কাজও ফেলে রাখলে চলবে না।

কন্‌লেশ এসেছে অক্কম্মাকে নিয়ে যেতে, পরের দিন সকালেই রওনা হবার কথা, এই সময় গ্রামের চৌকিদারের কর্মচারী এসে খবর দিল, দোকানী চেন্নাশেট্টীর বাড়িতে পঞ্চায়েত ডাকা হয়েছে, সেখানে পাটোয়ারীজীকে যেতে হবে।

'কিসের পঞ্চায়েত ?'

'চেন্নাশেট্টী তার পুত্রবধূর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, তাই তার স্বামী পঞ্চায়েত ডেকেছে।'

'বেশ কথা। সব প্রধানদের যেতে বল। আমার বাড়িতে এখন অতিথি রয়েছেন, তাই আমি যেতে পারব না।'

কিন্তু সবাই বলেছে পাটোয়ারীজীকে আসতেই হবে।

গ্রামের বিচারকার্যে পঞ্চায়েতের মিটিং-এ পাটোয়ারীকে উপস্থিত থাকতে হবে, এটাই রীতি। অবশ্য ন্যায়বিচারের অ-আ-ক-খও চেন্নিগরায়ের জানা নেই, সেকথা সবাই জানে। কিন্তু সে যাই হোক, পাটোয়ারী তো বটে ! অগত্যা বেরিয়ে পড়ল চেন্নিগরায়। ভগ্নীপতির সঙ্গে কন্‌লেশও গেল, এই ধরনের বিচারকার্যে জিজ্ঞাসাবাদ করার অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট আছে।

চেন্নাশেট্টীর অন্দরের উঠোনে গ্রামের প্রধানরা সবাই হাজির। প্যাটেল শিবেগৌড়, তার শালা, ভূতপূর্ব পাটোয়ারী শিবলিঙ্গে, পঞ্চায়েতের চারজন সদস্য ; দুই পুরোহিত ছাড়াও উপস্থিত রয়েছে আরো দশ-পনের জন। সভার মাঝখানে পান-শুপারী, তামাক, বিড়ি ইত্যাদি রাখা হয়েছে সকলের জন্য। পঞ্চায়েত শুরু করার আগে প্রশ্ন উঠল, 'ন্যায়পীঠে' বসবে কে ? একজন পাটোয়ারীর নাম করায় শিবেগৌড় বলে উঠল, 'ঐ বোকাটা কিছু বোঝে নাকি ?' প্যাটেলের নাম প্রস্তাবিত হল, কিন্তু রেবন্নাশেট্টী এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলল, 'এ কাজটা স্থানীয় লোকের দ্বারা না হওয়াই ভাল।' শেষে, মুদ্দইগিরিয়া বলল, 'কন্‌লেশ জোইশ পুলিশে কাজ করেছে, তাছাড়া পাটোয়ারীজীর শালাও বটে, সুতরাং তাকেই এ পদে বসানো হোক।' এ প্রস্তাব সকলেরই মনোমত হওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে কন্‌লেশ বিচারকার্যের কেন্দ্রস্থানে বসল। তামাক মুখে পুরে প্রশ্ন শুরু করল সে—'নালিশটা কি ? কার প্রতি অন্যায় হয়েছে ? সব কথা পঞ্চায়েতের সামনে খুলে বলা হোক।'

গিরিয়াশেট্টী জানাল, 'আমার বাপ আমার স্ত্রীর সঙ্গে শুয়েছে। দুজনকারই শাস্তি হওয়া উচিত।'

'কোনজন তোমার পিতা?'

থামের পাশে এক কোণে নতশিরে বসে থাকা চেন্নাশেট্টীর দিকে আঙুল তুলে গিরিয়া বলে, 'ঐ তো, ঐ কোণে বসে আছে নীচ ইতরটা।'

আরো বিস্তারিতভাবে প্রশ্ন করে কল্লেশ জানতে পারে—গিরিয়া যায় খেতে লাঙল চষতে আর চেন্নাশেট্টী দোকানে বসে ব্যবসা করে। নিজেদের বাড়ির বারান্দাতেই দোকান। গিরিয়ার স্ত্রী নরসী এই বাড়িতেই থাকে, তার বিয়ে হয়েছে আজ আট বছর।

কল্লেশ বলে এই ধরনের বিচারে দুই তরফেরই বক্তব্য শোনা দরকার।

চেন্নাশেট্টীর স্ত্রী মারা গেছে প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল। সে আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেনি। মায়ের স্নেহ-মমতা না পেয়েই বড় হয়েছে গিরিয়া, কাজেই সে একটু বেয়াড়াই হয়ে উঠেছে বলা চলে।

কল্লেশ এবার চেন্নাশেট্টীকে তার বক্তব্য শোনাতে আদেশ করে। মাথা নত করে সে বলতে শুরু করে, 'মশাইরা, আমি এক কুলাঙ্গারের জন্ম দিয়েছি। আমাকে বেইজ্জত করার জন্য, অন্যদের কথায় নেচে আমার ছেলে এই পঞ্চায়েত ডেকেছে। আমার দোকানের আয় থেকে এক পয়সাও আমি এই মুখ্যুটাকে দেব না, জমিজমাও দেব না ওকে।'

'আমার মায়ের দিব্যি, আমি মিথ্যা কথা বলছি না। 'স্বচক্ষে দেখেছি আমি', গিরিয়াশেট্টী তার অভিযোগ প্রমাণ করার চেষ্টা করে।

ন্যায়পীঠ থেকে কল্লেশ আদেশ দেয়, 'বেশ, এবার তোমার স্ত্রীর বক্তব্য শুনতে হবে। ডাকো তাকে।'

অইয়াশাস্ত্রীজী ডাক দেন, 'বোন এদিকে এসো।' কিন্তু সামনে আসতে চাইছে না নরসী। আবার ডাকলেন তিনি, 'পঞ্চায়েত ডাকছে, তোমাকে সামনে আসতে হবে।' পাটোয়ারী চেন্নিগরায়ের মুখে এখন পানের পিক নেই, তবু সে মুখ না খুলেই 'হুঁ, হুঁ' করে। নরসী রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। এ গ্রামে এমন কেউ ছিল না যে তাকে দেখেনি। কল্লেশ তো তাকে দেখে হকচকিয়ে গেল। গোলাপী, গোলগাল মুখ, উন্নত বক্ষ, দীর্ঘদেহী মেয়েটি এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে যে তাকে দেখে কল্লেশ ভেবেই পেল না কি ন্যায় বিচার শোনাবে। নরসীকে দেখে অইয়াশাস্ত্রীজী বললেন, 'দেখ, শ্বশুর পিতৃতুল্য, তুমি তাঁর কন্যাস্থানীয়া, তা সত্ত্বেও যদি এমন ব্যাপার ঘটে থাকে তাহলে সেই পাপে এ গ্রামে অনাবৃষ্টি হবে, ফসল ফলবে না। আমার কথা বুঝতে পারছ তো? চেন্নাশেট্টী তুমিও শুনছ?'

নানাবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করে অইয়াশাস্ত্রী ধর্ম আর অধর্মের ব্যাখ্যা শুরু করেন। দুই পুরোহিতের শাস্ত্র ব্যাখ্যার মধ্যে অন্যেরাও কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। পাটোয়ারী চেন্নিগরায় এখানে যে তামাকটা পাওয়া গেল ভাল করে তার রসগ্রহণ করার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে রেবন্নাশেট্টী বলল, 'অন্যদের কথা থাক। এই বোন কি বলেন, এঁর বক্তব্যই শোনা উচিত।' কল্লেশও বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার কি বলবার আছে বল বোন।'

'আপনারা তো এত কথা বলছেন, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন?' দুই পুরোহিতের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করে নরসী।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়, বল কি বলবে?' দুই পুরোহিত সমস্বরে বলে ওঠে।

'বারো-মানুষ গভীর একটা কুয়োর মধ্যে ছ-মানুষ লম্বা একটা দড়ি ফেললে সে দড়ি নিচে পৌঁছাবে কি?'

'এ্যাঁ?' কথা খুঁজে না পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান অইয়াশাস্ত্রীজী। পঞ্চায়েতের অন্য লোকেরাও একেবারে স্তব্ধ। রেবন্নাশেট্টী এবার কল্লেশকে অনুরোধ করে, 'ফয়সলাটা শুনিয়ে দিন এবার সকলকে।'

গিরিয়াশেট্টী জোরগলায় তার শেষ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়, 'ঐ কুলটা ছেনাল মেয়েমানুষকে নিয়ে আর আমি ঘর করব না।'

মিনিট পাঁচেক চিন্তা করে কল্লেশ, তারপর রায় দেয়, 'স্বামী বলছে সে এই স্ত্রীর সঙ্গে বাস করবে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে এই স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে বলা অনুচিত। সে বলছে শ্বশুর এবং পুত্রবধূর মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক আছে, কিন্তু চেন্নাশেট্টী বলছে এ অভিযোগ মিথ্যা। কারো ওপর মিথ্যা দোষারোপ কারও উচিত নয়। কিন্তু সবাইকার সন্তোষের জন্য এক্ষেত্রে শ্বশুর এবং পুত্রবধূকে আলাদা আলাদা জায়গায় থাকতে হবে। স্বামী যেহেতু স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে গররাজি, সেইহেতু স্ত্রীকে একা আলাদা বাড়িতে থাকতে হবে। মেয়েটি চেন্নাশেট্টীর পুত্রবধূ, সুতরাং চেন্নাশেট্টীকেই তারজন্য একটি আলাদা আস্তানা তৈরী করে দিতে হবে। পিতা এবং পুত্র তাদের যেমন ইচ্ছা সেইভাবে থাকতে পারে।'

এই ফয়সলার যুক্তিগুলো অনেকেই বুঝল না। শিবেগৌড় প্রশ্ন করল, 'এ কেমন ন্যায় বিচার হল?' কিন্তু রেবন্নাশেট্টী নরসীর দিকে ফিরে বলল, 'আমরা কল্লেশজীকে ন্যায়পীঠে বসিয়েছি, উনি যা বলবেন তাই শুনতে হবে, এখন ওঁর ওপর অন্য কারো কথা চলবে না। বোন, আমি বলছি, তুমি চুপচাপ এই ফয়সলা মেনে নাও।'

নরসীও এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে বলল, 'আপনারা পাঁচজনে যা বলবেন তা আমাকে তো মানতেই হবে।'

আর কোন কথা ওঠার আগেই উঠে দাঁড়াল রেবন্নাশেট্টী, কল্লেশও উঠে পড়ল ন্যায়পীঠ থেকে।

বাড়ি ফিরে এসে কল্লেশকে জিজ্ঞাসা করে চেন্নিগরায়, 'ও মেয়েটা কি বলল বলতো?'

'বুঝতে পারনি নাকি?'

'না তো!'

'ঐ জন্যই তো তোমায় ন্যায়পীঠে বসানো হয়নি। না বুঝেছ তো আর বুঝে দরকার নেই। কি হবে ওসব কথা ভেবে? যেতে দাও!'

চেন্নিগরায় আরেক দলা তামাকপাতা চটকে মুখে পুরে ফেলল।

২

রেবন্নাশেট্টী নিয়মিতভাবে তাস খেলতে যায় কোডীহল্লীতে। সেখানকার প্যাটেল চিক্কেগৌড়ের গোয়ালঘরের ছাদটি তাসের আড্ডার পক্ষে চমৎকার জায়গা। চিক্কেগৌড় আর

রেবন্নাশেট্টী ছাড়া সেখানে আসে কম্বনকেরের অধ্যক্ষ লিঙ্গদেব, তাড়ীর ঠিকাদার চিন্নস্বামী এবং চামড়ার কারবারী হায়াত সাবী।

সেদিন রেবন্নাশেট্টী চিক্কেগৌড়কে বলল, 'পঞ্চাশটা টাকা হবে কি? থাকে তো দিন, নারকেল বেচে শোধ করে দেব।'

'এ পর্যন্ত কত নিয়েছ সে খেয়াল আছে? এখন কিছু নেই আমার হাতে।'

'অমন কথা বলবেন না, দিয়ে দিন না টাকাটা।' অবশ্য ধার দিয়ে কখনও লোকসান হয় না চিক্কেগৌড়ের। বেশ কিছুটা তো খেলা থেকেই উশুল হয়ে যায়। টাকা ধার দেবার ফর্ম, রেভেন্যু স্ট্যাম্প ইত্যাদি সবই চিক্কেগৌড়ের কাছে মজুদ থাকে। কাগজে পঞ্চাশ টাকার অঙ্ক লিখে, তারিখ ও রেবন্নাশেট্টীর স্বাক্ষর বসিয়ে নিয়ে, এক বছরের সুদ ছ'টাকা কেটে চুয়াল্লিশ টাকা দিয়ে দিল সে। কিন্তু টাকাটা রেবন্নাশেট্টীর পকেটে ঢোকার আর সুযোগই পেল না। যে চাটাইতে খেলার আসর বসেছিল সেইখানেই রাখা হয়ে গেল। চুয়াল্লিশ টাকা খুবই সামান্য, কাজেই তিন পাত্তির খেলায় সে রাজি হল না। প্রতি দানে এক টাকা হিসাবে আঠাশের খেলা শুরু হল। সেদিন আর কেউ খেলতে আসেনি, তাই খেলা চলছিল শুধু চিক্কেগৌড় ও রেবন্নার মধ্যে। বিকেল ছ'টার মধ্যে চুয়াল্লিশ টাকার সবটাই চলে গেল আবার চিক্কেগৌড়ের পকেটে। কিন্তু রেবন্নাশেট্টীর জিদ চেপেছে, সে আজই খেলায় জিতে ঐ টাকাটা আবার আদায় করে নেবে। গৌড় আর ধার দিতে চাইল না। 'দুত্তোর খেলার নিকুচি করেছে, যা হয় হবে, দিন আরো পঞ্চাশ, এক্ষুণি লিখে দিচ্ছি।' আবার কাগজে সই করে চুয়াল্লিশ টাকা নেওয়া হল এবং খেলা চলল রাত এগারটা পর্যন্ত। এবারও সমস্ত টাকাটা জিতল চিক্কেগৌড়। এতক্ষণে রুমালখানা ঝেড়ে ঝেড়ে কাঁধের ওপর ফেলে বাড়ির দিকে রওনা দিল রেবন্নাশেট্টী।

বাড়িতে পাঁচটি ছেলেপেলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল সর্বক্কা। দরজা ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে খাবার দিতে বলল। কিন্তু কাঁসার থালায় ঠাণ্ডা লোন্দা আর পালং শাক দেখেই ক্ষেপে গেল রেবন্না, 'খাবারটা গরম গরম দিতে পার না।'

'গরম গরমই তো করে রেখেছিলাম, এত দেরী করলে, তাই জুড়িয়ে গেছে।'

'দুত্তোর তোর মায়ের ···, আমি কখন আসি, না আসি তুই জিজ্ঞেস করবার কে শুনি? হতচ্ছাড়ি কোথাকার, মারব এক লাথি!'—বলতে বলতে লোন্দা ছিঁড়ে মুখে পোরে। কিন্তু ঠাণ্ডা মড়ুয়ার ডেলা গেলা বেশ শক্ত, সুতরাং উঠে বৌয়ের পিঠে এক লাথি কষিয়ে দিয়ে বলে, 'গরম খাবার নিয়ে আয় শিগ্‌গীর।'

'চাল নেই ঘরে'—ফুঁপিয়ে ওঠে সর্বক্কা।

'সর্বদাই শোন কেবল "নেই" আর "নেই", হাভাতে ছেনাল কোথাকার', আর একটা লাথি ঝেড়ে সেই ঠাণ্ডা খাবারই কোনমতে গিলে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ে রেবন্না। এঁটো থালা ধুয়ে রেখে, নিচে মেঝেতে ছোটছেলে রুদ্রেশের পাশে এসে শোয় সর্বক্কা।

৩

হিসেব লিখতে বসে কিছু বুঝতে না পারলে খাতাপত্র পাটোয়ারীর কারিন্দা বা চাকরের ঘাড়ে চাপিয়ে নন্‌জম্মা নিজেই চলে যায় তিম্‌লাপুর। দাবরসায়াজী সব বুঝিয়ে দেন,

ভুলচুক ঠিকঠাক করে দেন। উশুল আদায় করার সময় সাধারণতঃ গ্রামের প্যাটেল সঙ্গে থাকে। রামসন্দ্র গ্রামের আদায় উশুল তো পুরোপুরি শিবেগৌড়েরই হাতে। তার ধারণা খাজনা আদায় করাটা প্যাটেলেরই কাজ। প্যাটেল যেমন বলবে পাটোয়ারী সেই-ভাবেই হিসাব লিখবে। শিবেগৌড়ের সঙ্গে টক্কর দেবার ক্ষমতা গ্রামে কারো নেই, কাজেই এতকাল ধরে এই নিয়মই চলে আসছে। জমির খাজনা আদায় করে প্যাটেল, সুতরাং পাটোয়ারী পরিবারের এ থেকে এক পয়সাও আমদানি হয় না। কোন খরিদ-বিক্রীর দলিল লেখাতে হলেও লোকে যায় আগেকার পাটোয়ারী শিবলিঙ্গের কাছে, চেন্নিগরায়ের কাছে কেউ আসে না। সবাই জানে চেন্নিগরায় দলিল লিখতে পারে না। তাছাড়া প্যাটেল সবাইকে এই বলে ভয় দেখিয়ে রেখেছে যে, ঐ স্ত্রীলোকটাকে দিয়ে দলিল লেখালে সইটা কাকে দিয়ে করাবে? রেজিস্ট্রী করানোর দলিলপত্র নন্‌জম্মা শিবলিঙ্গের চেয়ে অনেক ভাল লিখতে পারলেও গ্রামের লোকের ধারণা সরকারী কাগজে মেয়েমানুষের হাতের লেখা থাকলে নাকি অমঙ্গল হবে। এই সব কারণে রামসন্দ্র গ্রাম থেকে নন্‌জম্মাদের এক পয়সাও আয় নেই।

কুরুবরহল্লীর ওপর ভরসা করা যায়। সেখানে চেন্নিগরায় খাজনা আদায় করতে যায়, সঙ্গে থাকেন গুণ্ডেগৌড়জী। তিনি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কাছে খাজনা আদায়ের সময় পাটোয়ারী দস্তুরীটাও পাইয়ে দেন এবং নিজেও দেন দু'টাকা। এই গ্রামটি থেকে নন্‌জম্মাদের প্রায় চল্লিশ টাকা আয় হয়। গৌড়জী ভরসা দিয়েছিলেন দ্বিতীয় ফসল উঠলে তার থেকে আরো এক খণ্ডি মড়ুয়া ও পঞ্চাশ সের বরবটি দেবেন, সেটাও কিছু কিছু করে পাওয়া যাচ্ছে। তবে কুরুবরহল্লী গ্রামে খরিদ, বিক্রী, বন্ধকী কারবার বিশেষ হয় না, কাজেই এসব দিক থেকে এখানে উপার্জনের আশা কম।

এদের এলাকার লিঙ্গাপুর গ্রামে তিরিশটি পরিবার বাস করে, সবাইকারই অবস্থা বেশ ভাল। শিবেগৌড়ের সঙ্গে এ গ্রামের লোকেদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে, কাজেই শিবেগৌড় তাদেরও বুঝিয়েছে, পাটোয়ারীকে দস্তুরী দেওয়ার দরকার নেই। এখানকার প্যাটেল পুরদপ্পা দাবী করে যে দস্তুরী তারই পাওয়া উচিত। চেন্নিগরায়ের পিতা রামন্নাজীর আমলে এ গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবার থেকে এক টাকা করে দস্তুরী দেবার প্রথা ছিল। গ্রামের বৃদ্ধ ব্যক্তিরা এখনও একথা বলেন। কিন্তু এখন দিনকাল বদলে গেছে, কাজেই এ গ্রাম থেকেও কিছুই আমদানি নেই।

কুরুবরহল্লীর খাজনা আদায়ের সময় নন্‌জম্মাও যায়। অন্য দুই গ্রামে সেখানকার প্যাটেলরাই ও কাজটা করে। আর হিসাব লেখার কাজটা তো হয় বাড়িতে বসেই। খেত-খামারে ঘুরে রায়শুমারী আর মর্দুমশুমারীর তথ্যাদি যোগাড় করে আনে চেন্নিগরায়। তারপর সেই খসড়া থেকে জমাবন্দীর হিসাব লেখাটা নন্‌জম্মার দায়িত্ব। কিছু গোল-মেলে ব্যাপার দেখলেই সে চলে যায় তিমলাপুর। চেন্নিগরায় যখন কোট পরে, মাথায় ফেটি বেঁধে, গলায় চাদর জড়িয়ে জমাবন্দীর হিসাব নিয়ে শহরে যায়, তার হাত-পা কাঁপতে থাকে। হেড ক্লার্ককে ঘুষ-টুস দিয়ে কোনমতে সাহেবের সইটা করিয়ে নিয়ে তারপর বুক ফুলিয়ে গাঁয়ে ফিরে আসে। এলাকাদার বা আমলাদার কখনো গ্রাম সফরে

এলে নন্‌জম্মা বেচারী বাচ্চাদের না খেতে দিয়ে জমিয়ে রাখা ঘি, ভাল চালের ভাত, ভাল ডাল, উৎকৃষ্ট সব্জী, পাঁপড় ইত্যাদি খাইয়ে যথাসাধ্য আপ্যায়ন করে তাঁদের। তারপর বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'আমরা বড় গরীব। হিসাবে যদি কিছু ভুলচুক থাকে দয়া করে শুধরে দেবেন।' কিন্তু আজ পর্যন্ত সে এদের কাউকে বলেনি যে সমস্ত হিসাব সে নিজেই লেখে।

এতসব খাটুনীর মধ্যে স্বামীদেবতাটিকে সামলে রাখা তার আর একটা বড় কাজ। সারা বছর খেটে-খুটে হিসাব তৈরী করে দিল সে। বর্ষার সময় বর্ষাসনের হিসাব নিয়ে চেন্নিগরায় সেই যে শহরে গেল তারপর পনের দিন আর কোন খবরই নেই। অবশেষে ফিরল যখন, জানা গেল মাত্র পাঁচ টাকা এনেছে। তাও নন্‌জম্মার হাতে না দিয়ে, তিপটুর থেকে আনা টিনের বাক্সটায় রেখে তালা বন্ধ করে চাবীটা নিজের পৈতার সঙ্গে বেঁধে রাখে। আমলাদার, হেডক্লার্ক, তালুক ক্লার্ক, চাপরাসী সবাইকার প্রাপ্য দিয়েও অন্তত একশ' টাকা থাকার কথা। তার থেকেও গৌড়জীর কাছে আগাম নেওয়া পঞ্চাশ টাকা কেটে নিলে তবুও পঞ্চাশটা টাকা ঘরে আসার কথা। 'বাকি টাকা কোথায় গেল?' প্রশ্ন শুনেই খিঁচিয়ে ওঠে চেন্নিগরায়, 'রোজ তোর ঐ রুটি, বরবটি আর ঘ্যাট খেয়ে খেয়ে মুখে চড়া পড়ে গেছে বুঝলি রে ছেনাল? পনের দিন হোটেলে আলুকান্দা, ভাজা বড়া, দোসা, মৈসুরপাক এইসব খেয়ে তাই মুখ বদলে এলাম।'

'তুমি তো অনেক কিছুই খেয়েছ কিন্তু ঘরে বাচ্চাগুলো কোনদিন মৈসুরপাক চোখেই দেখেনি, ওদের কথা একবার মনে পড়ল না তোমার?'

উত্তর খুঁজে না পেয়ে গালাগালির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল চেন্নিগরায়, 'ছেনাল, ছেনাল, তোর মায়ের ···' ইত্যাদি বকতে বকতে মহাদেবায়াজীর মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিল।

কিন্তু এখন সারা বছর পেট চলবে কি করে? তৃতীয় সন্তান আট মাসের, ইতিমধ্যেই পেটে আর একটি এসে গেছে। বর্ষাসন বছরে একবারই আসে। সেই টাকা এভাবে উড়িয়ে দিলে ছেলেপেলের উপোষ ছাড়া গতি নেই। দিনে অন্তত দুটো মড়ুয়ার ডেলা না জুটলে তাদের কারোরই শরীর টিঁকবে না। বর্ষাসনের টাকা সোজাসুজি ওর হাতেই দেবার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করলে হয় না? চেন্নিগরায় তাহলে কি করবে কে জানে! কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় কি? দু'দিন ভেবে একটা উপায় স্থির করল নন্‌জম্মা।

পরদিন সকালে উঠে স্নান করে, বাচ্চাদের স্নান করিয়ে, রুটি আর চাটনী খাইয়ে তাঁতীপাড়ার পুট্টব্বার কাছে পৌঁছে দিল পার্বতী আর রামন্নাকে। তারপর বিশ্বকে কোলে নিয়ে চলে গেল কুরুবরহল্লী। গুণ্ডেগৌড়জীর বাড়িতে পৌঁছে দেখে ভিতরের উঠোনে বসে আছে গঙ্গম্মা। তার প্রসারিত লাল শাড়ীর আঁচলে গৌড়জীর স্ত্রী লক্কম্মা মড়ুয়া ঢেলে দিচ্ছেন। দেওয়ালের কাছে বসে গৌড়জী তাঁর পান-শুপারীর থলিটার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কি যেন খুঁজছেন। বউকে দেখেই চটে গেল গঙ্গম্মা,—'আমি ভিক্ষে মেগে খাচ্ছি, তাতেও বাগড়া দিতে এসেছিস কুলটা কোথাকার?' চেঁচিয়ে উঠল সে। নন্‌জম্মা কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

গৌড়জী ডেকে বললেন, 'এসো মা, বস।' সে মাদুরে এসে বসতেই, গঙ্গম্মা আঁচলে মড়ুয়াটা বেঁধে নিয়ে উঠে পড়ল এ বাড়ি থেকে।

লক্কম্মা এবার বলে উঠল, 'তোমার শাশুড়ী এতক্ষণ বসে বসে তোমার নামে ঝুড়ি ঝুড়ি নিন্দে করে গেল। তুমি নাকি ওকে দেখতে পার না, বরকে তো তুমি তুড়ি দিয়ে নাচিয়ে বেড়াচ্ছ, পুরুষের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াও—আরও কত কি কথা! পাটোয়ারীর রোজগারের ভাগের কথাও বলছিল।'

গৌড়জী বলে উঠলেন, 'যা খুশি বলতে দাও ওকে, তুমি চুপ কর এখন', তারপর নন্‌জম্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি সংবাদ বল মা, বর্ষাসন পেয়ে গেছ তো?'

'সেই কথা বলতেই তো এলাম গৌড়জী', নন্‌জম্মা এবার স্বামীর কীর্তি-কাহিনী বর্ণনা করল।

শুনে লক্কম্মা বলে ওঠে, 'ধরে আচ্ছা করে মার লাগাতে হয়।'

'মার খেলে ওর কিছুমাত্র শিক্ষা হবে না। কি করা যায় তুমিই বল মা, তুমি তো আমার চেয়ে বেশী চেন ওকে।'

'বর্ষাসনের টাকাটা ওর হাতে যদি না পড়ে তবেই সব দিক রক্ষা হয়।'

'কিন্তু সরকার তোমার হাতে টাকা দেবে কি?'

'তার দরকার নেই। মোট একশ কুড়ি টাকা বর্ষাসন হয়। তারমধ্যে আমলাদের, কেরাণী, চাপরাসী এদের দিতে হয় প্রায় পনের টাকা। সে কটা টাকা ছেড়ে দিয়ে বাকি একশ' টাকার জন্য গতবারে যেমন রসিদ লিখিয়ে নিয়েছিলেন, এবারেও তাই নিয়ে নিন। আশি টাকা তো আপনার কাছেই আদায় হয়, বাকি কুড়ি টাকা অন্য কারো নামে রসিদ লিখিয়ে নিন। ওকে যখন বর্ষাসন দেওয়া হবে তখন ওগুলো কাটা যাবে। তাহলেই ওর হাতে আর টাকা থাকবে না। সেই টাকা থেকেই আমার দরকার মত আপনি আমাকে মড়ুয়া, ধান-লঙ্কা আর মাঝে মাঝে পাঁচ দশ টাকা করে দেবেন।'

'বেশ, বেশ, সত্যি মা, তুমি দেওয়ানগিরি করতে পার। ঐ ষাঁড়টাকে যে সামলে রাখতে পারে সে গোটা মহীশূর রাজ্যও শাসন করতে পারে। কাল পরশুর মধ্যেই গিয়ে আমি লিখিয়ে নেব।'

লক্কম্মা অনেকবার অনুরোধ করল মন্দিরে বসে রান্না করে খেয়ে যেতে, কিন্তু ছেলে-মেয়েদের রেখে এসেছে বলে সে অনুরোধ রাখা সম্ভব হল না। নন্‌জম্মা বাড়ির পথে রওনা দিল। ওর ছেলেমেয়েদের জন্য লক্কম্মা গুড় আর নারকেল দিয়েছে, সেগুলো বেঁধে নিল শাড়ীর আঁচলে। যাবার আগে কোলের ছেলে বিশ্বনাথ ও নন্‌জম্মা দু'জনকেই ঘি আর গুড় মেশানো দুধ খাওয়ালো লক্কমা।

বাড়ি ফিরতে চেন্নিগরায় তাকে জিজ্ঞাসাও করল না কোথায় গিয়েছিল সে। কিন্তু সময় মত রান্না হয়নি দেখে খানিকটা রাগারাগি করল। তারপর স্ত্রীর আঁচলে বাঁধা গুড় আর নারকেল দেখতে পেয়ে তাই খুলে শুরু করে দিল খেতে। বেচারা পার্বতী আর রামন্না পুট্টব্বার বাড়ি থেকে ফিরে আসার আগেই তাদের ভাগের খাবারটুকু খেয়ে নিয়ে হাত ধুয়ে ফেলল তাদের বাবা।

পরের দিনই এসে গেলেন গুণ্ডেগৌড়জী। তাঁর কথামত দোয়াত কলম এনে সামনে রাখল নন্‌জম্মা। গৌড়জী আদেশ করলেন চেন্নিগরায়কে, 'যা যা বলা হচ্ছে লিখে যাও।' নন্‌জম্মা বলে যাচ্ছিল, 'কুরুবরহল্লীর প্যাটেল গুণ্ডেগৌড়ের নিকট রাজস্ব আদায়ের দরুণ মোট আশি টাকা প্রাপ্ত হইলাম', হঠাৎ কলম থামিয়ে পাটোয়ারী প্রশ্ন করে বসল, 'কেন, এ কথা কেন লিখব? আমি লিখব না। বর্ষাসনে তাহলে আমার হাতে কিছুই আসবে না যে।'

গৌড়জী খুব চটে বললেন, 'কে বলেছে আসবে না! মুখ বন্ধ করে এখন চুপচাপ লিখে যাও যা বলা হচ্ছে।' কিন্তু পাটোয়ারী তবু কলম তোলে না। গৌড়জী ভয় দেখান, 'লিখবে না তুমি? এরপর তাহলে আমার গাঁয়ে যেও, ঠ্যাং ভেঙে রেখে দেব।'

'আমার খরচ জুটবে কি করে?'

'সে আমি দেব, লেখ এখন।'

যা হোক শেষ পর্যন্ত একশ' টাকার রসিদ লিখে তাতে সই করে দেয় চেন্নিগরায়। তারপর বলে, 'তাহলে দিন আমায় কিছু!'

কোমরের কষি থেকে দুটো টাকা বার করে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গৌড় বলেন, 'এই নে, জমিচুক্তির টাকাটা তোকে এখনই দিয়ে দিলাম।'

টাকা দুটো চটপট পকেটে ভরে ফেলে পাটোয়ারী। গৌড়জী এরপর ফিরে যান নিজের গ্রামে। পরদিন শুক্রবার। চেন্নিগরায় সকালবেলাই রুটি খেয়ে কম্বনকেরের সাপ্তাহিক বাজারে গিয়ে হাজির। তিপটুর থেকে দোকানীরা এসে এই সাপ্তাহিক বাজারেও হোটেল খোলে। তিপটুরের মতই এখানেও আলুর বড়া, মশলা দোসা, মৈসুরপাক, কলাভাজা ইত্যাদি সবই পাওয়া যায়।

৪

নন্‌জম্মা বেশ বুঝতে পারছিল, শুধু পাটোয়ারী কাজের উপার্জনে সংসার চলা কঠিন। পৈতৃক সম্পত্তি না থাকলে, শুধু এইটুকুতে খাওয়া-পরা চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু আর কি করা যেতে পারে? তিম্‌লাপুরে সে দেখেছিল দাবরসায়াজীর প্রতিবেশীরা পলাশের পাতা জুড়ে জুড়ে খাওয়ার পাতা, দোনা এসব তৈরী করে। তারা সেগুলো বাণ্ডিল বেঁধে রাখত এবং তিপটুরে পাঠাত। তিপটুরের দোকানদাররা নাকি ছ'আনা শ' হিসাবে ওগুলো কিনে নেয়। নন্‌জম্মার মনে হল, বাড়ির কাজকর্ম সেরে অবসর সময়ে যদি কিছু কিছু ঐ রকম পাতা বানাতে পারি তাহলেও কিছু উপার্জন হবে।

রামসন্দ্রের ব্রাহ্মণেরা চোলেশ্বর টিলার পাশের নালাটার ধারের জঙ্গল থেকে পলাশ পাতা নিয়ে আসেন। জায়গাটা গ্রাম থেকে তিন মাইল দূর। চোলেশ্বরের টিলা নন্‌জম্মার বাপের বাড়ি নাগলাপুর যাবার পথেই পড়ে। এবার ফাল্গুন মাসে তাজা পলাশ পাতার মরশুমে সে বেরিয়ে পড়ল পাতা সংগ্রহ করতে। একা স্ত্রীলোকের পক্ষে এতটা পথ যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু কে যাবে ওর সঙ্গে? স্বামীকে বলে দেখল একবার। তৎক্ষণাৎ

জবাব হল, 'পেট চালাবার জন্য অত যার ছটফটানি সেই যাক, আমার কি দরকার?' সুতরাং তাঁতীপাড়ার পুট্টব্বাকে নিয়ে নন্‌জম্মা একদিন ভোরে কাক-পক্ষী ডাকার আগেই বেরিয়ে পড়ল। বাচ্চাগুলোকে রেখে এল প্রতিবেশী চেন্নাশেট্টীর বাড়িতে। পুট্টব্বা দিনে তিন আনা মজুরী পায়। খুব দ্রুতপায়ে হেঁটে দুজনে সূর্যোদয়ের আগেই পৌঁছে গেল, তারপর চটপট পাতা তুলতে শুরু করে দিল। এইভাবে রোজ ওরা পাতা তুলে নিজেদের পিঠের থলি বোঝাই করে। বেশ কিছুক্ষণ পরে খিদে পেলে সঙ্গে-আনা রুটি চাটনী খেয়ে নিয়ে আবার কাজ শুরু করে। চেপে চেপে থলি ভর্তি করে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে গ্রামে। বাড়িতে ফিরে থলি থেকে পাতাগুলো বার করে পার্বতীকে একটা মোটা ছুঁচ আর সুতো দিয়ে বসিয়ে দেয়, সে পাতাগুলোকে বোঁটার কাছে গেঁথে গেঁথে মালার মত তৈরী করে। মাঝে মাঝে ছোট্ট রামন্না পর্যন্ত এক একটা পাতার মালা বানিয়ে ফেলে। এই অবসরে রান্নাটা সেরে ফেলে নন্‌জম্মা। খাওয়ার সময় দেখা দেন বাড়ির কর্তা। কাঁচা সবুজ পলাশ পাতায় আহার তাঁর বড়ই পছন্দ। একটা বড় পাতাকে দোনার মত করে মুড়ে নিয়ে উবু হয়ে বসে আশ মিটিয়ে খেয়ে দেয়ে দিবানিদ্রায় গড়িয়ে পড়েন তিনি। বাসনপত্র ধুয়ে মেজে নন্‌জম্মাও বসে বসে কিছু পাতা গাঁথে। বাকি পাতাগুলো বিকেলের পড়ন্ত রোদে শুকোতে দেয়। এইভাবেই কেটে যায় দিন। পরদিন সকালের, নিজেদের জন্য, বাড়িতে স্বামী ছেলেমেয়েদের জন্য রুটি গড়ে চাটনী পিষে রাখতে হবে। অন্ধকার থাকতে উঠতে হবে, রাতেও তাই তাড়াতাড়ি শোয়া দরকার।

প্রথম বর্ষা নামলেই পলাশ পাতাগুলো জীর্ণ ও ফুটো ফুটো হয়ে যায়। তার আগেই নন্‌জম্মা শ'দেড়েক বাণ্ডিল বানিয়ে ফেলল। মনে মনে হিসাব কষল, যদি ছ'আনা করে এক বাণ্ডিলের দাম হয় তো দু'শ বাণ্ডিল বানাতে পারলেই অন্ততঃ পঁচাত্তর টাকা রোজগার হবে, অবশ্য খাটতে হচ্ছে খুব, কিন্তু মেহনত না করলে কি পেট চলে? পাতা তুলে জমা করতে করতেই খাজনা আদায়ের সময় এসে গেল। চতুর্থ কিস্তিতে কুরুবরহল্লীর লোকেরা দস্তুরী দেয়। এতদিনে ওর গর্ভেরও ছ'মাস হয়ে গেছে। স্বামী তাকে ধমকে উঠল, 'তোর যাবার দরকারটা কি শুনি? আমি আদায় করে আনতে পারি না নাকি?' সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে পড়ল নন্‌জম্মা। দস্তুরীর সমস্ত টাকা গুণ্ডে-গৌরজী সংগ্রহ করে রেখেছেন নিজের কাছে। পাটোয়ারীর হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে তিনি বলেন, 'যখন তোমার দরকার পড়বে তখন টাকা চাইবে। এখন এর বেশী আর কি দরকার?' চেন্নিগরায় এমন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকায় যেন গিলে খাবে। গালাগালটা মুখে উঠে আসে, কিন্তু উচ্চারণ করতে সাহস হয় না। বাড়ি গিয়ে অবশ্য নন্‌জম্মা ও গুণ্ডেগৌড়ের নামে ব্যভিচারের ইঙ্গিত করে প্রচুর গালাগাল দিয়ে নিজের গায়ের জ্বালা মেটায়। যাক, পাঁচটা টাকা তো পাওয়া গেছে, তিপটুরে গিয়ে কি কি মজা লুটবে তারই চিন্তায় মশগুল হয়ে যায় পাটোয়ারী। লোকে বলে তিপটুরে নাকি গুব্বিবীরণ্ণর নাটক হয়, তার দৃশ্যপট এমন চমৎকার যে মনে হয় যেন সত্যিকারের রাজপ্রাসাদ দেখাচ্ছে। ছ'আনা খরচ করে সেটা তো দেখতেই হবে। রাতে অন্য কিছু না খেয়ে শুধু বোম্বাই বোণ্ডা খেলেই হবে। 'ব্যাটা রাঁড়ের পুত গুণ্ডেগৌড় একশ' টাকার রসিদ লিখিয়ে নিল।

বর্ষাসন পাবার পর তালুক অফিসের সবাইকে দিয়ে-থুয়ে মোটে চার পাঁচটা টাকা থাকবে হাতে। এখন কাছে আছে পাঁচ টাকা। সব মিলিয়ে এই দশ টাকায় কদিনই বা চালানো যাবে? একটা মৈসুরপাকের দামই তো ন'পয়সা। চার আনায় মাত্র ছ'খানা দেয় হারাম-জাদারা। আর দুটো বেশী দিলে কি ক্ষতি হত ব্যাটাদের? দুত্তোর তোর মায়ের ···।'

এই সময় রামসন্দ্র গ্রামে সরকারী প্রাইমারী স্কুল খুলল। স্কুলের জন্য বাড়ি দরকার। সরকার গ্রামের প্যাটেলের কাছে খোঁজ করল কোথায় স্কুল বসানো যায়। শিবেগৌড় রায় দিল, হনুমান মন্দিরই হচ্ছে উপযুক্ত জায়গা। অর্থাৎ অপ্পন্নায়া এবং গঙ্গম্মাকে এবার সরতে হবে সেখান থেকে। খবরটা কানে যেতেই গঙ্গম্মা শিবেগৌড়ের বাড়ির সামনে গিয়ে মুঠো মুঠো মাটি ছুঁড়তে শুরু করল। অবশেষে পুরোহিত অন্নাজোইস এসে মন্দিরে স্কুল হবে না এ কথাটা জানাতে তবে শান্ত হল সে। শিবেগৌড়েরই একটা খালি বাড়ি ছিল, সেইটা বার্ষিক ছত্রিশ টাকায় ভাড়া নিল সরকার স্কুলের জন্য। কিক্কেরী থেকে সুরপ্পা নামে এক মাস্টারও এসে গেল। কিছু ছেলে ভর্তি হল স্কুলে। কিন্তু মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করা হবে কি না তাই নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। মাস্টার-মশাই বললেন, 'মেয়েরাও পড়ুক, কোন চিন্তা নেই। আজকাল বড় বড় গ্রামে মেয়েরা হাই স্কুলেও পড়ছে।' কিন্তু কথাটা কারোই মনঃপুত হল না। মাস্টার আবার বললেন, 'যে সব বোনেরা লেখা-পড়া একটু শিখেছেন তাঁরা তো জানেন, সামান্য অক্ষর পরিচয় থাকলেই অন্তত বিশটা টাকা রোজগার করা যায়। এই কথা শুনে নন্‌জম্মা পার্বতীকে স্কুলে ভর্তি করে দিল। গ্রামশুদ্ধ লোক বলাবলি করতে লাগল, 'কি সাহস ঐ মেয়ের দেখলে?' পার্বতীর সঙ্গে রামন্নাও ভর্তি হল স্কুলে, তাকে বোঝানো হল স্কুলে মাস্টার মশাই একটুও মারবেন না, বালির ওপরেও লেখাবেন না, সে শ্লেটে লিখতে শিখবে।

এবারেও প্রসবের সময় এল অক্কম্মা। কিন্তু এবার নন্‌জম্মার মেয়েটি জন্মাবার আধ ঘন্টা পরেই মারা গেল। অক্কম্মা বলল, 'পোয়াতি অবস্থায় তোর এই এত এত পাতা তুলে কাজ করা উচিত হয়নি নন্‌জু। কি থেকে কি হল, কেন বাচ্চাটা বাঁচল না কে জানে।'

নন্‌জু কিছু বলল না, সে নিঃশব্দে কাঁদছিল। 'কাঁদিস নে মা, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর নিজের শরীর ভেঙে গেলে এই বাচ্চাগুলোকে কে দেখবে?' দু'দিন ধরে অক্কম্মা অনেক সান্ত্বনা দেবার পর একটু সামলে উঠল নন্‌জম্মা। গঙ্গম্মা মন্দিরে থেকেই অশৌচ পালন করল, কিন্তু বৌয়ের কাছে এসে একবার একটা সান্ত্বনার কথাও বলে গেল না সে। শিশুটি মারা যাবার পরও তিন মাস অক্কম্মা থেকে গেল নন্‌জুর সেবাযত্নের জন্য। গ্রামে ফিরে যাবার আগের দিন সে নাতনীকে বলল, 'তোর স্বামীর তো নিজের ছেলেপেলের জন্যও এতটুকু মায়ামমতা নেই। নিজের পেট ভরানো ছাড়া আর কিছু বোঝে না ও। তোকে কত কষ্ট করে মানুষ করতে হচ্ছে বাচ্চাগুলোকে। এর পর আর ওকে তোর বিছানার কাছে ঘেঁসতে দিসনে।'

চুপ করে থাকে নন্‌জু। অক্কম্মা বলে, 'তাতে যদি ওর রাগ হয় তো হোক, তুই ওর থেকে দূরে থাকবি।' এবার বলে ওঠে নন্‌জম্মা, 'কি করব অক্কম্মা, এসব পূর্ব জন্মের

কর্মফল। আমি যদি ওরকম ব্যবহার করি তাহলে ও লাজলজ্জার মাথা খেয়ে রাস্তায় দাড়িয়ে গালিগালাজ করবে। আমি আগেই ও চেষ্টা করে দেখেছি।'

'হা রে পোড়াকপাল' বলে স্তব্ধ হয়ে যায় অক্কম্মা।

অক্কম্মার বয়স এখন আটাত্তর, তবুও সে পায়ে হেঁটেই গ্রামে ফিরতে চায়, শুধু সঙ্গে একটা লোক চাই। কিন্তু নাতনী কি ওভাবে পাঠাতে পারে তাকে? তিন টাকা দিয়ে একটা নতুন লাল শাড়ী পরিয়ে, দেড় টাকায় একটা গরুর গাড়ি ভাড়া করে ঠাকুমাকে বাড়ি পাঠালো নন্‌জম্মা।

৫

একদিন দুপুরবেলা রেবন্নাশেট্টীর বৌ সর্বক্কা হঠাৎ এসে বলল, 'নন্‌জম্মা, ঘরে আজ আমার কিছুই নেই, দু'সের আটা দিতে পার?'

'আটা তো পেষা নেই সর্বক্কা। এসো, বস।'

'তাহলে না হয় দু'সের মড়ুয়াই দাও।'

পাত্র এনেছিল সর্বক্কা, তাতে দু'সের মড়ুয়া মেপে ঢেলে দিল নন্‌জম্মা। তখনকার মত আর কিছু না বলে চলে গেল সর্বক্কা। কিন্তু সেইদিনই সন্ধ্যায় আবার এল সে। নন্‌জম্মা তখন বসে বসে পলাশের পাতা গাঁথছে। সর্বক্কা ওর কাছে বসে পড়ে বলল, 'কার কাছে ভিক্ষে চাইতে যাব, তাই ভাবছিলাম। বাচ্চারা উপোষ করে ছিল। উপোষ করতে করতে আমারও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তুমি মড়ুয়াটুকু দিয়ে আজ আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ ভাই।'

'সে কি সর্বক্কা, তোমার মুখে এমন কথা? তোমরা জমি জায়গাওয়ালা বড়লোক, তোমার মুখে একথা কে বিশ্বাস করবে?'

'সত্যি বলছ? তুমি কিছু শোন নি?'

'কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু ঘরে খাবার মত আটাও নেই এটা ভাবতে পারিনি।'

'আমার ভাগ্য! পূর্ব জন্মে নিশ্চয় ভাল করে শিব পুজো করিনি'. চোখের জল ফেলতে ফেলতে সর্বক্কা জানায় তার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।

রেবন্নাশেট্টী কোডীহল্লীতে তাস খেলতে যেত। তাসের জুয়ায় ক্রমাগত হেরেছে, আর হ্যাণ্ডনোট লিখে লিখে টাকা ধার নিয়েছে, ধারের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল তিন হাজার টাকা। জমি বেচে এ টাকা শোধ করবে বলেছিল। চিক্কেগৌড়ের সঙ্গে ওখান থেকেই সোজা তিপটুরে গিয়ে রেজিস্ট্রি করানো হয়ে গেছে, তারপর হ্যাণ্ডনোট ছিঁড়ে ফিরে এসেছে। এখন আছে মাত্র দেড় দু' একর জমি। বৃষ্টি নামবে, পুকুর ভরবে, ক্ষেতে লাঙ্গল পড়বে তার পরে তো ফসলের আশা। তাতেও অন্ততঃ বারো খণ্ডি ধান হওয়া দরকার। কারণ ধোপদুরস্ত কাপড় আর চটি পরা 'উকিল' খেতাব-পাওয়া রেবন্নাশেট্টী তো আর নিজে নিজে খেত চষতে পারে না, সে অন্যকে দিয়ে নিজের খেতে চাষ করায়, তার ভাগে আসে মাত্র চার খণ্ডি ধান। শোনা যাচ্ছে এই জমিটুকুও নাকি কাশিমবদ্দির কাছে বাঁধা দিয়ে আটশ' টাকা নেওয়া হয়ে গেছে।

'তা হঠাৎ জমি বাঁধা দেওয়ার দরকার হল যে? রুদ্রাণীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল নাকি?'

'মেয়ের বিয়ের চিন্তা যদি কারো থাকে তবে তো ঠিক হবে? ঘরে এতবড় বিয়ের যুগ্যি মেয়ে রয়েছে! ওদিকে সেই সোয়ামীর ত্যাগ করা বউটা আছে না? সেই যে শ্বশুরের সঙ্গে পিরীত করেছিল যে? সে তো এখন গাঁয়ের ওপাশে ঝোপের ধারে খাপরার চালের বাড়ি করেছে, সেখানে আবার দোকান দিয়েছে। কোথায় পেল সে অত পয়সা? শুনছি তো এই আটশ' টাকা ঐ ছেনালটার কাছেই ঢেলেছে। এখন পঞ্চাশটা গাছের বাগানখানা আছে, তা নারকেলগুলো তৈরী হবার আগেই পেড়ে পেড়ে বিক্রী করে ফেলছে। হাতে কাঁচা পয়সা না থাকলে রেবন্নাশেট্টীর ধবধবে সাদা ধুতি আর কলার দেওয়া সার্ট কাচার সাবান জুটবে কি করে? তারপর দাড়ি কামাবার ব্লেড, হলুদ হাতী ছাপ সিগ্রেট, এসবের পয়সা আসবে কোথা থেকে?'

নরসী এখন গ্রামদেবীর পীঠস্থান ঝাঁকড়া গাছটার কাছে তিন কামরার ছোট একখানা বাড়ি তুলে সেখানে দোকান খুলেছে। অপমানিত শ্বশুর চেন্নাশেট্টী লজ্জায় রামসন্দ্র ছেড়ে চলে গেছে, সে এখন তিপটুর ছাড়িয়ে সেই চন্নাপুরে গিয়ে দোকান করেছে। স্বামী গিরিয়াশেট্টীও চলে গেছে গ্রাম ছেড়ে। লোকে বলে সে নাকি এখন অরসিকেরের কাছে কোন গ্রামের কার বাড়িতে চাকরের কাজ করছে।

রেবন্নাশেট্টীকে সৎ পরামর্শ দেবার মত কেউ নেই। তার মুখের সামনে কেউ দাঁড়াতেই পারে না। সর্বক্কার বাপের বাড়িতে তার ভাইয়েরা আছে, তারা বোন আর তার ছেলে-মেয়েদের জন্য যথাসাধ্য করেছে। কিন্তু তাদেরও নিজের নিজের সংসারে আছে। তাদের কাছে গিয়ে কত আর কাঁদুনী গাওয়া যায়? একবার বড় ভাই এসেছিল ভগ্নীপতিকে বোঝাতে, কিন্তু রেবন্না তাদের মা, খুড়ি, ঠাকুমা, দিদিমা পর্যন্ত তুলে এমন গালাগালির ফোয়ারা ছুটিয়েছিল যে সে বলে গেছে আর জন্মে কখনও ওর সঙ্গে কথা বলতে আসবে না।

সর্বক্কা বলছিল, 'দেখ নন্‌জম্মা, এতগুলো বাচ্চার জন্ম দিয়ে খুব ভুল করেছি, এখন যেমন করে হোক এদের মানুষ তো করতেই হবে! তোমার মত পাতা তৈরী করতেও জানি না, একটু শিখিয়ে দেবে আমায়? শিখে নিলে তারপর এ বছর তুমি যখন চোলেশ্বরের টিলায় পাতা আনতে যাবে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'তুমি পাতা তুলে বেড়ালে শেট্টীজী চুপ করে থাকবেন ভেবেছ?'

'চুপ থাকবে না তো করবেটা কি শুনি? আজ দুপুরে যখন তোমার কাছে মড়ুয়া ধার করে নিয়ে পিষে লোন্দা বানালাম তখনতো ঠিক কুকুরের মত গিলেছে বসে বসে।'

পরের দিন থেকে সর্বক্কা রোজ পাতা তৈরী শিখতে আসে। গাঁথবার কাঠিগুলো কিভাবে চিরতে হয়। পাতার বোঁটা ছিড়ে কিভাবে একটু জল ছিটিয়ে নিয়ে চারদিক থেকে গোল করে সাজিয়ে গাঁথতে হয়, কাঠিগুলো ভাঙতে হয় কিভাবে সব সে শিখে ফেলল কদিনে। 'একটু অভ্যাস হয়ে গেলেই আরো তাড়াতাড়ি হাত চলবে।' নন্‌জম্মার এ কথায় অনেকটা ভরসা পেল সর্বক্কা।

৬

সেদিন দুপুরে সরকারী কুয়ো থেকে খাবার জল আনতে গিয়েছিল নন্‌জম্মা। হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে কলসিটা পড়ে গেল কুয়োর মধ্যে। বাড়িতে ঐ একটাই কলসি। কম্বনকেরের কাশিম সাবী এলে তবেই ঐ কলসি তোলা যাবে। এখন বাড়ি গিয়ে আবার ঘড়া নিয়ে আসতে হবে। ঘড়ায় করে সরকারী কুয়ো থেকে জল নিয়ে যেতে একটু লজ্জাও করছিল, কিন্তু উপায় কি? এই সব ভাবতে ভাবতে বাড়ি এসে দেখে কল্লেশ বসে আছে, ছেলে-মেয়েরা মামার আনা চকোলেট খাচ্ছে মহা উৎসাহে।

'ওরা বলল, জল আনতে গেছিস, তা খালি হাতে এলি যে?'

'দড়ি ছিঁড়ে কলসিটা জলে পড়ে গেল।' 'চল, আমি তুলে দিচ্ছি গিয়ে', নন্‌জু ভাইয়ের পিছনে চলল। মামা কি করে কুয়োতে নামবে তাই দেখতে বাচ্চাদেরও কৌতূহল কম নয়, অগত্যা বাড়িতে তালা লাগিয়ে যেতে হল নন্‌জুকে।

গ্রামের অন্য সব কুয়োর জল একটু কটু, তাই বছর দুই হল সরকার থেকে এই কুয়ো খুঁড়ে পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর জল খুব মিষ্টি এবং পরিষ্কার। ডোম চামার ছাড়া অন্য সব জাতের লোকই এই কুয়োর জল নিয়ে যায় খাওয়ার ও রান্নার জন্য। ব্রাহ্মণ, লিঙ্গায়েত, সোনার বেনে, বৈষ্ণব ইত্যাদি উঁচু জাতের বাড়ির মেয়েরা নিজের নিজের দড়ি, কলসি আনে এবং কুয়োয় দড়ি নামাবার আগে বাড়ি থেকে আনা কলসির জলে দড়ি নামাবার চাকাটা ধুয়ে শুদ্ধ করে নেয়।

দড়ির একটা প্রান্ত কুয়োর মধ্যে ফেলে অন্য দিকটা জল তোলার চাকাটার লোহার খুঁটিতে বাঁধল কল্লেশ। ধুতি, কোট ইত্যাদি খুলে রেখে দড়ি ধরে নামতে শুরু করল। জল একেবারে পাতালে, কুয়োটা দু' গজ লম্বা, দু' গজ চওড়া, তবে ওঠা-নামা করার জন্য কুয়োর দেওয়ালে ছোট ছোট কোণ বার করা পাথর লাগানো আছে। জল পর্যন্ত পৌঁছে একটা কলসি তুলল কল্লেশ, তারপর দড়ির ফাঁসে বেঁধে বোনকে বলল ওপরে টেনে নিতে। নন্‌জু টেনে তুলল কলসি, কিন্তু দেখা গেল সেটা ওর কলসি নয়। 'ওটা ওখানেই রেখে দে, কেউ চাইলেও দিবি না এখন। দড়িটা আবার ফেলেদে নিচে' নির্দেশ দিয়ে আবার ডুব দিল কল্লেশ। আরেকটা কলসি পাওয়া গেল। জল হাতড়ে দেখে আরো অন্তত দশ বারাটা কলসি রয়েছে। একে একে সবকটা তুলল সে।

দড়ি ধরে ওপরে উঠে এল পাথরের খাঁজে পা রেখে রেখে। কুয়োর পাড়ে ততক্ষণে কুড়িজনেরও বেশী স্ত্রী-পুরুষ জমা হয়েছে এসে। কল্লেশ বলল, 'নন্‌জা, কোনটা তোর কলসি বেছে নে।' তারপর অন্যদের দিকে ফিরে বলল, 'যার যার কলসি তারা আট আনা করে পয়সা দিয়ে কলসি নিয়ে যেতে পার। পয়সা না পেলে আমি কলসিগুলো বাড়ি নিয়ে যাব।'

কিছু লোক তখনি বাড়ি গেল পয়সা আনতে। আগেকার অস্থায়ী পাটোয়ারী শিবলিঙ্গেও এসেছে। সে বলে বসল, 'আমার গ্রামের কুয়োতে নামবার অনুমতি কে দিয়েছে তোমায়?'

'বেশ তো, কলসিগুলোতে আবার জল ভরে ফেলে দিচ্ছি কুয়োতে। এতবার নিঃশ্বাস বন্ধ করে এতবার ডুব দিলাম কি এমনি এমনি?'

শিবলিঙ্গে আর কিছু বলতে পারল না। সবাই আট আনা করে পয়সা দেওয়ায় সাড়ে ছ' টাকা পেল কল্লেশ। কোটের পকেটে পয়সা রেখে, ধুতি, সার্ট, কোট সব হাতে নিয়ে, ভিজে জাঙিয়া পরেই বাড়ির দিকে চলল সে।

অনেকদিন পরে ভাইয়া এসেছে, দিন দুই তো নিশ্চয় থাকবে। একটু ভাল খাবার-দাবার করতে হবে ভাবল নন্‌জু। সেওই তৈরীর জন্য জিনিসপত্র নিয়ে এল সে। দুপুরের আহারের পর শুয়েছিল কল্লেশ, উঠে বসে বলল, 'ও সব আবার কি আনতে গেলি?'

'কাল একটু সেওই করব, তুমি ভালবাস তো!'

'আমি থাকছি না। আজই সন্ধ্যায় ফিরব।'

'সে আবার কি? এই তো এলে, এখনি যাবে কেন? থেকে যাওনা দু'দিন?'

'না না, খুব দরকারী কাজ আছে। তোকে একবার দেখতে এলাম শুধু। একটু কফি করে দে, ব্যাস, তাহলেই হবে।'

রামন্নাকে দোকানে পাঠিয়ে ছ' পয়সার কফির গুঁড়ো আনিয়ে, গুড় দিয়ে কাঁসার ঘটি ভরে কফি তৈরী করে দিল নন্‌জু। সেটা খেয়েই বেরিয়ে পড়ল কল্লেশ। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বেশ অন্ধকার। বাপের মত কল্লেশেরও অন্ধকারে ভয়-ডর নেই।

সে চলে যাবার একটু পরেই এল সর্বক্কা, বলল, 'নন্‌জম্মা শোন, চোলেশ্বরের টিলার কাছে নাকি এরমধ্যেই সোনার রঙের পলাশ পাতা গজিয়েছে। মন্দিরের মহাদেবায়াজী হুবিনহল্লীতে ভিক্ষায় গিয়ে দেখে এসেছেন, লোকে বিশ্বাস করবে না ভেবে পাতা তুলেও এনেছেন, আমি দেখেছি।'

'এখনও তো মাঘ মাসও শেষ হয়নি সর্বক্কা?'

'এ বছর অঘ্রাণ মাসে বৃষ্টি হল না? তাতেই বোধ হয় এত শীগ্‌গীর নতুন পাতা বেরিয়েছে। চল, কালই যাওয়া যাক।'

যদি আবার বর্ষাও তাড়াতাড়ি নামে তাহলে পাতাগুলো খারাপ হয়ে যাবে, নতুন নতুনই তুলে নেওয়া ভাল, এই ভেবে রাজি হয়ে গেল নন্‌জম্মা। পরদিন অন্ধকার থাকতে তৈরী হতে বলে বাড়ি ফিরে গেল সর্বক্কা। সে প্রথম দিন যাবে বলে উৎসাহটা বেশী। রাতে ঘুমই হল না তার। কোন রকমে রাত কাটিয়ে, কাক পক্ষী ডাকার আগেই রুটির পুঁটলি নিয়ে, ঘোমটায় মুখ ঢেকে নন্‌জম্মার বাড়িতে এসে হাজির। নন্‌জম্মাও তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে এখনও কিন্তু চাঁদের আলো রয়েছে। নন্‌জম্মার ভয় হল বোধ-হয় এত জ্যোৎস্না দেখেই কাক ডেকে উঠেছে, ভোর হয়নি এখনও আসলে। কিন্তু সর্বক্কা তাড়া দিল, 'না না, এরপর রোদ উঠে গেলে মুশকিল হবে, তাড়াতাড়ি চল।' অগত্যা চলতে শুরু করল নন্‌জম্মা। দুজনে গ্রামের সীমা প্রায় পেরিয়ে এসেছে, এমন সময় দেখতে পেল ঝাঁকড়া গাছটার পাশে নরসীর বাড়ির দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল, একটি লোক 'নিশ্চয়, নিশ্চয়', বলতে বলতে বেরিয়ে এল এবং এদেরই সামনের পথ ধরে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। নরসীর বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল আবার।

চিনতে এক মুহূর্তও দেরী হল না নন্‌জম্মার, লোকটি আর কেউ নয়, কল্লেশ। মাথায় ঘোমটা এবং পিঠের ওপর থলি থাকায় কল্লেশ চিনতে পারল না যে স্ত্রীলোক

দুটির মধ্যে একজন তারই বোন নন্‌জু। এরা কে তাই নিয়ে চিন্তা না করে সে খুব জোর কদমে হেঁটে এগিয়ে গেল। নন্‌জু একটু আস্তে হেঁটে ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়ল কিন্তু সর্বক্কাকে বলল না কিছু। সামনের লোকটি দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই প্রশ্ন করল সর্বক্কা 'ওটি আপনার বড় ভাই না?'

'কে জানে কে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই হবে। শুনেছি দশ-বারো দিন পরে পরে একবার করে আসে। রাতের আঁধারে এসে ঢোকে আর ভোরে মোরগ ডাকার আগেই চলে যায়। নরসী নিজেই তো একথা সবাইকার কাছে বলে বেড়ায়।'

কোন উত্তর দেয় না নন্‌জম্মা। মুখ বুঝে এমনভাবে হাঁটতে থাকে যেন এতসব কথা তার কানেই ঢোকে নি।

নবম অধ্যায়

একটা জায়গায় কেউ যদি অনেকদিন ধরে থেকে যায় তাহলে সাধারণত তার নাম করেই জায়গাটার উল্লেখ করা হয়ে থাকে। হনুমান মন্দিরেরও এই অবস্থা হয়েছে। সেখানে অন্নাজোইসের নিত্যপুজোর অধিকার যদিও অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু লোকে আজকাল ও জায়গাটাকে 'গঙ্গম্মার বাড়ি' বলতে শুরু করেছে।

গঙ্গম্মা আর অপ্পন্নায়া হামেশাই এদিক-ওদিকের গ্রামগুলোতে যাতায়াত করে। আগে প্যাটেল শিবেগৌড়ের নাম রামসন্দ্রের তিন মাইল পরিধির বাইরে বিশেষ কেউ জানত না, কিন্তু এখন গঙ্গম্মাদের কল্যাণে আশে-পাশে বিশ মাইল দূরের গ্রামেও সে বেশ সুপরিচিত ব্যক্তি। মা আর ছেলে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাঁদুনি গেয়ে বেড়ায়। 'ঐ পাপী রাঁড়ের ব্যাটা আমাদের ঠকিয়ে সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে, দয়া করে কিছু সাহায্য কর গো।' এই সব বলতে বলতে নিজের লাল শাড়ীর আঁচল পেতে বসে পড়ে গঙ্গম্মা গৃহস্থের উঠোনে। লোকে কুলোয় করে এনে তার আঁচলে ঢেলে দেয় মড়ুয়া, বরবটি, লঙ্কা ইত্যাদি। আঁচলে বেঁধে উঠে পড়ে গঙ্গম্মা সেখান থেকে। বেশ কিছু রসদ সংগৃহীত হলে অপ্পন্নায়া বস্তায় ভরে মাথায় চাপিয়ে সেগুলো নিয়ে আসে বাড়িতে। ভিক্ষা অবশ্য মহাদেবায়াজীও করেন, কিন্তু সে অন্য রকম ব্যাপার। তিনি বন্ধনহীন বৈরাগী মানুষ। গেরুয়া পরনে, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, কপালে বিভূতিমাখা সন্ন্যাসী, লোকের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একবার শুধু বলেন, 'ভিক্ষা, গুরু রেবন্নাজীর শিক্ষা।' এক মুঠো মড়ুয়া হয়ত পড়ে তাঁর ঝুলিতে। কিন্তু গঙ্গম্মা প্রতিটি বাড়িতে বসে বসে নিজের ইতিহাস শোনায় এবং অভিসম্পাত দিতে থাকে শিবেগৌড়ের পরিবারকে। যা হোক কিছু তো পাওয়া যায়ই, আর যারা কিছু দেয় না, তাদের গঙ্গম্মা শাপমন্যি দিয়ে চলে আসে।

গঙ্গম্মার বাড়িতেও একটা সিন্দুক আছে, সেটাতে মড়ুয়া ভরা। দু'বস্তা বরবটির ডাল এবং একটা বড় হাঁড়ি ভর্তি লঙ্কাও আছে। 'শিবেগৌড় বেঁচে আছে বটে, কিন্তু আমিও তো মরিনি।' এই বলে নিজের ধর্ম-কর্মের বড়াই করে গঙ্গম্মা।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা দু'খানা গরুর গাড়ি এসে দাঁড়াল হনুমান মন্দিরের সামনে। একটা গাড়ির চালক তেলী শিঙ্গরেট্টী, অন্যটায় মিস্ত্রী মুকন্না। গাড়ি দুটোয় বাসন-কোসন, বিছানা-মাদুর ইত্যাদি ঘর-সংসারের যাবতীয় জিনিস ঠাসা। গাড়িতে এসেছে বছর পঞ্চাশ বয়সের একটি বিধবা মহিলা, বছর পঁচিশের এক যুবতী, সাত বছরের একটি মেয়ে ও চার বছরের ছোট্ট একটি ছেলে। এদের আসতে দেখেই অপ্পন্নায়া চোরের মত চুপি চুপি মন্দিরের পেছন দিকের ঘাস বনের মধ্যে দিয়ে কেটে পড়ল। মুকন্না গাড়ি

থেকে নেমে বলে উঠল, 'এইটেই গঙ্গম্মাজীর বাড়ি'। জিনিসপত্র নামাতে শুরু করল সে। মহিলা একটু সঙ্কুচিতভাবেই ভিতরে এল, গঙ্গম্মা চিনতে পারছে না এদের। বৃদ্ধা এবার বলল, 'আমরা নুগ্গীকেরে থেকে আসছি। আমার স্বামী মারা গেছেন দু'বছর হয়ে গেল। সাতু তার ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন এখানেই থাকতে চায়, তাই ওদের নিয়ে এলাম।'

মিনিট দুই লাগল গঙ্গম্মার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে। ইতিমধ্যে বাচ্চাদের হাত ধরে সাতুও ভিতরে এসেছে। মুহূর্তে অনেক কিছু ভেবে ফেলল গঙ্গম্মা, বলে উঠল, 'হ্যাঁরে ছেনাল, এ মেয়েটা তো তার বাপেরই বুঝলাম, এখানে থাকতেই তুই পোয়াতি হয়েছিলি। তা এই ছেলেটা কার শুনি? পাটোয়ারী রামন্নার কুলে কালি দিলি শেষ পর্যন্ত? দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা তোকে!' কোণায় রাখা আবর্জনার টুকরীটা তুলে নিল সে।

তার বেয়ান ঠাকরুণ বলে উঠলেন, 'এ সব যা তা কথা বলছেন কেন? আপনার ছেলে তো আসত আমাদের গ্রামে, তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন না। আমার মেয়ের স্বভাবে কোন দোষ নেই। নামকরণের সময় তো খবর দিয়ে চিঠি লিখেছিলাম, কেউ এলেন না কেন?' কিন্তু এ সব কথা কানেই ঢুকল না গঙ্গম্মার।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এল সাতু। বাচ্চারা ভয়ে ভয়ে মায়ের আঁচল চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সাতুর মা বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'বাপরে বাপ, এমন মেয়েমানুষ জন্মে দেখিনি, খুব শিক্ষা হল যাহোক।' সাতু বলল, 'ওঁর সঙ্গে দেখা না করে আমি যাব না। আমার বড় জা এখানেই আলাদা থাকে, এখনকার মত তার বাড়িতে চল।' মা রাজি হলেন। মুকন্না আর শিঙ্গরেট্টী গাড়ি দুটো নিয়ে এল এবার নন্‌জম্মার বাড়ির সামনে, সেখানেই নামিয়ে দিল জিনিসপত্র। এদের আগমনের কারণ জানতে চাইল না নন্‌জম্মা, সাতুর মায়ের লাল শাড়ী দেখেই সে বুঝল সাতুর বাবা মারা গেছেন। আহা, হয়ত অনেক কষ্ট পেয়েছে এরা! খাওয়া দাওয়া করুক আগে, তারপর সব খবর নিলেই হবে। সবাইকে আদর করে ভিতরে নিয়ে এল সে। ছেলেটিকে দেখে তারও একটু আশ্চর্য লাগছিল, কিন্তু কোন রকম গোলমাল থাকলে একে নিয়ে আসার সাহস নিশ্চয় হত না সাতুর! সাতু কাঁদতে শুরু করেছে। তার মা তঙ্গম্মা বললেন, 'অপ্পন্নায়া দু বার এসে পনেরদিন করে থেকে গেছে, তারপর তো এই রামকৃষ্ণ জন্মাল। ঐ বজ্জাত মাগী, রাস্তা থেকেও যাতে লোকে শুনতে পায় এমন করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার মেয়ের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে খোঁটা দিল!'

'আপনারা কাপড়-চোপড় বদলে নিন। কতদিন হল উনি মারা গেছেন?'

'দু বছর হল। তিনি যতদিন ছিলেন, পুরোহিতের কাজ করতেন, কোন অভাবই ছিল না। এখন আমরা অনাথ, কে দেখবে আমাদের? স্বামীর কাছেই স্ত্রীর থাকার কথা। অপ্পন্নায়া যখন এসেছিল, বলেওছিল এদের নিয়ে আসবে। সে তো আর গেল না, তাই আমাদেরই আসতে হল। তিপটুর থেকে বাসে এসেছি। এই দুটো গাড়ি গোবরের সার নিয়ে খেতে গিয়েছিল, সেখান থেকে চার-চার আনায় ভাড়া নিলাম জিনিস-পত্র গুলো বয়ে আনার জন্য।'

'সাতু, বাচ্চাদের জামা-কাপড় বদলে নাও, ওদের খিদে পেয়েছে নিশ্চয়'—নন্‌জম্মার

মুখের কথা শেষ হতে না হতে গঙ্গম্মার তীক্ষ্ণ কন্ঠের চিৎকার শোনা গেল, 'ঐ ছেনালকে জুতোপেটা করে মাথা মুড়িয়ে গাঁছাড়া করব, না করি তো আমার নাম গঙ্গম্মা নয়।' এ বাড়িতে ঢুকেই আবার শুরু করল, 'তুইও ওর দলে নাম লেখাবি না কি রে ছেনাল, ওকে যে ঘরে বড় জায়গা দিয়েছিস? তোকেও উচিত শিক্ষা দিয়ে তবে ছাড়ব।' গঙ্গম্মার পেছন পেছন এসে ঢুকলেন অইয়াশাস্ত্রী এবং অন্নাজোইস। মিনিটখানেকের মধ্যেই এসে গেল শিবেগৌড় ও শিবলিঙ্গে, দশ গুনতে না গুনতে তাদের পেছনে রেবন্নাশেট্টী, তার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশ ক'জন কৌতুহলী দর্শক, মনে হচ্ছে যেন এ বাড়ির উঠোনে ভালুক নাচের তামাশা হচ্ছে বুঝি। বেশ বোঝা গেল গঙ্গম্মাই এদের সব ডেকে এনেছে।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল নন্‌জম্মা। একবার ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করে, 'কেন এসেছেন আপনারা, কে আসতে বলেছে এখানে?' কিন্তু গ্রামের এইসব প্রধান ব্যক্তিদের শত্রু করে তোলাটা উচিত হবে না। তবে কাউকেই সে ভিতরে এসে বসতে আহ্বানও জানাল না এবং মাদুর বিছিয়ে আপ্যায়নও করল না। এতক্ষণে চেন্নিগরায়ের ঘুম ভেঙেছে, সে এসে দু'খানা মাদুর বিছিয়ে দিল। দুই পুরোহিতের জন্য আলাদা আসন। সাতু, দুই বাচ্চা এবং তঙ্গম্মা তখন রান্নাঘরে আশ্রয় নিয়েছে।

গঙ্গম্মা চিৎকার করল, 'পালাচ্ছিস কোথায়? ছেনাল, রাঁড় কোথাকার, এদিকে আয় পঞ্চায়েতের সামনে'।

ধর্মের প্রতিনিধি রেবন্নাশেট্টী হাঁক দিল, 'ন্যায়বিচার হবে, ন্যায়বিচার! সামনে চলে এস বোন।' রেবন্নাশেট্টী এখানে এসে ধর্মাত্মা সেজে ন্যায়বিচারের জন্য আস্ফালন করছে, এটা একেবারে অসহ্য মনে হল নন্‌জম্মার, কিন্তু এদের তাড়াবে কি করে সে? একটা উপায় আছে! ঠিক এই সময় শ্লেট-বই নিয়ে স্কুল থেকে ফিরল পার্বতী আর রামন্না। নন্‌জম্মা তাদের বলল, 'দৌড়ে যা দেখি, মন্দির থেকে মহাদেবায়াজীকে আর তোদের মাস্টারমশাইকে ডেকে নিয়ে আয়, বলবি এখনি আসেন যেন, একটুও দেরী না করেন।' দুই ছেলেমেয়ে ছুটে চলে যায়।

নন্‌জম্মার দিকে তাকিয়ে রেবন্নাশেট্টী বলে ওঠে, 'কেন আমরা কি ন্যায়বিচার করতে পারি না নাকি?' উত্তর না দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল নন্‌জম্মা। গঙ্গম্মা ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে, 'উকিলনী, ঘরে গিয়ে ঢুকলেন যে বড়?' নন্‌জম্মা কিন্তু বাইরে এল না।

অইয়াশাস্ত্রীজী এবং অন্নাজোইস এবার প্রস্তুত হলেন তাঁদের শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিতে। অন্নাজোইস একটা মন্ত্র আউড়ে ফেলল। মনু-ধর্মশাস্ত্রে লিখেছে, ব্যভিচারিণীর মস্তকচ্ছেদ করাই বিধেয়। বেদে বলা হয়েছে, হাজার আসরফি ব্যয় করে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। প্রায়শ্চিত্তের পূর্বে একে গৃহে প্রবেশ করতে দিয়ে নন্‌জম্মাও অন্যায় করেছে, বিজ্ঞের মত মন্তব্য করলেন অইয়াশাস্ত্রী।

ইতিমধ্যে মহাদেবায়াজীও এসে গেলেন। গঙ্গম্মা তো সারা গ্রামে ঢ্যাঁটরা পিটতে পিটতে এসেছে, সুতরাং গ্রামসুদ্ধ লোক তামাশা দেখতে হাজির, যেন মেলা বসেছে। তাদের ভিড় ঠেলে পথ করে ভিতরে এলেন মহাদেবায়াজী। ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে বলার দরকার ছিল না। তাঁকে দেখে এবার নন্‌জম্মা বাইরে এসে বলল, 'অইয়াজী আপনি

ধর্ম জানেন, ন্যায়বিচারের জন্য যা প্রশ্ন করার আপনিই করুন। সবাই মিলে যেন কথা বলতে না আসে। ও ভিতরে বসে আছে, ঈশ্বরের নামে শপথ করে এখনও বলছে, অপ্পন্নায়া ওখানে গিয়েছিল, সেই এই সন্তানের জন্মদাতা।'

ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হল না মহাদেবায়াজীর। তিনি বললেন, 'আগে অপ্পন্নায়াকে ডাক, তারপর বিচার হবে।' গঙ্গম্মা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার বাছার কোন দোষ নেই, তেমন মায়ের ছেলে নয় সে।'

'দোষ আছে কিনা সেইটেই তো খোঁজ নিতে হবে। স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে যায় তাতে কোন দোষ হয় না'। এইভাবে গঙ্গম্মাকে শান্ত করে মহাদেবায়াজী দরজার বাইরে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যেখান থেকে হোক, অপ্পন্নায়াকে আগে ডেকে আন।' দশ-বারোজন দৌড়ল এদিক-ওদিকে। পুরোহিতদ্বয় এরমধ্যে আবার শাস্ত্রচর্চা আরম্ভ করার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু মহাদেবায়াজী এক কথায় সবাইকার মুখ বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'অপ্পন্নায়া না এসে পৌঁছন পর্যন্ত কোন কথা হবে না'।

মিনিট পনের পর অপ্পন্নায়াকে এনে হাজির করা হল। শোনা গেল, সে বসপ্পাশেট্টীর খড়ের গাদায় লুকিয়ে বসেছিল। সবাইকার চোখ এড়িয়ে পালাবার তালে ছিল, কিন্তু অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে দু'জন দেখতে পেয়ে গ্রেপ্তার করে এনেছে। টিকিটা খুলে তার চুলগুলো ঝুলছে মুখের চারপাশে। মহাদেবায়াজী ওকে প্রথমটা কিছু জিজ্ঞাসা না করে নন্‌জম্মাকে বললেন ঘরের মধ্যে ঠাকুরের ছবি রেখে তার সামনে প্রদীপ জ্বেলে দিতে। নন্‌জম্মা ঘরে একটি আসন পেতে সেখানে শ্রীরামচন্দ্রের ছবি রেখে দীপ জ্বালল। এবার সিঁদুরের কৌটোটা চাইলেন মহাদেবায়াজী। কৌটো খুলে অপ্পন্নায়ার কপালে একটি ফোঁটা দিয়ে, তাকে শ্রীভগবানের ছবি স্পর্শ করিয়ে বললেন, 'দেখ বাপু, মিথ্যা বললে ভগবান তোমার হাত-পা নষ্ট করে দেবেন, দেবীর কোপে তোমার বিনাশ হবে। সত্যি কথা বল দেখি, মাকে লুকিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলে কিনা?'

অপ্পন্নায়া চুপ করে রইল। 'আমার বাছাকে এমন জোর-জবরদস্তি করে মিথ্যে কথা বলিয়ে নিচ্ছ কেন বল তো?' চেঁচিয়ে উঠল গঙ্গম্মা। সে কথায় কান না দিয়ে মহাদেবায়াজী বললেন, 'উত্তর দিতেই হবে। সত্য কথা না বললে তোমার হাতে-পায়ে পক্ষাঘাত হবে। ঐ যে প্রদীপের আগুন দেখছ, ঐ আগুন ধু ধু করে জ্বলে উঠে তোমায় ভস্ম করে ফেলবে। শনি ঠাকুরের কথা জান তো? রাজা বিক্রমের হাত-পা কিভাবে কাটা পড়েছিল? নাও মুখ খোল এবার।'

বেশ ভয় পেয়ে গেছে অপ্পন্নায়া। নায়িশিঙ্গি গ্রামের দেবীদাসজী শনিমাহাত্ম্য-বিষয়ক যক্ষগান মঞ্চস্থ করিয়েছিলেন, তাতে পা-কাটা যাওয়া বিক্রমের বিলাপের দৃশ্য মনে পড়ে গেল তার। এই সময় মহাদেবায়াজী আবার বললেন, 'মিথ্যা উচ্চারণ করলেই শনিদেব ...।' তার কথা শেষ হবার আগেই অপ্পন্নায়া বলে উঠল, 'আমি মিথ্যা বলছি না, দু'বার আমি নুগ্গীকেরে গিয়েছিলাম।'

'কতদিন করে থেকেছিলে?'

'একবার পনেরদিন, অন্যবারের কথা মনে নেই।'

'শেষবার কবে গিয়েছিলে?'

'এর আগের বার যখন প্লেগের মড়ক লেগেছিল সেই'সময়।'

অর্থাৎ প্রায় ছ'বছর আগে। নন্‌জম্মা এবার ভিতর থেকে সাতুর ছেলেটির হাত ধরে বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। ছেলেটির বয়স বছর পাঁচেক, মুখের চেহারায় অপ্পন্নায়ার সঙ্গে সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট।

'হারামজাদা জাবগল্ল যাবার নাম করে তুই এই করতে গিয়েছিলি? যা তবে ওখানেই থাক গিয়ে, আমি আর তোর খোরাক জোগাতে পারব না। রাঁড়ের ব্যাটা কোথাকার!' বলেই সেখান থেকে চলে যায় গঙ্গম্মা। তামাশাটা বড় চট করে শেষ হয়ে গেল। এখানে আর বসে থেকে কোন লাভ নেই দেখে দুই পুরোহিত উঠে পড়লেন, অন্য সবাইও সভা ভঙ্গ করে চলে গেল।

২

সেই দিনই গঙ্গম্মা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে অন্য গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। এরকম ওরা প্রায়ই যায়, এটা কিছু নতুন কথা নয়। মন্দিরের দরজার অন্য চাবিটা থাকে অন্নাজোইসের কাছে, কাজেই তাদের অনুপস্থিতিতেও অন্নাজোইস চাবি খুলে মন্দিরে পুজো করতে ঢোকে।

সাতু আর তার দুই ছেলেমেয়ে নন্‌জম্মার কাছেই থেকে গেল। এদের জন্য মড়ুয়া এবং বরবটি নন্‌জম্মার ঘরে যথেষ্ট আছে, কিন্তু মুশকিল হল মড়ুয়ার রুটি আর বরবটির ডাল সাতুর বাচ্চাদের পেটে সহ্য হয় না। এদিকে প্রত্যহ ভাত এবং অড়হর ডাল রাঁধবার মত সঙ্গতি নেই নন্‌জম্মার। বিশেষ কোন পুজাপার্বনের দিন সে মোটাচালের ভাত রাঁধে আর এলাকাদার বা ঐ জাতীয় কোন সরকারী কর্মচারী এলে তবেই বাড়িতে মিহি সাদা চালের ভাত, অড়হর ডাল ইত্যাদি রান্না হয়। এর বেশী কিছু করা তার ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু উপায় কি? অগত্যা হাসিমুখেই নন্‌জু আজকাল রোজই ভাত ও অড়হর ডাল রাঁধছে। ভাত দেখলে তার নিজের ছেলেমেয়েরাও নেচে ওঠে, চেন্নিগরায়ের তো কথাই নেই। এতগুলি লোকের জন্য রোজ ভাত রাঁধতে গিয়ে ননজুর পক্ষে সংসারের খরচ চালানো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছে।

দিন পনের পর শোনা গেল মাতা, পুত্র গ্রামে ফিরেছেন। সন্ধ্যার পর একটা প্রদীপ জ্বেলে সে পার্বতীকে বলল, 'যা দেখি, চুপি চুপি তোর কাকাকে ডেকে নিয়ে আয়, ঠাকুমা যেন টের না পায়।' পার্বতীও ব্যাপার বুঝে চুপচাপ অপ্পন্নায়াকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। এ বাড়িতে এসে স্ত্রীকে দেখে অপ্পন্নায়ার ভালও লাগল আবার ভয়ও হল মনে। লজ্জিত ভাবে একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। নন্‌জম্মা তাকে বসতে দিয়ে কথা বলতে লাগল। সাতু রান্না ঘরে রান্নায় ব্যস্ত।

'আজ এখানেই খেয়ে যাও, অপ্পন্নায়া।'

'কিন্তু মা ···।'

'মা কিছু বলবেন না, রাতের ফলাহারে উনি তোমার রুটি খেয়ে নেবেন এখন। ওঠো মুখ হাত ধুয়ে নাও।' চেন্নিগরায়ও উঠে পড়ল। বাচ্চাদের বসিয়ে দিয়ে নন্‌জম্মা সাতুকে বলল পরিবেশন করতে। 'থাক, আর চাইনা' এটুকু বলতেও সঙ্কোচ বোধ করছে অপ্পন্নায়ার। সাতুরও লজ্জা করছে, সেই সঙ্গে নিজেকে সকলের কৃপার পাত্র ভেবে অপমানিতও বোধ করছে সে। নন্‌জম্মা আর তঙ্গম্মা রয়েছে উঠোনে। খেয়ে উঠে দুই ভাই পান নিল। নন্‌জম্মা এবার ঘরের মধ্যে এসে সাতুকে চুপি চুপি কিছু বলে, বিধবা তঙ্গম্মাও এসে যোগ দেয় এই আলোচনায়।

ধান-চাল ইত্যাদি জমা করে রাখার জন্য একটা ছোট ঘর আছে এ বাড়িতে, সে ঘরটা পরিষ্কার করে সেখানে মাদুর পাতে নন্‌জম্মা, সাতু সেখানে একটা বিছানা পেতে দেয়। অপ্পন্নায়া বাড়ি যাবার জন্য উঠতেই নন্‌জম্মা বলে ওঠে, 'আজ এখানেই থেকে যাও না?'

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে অপ্পন্নায়া বেশ খুশি হয়ে ওঠে, কিন্তু ভয় করছে যে? অন্যমনস্কভাবে বলে ওঠে, 'কিন্তু, মা …।' নন্‌জু বলে, 'না হয় পার্বতী আর রামন্নাকে মার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যদি একা থাকতে ভয় করে তাঁর। তুমি ঐ ছোট ঘরটায় গিয়ে শুয়ে পড়।' এদিকে চেন্নিগরায় স্ত্রীকে বকতে শুরু করে, 'তোর এসব ব্যাপারে এত মাথাব্যাথা কেন শুনি?' স্বামীকে তার পরিকল্পনায় বাগড়া দিতে দেখে চটে গিয়ে নন্‌জুও এবার চোখ রাঙিয়ে বলে, 'চুপচাপ মুখ বুজে থাক দেখি। তিরুমল গৌড়জীর বাড়ি থেকে প্রসাদী দুধ এসেছে, তাই দিয়ে পায়েস হচ্ছে, খাবে কি খাবে না বলে দাও।' পায়েসের নাম শুনেই আর কথাটি না বলে চেন্নিগরায় রান্নাঘরে ঢোকে। অপ্পন্নায়া ঢুকে পড়ে ছোট কুঠরীটার মধ্যে। নন্‌জু এবার রান্নাঘরে গিয়ে স্বামীকে বলে ওঠে, 'পায়েস হয়ে গেলে আমি ডাকব, ততক্ষণ আর একবার তামাক খাও গে যাও' স্বামীকে কোনমতে বাড়ি থেকে বাইরে পাঠিয়ে, সাতুকে পাঠায় অপ্পন্নায়ার ঘরে, তারপর দরজাটা বাইরে থেকে শিকল তুলে দেয়।

পায়েসের নাম করে তো এখনকার মত কাজ উদ্ধার হল, কিন্তু এখন পায়েস তৈরী করার মত গরু বা মোষের দুধ পাওয়া যায় কোথায়? বুদ্ধি খাটিয়ে নন্‌জম্মা তাড়াতাড়ি বাচ্চাদের আগে শুইয়ে দিল। তারপর একটা নারকেল ভেঙে, কিছু চাল ও নারকেল একসঙ্গে পিষে, দু ভেলি গুড় মিশিয়ে, ওপর থেকে সামান্য একটু দুধ ঢেলে বানিয়ে ফেলল পায়েস। তঙ্গম্মাকে বলল এবার চেন্নিগরায়কে ডেকে দিতে। পাটোয়ারীজী তখনও না ঘুমিয়ে বসেছিলেন পায়েসের আশায়। ডাক শুনে ভিতরে এসে বসে পড়তেই, পায়েসের হাঁড়ি আর এল্যুমিনিয়মের থালা সামনে দিয়ে নন্‌জম্মা বলল, 'নিজে তুলে নিয়ে খেয়ে নাও। ওদের মোষটা আজ পনের দিন হল বিইয়েছে, তা দুধটা ফাটেনি, ভালই হয়েছে পায়েস।'

চেন্নিগরায় এক হাতা পায়েস তুলে থালায় নিয়ে চাখল, চমৎকার হয়েছে। নন্‌জম্মা বলল, 'তাহলে নিজেই নিয়ে খেয়ে নাও। আমি যাচ্ছি, কাজ আছে।' আহারে ব্যস্ত চেন্নিগরায়ের তখন 'হুঁ' বলবার মতও অবসর নেই।

সকালে উঠে পুকুরধার থেকে ঘুরে এসেই অপ্পন্নায়া মন্দিরে চলে গেল। মাকে গিয়ে বলল, 'ওদের এখানেই নিয়ে আসি, মা?'

'কাদের?'

'ওই নুগ্গীকেরের ওদের।'

গঙ্গম্মা তো অবাক। একটু পরেই ব্যাপার বুঝে ফেলল সে। 'ওরে রাঁড়ের ব্যাটা, আমি ভাবলুম বুঝি দাবলাপুরে যক্ষগান দেখতে গেছিস। তুই গিয়ে ঐ খারাপ মেয়েটার সঙ্গে শুয়েছিস?'

অপ্পন্নায়া দাঁড়িয়ে আছে নতমস্তকে। কিছুক্ষণ অবিশ্রান্ত গালিবর্ষণের পর গঙ্গম্মা প্রশ্ন করে, 'সেই লক্ষ্মীছাড়িই বলেছে বুঝি এখানে নিয়ে আসার কথা?'

সাহস সঞ্চয় করে অপ্পন্নায়া বলে, 'সে আর কি বলবে, আমিই বলেছি। ওখানে ফেলে রাখার কি দরকার? নিয়েই আসব।'

'ওরে হারামজাদা, তুই কি তাকে এখানে নিয়ে আসবি বলে কথা দিয়ে এসেছিস নাকি? দাঁড়া, অন্নাজোইসজীকে বলে তোকে দেখাচ্ছি মজা।' বিন্দুমাত্র দেরী না করে গঙ্গম্মা অন্নাজোইসের বাড়িতে গিয়ে ডাক দেয়, 'জোইসজী একটু শুনে যান তো।'

গঙ্গম্মার গলা শুনেই দু চারজন লোক জমে গেছে। জোইস বাইরে আসতেই গঙ্গম্মা বলে, 'কাল সেই ব্যভিচারিণী মেয়েমানুষের সঙ্গে রাত কাটিয়ে এসেছে, আজ বলছে তাকে মন্দিরে নিয়ে আসবে। আপনিই বলুন, স্বামী-স্ত্রী কি মন্দিরে একত্র বাস করতে পারে?'

'হনুমানজী নিজেই ব্রহ্মচারী, তাঁর মন্দিরে স্বামী-স্ত্রীর একত্রে বাস ধর্ম-নিষিদ্ধ। ওর বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে। এ কাজ যদি করে আমি তোমাদের সবশুদ্ধ মন্দির থেকে দূর করে দেব। এরকম পাপ ঘটলে এ গ্রামে হবে অনাবৃষ্টি আর দুর্ভিক্ষ।' অন্নাজোইস মন্দিরে গিয়ে অপ্পন্নায়াকে শাসিয়ে দিয়ে এল। এবার অপ্পন্নায়ার মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু কাল রাতের সুখস্মৃতিও মনকে উতলা করে তুলছে, স্ত্রীকে ছেড়ে থাকার চিন্তাও অসহ্য লাগছে এখন। বহু কষ্টে নিজেকে একটু শান্ত করে বৌদিদির কাছে গিয়ে সব ব্যাপার খুলে বলল অপ্পন্নায়া। কিন্তু পেছন পেছন গঙ্গম্মাও এসে হাজির। দরজার কাছ থেকেই চেন্নিগরায় ও নন্‌জম্মার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করছে। চেন্নিগরায় তখনও শুয়ে শুয়ে রাত্রের পায়েসের জাবর কাটছিল, উঠে বসল এবার। হয়ত বৌকে ধমক দিতে শুরু করত, কিন্তু পুকুরে যাবার তাড়া থাকায় উপস্থিত কিছু না বলেই দৌড়ল। গঙ্গম্মা ভাবল বড় ছেলেও বুঝি তার বিরুদ্ধে। সে আর সময় নষ্ট না করে বাড়ি ফিরে এল।

৩

অপ্পন্নায়া বৌদির বাড়িতেই থেকে গেল সে দিনটা। এই দু তিন দিনে সে মনে মনে সিদ্ধান্ত করে ফেলেছে স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে আলাদা থাকবে। শাশুড়ীকেও তাদের সংসারেই রাখতে হবে। এতদিন ধরে মায়ের সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে, ভিক্ষা করেই সে সংসার প্রতিপালন করতে পারবে এ বিষয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে তার। শুধু একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা দরকার।

হনুমান মন্দির থেকে মাত্র তিরিশ গজ দূরেই কুরুবরহল্লীর গুণ্ডেগৌড়জীর একটা বাগান পড়ে আছে, সে বাগানটা কারোই কোন কাজে লাগে না। নন্জম্মা একদিন অপ্পন্নায়াকে নিয়ে গুণ্ডেগৌড়জীর কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলে সব ব্যবস্থা করে ফেলল। অপ্পন্নায়া যদি নিজে খরচ-পত্র করে সেখানে ঘর তুলে নেয় তাহলে গুণ্ডেগৌড়জীর তাকে থাকতে দিতে কোন আপত্তি নেই একথা জানিয়ে দিলেন তিনি। অপ্পন্নায়া চেন্নিগরায়ের মত অলস নয়। কেউ পথ বাতলে দিলে পরিশ্রম করার মত শক্তি তার যথেষ্ট আছে। বহুদিন পরে স্ত্রীকে কাছে পেয়ে দেহে মনে বেশ উৎসাহের জোয়ার নেমেছে তার। নন্জম্মা হয়েছে দিশারী। সাতু তার একসেরী রূপার পঞ্চ পাত্রটা বিক্রী করে পঁচিশ টাকা এনে দিল স্বামীর হাতে। তাই দিয়ে অপ্পন্নায়া চটপট বাঁশ, মাটি, পাথরের পিলপে ইত্যাদি কিনে নিয়ে, নিজেই মাপজোক করে দেখতে দেখতে কোমর পর্যন্ত উঁচু দেওয়াল তুলে ফেলল। পাথরের পিলপেগুলো পুঁতে তার সঙ্গে বাঁধল বাঁশ আর কাঠের বল্লা। পাঁচ-জনের কাছে চেয়েচিন্তে খড় আর নারকেল পাতা দিয়ে ঘরের ছাদ ছাওয়া হয়ে গেল। তিন টাকা মজুরী দিয়ে ছিটকিনী সমেত একটা কাঠের দরজাও করানো হল ছুতোরকে দিয়ে। তারপর এক শুভদিনে 'দুধ উথলানো' অনুষ্ঠান সেরে নতুন বাড়িতে সপরিবারে গৃহপ্রবেশ করল অপ্পন্নায়া। এতদিন পর্যন্ত নন্জম্মার কাছেই খাওয়া-দাওয়া চলছিল এদের।

এবার জীবিকার চেষ্টায় লাগতে হবে। মাকে ছেড়ে একাই গ্রামে গ্রামে ঘুরতে শুরু করল অপ্পন্নায়া। সর্বত্রই আগের মত শিবেগৌড়কে দোষারোপ করে কিছু ভিক্ষা চাইত। ঠিক, দরজায় ঝুলি পেতে দাঁড়ানো ভিক্ষুক তো নয় সে, কাজেই অন্ততঃ আধসেরের কম কেউই দিত না। এরই মধ্যে দ্বিতীয় ফসলের মরশুম এসে গেল এবং অপ্পন্নায়াকে দেখা যেতে লাগল কৃষকদের খেতের ধারে। রাশিপূজার সময় আগন্তুককে কিছু দান করলে নাকি ধন বৃদ্ধি হয়, সুতরাং সময়মত পৌঁছলে অপ্পন্নায়া পেয়ে যেত এক কুলোভরা শস্যের দানা। মাঝে মাঝে আবার কারো খেতের পাশে অতর্কিতে দেখা হয়ে যায় মা এবং ছেলের। কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না, এমন ভাণ করে, যেন দেখতেই পায় নি। এদিকে লোকে বিদ্রূপ করে বলে, 'দেখানো হচ্ছে যে দুজনে আলাদা হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা তাই বলে দুবার করে দেব কেন?' কেউ কেউ অবশ্য কোন কথা না শুনিয়ে দুজনকেই দেয় কিছু কিছু।

অন্য গ্রামে ভিক্ষায় বেরিয়েও মাঝে মাঝে ঐ রকম পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। আগে যে সব বাড়িতে মা ও ছেলে একসঙ্গে যেত এখন সেখানে দুজনে যায় আলাদা আলাদা। কিছু দিনের মধ্যেই অনেকে বলতে শুরু করল, 'এমনভাবে দুজনকে আলাদা করে বার বার কোথা থেকে দেব আমরা?' গঙ্গম্মা তাই প্রাণপণে চেষ্টা করে যাতে সে অপ্পন্নায়ার চেয়ে আগে আগে প্রত্যেকবার পরিক্রমাটা সেরে ফেলতে পারে। যদিও তার তো মাত্র একটা পেট, খরচ অনেক কম। এত মড়ুয়া, বরবটি আর লঙ্কা তাঁর ভাঁড়ারে জমে গেছে যে এখন তিন বছর বসে খেলেও বোধহয় ফুরোবে না। ওদিকে অপ্পন্নায়াকে পাঁচজনের মত অন্নসংস্থান করতে হয়, তার মধ্যে আবার একটি বিধবা। তাছাড়া বৃদ্ধা গঙ্গম্মা

ভিক্ষা চাইলে লোকের দয়া হয়, কিন্তু একজন শক্ত সমর্থ পুরুষ ভিক্ষা চেয়ে বেড়ালে অনেক সময়েই লোকে শুনিয়ে দেয় মুখের ওপর, 'তা হাত-পা কি পড়ে গেছে নাকি? মুটেগিরি করলেও তো রোজগার হয়?'

বৌকে কাছে পেয়ে প্রথম কিছুদিন অ'পন্নায়ার মনে বড় স্ফূর্তি ছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উৎসাহে ভাটা পড়ে এল। সারাদিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে দরজায় দরজায় নানা রকম মিঠে কড়া বুলি শুনতে আর ভাল লাগে না। আগে ভিক্ষা চাওয়াটা ছিল মায়ের কাজ, লাল শাড়ীর আঁচল পেতে সে সংগ্রহ করে আনত, তারপর সবটা একসঙ্গে বস্তায় ভরে বাড়ি পর্যন্ত বয়ে আনার কাজটাই শুধু করতে হত অ'পন্নায়াকে। এখন নিজেকে মুখ ফুটে চাইতেও হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁটকেঁটে কথাও শুনতে হয়, মনটা তেতো হয়ে ওঠে।

নন্‌জম্মা এল একদিন এ বাড়িতে। অ'পন্নায়া তখন ভিক্ষায় বেরিয়েছে। এদিক-ওদিক দু-চার কথার পর নন্‌জম্মা বলল, 'জয়লক্ষ্মী তো পার্বতীর চেয়ে বেশী ছোট নয়, ওকে আর রামকৃষ্ণকেও স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া উচিত। ছেলেপেলের অক্ষরপরিচয় না হলে মানুষ হবে কি করে।'

'হ্যাঁ, তাতো বটেই।'

'আর একটা কথাও বলতে এলাম আমি', তঙ্গম্মাকে বলে সে, 'আপনারা নাকি মড়ুয়া যা পাওয়া যায় সব বেচে দেন? এই দ্বিতীয় ফসলের পর কিছুদিন লোকে একটু-আধটু ধান দেবে কিন্তু জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের পর কেউ আর একদানাও ধান ঘরের বার করবে না। এখন যদি সমস্ত ধান খরচ করে ফেলেন, পরে খুব অসুবিধায় পড়তে হবে। সন্নেনহল্লীর থেকে দু একটা বড় মাটির জালা আনিয়ে কিছু ধান জমিয়ে রাখুন।'

বিধবা তঙ্গম্মা জবাব দিল, 'ঐ পোড়ার মড়ুয়া রেখে করবটা কি? কেউ তো খাবে না ওসব?'

নন্‌জম্মা জানে এদের মড়ুয়া হজম হয় না, কিন্তু শুধু ভাত খায় এমন লোক এ গ্রামে কটা আছে? আস্তে আস্তে অভ্যাস করে নেওয়া উচিত। জমিদার তো নয় যে ভাত খেয়েই জীবন কাটাতে পারবে সব! নন্‌জম্মার মনে হল, কয়েকটা ব্যাপারেই এদের একটু সুপরামর্শ দেওয়া দরকার। এদের নিয়মিত কফি পানের অভ্যাস আছে, কড়ুরের অধিবাসীদের নাকি বাল্যকাল থেকেই এ অভ্যাস হয়ে যায়। সাতু যখন প্রথম শ্বশুর বাড়ি এসেছিল শাশুড়ীর ভয়ে কিছু বলতে পারত না। আজকাল অবশ্য এই রামসন্দ্র গ্রামেও কফির প্রচলন হয়েছে। তা ধনীরা না হয় খেতে পারে কিন্তু অ'পন্নায়ার এই পাঁচজন সদস্যের সংসারে দিনে দুবার কফির পাট চললে খরচে কুলোবে কি করে?

'এ অভ্যাসটা যদি ছাড়তে পারেন অনেক সাশ্রয় হবে আপনাদের।'

'ও বাবা, কফি তো আমি ছাড়তে পারব না', বলে উঠল তঙ্গম্মা, 'সকালে উঠে খালি পেটে কখনও থাকা যায়? তোমরা তো দিব্যি শুকনো রুটি খেয়ে নাও, আমাদের ওরকম খাওয়া কখনও অভ্যাস নেই তো!'

এ নিয়ে আর কথা বাড়াল না নন্‌জম্মা।

সেদিন সাতু বড় জায়ের বাড়ি এসেছে বেড়াতে। নন্‌জম্মা তখন দ্রুত হাতে কাঠি ভেঙে ভেঙে দু মিনিটে একটা করে পাতা তৈরী করে করে গোছা করে রাখছে। 'উঃ কত কাজ তুমি করতে পার দিদি! সংসারের পাট সেরে, পাটোয়ারীর খাতা লেখ, তারপর আবার পলাশপাতা তুলে এনে এই এত এত পাতা বানিয়ে ফেলছ। আমি তো জন্মেও এত কাজ করতে পারব না,' বলে উঠল সাতু।

নন্‌জম্মা বলল, 'দেখ, কিছুদিন থেকেই ভাবছি একটা কথা তোদের বলব, কিন্তু যদি আবার কিছু মনে করিস, তাই বলিনি এতদিন।'

'কি কথা দিদি, বল না?'

'তোদের সংসারে খেতে পাঁচটি মুখ। রোজগার তো মোটে একজনের। তাও ঐভাবে ভিক্ষা করেই কি সারাজীবন চলবে? নিজেদের কিছু কাজ কর্ম তো করা উচিত। উপার্জন করার অভ্যাস থাকলে এই পরিবারের আজ এই দশা হবেই বা কেন? তা বাড়িতে তোরা দুটি স্ত্রীলোক আছিস, তোরাও তো কিছু করতে পারিস? বাড়ির কাজ সেরেও সারাদিন অন্ততঃ তিনশ-পাতা সহজেই তৈরী করা যায়। বাজারে এখন একশ পাতার বাণ্ডিলের দাম সাত-আনা। শুনি নাকি তিপটুর থেকে লরী বোঝাই হয়ে বাঙ্গালোর পর্যন্ত যায়। যদি মাসে তিরিশ টাকা রোজগার করতে পারিস কত সুবিধা হবে বল্‌তো?'

'রোজ রোজ পলাশপাতা নিয়ে কাজ করলে শরীর গরম হবে না?'

'অভ্যাস হয়ে গেলে কিছুই হবে না। তাছাড়া গরম হলেও রাত্রে শোবার আগে দুই হাতের তালুতে একটু রেড়ির তেল মেখে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

সুতরাং সাতুও এবার মন স্থির করে ফেলল সেও পাতা তৈরী করা শুরু করবে। পরের দিনই বড় জায়ের বাড়িতে এসে বসে গেল তার সঙ্গে। নন্‌জম্মা দেখতে দেখতে শ'খানেক পাতা বানিয়ে ফেলেছে, আর এতক্ষণে সাতুর হয়েছে মাত্র আঠারটা। উৎসাহ দিয়ে নন্‌জম্মা বলে, 'একটু অভ্যাস হয়ে গেলেই দেখবি কত তাড়াতাড়ি হাত চলবে।' কিন্তু পরের দিনই সাতুর হাত-পা জ্বালা করতে লাগল, তাই দেখে তঙ্গম্মা বোঝাল মেয়েকে, 'ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ করা স্বামীরই কর্তব্য, তোর ঐ সব পাতা-টাতা বানাতে যেতে হবে না আর।' ব্যস, হয়ে গেল ওর পাতা তৈরী শেখার দফা শেষ। ইতিমধ্যেই দেখা গেল সে সন্তান-সম্ভবা, বমি ইত্যাদি উপসর্গ শুরু হয়ে গেল তার।

সাতুর বাবা ছিলেন পুরোহিত শ্যামভট্ট, এঁরা পুরোন পুরোহিত বংশ, কাজেই পবিত্রতা, অপবিত্রতা, আচার-বিচার ইত্যাদি নিয়ে তঙ্গম্মার শুচিতার একটু বাড়াবাড়ি ছিল। এদিকে গঙ্গম্মার বাড়িতে কোন কালেই কেউ এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাত না, নন্‌জম্মাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলো মেনে চলত কিন্তু আচার-বিচার নিয়ে বাড়াবাড়ি সে করত না। সে হাঁড়িতে করেই ডাল রাঁধে, মাটির পাত্রে ভাত রাঁধে কারণ পিতলের হাঁড়ির চেয়ে মাটির হাঁড়ি বেশী ঠাণ্ডা থাকে। তা চাষাভূষোর ঘরে না হয় এসব চলতে পারে, তাই বলে সদ্‌ব্রাহ্মণের ঘরে এমন অনাচার করলে চলে কখনো? নন্‌জম্মার ছেলেপেলেরা তো যখন তখন মহাদেবায়াজীর দেওয়া খাবার খায়। মহাদেবায়াজী স্বজাতের বাড়ি থেকে ভিক্ষান্ন নিয়ে এলে বিশ্ব তো তাঁর কোলে বসেই খেয়ে আসে কতদিন।

নন্‌জম্মা এসব জানতে পারলেও ছেলেমেয়েদের শাসন করে না, এটা তঙ্গম্মার মোটেই ভাল লাগে না। সাতুরও বিশেষ পছন্দ নয় এ সব ব্যাপার।

অইয়াশাস্ত্রী এবং অন্নাজোইস এই দুই পুরোহিতের স্ত্রীরা দুইজনেই যথেষ্ট আচার-পরায়ণা মহিলা। অন্নাজোইসের স্ত্রী মাসিক ঋতুর সময় নিজেকে একেবারে সরিয়ে রাখে স্বামীর দৃষ্টিপথ থেকে। এদিকে নন্‌জম্মা নাকি ঐ দিনগুলিতেও লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ির রান্নাবান্না সবই করে। অন্নাজোইসের স্ত্রী বেঙ্কটলক্ষ্মী তঙ্গম্মাকে বলেছেন এ কথা। বাইরে কেউ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে 'পার্বতী রেঁধেছে' কিন্তু সেটা বাজে কথা। এই খবরটা শুনে পর্যন্ত তঙ্গম্মা স্থির করে ফেলেছেন, জীবনে আর কখনো নন্‌জম্মার বাড়িতে আহার করবেন না। নিচু জাতের বাড়ির মেয়েরা ঋতুর প্রথম দিনেই স্নান করে রান্নাঘরে ঢুকে কাজকর্ম শুরু করে দেয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ঘরেও যদি সেই ব্যাপার চলতে থাকে তবে আর ছোট জাতের সঙ্গে তফাৎ রইল কোথায় ছিঃ ছিঃ থুঃ।

একদিন সাতু ও তঙ্গম্মা গেছে অন্নাজোইসের বাড়িতে বেড়াতে। সেখানে জোইসজী তাদের মনে একটা খটকা ধরিয়ে দিলেন, 'পৈতৃক সম্পত্তিতে দুই ভ্রাতার সমান অধিকার, ঠিক কি না? তা এদের সম্পত্তিতো সবই বেহাত হয়ে গেছে। পাটোয়ারীগিরির যা কিছু উপার্জন তা তো ভোগ করছে একা চেন্নিগরায়। অপ্পন্নয়া কিছুই পাচ্ছে না এটা তো অন্যায়। বর্ষাসনের পাওনাটা দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হওয়া উচিত। সরকারী আইনেই বলে একথা। এভাবে আর কতদিন ওরা ঠকাবে?'

সচকিত হয়ে ওঠে তঙ্গম্মা। তাই বল! আমাদের ন্যায্য পাওনা সম্বন্ধে কখনো উচ্চবাচ্যও করে না, আর এদিকে কথায় কথায় আসে উপদেশ দিতে! বড় জায়ের প্রতি ঈর্ষা আর বিদ্বেষে সাতুও মনে মনে জ্বলে ওঠে। এবার অন্নাজোইস পরামর্শ দেয়, 'অপ্পন্নায়া আর তুমি আগে বলে দেখ, যদি রাজি না হয় তখন তিপটুরে গিয়ে আমলাদারের পায়ে পড়লেই হবে, তিনি ঠিক পাইয়ে দেবেন।'

সেদিন সন্ধ্যায় অপ্পন্নায়া ফিরতেই সাতু তাকে জানাল সমস্ত কথা, বলল, 'আমাদেরও তো ছেলেপেলে রয়েছে। পৈতৃক অধিকারের লাভের ভাগ তো আমাদেরও পাওয়া উচিত। বর্ষাসন পাওয়া যায় একশ কুড়ি টাকা, তারমধ্যে ষাট টাকা নিশ্চয় আমাদের প্রাপ্য। তাছাড়া দস্তুরীও পাওয়া যায়, তারও ভাগ চাই।'

অপ্পন্নায়া কিছুই জানে না। তবে সে শুনেছিল পাটোয়ারীর কাজ, প্যাটেলের কাজ এসব উত্তরাধিকার সূত্রে বড়ছেলেই পেয়ে থাকে। সরকারী আইন-কানুন কিছুই তো জানা নেই, অন্নাজোইস নিশ্চয় ভাল করেই সব জানে এই ভেবে সে রাত্রেই চলে গেল জোইসকে সব জিজ্ঞাসা করতে। অন্নাজোইস পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন, 'বড়-ছোট দুই ভাইয়েরই সমান ভাগ পাওয়া উচিত, ওরা এতদিন ধরে তোমাকে ঠকিয়ে সব কিছু ভোগ করছে।' এবার ক্ষেপে উঠল অপ্পন্নায়া, ছুটে এল বড় ভাইয়ের বাড়িতে। চেন্নিগরায় বাড়িতে নেই। প্রদীপের আলোয় বসে নন্‌জম্মা ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছে। সোজা তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, 'ধোকাবাজি আর চলবে না, বর্ষাসনের অর্ধেক অংশ আমি চাই।'

এ কথার মানে বুঝতে না পেরে নন্‌জম্মা প্রশ্ন করল, 'কিসের বর্ষাসন? কিসের

কথা বলছ?'

'পাটোয়ারীগিরির। খালি চিন্নৈয়া নয়, আমিও আমার বাপের ছেলে। অর্ধেক অংশ না পেলে সোজা আমলাদারের কাছে যাব, বুঝলে?' বড় ভাই হয়ত মহাদেবায়াজীর মন্দিরেই আছে, কথাটা মনে হতেই অপ্পন্নায়া সেদিকে চলল মনে মনে গজরাতে গজরাতে, 'আমিও বাপের ব্যাটা, বর্ষাসনের অর্ধেক কেন পাব না? আমি গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে করে বেড়াব আর উনি বর্ষাসন হজম করে মজা লুটবেন, বারে!' চিন্তাটা বেশ স্বরবেই করছিল সে যাতে আশে-পাশের লোক শুনতে পায়।

অপ্পন্নায়া যে মহাদেবায়াজীর মন্দিরে গেছে তা বুঝতে পারেনি নন্‌জম্মা। তাই ব্যাপারটা বোঝার জন্য সে অপ্পন্নায়ার বাড়িতেই এল। অপ্পন্নায়া তখন নেই সেখানে। সাতুকেই বলল সে, 'এখনি অপ্পন্নায়া এসেছিল, 'বর্ষাসনের অর্ধেক ভাগ চাই', আরো কি সব বলে গেল। তা ব্যাপারটা কি?'

সাতু বলে উঠল, 'দুই ভাইয়ের সমান ভাগ পাওয়াই তো উচিত। ইনি না হয় এতদিন জানতেন না, কিন্তু তোমাদের কি নিজে থেকেই অর্ধেক ভাগ দেওয়া উচিত ছিল না? এ যুগে কাউকে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হয়!'

'সরকারী আইনে এ কথা বলে না। কে উল্টোপাল্টা বুঝিয়েছে তোমাদের? বর্ষাসন একশ বিশ টাকা আসে বটে, কিন্তু তার জন্য খরচও আছে তা জান তো? খাতার কাগজ, কালি এসব খরচ আছে। রাত জেগে কত কষ্ট করে লাইন টেনে টেনে খাতা-ভরা হিসেব লিখতে হয়। না বুঝে-সুঝে অপ্পন্নায়া সবাইকে শুনিয়ে চেঁচামেচি করছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'কি এত হিসেব লেখার আছে? ও আমিও লিখতে পারি। না মরলে কি আর স্বর্গ নাগালের মধ্যে আসে?'

আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বুঝে বাড়ি ফিরে এল নন্‌জম্মা। চেন্নিগরায় মন্দিরে ছিল না। বাঁধের ওপরের পথ দিয়ে বাড়িতে ফিরে সন্ধ্যা পূজায় বসেছিল। ছেলেমেয়েরা আলোর কাছে বসে পড়ছে। সন্ধ্যাপুজোয় ব্যাঘাত না করে নন্‌জম্মা রান্না ঘরে ঢুকল। ঝাঁট দিয়ে, থালা সাজিয়ে ঠাকুরের সামনে প্রদীপ জ্বেলে প্রদক্ষিণ করে হাতজোড় করল সে। অপ্পন্নায়াকে সে ভাল করেই চেনে, কিন্তু সাতুর ব্যবহারে আজ সে অবাক হয়ে গেছে। 'স্বামীকে সেই বুঝিয়েছে, কিন্তু তাকে কে কুপরামর্শ দিল? যেই হোক, তার কথা শুনে সাতুর কি এমনভাবে বদলে যাওয়া উচিত? এ যুগে সত্যিই কি কারো উপকার করতে নেই? নুন খেয়ে কেউ মনে রাখে না?' এই সব ভাবতে ভাবতে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

বাইরে হঠাৎ অপ্পন্নায়ার সাড়া পাওয়া গেল। মনে হল যেন আরো আট দশজন লোক রয়েছে তার সঙ্গে। তাদের পেছন থেকে গঙ্গম্মা ঠাকরুণের কন্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে। নন্‌জম্মা বাইরে এসে দেখে, অন্নাজোইস অইয়াশাস্ত্রী, রেবন্নাশেট্টী, তেলীশিঙ্গা, ভূতপূর্ব পাটোয়ারী শিবলিঙ্গে ইত্যাদি, অর্থাৎ সমস্ত পঞ্চায়েত এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু প্যাটেল শিবেগৌড়কে দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে চেন্নিগরায় সন্ধ্যাপুজো শেষ করে উঠে

পঞ্চপাত্রটা রান্নাঘরে রেখে গায়ে চাদর জড়াচ্ছে। এইসময় নন্‌জম্মা বাইরে আসতেই চিৎকার শুরু করল গঙ্গম্মা, 'অন্য জায়গায় জমি থাকলে ঠাকুমা পর্যন্ত জমির ভাগ পায়। সেই পুণ্যাত্মা, এই দুই ছেলের জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু এটাও তো মিথ্যে নয় যে তিনিই আমার গলাতেও মঙ্গলসূত্র পরিয়েছিলেন? বর্ষাসনের মধ্যে আমারও ভাগ আছে, ঠিক কিনা রেবন্নাশেট্টী তুমিই বল?'

রেবন্নাশেট্টী বলল, 'শিবলিঙ্গে এককালে পাটোয়ারীর কাজ করেছে, এসব ক্ষেত্রে আইনে কি বলে তা ওর নিশ্চয় জানা আছে, ওকেই বসানো হোক ন্যায়পীঠে।'

মহা উৎসাহে উঠে গিয়ে থামের পাশে বসে পড়ল শিবলিঙ্গে, তারপর প্রশ্ন করল 'চিন্নৈয়া তোমার কি বলবার আছে?' চেন্নিগরায় ব্যাপারটা বুঝেছে এতক্ষণে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কি বলা উচিত ঠিক করতে পারছে না। সে স্ত্রীকে দেখিয়ে দিয়ে 'ওকে জিজ্ঞাসা কর' বলেই বসে পড়ল। একদৃষ্টে নন্‌জম্মার দিকে চেয়ে রেবন্নাশেট্টী বলল, 'বেশ কথা, যা বলবার তুমিই বল বোন।' একটু পরে আবার অভয় দিতে চেষ্টা করল, 'ভয় পাবার কিছু নেই।'

ততক্ষণে সাতু আর তঙ্গম্মাও এসে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছে। খুব রাগ হয়ে গেল নন্‌জম্মার। জোর গলায় সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল সে, 'কে আপনাদের এখানে ডেকে এনেছে? অন্যের বাড়ির সব ব্যাপারে নাক গলাতে ছুটে আসেন কেন? নিজেদের সংসারের অবস্থাগুলো একটু চোখ মেলে দেখুন, যাতে মান সম্ভ্রম নিয়ে গ্রামে বাস করতে পারেন। যদি সবাই নিজে থেকে ভালয় ভালয় না বেরিয়ে যান তো কারো সঙ্গে খাতির রাখব না আমি, তা বলে দিচ্ছি।'

এ রকম চোটপাট কথাবার্তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তেলী শিঙ্গা, গুরুবয়া প্রমুখ কিছু কিছু লোক ঠিক করে জানেই না আসল ঘটনাটা কি। 'পঞ্চায়েত বসাতে হবে, চলে এসো' বলে অপ্পন্নায়া রাস্তা থেকে এদের ধরে এনেছে এবং এরাও সুড়-সুড় করে চলে এসেছে। এখন ব্যাপার শুনে সবাই বলাবলি করতে লাগল, 'সারা গ্রামের পাটোয়ারী হিসেব এদের কাছে আছে, শুধু শুধু এদের সঙ্গে শত্রুতা করে কি দরকার?' একে একে সবাই কেটে পড়তে শুরু করল। নন্‌জম্মা দ্বিতীয়বার হুমকি দেবার পর শিবলিঙ্গে এবং রেবন্নাশেট্টীও আর দাঁড়াল না সেখানে। নন্‌জম্মা এবার প্রশ্ন করল, 'কোন ঘর ভাঙানে তোমাকে এই পরামর্শ দিল বলত অপ্পন্নায়া?' কোন জবাব দিল না অপ্পন্নায়া, কিন্তু অন্নাজোইস বলে উঠল, 'যাই, সন্ধ্যাপুজোর সময় হয়ে গেছে। এ সব হল নিজের নিজের ঘরের কথা, অপ্পন্নায়াটার কবে যে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে! মানা করলুম, তবু গাঁসুদ্ধ লোক ডেকে জড়ো করলে!' অন্নাজোইসের পেছন পেছন গায়ের চাদরটা ঠিক করতে করতে অইয়াশাস্ত্রীও অদৃশ্য হলেন।

'পাটোয়ারী অধিকার চিরকাল বড় ছেলেই পায়, চাও তো তিপটুরে গিয়ে জেনে এস', নন্‌জম্মার মুখে এইটুকু শুনেই নিঃশব্দে উঠে পড়ল অপ্পন্নায়া। গঙ্গম্মা কিন্তু যেতে যেতেও কথা শোনাতে ছাড়ল না, 'কি মুখের তেজ লক্ষ্মীছাড়ীর, সারা গাঁসুদ্ধ লোককে অপমান করে বসল! যাক, যা খুশি বলুক, আমার ভাগ আমি কিছুতেই ছাড়ছি না বাপু …।'

খেতে বসেও এ নিয়ে কোন মন্তব্যই করল না চেন্নিগরায়। নন্‌জম্মা যখন বলল, 'দেখলে একবার ওদের কাণ্ডটা?' তখনও 'বলুক-গে যা খুশি' বলে এমন একটা ভাব

দেখাল যেন সমস্ত ঘটনাটার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধই নেই। দুপুরের তৈরী তাজা সবুজ পাতায় পর্বতপ্রমাণ আহার করে উঠে পড়ল সে। নন্‌জম্মা কিন্তু ভাল করে ঘুমোতে পারল না সে রাত্রে। সাতুর এই ভাব পরিবর্তন তাকে খুবই ব্যথা দিয়েছে। সেই সঙ্গেই মনের কোণে আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে, সত্যিই যদি ভাগ দিতে হয়, কি উপায় হবে তাহলে?' অনেক রাত্রে তার মনে হল, 'ঠিক তো! দাবরসায়াজীকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই হয়।'

ভোর হতে না হতেই স্বামীকে ডেকে তুলল নন্‌জম্মা, কিন্তু চেন্নিগরায় চাদরের নিচে থেকেই গজ গজ করে উঠল, 'আমি ওসব পারব না, যেতে হয়, তুই যা।' অগত্যা রামন্না আর পার্বতীকেই ডেকে তুলে মুখ, হাত ধুইয়ে একটু ছাতু মেখে খাইয়ে, ওদের নিয়েই বেরিয়ে পড়ল সে।

দাবরসায়াজী খুব বুড়ো হয়ে পড়েছেন, শরীর আজকাল প্রায়ই ভাল থাকে না, তাই শীতের সময় বেলা করে ওঠেন। সূর্যোদয়ের সময় হঠাৎ নন্‌জম্মাকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। প্রায় বছর দুই সে এদিকে আসেনি। কিন্তু একথা ভেবেই তাঁর তৃপ্তি হত যে, আজকাল তার মানে নন্‌জম্মা নিজেই পাটোয়ারীর হিসেব লেখার কাজ সম্পূর্ণভাবে সামলাতে পারে। আজ ওদের আসার উদ্দেশ্য শুনে তিনি অভয় দিয়ে বললেন, 'কোন চিন্তা নেই, আমি খুব ভালভাবেই জানি, এ অধিকার কেবল জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই প্রাপ্য। ঠিক মহারাজের সিংহাসনের মতন। রাজ্য কখনো দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়?'

নন্‌জম্মা আর ছেলেমেয়েরা স্নান সেরে নিল, তাদের জল খাবার খাওয়ার পর দাবর-সায়াজী বললেন, 'কম্বনকেরে তো এখান থেকে দূর নয়, মাত্র তিন মাইল, তুমি যাও না, গিয়ে একেবারে খোদ এলাকাদারকেই জিজ্ঞাসা করে এস, তাহলে আর মনে কোন সংশয় থাকবে না।'

ওদের পথ দেখাবার জন্য দাবরসায়াজী সঙ্গে একটি লোকও দিয়ে দিলেন। দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে নন্‌জম্মা জোর কদমে হাঁটতে শুরু করল তালুকের প্রধান জায়গা কম্বনকেরের উদ্দেশ্যে। এলাকাদার তার পূর্ব-পরিচিত, রামসন্দ্র এলে ওদের বাড়িতেই অতিথি হন তিনি। ডাল, ভাত, চাটনী, পঞ্চব্যঞ্জন রেঁধে নন্‌জম্মা তাঁকে অনেকবার খাইয়েছে। মানুষটির স্বভাব ভাল, নন্‌জম্মাকে সর্বদা 'বোন' বলে সম্বোধন করেন। তাই এঁর সঙ্গে দেখা করতে নন্‌জম্মার মনে কোন দ্বিধা ছিল না। এদের দেখে তিনি নিজেই আগে থেকে বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার বোন, পাটোয়ারীর বর্ষাসনে ছোট ভাইয়ের অংশ আছে কিনা তাই জানতে এসেছ তো?'

নন্‌জম্মা তো একেবারে অবাক। তাকে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে এলাকাদার এবার ব্যাখ্যা করে বলেন, 'এই তো, এখনও আধ ঘন্টাও হয়নি বোধহয়, তোমার দেওর অপ্পন্নায়া আর তার স্ত্রী এসেছিল এখানে। আমার সামনে ভয়ে তাদের তো মুখ দিয়ে কথাই বেরোয় না, দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল জোড় হাতে। অন্নাজোইসজী আর শিব-লিঙ্গেগৌড়ই ওদের হয়ে কথাবার্তা বললেন। আমি চারজনকেই আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি। আপনার কোন চিন্তা নেই বোন, সবাই জানে এ কাজের অধিকার পায় শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্র। এই সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করতে কষ্ট করে এতটা পথ হেঁটে এলেন কেন শুধু শুধু?'

এতক্ষণে দুশ্চিন্তা কাটল নন্‌জম্মার। 'এই রোদে এসেছেন, চলুন বাড়ির ভিতরে' এলাকাদার ওদের আপ্যায়ন করে নিজের স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন সকলের আহারের ব্যবস্থা করতে। বিকেলে রোদ পড়লে তবে ওদের যেতে দিলেন। সধবা মানুষ বাড়িতে এসেছে বলে নন্‌জম্মাকে দেওয়া হল পান আর একটি চোলীর (ব্লাউজ) কাপড় এবং বাচ্চাদের হাতে দেওয়া হল গুড় ও নারকেল।

সোজা এলেও কম্বনকেরে থেকে রামসন্দ্র পাঁচ মাইল। বাচ্চাদের এবার পা ব্যথা করছে, আর হাঁটতে চাইছে না ওরা। কিন্তু এলাকাদারের আশ্বাসে নন্‌জম্মার মন খুশিতে ভরা, তাই সে দুই ছেলেমেয়ের হাত ধরে অনেক গল্প করে ভুলিয়ে ভালিয়ে পথটুকু পার করে সন্ধ্যার আগেই ফিরে এল নিজেদের গ্রামে।

৪

অপ্পন্নায়া স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাবার পর থেকে আজকাল নিজেকে বড় একলা মনে হয় গঙ্গম্মার। নিজের পেটের ছেলেরাই তাকে দূরে ঠেলে দিল এ চিন্তাটাও মনকে বেশ ব্যথিত করে। এ যেন তার মস্ত একটা পরাজয়, এটা কি করে চুপচাপ সহ্য করবে সে? মনে মনে সে ভেবে নিয়েছে, বড় বৌয়ের সাহায্য পেয়েই আলাদা বাড়িখানা এমন চটপট তৈরী করে ফেলল ছোটছেলে।

স্ত্রী, সন্তান ও শাশুড়ীকে নিয়ে আলাদা হবার পর কেটে গেল প্রায় দেড় বছর। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভিক্ষা চেয়ে আর লোকের মুখনাড়া শুনে শুনে তিক্ত হয়ে উঠেছে অপ্পন্নায়ার মন। সেদিন সে গিয়েছিল কেঁচেগৌড় গ্রামের কল্লেগৌড়ের বাড়ি। গৌড় বাড়িতেই ছিল, কিন্তু ওকে দেখেও বসতে আসন দিল না। শেষ পর্যন্ত মাটিতেই বসে পড়ল অপ্পন্নায়া, তারপর কিছু মড়ুয়া চাইবামাত্র গর্জন করে উঠল গৌড়, 'মাথা খারাপ নাকি? এই তো একটু আগে তোমার মা এসে নিয়ে গেল, এরই মধ্যে আবার তুমি এসে হাজির? মড়ুয়ার কি পয়সা লাগে না নাকি? খেতে দিচ্ছি, এসো আমার খেতে সারাদিন কাজ কর, যাবার সময় দু সের ধানও দেব।'

চুপ করে বসে রইল অপ্পন্নায়া। এবার গৌড় বলে উঠল, 'ভালয় ভালয় বিদেয় হবে, না ঘাড় ধরে বের করে দেব?'

দারুণ কষ্ট হল অপ্পন্নায়ার। গত দেড় বছর ধরে অনেক রকম কটু কথা তো শুনতেই হচ্ছে, কিন্তু ঘাড় ধরে বের করে দেবার কথা এ পর্যন্ত কেউ বলেনি। নিঃশব্দে নিজের ঝোলা আর টুকরী নিয়ে উঠে পড়ল সে। বাইরে এসে চোখের জল আর সামলাতে পারল না। চোখ মুছতে মুছতে কিছুদূর এগোতেই দেখা হল গঙ্গম্মার সঙ্গে, তার কোঁচড় ভরা মড়ুয়া। এতবড় ছেলের চোখে জল দেখে গঙ্গম্মারও হঠাৎ যেন বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল, সে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে রে? চোখে জল কেন তোর?' মায়ের গলা শুনেই অপ্পন্নায়ার কান্না আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সব কথা বলে সে মাকেই সালিশ মানে, 'বল তো, কল্লেগৌড়ের অমন কথা বলাটা কি উচিত হয়েছে?'

ছেলেকে ডেকে নিয়ে এসে নন্দীমন্দিরের বারান্দায় বসল গঙ্গম্মা, বলল, 'আয়, এখানে বসে একটু কথা বলি। সত্যিই তো আমরা মা, ব্যাটা দুজনেই ভিখ মেগে বেড়াই, লোকেই বা কি করবে! তা তুই ঐ বাড়িতে গেলি কেন?'

'না গেলে আমারই বা চলবে কি করে?'

'হা রে পোড়াকপাল আমার! আমার পেটে জন্মেছিস, এতদিন রাজপুত্তুরের মত করে তোকে যত্ন করেছি, কত দূর-দূরান্তর থেকে ভিক্ষে করে এনে তোকে খাইয়েছি। আর এখন ঐ ছেনালগুলোর জন্যে তোর এত কষ্ট। তুই সারাদিন ঘুরে ঘুরে মড়ুয়া যোগাড় করে নিয়ে যাস আর ওরা সেই মড়ুয়া বেচে সরু চালের ভাত আর ভাল ডালের সম্বর বানিয়ে খায় পেট ভরে। তার ওপর আবার কফি চাই। ঐ ছেনালের রং বেরং এর শাড়ির বাহার আর এই দেখ আমার অঙ্গে ছেঁড়া ন্যাকড়া। ওই বজ্জাত মেয়েমানুষ দুটো নিজেদের সুখ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।'

মায়ের কথাগুলো খুব যুক্তিযুক্ত মনে হল অপ্পন্নায়ার। সত্যিই তো স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আসার আগে তাকে কোনদিন ভিক্ষা করতে হয়নি। সে বেশ আরামে গ্রামের বাইরে বসে বসে তামাক খেত। মা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে ধান ও মড়ুয়া ইত্যাদি নিয়ে এলে সেগুলো বস্তায় ভরে বয়ে নিয়ে আসাই ছিল ওর একমাত্র কাজ। এইভাবে মাস তিনেক গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরলেই মা আর ছেলের সারা বছরের খোরাক সংগৃহীত হয়ে যেত।

'বৌটাকে না হয় খাওয়াচ্ছিস, কিন্তু বেহায়া ঐ শাশুড়ীমাগীও কি বলে বসে বসে তোর ঘাড়ে খাচ্ছে এতদিন?' মন্তব্য করে গঙ্গম্মা।

সেদিন আর কোন বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে গেল না অপ্পন্নায়া। মা যা সংগ্রহ করেছিল সেইগুলোই বস্তায় ভরে মাথায় তুলে নিল। মোট বওয়া তার কাছে কিছুমাত্র কষ্টসাধ্য নয়। পথে যেতে যেতে গঙ্গম্মা বলে, 'ঐ হতভাগা মহাদেবায়াটাইতো পেটের ছেলেকে আলাদা করে দিল মায়ের কোল থেকে। তোকে দিয়ে কি সব মিথ্যা কথা বলিয়ে নিল আর তুই ও-সব মেনে নিলি। ও গাঁয়ে তুই দু-একবার গিয়েছিস ঠিক কথা কিন্তু তুই জানলি কি করে যে ও বাচ্চা তোরই? তুই যাবার আগেই যে সাতু পোয়াতি হয়নি তারই বা প্রমাণ কি?'

কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ হাঁটছিল অপ্পন্নায়া। গ্রামের কাছাকাছি এসে গঙ্গম্মা বলল, 'তুই চলে আয় আমার কাছে, আগে যেমন সুখে ছিলি তেমনি থাকবি আবার।'

ছেলে মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়িতেই এল, এসে আর কিছু না করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। গঙ্গম্মা তাড়াতাড়ি বরবটির ডাল ও গরম গরম মড়ুয়ার ডেলার লোন্দা বানিয়ে, রসুন দিয়ে চাটনী পিষে তারপর ডেকে তুলল ছেলেকে। খেতে বসে অপ্পন্নায়ার মনে হল যেন দেড় বছর আগেকার সেই স্বর্গসুখ আবার ফিরে এসেছে। লোন্দা তো চিরকালই ওর প্রিয় খাদ্য, তার ওপর খোসা ছাড়ানো বরবটির ডালের মত ভাল জিনিষ আর কিছু আছে নাকি। বৌ আর শাশুড়ী তো একদিনও বাড়িতে মড়ুয়ার লোন্দা তৈরী করে না। আবার বলে বরবটির ডালে পেটে হাওয়া হয়। ওসব নাকি বাজে লোকেরাই খায়! 'যত ছেনালের দল' মনে মনে তাদের মুণ্ডপাত করতে করতে আকন্ঠ ভোজন করে অপ্পন্নায়া।

তারপর আর বৌয়ের বাড়ির দিকে গেলই না অপ্পন্নায়া, প্রথম দিন তো সাতু ভাবল, হয়ত দূর গ্রামে গিয়ে আটকে পড়েছে, কিন্তু তারপর খবর পাওয়া গেল স্বামী আবার মায়ের আঁচলের তলায় ফিরে গেছে। নিজে ডাকতে যেতে লজ্জা করল, তাই ছেলে রামকৃষ্ণকে পাঠাল। কিন্তু ছেলে গিয়ে দেখে হনুমান মন্দিরে তালা ঝুলছে। পনের দিন মা আর ছেলে গ্রামে ফিরলই না। এদিকে ঘরে বিক্রী করার মত মড়ুয়া আর নেই, চালও শেষ হয়ে গেছে। কফি পাউডার বাড়ন্ত। জলাশয়ের ওপারে গুড় তৈরীর সময় জয়লক্ষ্মী আর রামকৃষ্ণ গিয়ে যে গুড়ের ভেলি চেয়ে এনেছিল সেগুলো অবশ্য কিছু আছে, কিন্তু শুধু গুড় দিয়ে তো কফি হয় না। গ্রামের লোকেরা এদের আগেই জেনে গিয়েছিল যে, অপ্পন্নায়া আবার মায়ের কাছে ফিরে গেছে, কাজেই দোকানী ধারেও এখন কিছু আর দিতে চায় না। উপায় কি এখন? না খেয়ে থাকতে হবে না কি? কফি না খেয়ে এদিকে মাথা ধরে উঠেছে। বাড়ির বড় পঞ্চপাত্রটা কাশিমবদ্দির কাছে বাঁধা রেখে দু টাকা পাওয়া গেল। এক টাকায় আট সের চাল, দু আনার কফির গুঁড়ো আর এক আনার দুধ কিনে আনা হল শেষ পর্যন্ত।

এদিকে মায়ের সঙ্গে গ্রামে ফিরেছে অপ্পন্নায়া। বৌয়ের কাছে যায়নি এখনও। সাতু চারমাস পোয়াতি। সে নিজে না গিয়ে আবার ছেলেকেই পাঠাল স্বামীর কাছে। কিন্তু গঙ্গম্মা ছোট্ট ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিল এই বলে যে, 'যা যা, যে কুলাঙ্গার তোর জন্ম দিয়েছে তার কাছ থেকেই খোরাক যোগাড় করতে বল্ গে যা।'

ছেলে বাড়ি ফিরে মাকে বলল, যা যা শুনে এসেছে ঠাকুমার মুখে। শুনে অসম্ভব রাগ হল সাতুর। তঙ্গম্মা তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। সাতু অবশ্য বলল, 'মা, তুমি এ ঝগড়ার মধ্যে থেকো না।' কিন্তু তঙ্গম্মা সে কথায় কান না দিয়ে সোজা গিয়ে হাজির হল হনুমান মন্দিরের সামনে। চিৎকার করে বলল জামাইকে, 'ঘরে একদানা খাবার নেই। বৌ বাচ্চাকে খাওয়াবার মুরোদ নেই যার, তার বিয়ে করার সখ হয় কেন?'

গঙ্গম্মাও সমান তেজে জবাব দেয়, 'ওরে পুজুরি বামুনের বৌ, শুনে রাখ, আমার ছেলে চিরকাল বেশ্যা নিয়ে ঘর করবে না।'

'কে বলে আমার মেয়ে বেশ্যা? তুই নিজেই নিশ্চয় জাত খুইয়ে ঐ ছেলের জন্ম দিয়েছিস! আমরা তো তোকে জাতে তুলেছি, কিন্তু তোর ঐ কুকুরির মত স্বভাব যাবে কোথায়!' তঙ্গম্মার কথার মধ্যেই এসে পৌঁছয় সাতু, সে মাকে বলে, 'মা তুমি কেন মুখ নষ্ট করছ। যা খুশি বলতে দাও ওদের। ঐ সব মিথ্যা বলার পাপেই ওরা ডুববে।' গঙ্গম্মা সাতুর কথাগুলো শুনতে পেয়ে ছেলের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে, 'কথা শুনছিস অপ্পন্না? প্রথমে মাকে পাঠিয়েছে শিখিয়ে-পড়িয়ে তারপর এখন আবার আমার কথাকে পাপ বলা হচ্ছে। স্বামীর অনুপস্থিতিতে ছেলে বিয়োন পাপ নয় বুঝি?' ইতিমধ্যে অপ্পন্নায়াও ক্রুদ্ধভাবে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে, সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'তুই কি ভেবেছিস আমি জানিনে তোর স্বভাব চরিত্র কেমন? আজ জুতোপেটা করব তোকে বুঝলি ছেনাল?' এবার সাতু আর তঙ্গম্মা ঘাবড়ে গিয়ে চুপচাপ বাড়ি ফিরে যায়। গঙ্গম্মা এবার পরামর্শ দেয়, 'চুপ করে দেখছিস

কি? ওর মঙ্গলসূত্রটা কেড়ে নিয়ে দূর করে দে এ গ্রাম থেকে। ঐ ঘরখানা তো তুইই তুলেছিস, আগুন ধরিয়ে দে ওতে।

অপ্পন্নায়া তৎক্ষণাৎ চলে গেল স্ত্রী পুত্রকন্যাকে বিতাড়িত করতে। সাতু গিয়ে ঘরে ঢুকছে এমন সময় পিছন থেকে তার মঙ্গলসূত্র ধরে মারল এক টান, সুতো ছিঁড়ে পুঁতি-গুলো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে, মাঙ্গল্যপূর্ণ মাদুলীটা তখনও সুতোর মধ্যেই রয়েছে। এদিকে সাতুর গলার পাশটা কেটে রক্ত বেরোচ্ছে, সে 'ও মাগো' বলে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল অপ্পন্নায়া। রান্নাঘরে উনুন জ্বলছিল, তার থেকে একটা জ্বলন্ত নারকেলের ডাঁটা তুলে নিয়ে সে ছাদের নারকেলপাতার ছাউনীতে আগুন ধরিয়ে দিল, ঘরের মধ্যে থেকেই জ্বলে উঠল ছাদটা। ওপর থেকে দেখা যেতে লাগল ধোঁয়া ও আগুনের শিখা। মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেল, পথচলতি লোকেরা এসে জমা হল সেখানে।

তঙ্গম্মা চিৎকার করছে, 'ওগো আমাদের সর্বস্ব পুড়ে গেল, তোমরা এসে জিনিসগুলো বাইরে বার করে দাও গো।' লোকে সাহায্য করতে হাত লাগাল, সবাই মিলে বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, ঝুড়ি-বালতি যা পেল বাইরে এনে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল। নারকেলপাতার কুঁড়েতে আগুন লাগলে জল ঢেলে নেভানোর চেষ্টা বৃথা। তাছাড়া জল নেইও কাছাকাছি। সুতরাং মাত্র দেড় বছর আগে অপ্পন্নায়া নিজে হাতে কোদাল চালিয়ে, মাটি মেখে দেওয়াল গেঁথে যে কুটির গড়ে তুলেছিল তা তারই স্বহস্তে লাগানো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল আধঘন্টার মধ্যে। রইল শুধু পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া নিচের দেওয়ালটুকু আর পাথরের পিলপেগুলো।

অপ্পন্নায়া বাঘের মত গর্জন করে উঠল, 'দেখছিস তো, কি করতে পারি আমি?'

তঙ্গম্মা বলে উঠল 'ঐ হাত খসে পড়ুক', কিন্তু তৎক্ষণাৎ সাতু বলে উঠল, 'মা, আমার দিব্যি, তুমি কোন কথা বোল না।'

'ঐ হারামজাদীর মঙ্গলসূত্র আমি কেড়ে নিয়েছি। এখন ও আমার স্ত্রী নয়, আমিও ওর স্বামী নই। বেশ্যা কোথাকার…।' এই সব শোনাতে শোনাতে ছেঁড়া মঙ্গলসূত্রটা উঁচু করে ঝুলিয়ে সবাইকে দেখিয়ে গ্রামের পথে পথে ঘুরে এল অপ্পন্নায়া।

বাড়িতে আগুন লাগার খবর পেয়ে নন্‌জম্মাও ছুটে এসেছিল, অন্যদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সেও যথাসাধ্য জিনিসপত্র টেনে টেনে বার করেছে। কিন্তু এখন কি করা উচিত, কি বলা উচিত কিছুই বুঝতে পারছিল না সে। সাতুই তার কাছে এসে বলল, 'দিদি তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।' কিন্তু নন্‌জম্মা কি ভরসা দেবে ভেবে পেল না। এই মুহূর্তে অপ্পন্নায়াকে কিছু বলতে যাওয়া ঠিক হবে না, আর শাশুড়ী গঙ্গম্মার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে যাওয়া তো বাতুলতা মাত্র।

সে জিজ্ঞাসা করল সাতুকে, 'আমি কি করতে পারি বল্?'

'এখন দু-একদিন তো তোমার বাড়িতে আশ্রয় দাও, তারপর ভেবে দেখি কি করা যায়।'

এ পরিস্থিতিতে 'না' বলা সম্ভব নয় নন্‌জম্মার পক্ষে। উপস্থিত লোকগুলিকে সে

অনুরোধ করল, 'তোমরা সবাই মিলে এদের জিনিসপত্রগুলো একটু আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দাও ভাই।' সে নিজের হাতেও তুলে নিল কিছু জিনিস। সবাই মিলে এ বাড়ির জিনিসপত্র এনে নন্‌জম্মার বাড়ির একটা ঘরে রেখে গেল। এবার নন্‌জম্মা ঢুকল রান্নাঘরে। এরা তো আবার মড়ুয়ার রুটি খাবে না, সুতরাং বিশেষ পাল-পার্বণের জন্য তুলে রাখা সঞ্চয় থেকে কিছু চাল বার করে ভিজিয়ে দিল সে। ঘরে অড়হর ডালও বাড়ন্ত। পার্বতীকে দোকানে পাঠিয়ে চার আনায় এক সের ডাল আনাল।

সবাই গিয়ে বড় বৌয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে শুনেই ছটফটিয়ে উঠল গঙ্গম্মা। 'ঐ ডাইনী আবার কিছু ছলা-কলা করে আমার বাছাকে বশ করে ফেলবে' ভাবতে ভাবতে ছুটল সে অন্নাজোইসের বাড়িতে, বলল, 'জোইসজী, খবর শুনেছেন তো?'

গঙ্গম্মার মুখেই বিশদ বিবরণ শোনার আশায় জোইস বললেন, 'কই না তো! কি হয়েছে কি?'

ছেলে কিভাবে বীরের মত স্ত্রীর গলা থেকে মঙ্গলসূত্র কেড়ে নিয়েছে সে-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে গঙ্গম্মা প্রশ্ন করল, 'যার মঙ্গলসূত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে তাকেই কিনা নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে বড় বৌ! পঞ্চায়েত ডেকে ওকে শাস্তি দেওয়া উচিত কিনা আপনিই বলুন?'

ধর্মের বিধান ব্যাখ্যা করার একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন অন্নাজোইস। মনে মনে তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেললেন পঞ্চায়েত ডেকে নন্‌জম্মার অন্তত পঁচিশ টাকা জরিমানা করাতে হবে। কিন্তু তখনি মনে পড়ল, কিছুদিন আগেই বর্ষাসনের ভাগ আদায় করানোর জন্য যে পঞ্চায়েত বসেছিল তাদের কিভাবে আপ্যায়িত করেছে নন্‌জম্মা। তার পরদিন এলাকাদারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেটাও বিশেষ সুখকর বলা চলে না, কাজেই একটু ভেবে চিন্তে এগোতে হবে। সেবারকার অপমানের শোধ নেওয়া দরকার। গঙ্গম্মাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে, অন্নাজোইস গেলেন খুড়ো অইয়াশাস্ত্রীর কাছে। এমন চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া করার পাত্রই নন অইয়াশাস্ত্রী। তিনিও সদম্ভে ঘোষণা করলেন, 'এটা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সমস্যা, ব্রাহ্মণের ধর্মকে শুদ্ধাচারে রক্ষা করতে হবে, না রসাতলে পাঠাতে হবে, তাই স্থির করার সময় এসেছে এখন।'

সুতরাং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই দুই রক্ষাকর্তা গ্রামের অন্যান্য ব্রাহ্মণদের একত্রিত করে সদলবলে এলেন নন্‌জম্মার বাড়িতে। গঙ্গম্মা এবং অপ্পন্নায়াও আছে তাঁদের সঙ্গে। এঁরা সব এসেছেন ন্যায়বিচার করতে। নন্‌জম্মার সে খেয়াল আছে কিনা কে জানে। অন্নাজোইসজী প্রথমে শুরু করলেন, 'যার মঙ্গলসূত্র খোয়া গেছে সে স্ত্রীলোক বিধবা তুল্য। কিন্তু এক্ষেত্রে পতি জীবিত, সুতরাং তাকে বিধবা বলা চলবে না, অতএব এরূপ স্ত্রীলোককে জীবিত অবস্থাতেই মৃত বলে গণ্য করতে হবে। এরূপ স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করাও অনুচিত, অথচ এগৃহে তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, সেজন্য তোমাদের জরিমানা দিতে হবে।'

জরিমানার কথা শুনেই ঘাবড়ে গেল চেন্নিগরায়। বলে উঠল, 'আমি কিছু জানিনে মশাই, ওই ও নিয়ে এসেছে এদের। যদি বলেন তো এখনই এদের গলাধাক্কা দিয়ে

বিদায় করে দিচ্ছি।'

'তা হলে তো কোন কথাই নেই। কিন্তু এরাতো ইতিমধ্যেই বাড়িতে প্রবেশ করেছে, কাজেই জরিমানা তো দিতেই হবে।'

'কত দিতে হবে?'

'খুড়োমশাই, আপনি বলুন' প্রশ্ন করেন অন্নাজোইস। অইয়াশাস্ত্রী রায় দেন, 'এরাও গরীব, সেটাও বিবেচনা করতে হবে, তা—পঁচিশ টাকা হলেই যথেষ্ট হবে!'

'এত টাকা কোথায় পাব শাস্ত্রীজী, আরো কিছু কম করুন দয়া করে!'

'আরে চিন্নয়া, তুমি কি ভাবছ এ টাকা আমার হাতে থাকবে? তা মোটেই নয়, এ টাকা পাঠাতে হবে একেবারে সেই শৃঙ্গেরী মঠে।'

এর ওপর আর কোন কথা নেই। চেন্নিগরায় এবার ফেটে পড়ে নিজের স্ত্রীর ওপর, 'ছেনাল কোথাকার! কি ভেবেছিস কি তুই? এই অলুক্ষুণেদের কেন বাড়িতে এনে তুললি শুনি? এখুনি গলাধাক্কা দিয়ে বিদেয় কর সব কটাকে।'

তঙ্গম্মা এতক্ষণ রান্নাঘরে বসে বসে সবই শুনছিল, এবার বাইরে এসে বলল, 'জোইসজী, আপনার সঙ্গে আমাদের এতদিনকার আত্মীয়তা, আজ হঠাৎ এমন শত্রুতা করছেন কেন? আপনার কি ক্ষতি করেছি আমরা বলুন তো?'

'দেখ বোন, ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই, কিন্তু এ হল শাস্ত্রের বিধান। এই ব্যাপার ঘটতে দেখেও যদি চুপ করে থাকি তাহলে শৃঙ্গেরী মঠে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে যে!' বললেন অন্নাজোইসজী।

নন্‌জম্মা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার সে বলে উঠল, 'অপ্পন্নায়া মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে দিয়েছে। স্ত্রীর গলা থেকে এভাবে মঙ্গলসূত্র টেনে ছিঁড়ে নেবার অধিকার কি স্বামীর আছে? শাস্ত্রে কি বলে এ বিষয়ে? জরিমানা যদি করতে হয় তো তাকেই করা উচিত। ঘর-দোর পুড়ে গেছে, ছেলেপেলে নিয়ে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে এরা, এ সময় আশ্রয় না দিয়ে কি করা উচিত ছিল? আপনাদের ধর্মশাস্ত্রে কি এই লেখা আছে যে, "লোকে বিপদে পড়লে কোনমতেই সাহায্য করবে না তাকে"?'

ধর্মের ধ্বজাধারী দুই পণ্ডিত এবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। বউটা যেন জাদু জানে, সমস্ত দোষ এখন তার ছেলের ঘাড়েই এনে ফেলছে দেখে গঙ্গম্মা প্রায় বজ্রাহত হয়ে পড়ল। বৃদ্ধ অইয়াশাস্ত্রী বললেন, 'মঙ্গলসূত্র সেই পরিয়েছিল আবার সেই খুলে নিয়েছে ··· ' অন্নাজোইস কথার মাঝখানেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি চুপ করুন খুড়োমশায়। শুনছি তো সাতুই নাকি তেজ দেখিয়ে মঙ্গলসূত্র ফিরিয়ে দিয়েছে, বলেছে, "তোমার দেওয়া মঙ্গলসূত্র চাই না আমার", তাই না গঙ্গম্মা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। ঐ হারামজাদীই "মঙ্গলসূত্র চাই না" বলে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।'

তঙ্গম্মা বলে উঠল এবার, 'এসব পাপ কথা মুখে আনছ কেন? কোন প্রমাণ আছে তোমাদের কাছে?'

'সারা গ্রাম চোখে দেখেছে এসব। আবার কি প্রমাণ দিতে হবে শুনি?' জবাব দিল গঙ্গম্মা।

এইভাবে ন্যায়বিচারের কাজটায় বাধা পড়ে গেল। এদের হয়ে লড়াই করবার মত তেমন শক্তিশালী পুরুষমানুষ কেউ থাকলে হয়ত এই কলহের ফলাফল অন্যরকম দাঁড়াত। নন্‌জম্মা সেটা ভাল করেই জানে, তাই এবার সে শক্ত হয়ে বলল, 'জোইসজী, আপনারা কেউই স্বচক্ষে ঘটনাটা দেখেননি। পরের সংসারে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়ে এভাবে তামাশা দেখতে আসেন কেন আপনারা? এটা কি ভদ্রলোকের কাজ? কে ডেকেছে আপনাদের? যান, আর কথা না বাড়িয়ে, বাড়ি যান। আর হ্যাঁ, ভবিষ্যতে আর কখনও এইরকম ন্যায়বিচার করতে আমার বাড়ি আসবেন না আপনারা।'

'দেখুন জোইসজী, দেখুন একবার, কি অহঙ্কার হারামজাদীর'—কথা শুরু করেছিল গঙ্গম্মা, এর মধ্যে হঠাৎ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সাতু, দরজার পাশে রাখা ঝাঁটা-গাছটা তুলে নিল হাতে, তারপর 'এই ঘরভাঙানী মেয়েমানুষটাই সব নষ্টের গোড়া' বলতে বলতে ঝাঁটাটা ছুঁড়ে মারল শাশুড়ীর মুখের ওপর। আচমকা এই ব্যাপারে গঙ্গম্মার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোল না। কিন্তু তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে তেড়ে এল অপ্পন্নায়া। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে নন্‌জম্মা তাড়াতাড়ি সাতু আর তঙ্গম্মাকে ঠেলে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল, তারপর দরজাটা আগলে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনারা সবাই এখান থেকে যাবেন কি-না?' দুই পুরোহিতই উঠে পড়লেন। অন্য ব্রাহ্মণেরাও এই ব্যাপারে তাঁদের কোন দায়িত্ব নেই বুঝে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গঙ্গম্মা ক্ষেপে উঠেছে। কোণায় রাখা উদূখলের মুষলটা তুলে নিয়ে সে এগিয়ে এল রান্নাঘরের দরজার সামনে। নন্‌জম্মা দরজা আগলে গর্জে উঠল, 'এটা পাটোয়ারীর বাড়ি, মনে থাকে যেন। তেমন কিছু ঘটলে আমি এখনি পুলিশ ডাকব।' একটু ঘাবড়ে গেল গঙ্গম্মা। অপ্পন্নায়া তো এই হুমকি শুনেই ঘামতে শুরু করেছে। মায়ের হাত থেকে মুষলটা টেনে নিয়ে রেখে দিতে দিতে সে বলল, 'চল মা এই ছোটলোকদের বাড়িতে আর থাকতে হবে না।' কিন্তু একেবারে মুখ বুজে চলে এলে মান থাকে না তাই বেশ কিছুক্ষণ গালিবর্ষণ করে তারপর ছেলেকে অনুসরণ করে ফিরে গেল গঙ্গম্মা।

ভাত ডাল সবই রান্না হয়েছে, কিন্তু সাতু বা তঙ্গম্মা কিছুই মুখে তুলতে পারল না। এবার দিন চলবে কি করে সেই ভাবনায় দুজনেই উদ্বিগ্ন। দুপুরের ঘটনার আকস্মিকতা ওদের খুব আঘাত দিয়েছে।

৫

সারা রাত মা ও মেয়েতে অনেক আলোচনা হল। সকালে উঠে নন্‌জম্মাকে বলল তঙ্গম্মা, 'আর এখানে থেকে লাভ কি? গ্রামে আমাদের একখানা বাড়ি ছিল, কিন্তু এখানে আসার আগে সে বাড়ি বিক্রী করে এসেছি। তবে আশেপাশের গ্রামে দু-চার ঘর শিষ্য আছে। রামকৃষ্ণর বয়স তো প্রায় আট বছর হয়ে এল, কোনরকমে ওর পৈতেটা দিয়ে নিলে বাঁধা ঘরগুলোতে পুজোপার্বন, নবগ্রহদান এসব কাজ করতে পারবে, তাইতেই যা হোক করে

পেট চালাতে হবে। কেউ দয়া করে একটু জায়গা দিলে সেখানেই একখানা কুঁড়ে বেঁধে নেব।'

নন্‌জম্মা কি পরামর্শ দেবে এদের? এরা মা মেয়ে কেউই পরিশ্রম করতে পারে না, মড়ুয়ার রুটি, লোন্দা এদের রোচে না। গরীব ঘরের মত খাওয়া দাওয়ার অভ্যাস করার চেষ্টাও করে না এরা, তা যদি করত তাহলে অপ্পন্নায়া হয়ত এ কাণ্ড বাঁধাত না। গ্রামে ফিরে গেলেও এদের অভ্যাস বদলাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু নন্‌জম্মার পক্ষেও তো আর কিছু করা সম্ভব নয়, কাজেই মা ও মেয়ের এই পরিকল্পনায় সম্মতি দেওয়া ছাড়া আর কি করবে সে? এখন এরা যত শীঘ্র সম্ভব এ গ্রাম ছাড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সাতু তার কানবালা দুটি বিক্রী করতে চাওয়ায় নন্‌জম্মার এক প্রতিবেশিনী পঁচিশ টাকায় সে দুটো কিনে নিল। এ থেকে পথ খরচটা হয়ে যাবে। নন্‌জম্মা পায়েস রাঁধল সেদিন। সাতু আর জয়লক্ষ্মীকে সিঁদুরের টিপ পরাল। পরদিন গরুর গাড়িতে সব মালপত্র চাপিয়ে বাস ছাড়ার জায়গা পর্যন্ত এল ওদের সঙ্গে সঙ্গে। যাবার সময় সাতু বলল, 'দিদি দুজনেই এ বাড়িতে বউ হয়ে এসেছিলাম। তুমি তো কোনরকমে এখনও মানিয়ে চলছ, কিন্তু আমার কপালে শেষ পর্যন্ত এই ছিল।'

এ কথার জবাবে কিছুই বলতে পারল না নন্‌জম্মা। বিয়ে হয়ে এ গ্রামে আসার পর থেকে একটার পর একটা ঘটনা সব মনে পড়ছিল। 'কেনই বা আমরা জন্মেছিলাম, আর কি কুক্ষণেই এ বাড়িতে সম্বন্ধ হয়েছিল আমাদের?' এই প্রশ্নগুলোই উঠছিল তার মনের মধ্যে তখন। বাসের ছাদে মালপত্র সব তোলা হলে, সবাই উঠে বসল ভিতরে। 'একবার আমাদের গ্রামে যেও দিদি' একথা বলার সময় মনে মনে দুজনেরই গভীর সন্দেহ ছিল, কি জানি আর কখনও দুই জায়ে দেখা হবে কি না।

খালি গরুর গাড়িটায় চড়ে বাড়ি ফিরে এল নন্‌জম্মা। কিছুক্ষণ পরে মাস্টার সুরপ্পার স্ত্রী রুকম্মা এল ওর বাড়িতে। এদিক ওদিক দু-চার কথা বলার পর সে জানাল, 'লোকে বলছে আপনাদের একঘরে করার জন্য অন্নাশাস্ত্রীজী নাকি মঠে চিঠি লিখেছেন।'

'চিঠি লিখে কি করবে?'

'ওমা, তা জানেন না বুঝি? মঠ থেকে আদেশ আসবে যে, গ্রামের কেউ যেন এ বাড়িতে যাওয়া-আসা খাওয়া-দাওয়া কোন কিছু না করে। সবাই সব সম্পর্ক তুলে দেবে। গ্রামের জাতভাইদের কাছে একঘরে হয়ে থাকলে জীবন কাটবে কি করে?'

কথাটা শুনে নন্‌জম্মাও প্রথমটা বেশ থতমত খেয়ে গেল, কিন্তু তারপরই ওর মনে হল জাতভাইরা এতদিন পর্যন্ত কবে ওর কোন উপকারটা করেছে? ভবিষ্যতেও কিছু করবে এমন কোন আশা আছে নাকি? তাহলে কেউ ওর বাড়িতে না এলে কি আর ক্ষতি হবে? যা হোক, সে যে একটুও ভাবনায় পড়েছে এমন ভাব বাইরে একেবারেই প্রকাশ করল না।

দিন পনেরো পরে অন্নাজোইস ও অইয়াশাস্ত্রী এলেন নন্‌জম্মার বাড়িতে, এসেই একটা চিঠি দিলেন তার হাতে। শৃঙ্গেরীর সর্বাধিকারীর স্বাক্ষরযুক্ত সেই চিঠিতে লেখা রয়েছে, 'যে স্ত্রীলোক নিজের স্বামীকেই অস্বীকার করেছে এবং মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে সেই

স্ত্রীলোককে স্বগৃহে প্রবেশ করতে দেওয়ার অপরাধে পাটোয়ারী চেন্নিগরায়ের পরিবারকে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করা হল। এই মঠে একশত টাকা জরিমানা দিয়ে, দূর্বা পুড়িয়ে জিহ্বা পরিশুদ্ধ করে, গ্রামের পুরোহিত দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্যন্ত এই পরিবারের সঙ্গে কারো অগ্নি বা জল দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক থাকবে না। যে এই নির্দেশ অমান্য করবে তাকেও সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করে সকলে শ্রীমঠের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।' চিঠির ওপর মঠের শিলমোহরের ছাপও রয়েছে।

চিঠিখানা পড়ে ফেলল নন্‌জম্মা। অইয়াশাস্ত্রী প্রশ্ন করলেন, 'কি করবে এখন?'

নন্‌জম্মা উত্তর দিল, 'এতকাল ধরে রামনবমীর দিন কোনমতে শরবৎ মিষ্টি ইত্যাদি তৈরী করে আপনাদের পাঁচজনের সামনে পরিবেশন করতাম, এখন থেকে সেটা আর তৈরী করতে হবে না।'

'তৈরী করলেও আমরা কেউ খেতে আসব না।'

'সে আপনাদের অভিরুচি।'

'রাজমহলের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বাঁচতে পারবে? গুরুগৃহ থেকে বহিষ্কারের আদেশ এসেছে, এরপর জীবন দুর্বহ হয়ে উঠবে তোমাদের এটা মনে রেখো', শাসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন দুই পুরোহিত। নন্‌জম্মার যথেষ্ট অপমানিত মনে হচ্ছিল নিজেকে, কিন্তু সে ভয় পায়নি একটুও। দ্বিতীয় দিন সে একটি পত্রে সমস্ত বিবরণ বিশদভাবে লিখল। —মায়ের প্ররোচনায় পুত্র নিজেই স্ত্রীর গলা থেকে মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে নিয়েছে, এক্ষেত্রে স্ত্রীর কোন দোষ ছিল না। এরপর অনাথ স্ত্রী ও তার সন্তানদের একদিনের জন্য পাটোয়ারীর বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে তারপর তাদের স্বগ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর কোন অন্যায় তারা করেনি, ইত্যাদি সব কিছু লিখে নিচে স্বামী চেন্নিগরায়কে দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে, পরদিন পোস্টম্যানের কাছে একটি লেফাফা চেয়ে নিয়ে তাকে দিয়েই ঠিকানা লিখিয়ে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিল নন্‌জম্মা। কিন্তু বহুদিন কেটে যাবার পরও কোন উত্তর এল না মঠ থেকে।

পৌষ মাসে শ্বশুরের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। এতদিন এ অনুষ্ঠান বড় ছেলে চেন্নিগরায়ের বাড়িতেই হয়ে আসছে। নিজে একপয়সাও খরচ না করে অপ্পন্নায়াও এখানে এসেই তর্পণের কাজ সেরে চলে যায়। আসল শ্রাদ্ধের কাজ বড় ছেলেই করে, কনিষ্ঠ কেবল চুপ করে বসে দেখে এবং পুরোহিতের নির্দেশ মত যথাসময়ে প্রণাম করে। এরা আলাদা হবার পর থেকে স্বামীর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেও আসত না গঙ্গম্মা, কিন্তু ইদানীং শ্রাদ্ধের দিনে সে আসতে শুরু করেছিল। এবার পুরোহিতেরা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে যেহেতু এরা 'একঘরে' তাই এদের বাড়িতে শ্রাদ্ধের কাজ করাতে এবং পংক্তি ভোজনে যোগ দিতে তাঁরা আসবেন না। চেন্নিগরায় মহা দুশ্চিন্তায় পড়েছে। সব গণ্ডগোলের মূল হচ্ছে এই বউটি। তাকেই গালাগাল দিয়ে গায়ের জ্বালা মেটায় সে— 'হারামজাদী, কেন খামোকা ওদের বাড়িতে এনে ঢোকাতে গেলি।' স্ত্রী চুপ করেই শুনে যায় কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হয় না।

দুই পুরোহিত মিলে স্থির করেছেন, এ বছর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ হবে গঙ্গম্মার বাড়িতে,

অপ্পন্নাই উপোষ করে শ্রাদ্ধ করবে। অর্থাৎ তাকে বাড়ির কর্তার সম্মান দেওয়া হচ্ছে। বেশ খুশি হয়ে ওঠে অপ্পন্নায়া, সেও তাহলে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠল। তাছাড়া, এ বাড়িতে শ্রাদ্ধ হলে খাবার দাবার বড়া, লুচি, সুজির নাড়ু ইত্যাদি যা উদ্বৃত্ত থাকবে অন্ততঃ সাত-আট দিন ধরে খাওয়া চলবে সেগুলো। কিন্তু খরচটা যে সমস্ত ওর ঘাড়েই পড়বে সেটার দিকে খেয়ালই নেই তার।

খরচের কথা গঙ্গম্মাও বিশেষ ভাবছে না। খরচ হবে বড়জোর পনেরো-ষোল টাকা, সে কোনরকমে যোগাড় হয়েই যাবে। যেসব জায়গায় সে ভিক্ষায় যায় সেখানে স্বামীর শ্রাদ্ধের কথা বললে সবাই দু-চার আনা করে দেবে। তাছাড়া নারকেল, তিসি, কলাই ডাল, বরবটি এসব যা পাওয়া যাবে তা দিয়ে তিনটে শ্রাদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সমস্যাটা অন্য। বড় ছেলের বর্তমানে তার হাত দিয়ে পিণ্ড না দিয়ে ছোট ছেলেকে দিয়ে পিণ্ডদান করলে স্বর্গলোক থেকে কাকের রূপধারী স্বামী এসে সে পিণ্ড স্পর্শ করবেন কি? পাটোয়ারীর কাজ যেমন বড় ছেলেরই প্রাপ্য তেমনি শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের অধিকারও তো তারই। সুতরাং গঙ্গম্মা চলল জোইসজীর বাড়ি। জরিমানার একশ' টাকা দেবার ক্ষমতা তো কারোই নেই। কিন্তু এদের অপরাধের জন্য স্বর্গগত স্বামী রামন্নাজী যদি বাৎসরিক পিণ্ডটাও না পান তাহলে তাঁকে উপবাসে থাকতে হবে যে! তাছাড়া আসল অপরাধ তো ঐ হারামজাদী বৌয়ের, চিন্নয়া বেচারা তো কিছু করেনি। এখন কি ব্যবস্থা করা যায়?

গঙ্গম্মার কথায় যুক্তি আছে এটা দুই পুরোহিতকেই মানতে হল। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে যৎসামান্য জরিমানা নিয়ে চেন্নিগরায়কে আবার সমাজে গ্রহণ করা হবে কিন্তু তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা 'একঘরে' হয়েই থাকবে। কিন্তু জরিমানা দেবার মত সামান্য টাকাও কি আছে চেন্নিগরায়ের? অগত্যা দুই পুরোহিত সেটারও ব্যবস্থা করে দিলেন। এ গ্রামে অন্নাজোইসকে খাজনা দিতে হয় মোট ন'টাকা আট আনা। অইয়াশাস্ত্রীর দেয় খাজনা মাত্র ছ'টাকা তিন আনা পাঁচ পাই। চেন্নিগরায় এঁদের দুজনকেই এই মর্মে রসিদ লিখে দিল যে এঁদের কাছ থেকে সে সরকারী রাজস্ব পেয়ে গেছে। পরে এই টাকা তার বর্ষাসন থেকে কাটিয়ে দিলেই হবে, সে ব্যবস্থা তো আছেই। যাক, এইভাবে পাটোয়ারী চেন্নিগরায় তার বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ করার অধিকার ফিরে পেল। স্থির হল সে তার মায়ের বাড়িতে গিয়ে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করবে। তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

অন্নাজোইসকে পূর্বপংক্তিতে বসতে হবে তাই সেদিন সকাল থেকে তাঁর উপবাস। তাছাড়া সকালে আর কোন কাজও নেই। তাঁর স্ত্রী বেঙ্কটলক্ষ্মী রান্নাঘরে বসে তরকারী কুটছিল। সকাল থেকে উপোষ করার জন্যই বোধ হয়, কবে একবার শ্বশুর বাড়িতে খাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচির স্মৃতি অন্নাজোইসকে উতলা করে তুলল। তিনি রান্নাঘরে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'সেই যে একবার তোমার মা ঘিয়ে ভাজা লুচি খাইয়েছিলেন না? আহা সে স্বাদ আর ভোলবার নয়। তা তুমি তো কখনো ঐ রকম লুচি তৈরী কর না?'

'তা, অতখানি ঘি যদি এনে দিতে পার তাহলে যা চাইবে সবই ঘিয়ে ভেজে দেব এখন।'

'এক সের ঘি চার আনা। আনব কোথা থেকে?'

'তা হলে আবার খাওয়ার সখ কেন? চুপ-চাপ থাকলেই হয়।'

জোইসজী একটু মিইয়ে গেলেন। একটু পরে একটা উপায় মনে পড়ল। স্ত্রীকে বললেন, 'আজ মাখন থেকে তৈরী ঘিয়ে ভাজা খাবার খাব, দেখে নিও।' স্ত্রী এবার ব্যঙ্গ করে শুনিয়ে দিল, 'কে অতসব খাওয়াচ্ছে তোমায়? চুপ করে থাক, বেশী কথা বোল না।'

'দেখতেই পাবে সব' বলেই অন্নাজোইস ছেলেকে ডাক দিলেন, 'ওরে নরসিং, যা দেখি, ছুটে গিয়ে অপ্পন্নায়াকে ডেকে আন একবার।'

অপ্পন্নায়া তখন স্নান করে শুচি শুদ্ধ হয়ে ভিজে গামছা পরে মাকে রান্নায় সাহায্য করছিল। জোইসজী ডাকছেন শুনে খালি গায়েই ছুটে এল। জোইসজী বললেন, 'দেখ অপ্পন্না, আমার শরীরটা ভাল ঠেকেছে না, ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। আমি তো কাজ করাতে বসতে পারব না।'

'এখন একথা বললে চলবে কি করে জোইসজী? এত বেলা হয়ে গেছে, এখন আর অন্য কাকে যোগাড় করব?'

'তোমার মাকে ডেকে আন, তারপর বলছি।'

গঙ্গম্মাও ছুটে এল। দূর থেকেই প্রণাম জানিয়ে মিনতি করে বলল, 'জোইসজী, এখন কাজে বাধা পড়লে আমার স্বামী স্বর্গে উপবাসে থাকবেন।'

'দেখি, এত করে বলছ যখন, "না" করি কি করে। ব্রাহ্মণ ভোজনে গিয়ে না খেয়ে থাকাটাও আবার অশাস্ত্রীয়। তা এক কাজ কর। আমার খাবারটা যা দেবে সব কিছু ঘিয়ে ভেজে দিও, তাহলে খেতে পারব।'

'এখন এত ঘি পাব কোথায় জোইসজী?'

'পয়সা নিয়ে এস, গোয়ালাদের কাছ থেকে আমি মাখন যোগাড় করে দিচ্ছি। এখনও তো আমার স্নান হয়নি।'

বাড়ি ফিরে গেল গঙ্গম্মা। এক ব্রাহ্মণকে ঘিয়ে ভাজা খাবার পরিবেশন করলে অন্যজনকে তো আর তেলেভাজা দেওয়া চলে না। নিজেদের জন্য না হয় তেলেই রান্না হবে। ওঁদের দুইজনের লুচি, বড়া ইত্যাদি ভাল ঘি দিয়ে ভাজতে হলে অন্ততঃ দেড় সের ঘি চাই, অর্থাৎ ছ'সাত সের মাখন। ঘরে তো আছে মোটে দুটি টাকা। গঙ্গম্মার নিজের বিয়েতে পাওয়া রূপোর পঞ্চপাত্রটা ছিল এখনও, অপ্পন্নায়ার হাতে সেইটেই পাঠাতে হল কাশিমবদ্দির কাছে। সে ওজন করে বারো তোলা রূপোর জন্য দিল দু টাকা মাত্র, তাও প্রতিদিন দু পয়সা করে সুদ।

যাহোক মাখন থেকে প্রস্তুত ঘিয়ে ভাজা লুচি পেট ভরে খেলেন জোইসজী। যা বাকি রইল ছেলে-পেলেদের নাম করে ছাঁদা বেঁধে নিলেন, বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বললেন, 'নাও তুমিও খেয়ে দেখ দুটো।' স্ত্রী বলল 'অন্যের বাড়ির শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ ভোজনের প্রসাদ আমি কি করে খাব?'

'আরে কিছু হবে না, খেয়ে ফেলো। ছেলেদেরও দাও একটু একটু।'

'দেখ বাপু, আমি লৌকিকের ঘরের মেয়ে। তোমাদের শাস্ত্রের আচার নিয়মে আমার যথেস্ট ভয় আছে। পুরোহিতরা নিজেরা না হয় যা খুশি করতে পারে', কথাটা বলে হেসে ফেলল বেঙ্কটলক্ষ্মী। জোইসজী আর জোর করতে পারলেন না এ নিয়ে।

৬

শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণ ভোজনের পর চেন্নিগরায় দেবতাকে উৎসর্গ করা পাতার সামনে বসে 'প্রসাদ ভোজন' করল পেট ভরে। তারপর জামাটা পরে ফেলে বাঁধের দিকে চলে গেল। বেলা তখন প্রায় সাড়ে চারটে। দুপুরে স্নানের পর থেকে আর পান খাওয়া হয়নি। হনুমান মন্দিরে পান সুপারির ব্যবস্থা ছিল না। পান কেনার মত পয়সাও নেই পকেটে। বাঁধ থেকে নেমে গ্রামে ঢোকার পথে গ্রামদেবীর ঝাঁকড়া গাছের পাশে নরসীর দোকান। খাপরার চালের তিন কামরার বাড়ি, তার সামনের ঘরখানায় দোকান খুলেছে নরসী। পেছনের ঘরে থাকে ওর সংসারের জিনিসপত্র। লোকে বলে একেবারে শেষ ঘরখানার মাচার ওপরেও নাকি ঠাসা আছে দোকানের মালপত্র।

দোকানে বসে বসেই সে দেখতে পেল পাটোয়ারী আসছে। ওর সামনেই সাজানো রয়েছে পানের গোছা। পান আর তামাকের চাহিদায় পাটোয়ারী নিজেই এসে হাজির হল দোকানের সামনে, বলল, 'নরসী, দু-একটা পান একটু সুপাড়ী আর তামাকপাতা দিতে পারবে?'

নরসীর মুখেও পান রয়েছে। বড় বড় চোখ, গোলগাল মুখখানা তার সর্বদাই পানের রসে ভরা থাকে। ভারি ঢলঢলে চেহারাটি নরসীর, দেখলেই মনে হয় কোন দুঃখ নেই তার জীবনে, হাসিমুখে কথা বলার সময় তার চোখদুটি এমন ঝিলিক দিয়ে নেচে ওঠে যে, দর্শকের আর চোখের পলক পড়ে না। সে বলে উঠল, 'ব্যাপার কি পাটোয়ারীজী, আমার কাছে পান চাইছেন? বউ আজ পান সেজে দেয়নি না কি?'

'বাড়িতে পান নেই। আজ আমার বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ ছিল, সে কাজ সেরে বাঁধের পথ ধরে ফিরছিলাম।'

'আসুন আসুন, পান দিচ্ছি। আপনি হলেন এ গ্রামের পাটোয়ারী, আপনাকে কি না বলতে পারি?' চোখ নাচিয়ে হাসল সে। যাক এ গ্রামে একজন অন্ততঃ তাকে পাটোয়ারী বলে খাতির করছে এতেই ভারি খুশি হয়ে দোকানে ঢুকল চেন্নিগরায়। 'আসুন না, ভিতরে এসে বসুন' বলে তাকে একেবারে বাড়ির মধ্যেই নিয়ে গেল নরসী। ভিতরটা আবছা অন্ধকার, ভাল করে কিছু দেখা যায় না। একপাশে দশ বারোটা বস্তায় বোধহয় দোকানের জিনিসপত্র রয়েছে। অন্যদিকে দেওয়ালে লাগানো খাটের ওপর বিছানা পাতা। 'বসুন এখানে' বলল নরসী। চেন্নিগরায় একটু ইতস্ততঃ করে বলে, 'বড় অন্ধকার যে।' 'ওমা, অন্ধকার তো কি হয়েছে? আসুন, বসুন এসে' কাছে এসে নরসী ওর দুই হাত ধরে বসিয়ে দেয় খাটের ওপর আর নিজেও বসে পড়ে পাশ ঘেঁসে। হঠাৎ বাইরে থেকে আসার

পর চেন্নিগরায়ের যতটা অন্ধকার লাগছিল ঘরের ভিতরটা এখন আর তা লাগছে না, কিন্তু সারা শরীর কাঁপতে শুরু করেছে, মনে হচ্ছে যেন দারুণ শীত করছে। দেখতে দেখতে তার কাঁপুনী এত বেড়ে গেল যে দাঁতে দাঁতে লেগে খট্‌খট্‌ শব্দ হতে লাগল।

'এত কাঁপছেন কেন আপনি?'

'এভাবে আমাকে স্পর্শ করা কি উচিত হচ্ছে তোমার?' বহু কষ্টে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে ওঠে চেন্নিগরায়।

'আপনি তো পান চাইলেন এসে আমার কাছে?'

এ কথার অর্থ বুঝল না চেন্নিগরায়, সে বলল, 'হাতে পয়সা ছিল না তাই জিজ্ঞাসা করছিলুম।'

'তা, আমি কি পয়সা চেয়েছি নাকি আপনার কাছে?'

'কি-কিন্তু, এ ভাবে আমাকে ছুঁয়েছ কেন?'

এবার ওর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এসে নরসী বলে, 'যান চুপচাপ বাড়ি চলে যান।'

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে বেরিয়ে পড়ে দোকান থেকে। 'দাঁড়ান একটু', শুনেই আবার চমকে উঠে থেমে যায়। নরসী বেরিয়ে আসে দোকান থেকে, হাতে তার এক গোছা পান, এক মুঠো সুপারী আর তামাকপাতার মোড়ক। চেন্নিগরায়ের হাতে সেগুলো ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'যান, বাড়ি গিয়ে নন্‌জম্মাকে বলবেন সেজে দিতে। দেখুন আপনাদের মত লোকের উচিত, ঠিক বউ যা যা বলবে সেই মত চলা, বুঝলেন?'

চেন্নিগরায়ের বেশ রাগ হল, কিন্তু একে কি বলে গাল দেওয়া যায় ভেবে পেল না সে। পান-সুপারী হাতে বাড়িতে এসে দেখে স্ত্রী বসে বসে হিসেব লিখছে। কোন বাক্যালাপ হল না দুজনের মধ্যে। থামের পাশে মাদুরে শুয়ে শুয়ে পান চিবোতে লাগল চেন্নিগরায়।

দশম অধ্যায়

স্বামীকে সমাজে গ্রহণ করা হয়েছে, কেবল নন্‌জু ও তার সন্তানদের 'একঘরে' করে রাখা হয়েছে এ খবরটা জানার পর দুঃখের চেয়ে ঘৃণাই বেশী হল নন্‌জম্মার। এইসব ধর্ম-কর্ম, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে তার অভিমত সাধারণতঃ অন্যদের সঙ্গে মেলে না। শুধু গ্রাম কেন, সারা অঞ্চলের মানুষকে শেখাবার মত শাস্ত্র জ্ঞান ছিল নন্‌জম্মার বাবা কন্ঠীজোইসজীর। মঙ্গল অমঙ্গলসূচক ক্রিয়াকর্মে কারো মনে এতটুকু সংশয় দেখা দিলেই লোকে আসত তাঁর কাছে এবং কন্ঠীজোইসজী সবাইকার সব কিছু সমস্যার সমাধান করে দিতেন। তিনি নিজে তাঁর পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ করতেন না। কেউ প্রশ্ন করলে বলতেন, 'গয়ায় গিয়ে আমি পিণ্ডদান করে এসেছি, আর শ্রাদ্ধের প্রয়োজন নেই।' একটা শ্লোকও শুনিয়ে দিতেন যার অর্থ হল, 'গয়াতে পিণ্ডদান করার পর আর প্রতি বৎসর শ্রাদ্ধ করতে হয় না।' কিন্তু সত্যি সত্যি উনি গয়া গিয়েছিলেন কিনা, এবং পিণ্ডদান করেছিলেন কিনা এ বিষয়ে অনেকেরই মনে সন্দেহ ছিল। এমন কি অক্কম্মা পর্যন্ত ওঁর গয়া যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস করত না। কিন্তু কন্ঠীজোইসজীর মুখের সামনে কোন কথার প্রতিবাদ করবে এত সাহস কার আছে?

'আজ বাবা যদি থাকতেন, এ গাঁয়ের এই দুই পুরোহিতের এত দাপট কিছুতেই সহ্য করতেন না। জমিগুলোও এভাবে বেহাত হতে পারত না। বাবা একবার হুঙ্কার দিলেই স্বামী, শাশুড়ী সবাই চুপচাপ তাঁর কথা মত কাজ করতে রাজি হয়ে যেত। কোথায় যে চলে গেলেন বাবা! বেঁচে আছেন নিশ্চয়। শুনেছি তো আমার ছোটবেলায় এই রকম একবার নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন পুরো চার বছর। কাশী থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত সর্বত্র নাকি ঘুরে এসেছিলেন। এবার কোথায় গেছেন কে জানে, কিন্তু এবার তো ন'বছর হতে চলল। পার্বতী তখন আট ন'মাসের, সেইসময় গেছেন বাবা! সেই মেয়ের এখন ন'বছর বয়স। চিরজীবন বিদেশেই কাটবে এই বোধহয় ভাগ্যে লেখা আছে ওঁর। আর আমারও ভাগ্যলিপি বোধহয় এই যে পিতা চিরকাল দূরেই থাকবেন', এই সব কথা ঘুরে ফিরে কেবলই মনে হয় নন্‌জম্মার।

শ্রাদ্ধের দিন সকালে স্বামীকে তার মায়ের বাড়ি যেতে দেখে নন্‌জম্মার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। যদি এ বাড়িতে শ্রাদ্ধের ক্রিয়াকর্ম হত তাহলে তাকেই উপবাস ও স্নান করে শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ ভোজনের রান্না করতে হত। কিন্তু কাজ যখন ও বাড়িতে হচ্ছে তখনও কি তার উপোষ করার দরকার? কিন্তু বাড়ির বড় বৌ, ওরই স্বামী শ্রাদ্ধকর্মের অধিকারী, কাজেই ওর কিছু খাওয়াটা উচিত হবে না ভেবে শুধু ছেলেমেয়েদের জল খাবার খাইয়ে

দিল নন্‌জম্মা। এ বাড়িতে কাজ হলে ছেলেমেয়েরাও ভাল মন্দ খেতে পেত।

দুপুরে প্রসাদ ভোজনের জন্য বাচ্চাদের অন্ততঃ ডাকবে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। নন্‌জম্মা বুঝতে পারছিল না এবেলা ছেলেমেয়েদের জন্য রাঁধবে কিনা। শেষ পর্যন্ত সে আট দশখানা রুটি সেঁকে রাখল, যদি বাচ্চাদের নিমন্ত্রণ হয়, তাহলেও রুটি খারাপ হয়ে যাবে না। আর যদি শেষ পর্যন্ত না ডাকে তাহলে বেচারারা বাড়িতেই খেয়ে নিতে পারবে!

ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেছে। পার্বতী আর রামন্না দুজনেই পড়ে চতুর্থ শ্রেণীতে, আর বিশ্বনাথ দ্বিতীয় শ্রেণীতে। নন্‌জু বসে বসে পাতা তৈরী করছিল। শাশুড়ীর ওখানে এতক্ষণ হয়ত ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ হয়ে গেছে! এই সময় হঠাৎ মহাদেবায়াজী এলেন। উনি অবশ্য আসেন প্রায়ই, কিন্তু এ সময়ে সাধারণতঃ আসেন না, কারণ ভিক্ষা থেকে ফিরে এটা ওঁর আহারের সময়। যেদিন বেশী দূরের গ্রামে ভিক্ষায় যান সেদিন তো এরকম সময় গ্রামের বাইরেই থাকেন উনি। দেখে মনে হল এখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি মহাদেবায়াজীর। মুখখানা বেশ শুকনো। 'আমরা তো সংসারী মানুষ, ভোর না হতে হাজারটা দুঃখ কষ্টের চিন্তায় পাগল হয়ে যাই, কিন্তু ইনি তো সন্ন্যাসী মানুষ, এঁর মুখে আজ এমন দুঃখের ছাপ কেন?' ভাবতে ভাবতে মাদুরটা পেতে দেয় নন্‌জম্মা। জিজ্ঞাসা করে, 'আজ আপনাকে বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে যেন?'

'দেখ মা, আমি ঠিক করেছি, স্বজাতিদের বাড়ি থেকে আর ভিক্ষা নেব না।'

'কেন, কি হয়েছে বলুন তো?'

'গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমি মড়ুয়া সংগ্রহ করে আনি। বিদেশী সাধু-সন্ন্যাসী মন্দিরে এসে অতিথি হলে যথাসাধ্য তাঁদের সৎকার করি। যেদিন গ্রামেই থাকি সেদিন ভিক্ষায় যা পাই তাই খাই। কিন্তু মনে হচ্ছে এ গ্রামের ব্যবসায়ী মহলে একটা কিছু কথা উঠেছে। আজ ভিক্ষায় গিয়ে কয়েকটা বাড়িতেই শুনলাম, 'এই অইয়াজীর তো সকালবেলা গুরু-ভিক্ষা চাই, আবার দুপুর বেলাও ভিক্ষান্ন লোন্দা তরকারী সবই চাই।' কথাটা শুনে বড় দুঃখ হল, চুপচাপ ফিরে এলাম।'

নন্‌জম্মারও বড় দুঃখ হল কথাটা শুনে। মহাদেবায়াজী গ্রামান্তর থেকে ভিক্ষা করে আনা শস্য তো বাজারে বিক্রী করে পয়সা রোজগার করেন না। এ সংসারে ওঁর নিজস্ব সম্পত্তি বলতে কিছুই নেই। এত পরিশ্রম করে যে গ্রাম-গ্রামান্তর পর্যটন করে ভিক্ষা আনেন সে তো বিদেশী অতিথিদের সেবা যত্ন করার জন্যই।

'অইয়াজী, আজ কি আপনি মন্দিরে গিয়ে রান্না করবেন না?'

'আজ কিছু নেই মা। ক্ষুধা অবশ্য পেয়েছে। তুমি কিছু দাও তো খেতে পারি।'

খুব বেশী অবাক হল না নন্‌জম্মা। এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কোনদিন এখানে এক ফোঁটা জলও চেয়ে খাননি, কিন্তু আজ নিজে থেকে আহার করতে চাইছেন। 'একটু বসুন আপনি, আমি চট করে একটু ভাত আর সব্জী করে দিচ্ছি' বলে উঠল নন্‌জু। কিন্তু সন্ন্যাসী বললেন, 'তার দরকার নেই মা। যা তোমার ঘরে আছে তাই দাও।'

নন্‌জম্মা উঠে একটি এল্যুমিনিয়ামের থালায় রুটি আর চাটনী এবং অন্য পাত্রে মাঠা এনে রাখল তাঁর সামনে। মহাদেবায়াজী হাত ধুয়ে এসে আহারে বসলেন। নন্‌জম্মার

এই সময় আবার মনে পড়ল শাশুড়ীর বাড়িতে আজ বাৎসরিক শ্রাদ্ধ, এতক্ষণে সেখানেও হয়ত শুরু হয়েছে ব্রাহ্মণ ভোজন। সে বলল, 'অইয়াজী, আজ আমার শ্বশুরের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। আপনি শুনেছেন তো এখন কেবল একলা আমাকেই "একঘরে" করে রাখা হয়েছে?'

'সব জানি, সব জানি। শুনলাম তো সেই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ নাকি বলেছেন, সমস্ত খাবার ঘিয়ের তৈরী না হলে তিনি ভোজন করবেন না। অপ্পন্নায়া রূপার পঞ্চপাত্র কাশিমবদ্দির কাছে বাঁধা দিয়ে টাকা এনেছে, তাই দিয়ে মাখন কিনে ঘি তৈরী হয়েছে। সকালবেলা দশটা নাগাদ মন্দিরের সামনে বসেছিলাম, অপ্পন্নায়া আমাকে দেখে বলল 'জোইসজীর জ্বর হয়েছে তাই তিনি তেলের রান্না খাবেন না, সব খাবার ঘি দিয়ে তৈরী করতে হবে।'

'সুদ গুনতে গুনতে ঐ পঞ্চপাত্র কি আর কখনো উদ্ধার করা যাবে! আচ্ছা অইয়াজী, এই সব শ্রাদ্ধ ক্রিয়া-কর্ম এ সবের কি সত্যি কোন প্রয়োজন আছে? এই রকম সব পুরোহিতদের ডেকে আড়ম্বর করে ভোজন করানো, এ সব আমার মনে হয় লোক দেখানো কতকগুলো ভণ্ডামি মাত্র।'

'সত্য মিথ্যা কে বলতে পারে? হয়ত আছে কিছু প্রয়োজন। পাটোয়ারী রামন্না যতদিন বেঁচে ছিলেন গঙ্গম্মা সন্ধ্যা পর্যন্ত অনাহারে রাখত তাঁকে। স্বামীকে এতটুকুও সেবাযত্ন করেনি কখনো। আর আজ গ্রামান্তর থেকে ভিক্ষা করে এনে স্বামীর শ্রাদ্ধ করাচ্ছে।'

'আমার শ্বশুর যখন বেঁচে ছিলেন তখনও আপনি এ গ্রামেই ছিলেন?'

'আমি এ গ্রামে এসেছি চিন্নৈয়ার জন্মেরও তিন বছর আগে।'

'কিন্তু কোন গ্রামে আসল বাড়ি আপনার?'

'সে যেখানেই হোক না কেন, তাতে কি আসে যায়? শিবের কৃপায় মনুষ্যজন্ম পেয়েছি যখন, মৃত্যু পর্যন্ত একই জায়গায় থাকব কেন?' নিজের দেশের নাম কখনও বলেন না তিনি, কেউ জানে না কোথায় ওঁর আসল বাড়ি। শোনা যায় প্রথম প্রথম যখন এসেছিলেন, ওঁর কথায় হুবলি ধারওয়াড়ের উত্তরাঞ্চলের টান বোঝা যেত। উত্তরাঞ্চলের বোরেবাজার, রামনাথযাত্রা প্রভৃতি স্থানের লোকেরা এদিকে বলদ কিনতে আসে, তাদের মুখে যে ধরনের ভাষা শোনা যায় মহাদেবায়াজীর মুখের ভাষাও নাকি অনেকটা ঐ রকম ছিল। প্রথম দিকে তো মড়ুয়ার লোন্দাও গিলতে বেশ কষ্ট হত ওঁর। রুটি খেতেন কেবল। কিন্তু দু এক বছরের মধ্যেই এই অঞ্চলের ভাষা এবং আহার-বিহার সব কিছুই শিখে ফেলেছিলেন। কেউ ওঁর বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'রামসন্দ্র গ্রামের চোলেশ্বর মন্দির।'

শেষ পর্যন্ত কেউ আর ওঁর বাড়ির কথা জিজ্ঞাসাই করত না। কারণ চেন্নিগরায়দের মত বয়স্ক মানুষদের তো উনি জন্মাতে দেখেছেন। নন্‌জম্মাও আর কিছু জানতে চাইল না এখন।

অইয়াজীর খাওয়া শেষ হয়েছে এমন সময় ছেলেমেয়েরা ফিরল স্কুল থেকে দুপুরের

খাওয়ার ছুটিতে। চুপচাপ মায়ের দেওয়া রুটি চাটনী আর জল খেয়ে আবার স্কুলে চলে গেল তারা। নন্‌জম্মা খেলনা কিছু। বাচ্চাদের খাওয়ার পর আর কিছু অবশিষ্ট ছিলও না। আবার নতুন করে কিছু রাঁধতে ইচ্ছাও করছিল না। অইয়াজী এখনও বাইরেই বসে আছেন, নন্‌জম্মাও এসে বসল ওঁর কাছে। অনেক দিন থেকে একটা কথা ওর জানবার বাসনা, আজ সেটা সাহস করে জিজ্ঞাসা করেই ফেলল। 'অইয়াজী, একটা প্রশ্ন করব? উত্তর দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছা।—আপনি ঘর-সংসার ত্যাগ করে এখানে চলে এলেন কেন?'

'ত্যাগ করে আসব কেন মা? ঘর-সংসার কিছু ছিলই না। সন্ন্যাসী হয়েই জন্মেছি আমি, এমনি করে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াই। এখানে থাকতে ইচ্ছা হল, তাই থেকে গেলাম।' এইভাবে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন উনি। ওঁর গৃহ পরিবার সংক্রান্ত সব কথা রহস্যাবৃতই থেকে গেল।

নন্‌জম্মা কিন্তু ওঁর পূর্ব জীবনের কথাই ভাবতে লাগল বসে বসে। কে জানে ওঁর বিয়ে হয়েছিল কি না, যদি হয়ে থাকে, স্ত্রীকে কি ত্যাগ করেই এসেছেন? লোকে বলে, বেলারী জেলার লোক উনি। প্রতিবেশিনী পুটব্বা একদিন নন্‌জম্মাকে বলেছিল, মহাদেবায়াজীর স্ত্রী নাকি এমন কিছু করে বসেছিল যাতে মনের দুঃখে উনি সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে পড়েন। 'তুমি এসব জানলে কি করে?' বলেছিল নন্‌জম্মা, তাতে পুটব্বা বলে, এসব লোকমুখে শোনা কথা, সে খুব ছোটবেলায় শুনেছিল। অইয়াজী তখন এত বুড়ো হননি। কিন্তু পুটব্বার কথায় বিশ্বাস হয়নি নন্‌জম্মার। অইয়াজী নিজে কোনদিন কারো কাছেই এ নিয়ে মুখ খোলেন নি। 'না বললে কি আর করা যাবে, কে জানে কিসের দুঃখ উনি মনের মধ্যে পুষে রেখেছেন' এই ভেবেই চুপ করে রইল নন্‌জু।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর মহাদেবায়াজী মৌন ভঙ্গ করে প্রশ্ন করলেন, 'কি এত ভাবছ মা?'

'কিছু না তো!'

'এতদিন এ গ্রামে বোধহয় আমার কিছু ঋণ ছিল। এবার ভাবছি অন্য কোথাও চলে যাব।'

'অইয়াজী আপনি তো সন্ন্যাসীমানুষ। কেউ যদি অবুঝ হয়ে কোন কথা বলেই থাকে তা নিয়ে আপনি এত মন খারাপ করছেন কেন? যেখানেই যান, এই ধরনের মানুষ তো সর্বত্রই আছে।'

'এ কথাটা ঠিকই বলেছ মা' বললেন মহাদেবায়াজী। তাঁরও বোধহয় সেদিন আর বেশী কথাবার্তা বলতে ইচ্ছা করছিল না। একটু পরে উঠে চলে গেলেন মন্দিরের দিকে।

২

একদিন ভোরে উঠে মহাদেবায়াজী দূর গ্রামে ভিক্ষায় গিয়ে আর ফিরে এলেন না। মাস দুই তিন কেটে গেল। নন্‌জম্মা ভাবল তিনি বুঝি গ্রাম ছেড়ে সত্যিই চলে গেলেন।

মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল, 'ভাল লোক' বলতে তো ঐ একজনই ছিলেন এ গ্রামে। তিনিও মনে দুঃখ পেয়ে চলে গেলেন, আর ফিরবেন কিনা কে জানে! কিন্তু জিনিসপত্র তো সবই পড়ে রয়েছে মন্দিরে, দু তিন থলে মড়ুয়া, কুলথী, এক হাঁড়ি লঙ্কা, কিছু এল্যুমিনিয়ামের বাসন, মাদুর কয়েকটা ইত্যাদি একটা ঘরে তালাবন্ধ রয়েছে, চাবি নাকি মহাদেবায়াজী নিয়ে গেছেন। তাই মনে হয় নিশ্চয় ফিরে আসবেন। মহাদেবায়াজী যাবার পর থেকে মন্দিরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে। নন্‌জম্মা তো ওদিকে একেবারেই যায় না। আজকাল চেন্নিগরায়ের মত মানুষও আর মন্দিরে যাবার কোন আকর্ষণ খুঁজে পায় না।

পার্বতী আর রামন্না দুজনেই প্রাইমারী স্কুল থেকে পাশ করে গেছে। রামন্না খুব বুদ্ধিমান ছেলে, মাস্টার নিজেই বলেন, সারা স্কুলে ওর মত ছেলে আর একটিও নেই। তার হাতের অক্ষরের ছাঁদও একেবারে মুক্তোর মত। পাটোয়ারীর হিসেব লেখার খাতায় ঠিকমত লাইন টানতেও শিখেছে সে। বানান, উচ্চারণ সব কিছু নির্ভুল, কন্নড় ভাষায় লেখা বই সে বেশ গড়গড় করে পড়তে পারে। তিনটি ছেলে-মেয়েকেই নন্‌জম্মা বাড়িতে অনেক স্তোত্র পাঠ করতে শিখিয়েছে। নল চরিত্র, লবকুশের যুদ্ধ কাহিনী এসব পার্বতী ও রামন্না দুজনকারই মুখস্থ। পাটোয়ারী কাজের জন্য এর বেশী বিদ্যার প্রয়োজন নেই, কিন্তু নন্‌জম্মার ইচ্ছা একটু অন্যরকম। সন্তানকেও আবার এই কাজ করাতে চায়না সে। ভাল করে লেখাপড়া শিখে ওরা অন্য কিছু চাকরী করুক, অন্ততঃ এলাকা-দারের পদটা পাবার মত যোগ্যতা অর্জন করুক, এই আশা নন্‌জম্মার।

মাস্টার সুরপ্পাজীও বলেছেন রামন্নাকে মিড্‌ল স্কুলে ভর্তি করে দিতে, পড়াশোনা যেন ছেড়ে না দেয়। মিড্‌ল স্কুল আছে কম্বনকেরেতে, রামসন্দ্র থেকে তার দূরত্ব পাঁচ মাইল। সে গ্রামে নাকি দশ পনেরো ঘর ব্রাহ্মণ বাস করেন। কারো বাড়িতে যদি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দেওয়া যায় তাহলে ছেলেটা ওখানেই থেকে পড়তে পারে। শনিবারে না হয় গ্রামের বাড়িতে আসবে আবার সোমবারে এখান থেকেই স্কুল যাবে। সোমবারের খাবারটা বাড়ি থেকেই নিয়ে যেতে পারে। এলাকাদারকে অনুরোধ করলে তাঁর বাড়িতে একদিন খাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে কিন্তু বাকি চারদিনের খাওয়ার জন্য কাকে বলা যায়? মাস্টার সুরপ্পাজী বা দাবরসায়াজীর চেনাশোনা কেউ থাকতেও পারে।

কিন্তু অচেনা লোকের বাড়িতে খেতে যেতে চায়না রামন্না, তার নাকি লজ্জা করবে। সে রোজ বাড়ি থেকে কম্বনকেরে হেঁটে যাওয়া আসা করতে রাজি আছে, অর্থাৎ প্রত্যহ দশমাইল পথ হাঁটবে। পথটাও সোজা নয়, রামসন্দ্রের মাকালীর মন্দিরের সামনের পুরোন আমগাছতলা দিয়ে গিয়ে কব্বল্লি টেকড়িতে উঠতে হবে, সেখান থেকে নেমে আবার বমীঠা টিলার পাশ দিয়ে পথ, সে টিলাটা কেয়া ঝোপে ভরা, তার মধ্যে যে কত সাপ আছে কে জানে। কেয়া ঝোপের ছুঁচলো পাতাগুলো যেন শিং উঁচিয়ে আছে, দূর থেকে দেখলেই ভয় করে। তার ওপারে গৌডন্‌কোপ্পল। তারপর পাপাসুকল্লীর গলিপথ ধরলে তবে গিয়ে পৌঁছবে কম্বনকেরে। রামন্নার বয়স তো মোটে দশ বছর। এই দীর্ঘ-পথ ওকে একলা যাতায়াত করতে হবে। কিন্তু কষ্ট না করলে কি বিদ্যার্জন হয়?

মাস্টার সুরপ্পাজীর দেওয়া প্রাইমারী স্কুলের সার্টিফিকেটের কাগজখানা ঠাকুরের বেদীর সামনে রেখে পুজো করল নন্‌জম্মা, তারপর সেখানা তুলে মাথায় ঠেকিয়ে দিল ছেলের হাতে। চাটনী আর রুটি বেঁধে দিল সঙ্গে। চেন্নিগরায় ছেলেকে ভর্তি করাতে যেতে রাজি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু যাবার দিন ভোরে চাদরের তলা থেকে বলে উঠল, 'কালকে গেলে হয় না?' কিন্তু পাঁজি দেখে শুভদিন স্থির করা হয়েছে, সেটার পরিবর্তন করা নন্‌জম্মার ইচ্ছে নয়, কাজেই সে নিজেই রওনা হয়ে পড়ল ছেলেকে নিয়ে। ঠাকুরের বেদীতে এবং মা ও দিদিকে প্রণাম করল রামন্না। শুয়ে থাকা মানুষকে প্রণাম করতে নেই, তাই বাবাকে প্রণাম করা সম্ভব হল না। মা-ছেলেতে স্কুলে পৌঁছে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। অভিভাবকের জায়গায় মায়ের স্বাক্ষর নিয়ে আট আনা জমা করে হেডমাস্টার মশাই স্কুলে ভর্তি করে নিলেন রামন্নাকে। স্কুলের অন্য সব ছেলেদের দেখে নন্‌জম্মা বুঝল ছেলেকে একটা লুঙ্গি ও একটা ধুতি কিনে দেওয়া দরকার। মাথার জন্য কালো রংয়ের টুপীও চাই একটা। হাজার হোক এটা মিডল স্কুল, তার উপযুক্ত সাজসজ্জা তো চাই।

দু'খানা লুঙ্গির কমে হবে না, একটা কেচে দেবে তখন অন্যটা পরবে। একজোড়া লুঙ্গি ও একটা টুপী হল অন্ততঃ দু' টাকা। তারপর বই, খাতা, পেন্সিল, রোজকার রুটি চাটনী নিয়ে যাবার জন্য একটা রঙীন থলে, অর্থাৎ প্রায় সাত-আট টাকার ধাক্কা। ঘরে তো নেই এতগুলো টাকা। ছাদের ওপর তৈরী পাতার বাণ্ডিল অবশ্য রাখা আছে। এবার বিয়ের মরশুমে গ্রামের লোকে নন্‌জম্মার কাছ থেকেই পাতা কিনেছে। যা উদ্বৃত্ত ছিল, তোলা আছে ছাদের ওপর। বাড়ি ফিরে নন্‌জম্মা ছাদে উঠে বাণ্ডিলগুলো গুনে দেখল প্রায় একশটা আছে। সাত আনা করে বাণ্ডিল ধরলে মোট হয় চুয়াল্লিশ টাকা বারো আনা। সবগুলো একসঙ্গেই বেচে ফেলতে হবে। কিন্তু মাত্র একশ' বাণ্ডিলের জন্য তিপটুর পর্যন্ত একটা গাড়ি ভাড়া করাটা একেবারেই লাভজনক হবে না। কিন্তু তার যে এখনি টাকার দরকার! সর্বক্কার কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তার কাছেও আশিটা বাণ্ডিল তৈরী আছে। দু'জনে মিলে একটা গাড়ি ভাড়া করলে ভাড়াটা আধা-আধি ভাগ করে দেওয়া যায়। সর্বক্কা জানাল, আগামীকাল কোর্টে কিছু কাজ আছে, রেবন্নাশেট্টী গাড়ি নিয়ে তিপটুর যাচ্ছে। ছই দেওয়া গাড়িতে সে তো একলাই বসে যাবে, পাতার বাণ্ডিল সেই গাড়িতে ভরে দেওয়া যায়।

'পাঠিয়ে তো দেওয়া যায় সর্বক্কা, কিন্তু তোমার স্বামীর স্বভাব তো তুমি জান!'

'সে কথা সত্যি' সর্বক্কাও সায় দিল এ আশঙ্কায়। অবশেষে স্থির হল দু'জনকার তৈরী পাতার বাণ্ডিল নিয়ে ঐ গাড়িতে সর্বক্কাও যাবে এবং পাতা বিক্রী করে টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে আসবে। রামন্নার লুঙ্গি, টুপী, বই-খাতা, থলি ইত্যাদি যা যা কিনতে হবে তার তালিকাও নন্‌জম্মা দিয়ে দিল সর্বক্কার কাছে।

পরদিন সকালে স্বামীর সঙ্গে গাড়িতে তিপটুর চলে গেল সর্বক্কা। পাতা বিক্রী করে নন্‌জম্মার তালিকা অনুযায়ী সব জিনিসপত্র কিনে রাত্রেই আবার গ্রামের পথে রওনা হল তারা। গাড়িতে ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সর্বক্কা। ভোর বেলা বাড়িতে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে দেখে জিনিসগুলো ঠিক আছে কিন্তু ওর গলার সঙ্গে ঝোলানো টাকার

থলিটা নেই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করতে সে উল্টে ওকেই খিঁচিয়ে উঠল, 'সারা পথ ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছিলি, পথে নিশ্চয় কোথাও পড়ে গেছে গলা থেকে, আর কি।' কাঁদতে কাঁদতে সর্বক্কা ছুটে এল নন্‌জম্মার কাছে, খুলে বলল সব কথা। নন্‌জম্মা কি বলবে ভেবে পেল না। নন্‌জম্মার জিনিসগুলো কিনতে খরচ হয়েছে সাড়ে ছ' টাকা। এছাড়া আরো সওয়া আটত্রিশ টাকা পাবে নন্‌জম্মা। ঐ থলিতে সর্বক্কার নিজেরও ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ টাকা।

'আমার গলার এই মাদুলীর দিব্যি করে বলছি নন্‌জম্মা, আমাকে তুমি চোর ভেব না।'

নন্‌জম্মা ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করে তারপর একটু ভেবে বলল, 'সর্বক্কা তুমি যাই বল, টাকা এখনও বাড়িতেই আছে। তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলে, তোমার স্বামীই সেই সময় ওটা সরিয়ে ফেলেছে।'

সর্বক্কার কথাটা সত্যি বলেই মনে হল। বাড়ি এসে স্বামীকে বলল সে, 'টাকা তুমিই নিয়েছ। নন্‌জম্মার টাকাগুলো অন্ততঃ ফিরিয়ে দাও।' একথা শুনেই একেবারে খেপে গেল রেবন্নাশেট্টী। সাক্ষাৎ বীরভদ্রের মত রুদ্রমূর্তিকে সে প্রহার শুরু করল, সর্বক্কার হাড়গোড় চূর্ণ করে ফেলতে বাকি রাখল শুধু। কোর্টে সত্য বলবার শপথ নিয়ে যে সাক্ষ্য দেয় সেই 'ভদ্রলোক' কখনো চোর অপবাদ সহ্য করতে পারে?

এত মার খেয়েও মনে মনে সর্বক্কা যা স্থির করেছিল, সে সঙ্কল্পে অটল রইল। পরদিন সকালে উঠেই সে মেয়ে রুদ্রাণীকে নিয়ে বাপের বাড়ির গ্রাম শিবগেরেতে চলে গেল। বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া সোনার মাদুলী ছিল ওর গলায়। অন্যমনস্কতার দরুনই হোক, অথবা পাপের ভয়েই হোক, কি জানি কেন এটাতে এখনও রেবন্নাশেট্টীর নজর পড়েনি। স্যাকরার দোকানে এটা বিক্রী করে পাওয়া গেল দেড়শ' টাকা। আট টাকা দিয়ে একটা রুপোর মাদুলী গড়িয়ে গলায় পরে দু'দিন বাদে গ্রামে ফিরে এল সর্বক্কা। নন্‌জম্মার প্রাপ্য টাকা তাকে দিয়ে দিল, তারপর বাকি টাকাগুলোও তার কাছেই জমা রেখে বলল, 'ঘরে যখন সব কিছু বাড়ন্ত হবে তখন এসে এ থেকে দু-এক টাকা নিয়ে যাব, এখন তোমার কাছেই রাখা থাক।'

'এতগুলো টাকা কি করে রাখব সর্বক্কা? যদি কিছু হয়ে যায়, আমার কি অবস্থা হবে?'

'একটা হাঁড়িতে ভরে ছাদে পাতার মধ্যে রেখে দাও, ঠিক থাকবে, কেউ জানতে পারবে না।' তাই করল নন্‌জম্মা।

রেবন্নাশেট্টী এরপর আট দিন রাত্রে আর বাড়িতে শুতে আসত না। দিনের বেলা অবশ্য বাড়িতে এসে খুব ঘুমোত।

৩

রামন্না নিয়মিত যাচ্ছে মিডল স্কুলে, কিন্তু পার্বতী এখন বাড়িতেই থাকে। এতদিন তারজন্য কোন চিন্তা ছিল না, কিন্তু এখন নন্‌জম্মা ভাবতে শুরু করেছে। বারো বছর বয়স হল পার্বতীর। মায়ের মতই সে দীর্ঘাঙ্গিনী ও স্বাস্থ্যবতী, তাই বয়েসের তুলনায় বড়ই দেখায় তাকে। বিয়ে তো দিতেই হবে। কিন্তু কে সম্বন্ধ করবে, পয়সা আসবে

কোথা থেকে? এতদিন তো কেবল সংসার চালাবার চিন্তা ছিল, এখন আবার রামন্নার পড়ার খরচের কথাও ভাবতে হচ্ছে। এর ওপর মেয়ের বিয়ে দেওয়া, সে তো আর ছেলে-খেলা নয়? কিন্তু না দিয়েও তো উপায় নেই!

পার্বতী যখন স্কুলে যেত তখন থেকেই মায়ের কাছে অনেক গান শিখেছে। পুজো-পার্বণের দিনে ভাল খাবার-দাবার করতেও নন্‌জম্মা শিখিয়েছে তাকে। এখন তো স্কুলেও যায় না, তাই সারাদিনে সে আজকাল প্রায় দুশ' পাতা বানিয়ে ফেলতে পারে। এদের এখন বাড়ের বয়স, এইসময় একটু ঘি দুধ খাওয়া দরকার। বিশ্বের জন্মের সময় অক্কম্মা যে গরুটি দিয়ে গিয়েছিল, তার বাচ্চা এখন বিইয়েছে। কিন্তু তার যত্ন ঠিকমত হয় না, বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে ভাল করে চরানো হয় না বলে এমন ভাল জাতের গরুও দুধ দিচ্ছে মাত্র তিন পোয়া। এদিকে খেতে বসে দই না পেলেই স্বামী চেঁচাতে শুরু করে দেয়। যেটুকু দুধ বাঁচে, তা থেকে বাচ্চাদের কাকেই বা কতটুকু দেবে? মেয়ে রোজ এত এত পলাশ পাতা ঘাঁটা-ঘাঁটি করে, তারও শরীর গরম হয় ওতে, ছেলে রোজ দশ মাইল পথ হেঁটে স্কুল যাওয়া-আসা করছে, আর ছোটটাও তো ক্রমে বড় হয়ে উঠছে, এদের মধ্যে ঐ-টুকু দুধ কি করে ভাগ করা যায়?

এ বছর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে বর্ষা নামল না। লোকে বলছে জঙ্গলের দিকেও নাকি বৃষ্টি হয়নি, কেবল পশ্চিমে হাওয়া দিচ্ছে। গ্রীষ্মে মাটি একেবারে শুষ্ক, একটা সবুজ ঘাসের ডগা পর্যন্ত চোখে পড়ে না। উপোসী গরুটার দুধ ক্রমশঃ কমতে কমতে শেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। ঘরে একটু মাঠাও আর তৈরী হয় না। খেতের দিকে কেউ আর যায় না। গ্রামে গ্রামে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, এ বছর ফসলের আশা বোধহয় ত্যাগ করতে হবে। শীতকালের বৃষ্টিটা হলে তবে মড়ুয়ার ফসলের আশা করা যাবে। নতুন বছরের খাজনা থেকে নন্‌জম্মা প্রতিবছরের মত এবারও প্যাটেল গুণ্ডেগৌড় এবং অন্য আরো দু'জনের কাছে একশ' টাকা অগ্রিম নেওয়ার রসিদ লিখিয়ে নিল স্বামীকে দিয়ে। কিন্তু বর্ষার অবস্থা দেখে গৌড়জী এবার বললেন, 'দেখ মা, আমার মাটির নিচের গুদামে যা মড়ুয়া আছে তাতে বাড়ির লোকের ও চাকর-বাকরদের এ বছরটা চলে যাবে। কিন্তু খবর পেলাম আমার জম্মেহল্লীর বেয়াই বাড়িতে নাকি একদানাও ফসল নেই। তারা অন্ততঃ চার-পাঁচ খণ্ডি চেয়ে পাঠিয়েছে। মহা চিন্তায় পড়ে গেছি, দেওয়াও মুশকিল, আবার না দিলেও চলে না। এ বছর তোমাকে বরং আমি রসিদ অনুযায়ী টাকা দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু মড়ুয়া তো দিতে পারব না।'

'তা, অন্য কারো কাছে চেয়ে দিয়ে দিন না?'

কুরুবরহল্লীর পাশের গ্রাম নাগেলহল্লীর চিক্কতম্মেগৌড় এখনও তার মাটির নিচের গুদাম খোলেনি। সেটা খোলার খবর পেতেই গৌড়জী সেখান থেকে পাঁচ পল্লা মড়ুয়া কিনে পাঠিয়ে দিলেন। আজকাল দামও বেড়েছে। ষোল টাকা পল্লা, অর্থাৎ টাকায় ছ'সের। গুণ্ডেগৌড়জীর খাজনার অনেকটা পুরো হয়ে গেল ওতেই। বাকি রইল কুড়িটা টাকা। অন্যান্য খুচরো খরচের জন্য সে টাকাটা নগদেই নিল নন্‌জম্মা।

পাঁচজনের পেট ভরানোর জন্য দিনে অন্ততঃ চার সের মড়ুয়ার দরকার। দুধ, মাঠা,

সব্জী, ডাল এসব পরিমাণ মত দিতে পারলে আটার খরচটা কম হয়। কিন্তু যখন কোন উপকরণই নেই, শুধু আটা দিয়েই পেট ভরাতে হবে, তখন দিনে চার সেরের কমে কিছুতেই হয় না। সকাল বেলার জল-খাবারের পাট তুলে দিলে এক সের আটা বাঁচানো যায়, কিন্তু রামন্নার স্কুলের জন্য রুটি করে সঙ্গে দিতেই হবে। তাকে রুটি আর আমলকির আচার দিলেই বিশ্বও না নিয়ে ছাড়বে না। পার্বতীর বাড়ের বয়স, তাকেই বা কি করে না খাইয়ে রাখা যায়? তবু ছেলেপেলেদের ভাগের খাবার একটু কমালেও কমানো যেতে পারে, কিন্তু বাড়ির কর্তার আবদার সামলাবে কে? সকালে উঠেই তাঁর রুটি চাই-ই চাই। না পেলে বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এমন নাটক করতে শুরু করে দেবে যেন যক্ষগানের পালা গাইছে। তাছাড়া উচ্চকণ্ঠে 'রাঁড়, ছেনাল' ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণ তো আছেই। ভোর না হতেই এ বাড়ির কাণ্ড-কারখানা দেখে পাড়ার লোকে হাসাহাসি করবে এটা বাঞ্ছনীয় নয়! তাছাড়া ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে, ওদের কানে এই অকথ্য গালা-গালগুলো যত কম যায় ততই ভাল, তাই নন্‌জম্মা প্রাণপণে সব দিক সামলে চলতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সে বেশ বুঝছে এভাবে চললে এই পাঁচ পল্লা মড়ুয়া চার মাসে শেষ হয়ে যাবে। তারপর আর নতুন করে কেনবার টাকা নেই। সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য প্রচুর পাতা তৈরী ছাড়া আর কোন উপায় নেই, অগত্যা মা-মেয়েতে মিলে দিনে প্রায় চারশ' করে পাতা তৈরী করা আরম্ভ করল। এ বছর মর্দুমশুমারী লেখার কোন কাজই নেই। অনাবৃষ্টিতে সমস্ত শস্যক্ষেত্র শূন্য পড়ে আছে দগ্ধ প্রান্তরের মত, কোথাও ফসলের চিহ্নমাত্র নেই, কিসের মর্দুমশুমারী লেখা হবে? কিন্তু হিসাবের খাতা সেলাই করে তাতে যথাযথভাবে লাল কালির লাইন টেনে, প্রতিটি শীর্ষক লিখে তৈরী করে রাখতে হবে। যে-সব ঘরে কিছু লেখার নেই সেসব জায়গায় অন্ততঃ 'খালি' কথাটা লিখে রাখতে হবে, সরকারী হিসেবের ব্যাপার। নারকেল আর আম বাগানের জায়গায় তো 'খালি' লিখলেও চলবে না। কাজেই সংসারের কাজ আর পাতা তৈরীর কাজের ফাঁকে ফাঁকে হিসাব লেখার কাজটাও চালিয়ে যায় নন্‌জম্মা।

পৌষ-মাঘ মাস আসতে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গরু-বাছুরদের মধ্যেও যেন হাহাকার পড়ে গেল। একফোঁটা খাবার জল নেই কোথাও। মাঠে ঘাস নেই। ফসলই হয়নি তো গরুর খাবার খড় জুটবে কোথা থেকে? যাদের কাছে একটু-আধটু খড় আছে, তারা সেগুলো তুলে রেখেছে ছাদের ওপর, চুরি যাবার ভয়ে। রোজ এক-আধ আঁটি নামিয়ে মেপে মেপে খেতে দিচ্ছে গরু-বাছুরকে। যাদের এটুকুও নেই তাদের গৃহপালিত পশু মরতে বসেছে। নন্‌জম্মা বাছুরগুলো বড় হলেই তাদের বেচে দেয়। এখন রয়েছে দু'টি গরু ও একটি বাছুর, কিন্তু খাদ্যের অভাবে তারা প্রায় মৃত্যুর মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নন্‌জম্মা ভাবছিল এদের নাগলাপুর পাঠিয়ে দেবে কিনা। কিন্তু শোনা যাচ্ছে সেখানেও অবস্থা এই রকমই। দুর্ভিক্ষ শুধু রামসন্দ্র গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়, তুমকুর, হাসান, কোলার ইত্যাদি সমতল ক্ষেত্রের প্রদেশগুলোর কোথাও এবছর বৃষ্টি হয়নি। নার্লোর সমতল ক্ষেত্রের অবস্থা ওরই মধ্যে ভাল, ওদিককার গন্নি, শ্রীনিবাসপুর প্রভৃতি গ্রাম থেকে কেউ কেউ

পঞ্চাশ টাকায় একগাড়ি খড় কিনে এনেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার গিয়ে দেখে ততদিনে একগাড়ি খড়ের দাম হয়ে গেছে পঁয়ষট্টি টাকা। নন্‌জম্মা কি যে করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। একদিন সে গরু দুটো এবং বাছুরটাকে নিয়ে চলে গেল কুরুবরহল্লী, গুণ্ডেগৌড়জীর কাছে গিয়ে বলল, 'গৌড়জী, আমি গোদান করছি এই মনে করে এদের গ্রহণ করুন আপনি। কোন রকমে একমুঠো ঘাস দিয়ে এদের প্রাণ বাঁচান। যদি বেঁচে থাকে ভবিষ্যতে আপনার নাতি-নাতনীরা এদের দুধ খাবে। আমার চোখের সামনে এদের আমি মরতে দেখতে পারব না।'

'কৃষক হয়ে "গোদান" কি করে নেব মা?'

'বেশ তাহলে তিন পয়সা করে মূল্য ধরে দেবেন। আপনাকে বিক্রী করলাম এই-ভাবেই আমি দিয়ে যাচ্ছি। কোন রকমে ওদের প্রাণ বাঁচুক এই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।'

গৌড়জীর কাছেও খড়, ঘাস বিশেষ নেই। তিনি বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ, সারা বছরের উপযুক্ত রসদ তাঁকে মজুত রাখতে হয়। আগামী বছরও যদি বরুণদেব এইভাবে লুকোচুরি খেলেন, তখন কি অবস্থা হবে? কিন্তু আগামী বছরের অনিশ্চয়তার কথা ভেবে, এখন নন্‌জম্মার মত মেয়ের আবেদন তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন কি করে? শুধু তো পাটোয়ারী-গৃহিণীর অনুরোধ নয়, তিনটি প্রাণীর জীবনের প্রশ্নও এতে জড়িত। 'ঠিক আছে, আমি এদের রাখব। দানও নয়, বিক্রীও করতে হবে না। পরে বাছুরটা আমাকে দিও, ধপধপে সাদা, খাসা দেখতে।'

নিশ্চিন্ত হয়ে গ্রামে ফিরল নন্‌জম্মা। রামসন্দ্র গ্রামের বেশ কয়েকটি গরু মারা গেছে, যেগুলো বেঁচে আছে তাদের অবস্থাও ভাল নয়।

মা-মেয়েতে মিলে হাত চালিয়ে পাতা তৈরী করার ফলে এ বছর অগ্রহায়ণ মাসেই সমস্ত পাতা তৈরী হয়ে গেল। এদিকে ভাঁড়ারে মড়ুয়াও শেষ। আটা রাখার পাত্রগুলো সব খালি পড়ে আছে। ছাদে উঠে গুনে দেখা গেল প্রায় তিরিশ হাজারেরও বেশী তৈরী পাতা জমেছে। এখন পাতারও দাম বেড়েছে নিশ্চয়। সব জিনিসপত্রেরই দাম বাড়ছে, পাতাই বা বাদ যাবে কেন? আট আনায় একশ' হিসেবে বিক্রী হলেও প্রায় শ'খানেক টাকা হবে। দুটো গাড়িতে পাতা বোঝাই করে সর্বক্কা ও রামন্নাকে সঙ্গে নিয়ে নন্‌জম্মা নিজেই তিপটুর চলে গেল। সর্বক্কারও ছ' হাজার পাতা রয়েছে। এত পাতা একসঙ্গে দেখে কঞ্জুস ব্যবসায়ী শেট্টী বলল, 'দুর্ভিক্ষ তো সর্বত্রই, খাবারই নেই তা পাতা আর কে কিনবে? তা এনেছেন যখন, নিয়ে নিচ্ছি, তবে চার আনা শ'-এর বেশী দাম দিতে পারব না।'

'সে কি কথা শেট্টীজী। কত কষ্ট করে পাতা তুলে বয়ে আনি, তারপর শুকিয়ে গেঁথে তৈরী করে নিয়ে আসি, এত মেহনতের দাম মোটে চার আনা, এটা কি ধর্ম হল?'

'ধর্ম অধর্ম জানি না। চাও তো অন্য জায়গায় খোঁজ নিয়ে দেখতে পার।'

অন্য দোকানে জিজ্ঞাসা করতে তারা বলল তিন আনার বেশী দেবে না। অগত্যা চেনা দোকানেই দু'গাড়ী পাতা বিক্রী করে দু'জনে হিসেব মত টাকা বুঝে নিল। গাড়ী ভাড়ার নন্‌জম্মা দিল সাড়ে তিন টাকা আর সর্বক্কা দিল দেড় টাকা। নন্‌জম্মা নিজের ও মেয়ের

জন্য তিন টাকা করে দু'খানা শাড়ী, রামন্নার একটা সার্ট এবং বিশ্বর জন্য সার্ট ও প্যান্ট কিনল। এইসব কেনাকাটা করে হাতে রইল মাত্র সাঁইত্রিশ টাকা। রুটি সঙ্গে করে আনা হয়েছিল, তাই খেয়ে আবার গ্রামের দিকে রওনা হল তারা। এক পল্লা মড়ুয়ার দর এখন কুড়ি টাকা, কাজেই এই সাঁইত্রিশ টাকার মড়ুয়াতে কদিন চলবে?

৪

এরই মধ্যে আবার দেখা দিল প্লেগ মহামারী। এবার ঝুড়ি মাথায় করে কেউ মারী মাতার পুজো নিতে এল না। আগে থেকে কোন সংকেতই পাওয়া গেল না। একেবারে আচমকা এই সংক্রামক রোগ গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যু ঘটাতে শুরু করল। আশে-পাশের গ্রাম থেকেও ইঁদুর মরার খবর আসছে। কিন্তু কোথাও কোথাও এবার ইঁদুর মরার খবর ছড়াবার আগেই মানুষ মরতে আরম্ভ করেছে। রামসন্দ্র গ্রামেও কিছু লোকের গাঁট ফুলে উঠেছে। সবাই দেখতে দেখতে গ্রাম খালি করে ফেলল। যাদের নিজেদের বাগান আর খেত আছে তারা সবাই সেখানে গিয়ে কুঁড়ে বেঁধেছে। নন্‌জম্মা, গঙ্গম্মা, সর্বক্কা প্রভৃতি যাদের জমি-জমার বালাই নেই তারা গিয়ে আশ্রয় নিল গ্রামদেবীর মন্দিরে।

নতুন বছরেও বৃষ্টি হয়নি এখনও। তবু পলাশ গাছে নতুন পাতা বেরিয়েছে বটে কিন্তু সেগুলো তেমন ভাল নয়। পুরোন পাতা তো এখন চামড়ার মত শক্ত হয়ে গেছে। সেগুলো ঠিকমত গাঁথাও যায় না। বসে বসে কিই বা করা যায়। পাতা বেচা টাকায় যে মড়ুয়া কেনা হয়েছিল তাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর তিন দিন পরে হয়ত উনুনই জ্বলবে না। লোকে রাত্রে অন্যের বাগানে ঢুকে কাঁচা-পাকা ডাব, নারকেল যা পাচ্ছে চুরি করে খেতে শুরু করেছে। বাগানের মালিকরা তাই দেখে বাগানে পাহারা বসিয়েছে, কিন্তু তাদের ওপরও পাথর পড়ছে রাত্রে। প্রাণের ভয়ে পাহারাদাররা পাহারা দেওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। পেটের জ্বালা শান্ত করার আর কোন উপায় যাদের নেই তাদের বাড়ির সোনা, রুপো এখন রোজই এসে উঠছে কাশিমবদ্দির সিন্দুকে। দেখতে দেখতে তামা, পিতলের বাসন-কোসনও মহাজনের কাছে বাঁধা পড়তে শুরু হল।

নন্‌জম্মার ভাঁড়ারে মড়ুয়া শেষ হয়ে গেছে। সেদিন সকালে রামন্না উপোস করেই স্কুলে চলে গেল। ওদের স্কুলটা কম্বনকেরে গ্রামের বাইরে। প্রায় দু ফার্লং দূরে একটা উঁচু টিলার ওপর, কাজেই স্কুলটা বন্ধ করার দরকার হয়নি। লেখাপড়ায় রামন্নার খুব মন। বইয়ের নতুন পড়া সে আগে থেকেই পড়ে রাখে। অঙ্কের বইয়ে প্রত্যেক অধ্যায়ের শুরুতে উদাহরণস্বরূপ যেসব অঙ্ক কষা থাকে সেগুলো দেখেই সে নতুন অধ্যায়ের অঙ্ক ক্লাসের আগেই কষে ফেলে। ইংরেজী বইয়ের প্রথম ভাগখানাতো মুখস্থ হয়ে গেছে। স্কুল কামাই সে করে না কখনো, স্কুলে না গেলে ভালোই লাগে না তার। আজ সকালে খাওয়া হয়নি, তার ওপর পাঁচ মাইল পথ হাঁটা, স্কুলে গিয়ে ক্ষুধার জ্বালায় বেচারা চোখে অন্ধকার দেখছিল। দুপুর দেড়টার সময় সব ছেলেরাই নিজেদের কুঁড়েতে চলে গেল খাওয়া-দাওয়া সারতে। রামন্না স্কুলের পেছন দিকে গাছতলায় বসে রইল চুপ করে।

ছেলেটা না খেয়ে স্কুলে গেছে একথা ভেবে নন্‌জম্মার মনে এতটুকু শান্তি নেই। পার্বতী মুখ শুকিয়ে বসে রয়েছে একপাশে আর বিশ্ব খাওয়ার বায়না নিয়ে মায়ের আঁচল ধরে টানাটানি করছে। একদিন-দুদিন হয়ত উপবাস সম্ভব, কিন্তু কদিন চলতে পারে এভাবে? কাশিমবদ্দির কাছে এ পর্যন্ত নন্‌জম্মা একটাও বাসন বাঁধা দেয়নি। যে বাসনের দাম কুড়ি টাকা তারজন্য কাশিমবদ্দি দেবে মাত্র দু' টাকা। মড়ুয়ার দাম রোজই বাড়ছে। এখন টাকায় দু'সের, অর্থাৎ দু' টাকায় পাওয়া যাবে মাত্র চার সের, তাতে টেনে-টুনে চলবে বড় জোর দেড় দিন। তারপর আবার বাঁধা দিতে হবে আর একটা বাসন। এইভাবে তো পনের-কুড়ি দিনের মধ্যেই বাড়ি খালি হয়ে যাবে, কিন্তু তারপরও তো উপবাসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা নেই! অবশ্য এই দুর্ভিক্ষ চিরকাল থাকবে না, আবার মড়ুয়ার ফসল ফলবে কিন্তু ঐ বাসন আর কেনা যাবে না। তাছাড়া, এসবই তো সেবারে অক্কম্মার এনে দেওয়া বাসন।

সারাদিন ধরে এইসব চিন্তাই মাথার মধ্যে ঘুরছে নন্‌জম্মার। কিন্তু মাথা আর পেটের মধ্যে দূরত্ব যে অনেকখানি। পার্বতী ঘুমিয়ে পড়েছে, কেঁদে কেঁদে অনেকক্ষণ বায়না করে এখন বিশ্বও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তারও পেটের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে। বাড়ির কর্তা সকাল থেকেই উধাও, হয়ত গেছে নিজের মায়ের কাছে, সেখানে নিশ্চয় পেট ভরাবার মত জুটে গেছে কিছু। গঙ্গম্মার মড়ুয়া এখনও শেষ হয়নি। ওরা তো মা আর ছেলে দুটি মাত্র প্রাণী, তাছাড়া বহুদিন থেকে জমানো মড়ুয়া ছিলই গঙ্গম্মার ভাঁড়ারে। গত তিন মাসে সে দুবার বহুদূর ঘুরে ভিক্ষা করে এনেছে। যেসব এলাকায় খাল কেটে সেচ ব্যবস্থা আছে সেই অঞ্চল থেকে বস্তা ভরে চাল নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু রামন্না যে এখনও স্কুল থেকে ফিরল না? অন্ধকার হয়ে এসেছে। খালি পেটে ছেলেটা কোথাও মাথা ঘুরে পড়ে যায়নি তো? কম্বনকেরের পথে একটু এগিয়ে দেখা উচিত। কিন্তু একা মেয়েমানুষ অন্ধকারে যাওয়া ঠিক না। এদিকে পার্বতীরও উপোস করে এখন হাঁটবার শক্তি নেই। তাছাড়া ওকে সঙ্গে নিলে বিশ্বকে এই কুঁড়েতে একলা রেখে যেতে হবে। অন্ধকারে কুঁড়ের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কোথাও যাওয়া উচিত নয়, কেউ এসে বাসনগুলো চুরি করে নিতে পারে। যা দিনকাল পড়েছে, সব কিছুই চুরি হচ্ছে এখন। কি যে করা যায় ভেবে পাচ্ছিল না নন্‌জম্মা।

শেষ পর্যন্ত পার্বতী আর বিশ্বকে বাড়িতে রেখে বেরোল সে, ছেলেমেয়েদের বলল, 'এই পুকুর পাড় পর্যন্ত যাচ্ছি।' কম্বনকেরের রাস্তায় প্রায় তিন ফার্লং যাবার পর একটা আম গাছ আছে বহুকালের পুরোন, তার কোটরে অনেক প্যাঁচার বাসা। রাত্রে প্যাঁচার ডাক ওদের কুঁড়েঘরেও শোনা যায়। প্যাঁচার ডাক নাকি ভারি অলক্ষণ। কোন বাড়ির ছাদে বসে যদি প্যাঁচা ঐ অলুক্ষণে ডাক ডাকে তাহলে নাকি বাড়িতে কোন শিশুর মৃত্যু হয়। বয়স্ক লোক মারা গেলে তাকে দাহ করা হয় কিন্তু শিশুর মৃত্যু হলে তাকে পুঁতে ফেলা হয়। লোকে বলে, ব্রাহ্মণের বাড়িতে বসে প্যাঁচা ডাকলে সে বাড়ির ছেলে মরে আর অন্য জাতের ঘরের ছাদে প্যাঁচা ডাকলে পরিবারের যে কোন লোকের মৃত্যু ঘটতে পারে। ঐ গাছটার তলায় যেতে খুবই ভয় করছে নন্‌জম্মার, একবার মনে হল ফিরে

যায়। কিন্তু তাহলে দশ বছরের ছোট্ট ছেলে রামন্না কি করে আসবে ঐ গাছটার তলা দিয়ে?

না পারে ফিরতে, না পারে সামনে এগোতে, কোন মতে আর একটু গিয়ে, যে পথ দিয়ে রামন্নার আসার কথা সেইদিকে চেয়ে একটা বড় পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে রইল সে। আধ ঘন্টা কেটে গেল ছেলের এখনও দেখা নেই। নন্‌জম্মার বেশ ভয় করতে লাগল এবার। মনে পড়ল রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী, চন্দ্রমতী এমন করেই ছেলে রোহিতাশ্বের পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ওদিকে রোহিতাশ্ব তখন সাপের কামড়ে প্রাণ হারিয়ে পড়ে আছে। যখন তার সঙ্গীরা গিয়ে খবর দিল তখন চন্দ্রমতী না জানি কেমন করে কেঁদে উঠেছিল। ভাবতে ভাবতে নিজেই কেঁদে ফেলল নন্‌জম্মা। কম্বনকেরের পথে তো কেয়া গাছের জঙ্গল, কব্বল্লীর টিবিটার ওপারে বল্মীক টিলার পাশ দিয়েই পথ। সারা টিলাটা কেয়া ঝোপে ভরা। সবাই বলে, পাশের নালা থেকে ব্যাঙ ধরতে কেয়া ঝোপের সাপগুলো নিচে নেমে আসে। ছেলেটা সেই রকম কোন সাপকে মাড়িয়ে ফেলে যদি? কিম্বা, ধর, কেয়া ঝোপের মধ্যে থেকে সাপ মুখ বাড়াচ্ছে দেখে ছেলেটা যদি তার দিকে ঢিল ছুঁড়ে বসে তাহলে? হে ঠাকুর, এমন সর্বনাশ যেন না হয়। না না, রামন্না তো বুদ্ধিমান ছেলে, সে অমন করবে না কখনো। ও রকম দুষ্টুমী করা বরং বিশ্বর স্বভাব।

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে বেশ কিছুক্ষণ পথের ওপর দাঁড়িয়ে রইল নন্‌জম্মা। তারপর মনে হল কুঁড়েতে ফিরে গিয়ে কোন পুরুষ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজতে বেরোন উচিত। স্বামীর তো দেখা নেই সেই দুপুর থেকে। বাড়ির দিকে ফিরেও সে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, বার বার তাকাল পথটার দিকে। যে জায়গাটায় ও দাঁড়িয়ে আছে সে জায়গাটা ভাল নয়। এই পাথরটার পাশেই তিন বছর আগে চন্নেনহল্লীর প্যাটেল শিদ্দেগৌড় খুন হয়েছিল। লোকে বলে তাকে পাথরের ওপর ফেলে মাথায় পাথর মেরে মেরে খুন করেছিল আর আজও নাকি শিদ্দেগৌড়ের প্রেতাত্মা এই পাথরের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়। একবার তিপটুর থেকে গরুর গাড়িতে করে ফেরার পথে কারা যেন তার কান্নার শব্দও শুনেছিল।

ভয়ে সারা শরীর কাঁপছিল নন্‌জম্মার। ফিরে যাবে ভাবছে, কিন্তু ছেলে যে এল না এখনও! 'আমারই এত ভয় করছে, দুধের ছেলে একলা আসবে কি করে?' কথাটা মনে হতে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সে। কিন্তু অন্ধকারে এখন আর বেশী দেখাও যাচ্ছে না।

লোকে বলে ভূত, পিশাচেরা এক জায়গায় থাকতে পারে না, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়! হঠাৎ তার মনে হল কম্বনকেরের নির্জন পথে ছেলেটাকে একলা পেয়ে ভূতে ধরেনি তো? কিন্তু জোর করে ওসব ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলল নন্‌জম্মা, নিজের মনেই বলল. 'ভূত-প্রেত, পিশাচ ওসব কিছু নেই। আমার বাবা আর কল্লেশ গভীর অন্ধকার রাতে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল ঘোরাঘুরি করেছে কতবার। পিশাচ থাকলে কি তাদের কিছু না করে ছেড়ে দিত?' এসব কথা মনে হতে কিছুটা ভরসা হল বটে কিন্তু তবু একথাও মনে হতে লাগল যে রামন্না তো একটা নিতান্ত বাচ্চা ছেলে। ভয়কে কিছুতেই তাড়াতে পারল না মন থেকে।

এতক্ষণে দেখা গেল কে যেন আসছে। কিন্তু যে আসছে তার মাথায় মস্ত একটা পুঁটলি। স্কুল ফেরত ছেলের মাথায় তো কোন বোঝা থাকার কথা নয়! তাহলে ও রামন্না নয়, অন্য কেউ হবে। কিন্তু যে আসছিল সে হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে পাশের বাগানের মধ্যে নেমে পড়ল, তারপর যেন ভয় পেয়েছে এমনভাবে দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করে দিল। সাহস সঞ্চয় করে নন্‌জম্মা ডাকল, 'কে যায়?' কোন উত্তর এল না। আবার ডাকল সে, 'কে যাচ্ছ ওদিকে?' এবার মানুষটি দাঁড়িয়ে গেল, তারপর বলে উঠল, 'কে? মা?' এতক্ষণে নন্‌জম্মা বুঝল, রামন্নাই বটে!

'হ্যাঁরে, আমি! তুই পথ ছেড়ে ঐ জঙ্গলে ঢুকছিলি কেন রে?'

এবার কাছে এল রামন্না। তার মাথার পুঁটলিতে রয়েছে বড় বড় কাঁঠাল। লুঙ্গিটাকে থলির মত করে তারমধ্যে খেজুর পাতা বিছিয়ে তাইতে করে কাঁঠাল বয়ে এনেছে।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছিলি তুই?' মা আবার প্রশ্ন করে।

'দূর থেকে পাথরের কাছে কালো মতন কি দেখা যাচ্ছিল। ঐখানেই চন্নেনহল্লীর শিদ্দেগৌড় খুন হয়েছিল না? সবাই যে বলে ঐখানে তার ভূত আছে? আমি তো ভূত দাঁড়িয়ে আছে ভেবে ওদিকে পালাচ্ছিলাম। ওটা তুমি, তা কি করে বুঝব?'

'তা এগুলো আনলি কোথা থেকে? দে আমাকে দে, আমি নিয়ে যাচ্ছি', ছেলের মাথা থেকে বোঝাটা নিজের মাথায় তুলে নেয় সে।

'রাস্তায় গৌডনকোপ্পলা পড়ে না? সেখানে একটা বাগানে অনেক কাঁচা কাঁঠাল দেখেছিলাম। আজ ইচ্ছে করেই স্কুল থেকে অন্ধকার হবার পর বেরিয়েছি। একপাশের বেড়া টপকে চুপিচুপি ঢুকে তিনটে কাঁঠাল পেড়ে নিলাম। খেজুর পাতা তুলে থলির মধ্যে বিছিয়ে তার ওপর রেখে নিয়ে এলাম। রান্না করে খেলে বেশ পেট ভরবে, না মা?'

ছেলের সাহস আর বুদ্ধি দেখে কি বলবে ভেবে পেল না নন্‌জম্মা। সে ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের শিখিয়েছে চুরি করা, মিথ্যা বলা, এসব পাপ কাজ। কিন্তু এখন ছেলেকে সেসব বোঝাবার সময় নয়। দুজনে দ্রুতপায়ে চলল বাড়ির দিকে। বাড়িতেও অভুক্ত আছে ছেলেমেয়ে। রামন্না দশ মাইল পথ হেঁটেছে খালি পেটে। আজ এই কাঁচা কাঁঠালের তরকারীতেই পেট ভরবে সবার।

নন্‌জম্মা ফিরে এসে দেখল গৃহকর্তা বাড়িতে ফিরে নিজের বিছানাটি পেতে নাক ডাকাচ্ছেন। খাওয়া-দাওয়া নিশ্চয় হয়ে গেছে না হলে এমন আরামে নাক ডাকত না। কথাটা রামন্নারও বুঝতে দেরী হল না, কিন্তু এ নিয়ে কেউ কোন কথা বলল না, তাকে ডাকলও না কেউ। ওদিকে পার্বতী আর বিশ্ব গুটিসুটি মেরে ঘুমোচ্ছে। নন্‌জম্মা তাড়াতাড়ি কাঁঠালগুলোর খোসা ছাড়িয়ে টুকরো করে রান্না চড়াল, উপকরণের মধ্যে তো শুধু লঙ্কার গুঁড়ো। রান্না হচ্ছে, এমন সময় রামন্না জিজ্ঞাসা করল, 'মা, কৃষকদের বাড়ির রুটি খেলে কি হয়?'

'কেন বল্‌তো?'

'দুপুরে তো খাবার কিছু ছিল না, গাছতলায় চুপ করে বসেছিলাম, এমন সময় আমার একজন বন্ধু এল। কেঙ্গলাপুরের নরসেগৌড়, তার কাছে বাড়তি রুটি ছিল। আমি খাচ্ছি না কেন জিজ্ঞাসা করল, আমি কিন্তু কিছু বলিনি। ও নিজে থেকেই বলল, "আমার

রুটি খেয়ে নে, কিচ্ছু হবে না, আমি কাউকে বলব না। নে খেয়ে নে।" আমাকে একটা রুটি আর তিলের চাটনী দিল, বেশ মোটা রুটি। আমি খেয়ে ফেলেছি। ও আমার হাতে হাত রেখে শপথ করেছে কাউকে বলবে না।'

মা কিছু বলল না। রামন্না আবার জিজ্ঞাসা করল, 'বল না মা, আমার কি পাপ হয়েছে? ঠাকুর কিছু করবেন না তো?' এবার মা জবাব দিল, 'বিশ্ব কি মহাদেবায়াজীর থালায় খায় না কখনো?'

'ও তো ছেলেমানুষ, আমি তো বড় হয়ে গেছি?' ছেলের প্রশ্নের কি উত্তর দেবে বুঝতে পারে না নন্‌জম্মা। যে কাজে শিশুর পাপ হয় না তাতে বড়দেরই বা পাপ হবে কেন? তার নিজের মনেই এ জিজ্ঞাসা জেগেছে। রামন্না আর কিছু জানতে চাইল না। কাঁঠালের টুকরো সিদ্ধ হয়ে গেছে, নুন দিয়ে এবার নামিয়ে নিল নন্‌জম্মা। ডেকে তুলল পার্বতী আর বিশ্বকে, বলল, 'কাঁঠালের তরকারী খাবি তো ওঠ।' স্বামীকে জিজ্ঞাসা করায় সে প্রায় ঘুমের ঘোরেই জবাব দিল, 'আমার কিছু চাই না।' সেই তরকারী এমন অমৃতের মত লাগল যে পেট ভরে আহার করল মা আর ছেলেমেয়েরা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে মা ছেলেকে বলল, 'আর কখনও সেই বাগানে ঢুকো না কিন্তু। চুরি হয়েছে বুঝতে পারলেই তারা এবার চোর ধরার জন্য পাহারায় থাকবে।'

৫

দুর্ভিক্ষের হাহাকার প্রতিদিনই বেড়ে চলছে। লোকেও নানা রকম উপায় খুঁজে বার করছে পেটের জ্বালা শান্ত করতে। জলাশয় শুষ্ক, তার চারপাশের কালো মাটি ফেটে ফুটিফাটা হয়ে রয়েছে। কোলিমাটা একদিন কি করে টের পেল ঐ মাটির তলায় আছে শতমূলীর কন্দ, সে একদিন খুঁড়ে কিছুটা তুলে আনল। ব্যস, তারপর সারা গ্রামের মানুষ গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল জলাশয়ের তীরে। সবাই মাটি খুঁড়তে শুরু করল। এদিক-ওদিক থেকে পাওয়া যেতে লাগল বুড়ো আঙ্গুলের মত মোটা মোটা কন্দ। একজন লোক যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোঁড়াখুঁড়ি করে তো অন্ততঃ জনচারেকের পেট ভরার মত কন্দ সংগ্রহ করতে পারবে। ঝুড়ি আর কোদাল নিয়ে নন্‌জম্মা এবং পার্বতীও চলল জলাশয়ের তীরে। পাতা তৈরীর বদলে এ আর এক নতুন রকম কাজ। কিন্তু মাথায় শাড়ীর আঁচল ঢেকে কাজ করলেও সমস্ত দিনের কড়া রোদে শরীর যেন ঝলসে যায়। প্রথম দিন কন্দ তুলে এনে কুয়োর জলে ভাল করে রগড়ে ধুয়ে নুন-লঙ্কা দিয়ে সেদ্ধ করে খেতে গিয়ে দেখা গেল বেশ দুর্গন্ধ। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাই শেষ পর্যন্ত সেই দুর্গন্ধ তরকারীও এতটুকু আর অবশিষ্ট রইল না। মা-মেয়েতে স্থির করল আগামীকাল সূর্যোদয়ের আগেই পুকুরধারে পৌঁছে যেতে হবে।

পরদিন সকালে ওদের সঙ্গে সর্বক্কাও জুটে গেল। তিনজনে মিলে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একসময় নন্‌জম্মা বলে উঠল, 'মহাদেবায়াজী গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন, সেই পাপেই আজ আমাদের এই দশা। এইজন্যই বলে সাধুসন্তের মনে কষ্ট দিতে নেই।'

'কতকগুলো পাজী লোকের বাজে কথার ফলে সারা গ্রামের এই অনিষ্ট হল।'

'সবাই বলে তোমাদের জাতের লোকেরাই ঐসব বলেছিল।'

'তাও তো তুমি ভেতরের কথাটা জান না নন্‌জম্মা। আর কেউ নয়, এই আমার বাড়ির কর্তাটিই জাতের সবাইকে ঐ কথা বলার জন্য উস্‌কে ছিলেন। অমন উকিলী বুদ্ধির প্যাঁচ দেওয়া কথা অন্যদের মাথায় আসবে কেন?'

'আমার কিন্তু মনে হয় উনি আবার ফিরে আসবেন। মন্দিরে এখনও ওঁর মড়ুয়া, ডাল, লঙ্কা সব পড়ে রয়েছে। সে ঘরের চাবিও আছে ওঁর কাছে।'

সর্বক্কা আরো সাত-আট দিন ওদের সঙ্গে কন্দ খুঁড়তে এল। তারপর এক সন্ধ্যায় চুপিচুপি নন্‌জম্মার কুঁড়েতে এসে সে দিয়ে গেল পাঁচ সের মড়ুয়া আর এক সের চাল। বলল, 'কাউকে বোল না যেন, আমার কর্তা শুনছি নাকি কোর্টের কাজে তিপটুর গিয়েছিল, কিন্তু বাড়িতে নিয়ে এসেছে দু বস্তা মড়ুয়া, পঁচিশ সের চাল, কফির বীজ আরো কি কি জিনিস।'

এই মড়ুয়াটুকু খুব হিসেব করে খরচ করলে ক'দিন অন্ততঃ রামন্না আর বিশ্বকে স্কুলে যাবার সময় রুটি করে দেওয়া যেতে পারবে। কন্দ খেয়ে খেয়ে তো পেটের মধ্যে জ্বালা করছে। একটা দিন অন্ততঃ ভাত রেঁধে তেঁতুলের ঝোল দিয়ে তৃপ্তি করে খাবে সবাই। সর্বক্কার এই সহানুভূতি দেখে ভারি খুশি হল নন্‌জম্মা। রেবন্নাশেট্টীর যতই দোষ থাক, প্রয়োজনের সময় বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করে অন্ততঃ। কোর্টে কোন মক্কেলকে কথার মার-প্যাঁচে ফাঁসিয়েছে নিশ্চয়, না হলে দু বস্তা মড়ুয়া, পঁচিশ সের চাল, কফি এসবের পয়সা জুটল কোথা থেকে? কিন্তু যথেষ্ট রোজগার করেও তো সংসারটাকে ডোবাতে বসেছে— এইসব ভাবতে ভাবতে মড়ুয়া পিষতে বসল নন্‌জম্মা।

পাঁচ-ছ' দিন পরে একদিন গ্রামের বেণে, কৃষক, মেষপালক ইত্যাদি বিভিন্ন জাতের দলপতিদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। গ্রামের অনেকেই জানত মন্দিরে মহাদেবায়্যজীর ঘরে বেশ কিছুটা মড়ুয়া, ডাল ইত্যাদি রাখা আছে। নন্‌জম্মা বিশেষ কিছু না ভেবেই কথাটা সর্বক্কার কাছে উল্লেখ করেছিল। সর্বক্কা আবার সেটি বলেছে গিয়ে নিজের স্বামীর কাছে। বোধহয় সে চাইছিল, ঐ জিনিসগুলো যদি তার ভাঁড়ারে এসে যায় তো বড় ভাল হয়! এসব কাজে রেবন্নাশেট্টীর পটুত্ব অসাধারণ। সে ঠিক করে ফেলল মন্দিরে গিয়ে তালাটা ভেঙে একদিন সব কিছু নিয়ে চলে আসবে। কিন্তু গ্রাম এখন জনশূন্য, সবাই তো গ্রামের বাইরে কুঁড়েতে, এ অবস্থায় গ্রামে ঢুকতেও ভয় করছে। এখন তো মহামারীর দেবী সারা গ্রামে ঘুরছেন, এসব কাজ আবার রাত্রের অন্ধকার ছাড়া করাও চলবে না। মন্দিরের দেবতার বেদীর সামনের উঠোনে ঢুকে তবেই তালা ভাঙতে হবে। দেবী তো স্বয়ং মহাদেবের পত্নী পার্বতীরই আর এক রূপ—তাই তো বলে লোকে—তা এভাবে তাঁরই মন্দিরে ঢুকে চুরি করলে দেবী নিশ্চয় রুষ্ট হবেন, হয়ত রক্তবমি করে মরতে হবে! কিন্তু ওখানে রাখা ফসলের দানাগুলোর লোভও ছাড়া কঠিন। এসব কাজে একজনের জায়গায় দুজনে মিলে করলে অনেকটা সাহস বাড়ে, তাই রেবন্নাশেট্টী শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনাটা বন্ধু পুট্টন্নশেট্টীর কাছে খুলে বলল। পুট্টন্নশেট্টী আবার সেই রাত্রেই

কথাটা চুপিচুপি বলে ফেলল নিজের স্ত্রীকে। এইভাবে দেখতে দেখতে বেণে পাড়ার সবাই জেনে গেল ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত কথাটা এই দাঁড়াল যে, 'মহাদেবায়াজী আমাদেরই স্বজাতীয়, সুতরাং তার জমা করা শস্য আমরাই ভাগ করে নেব।' দেখতে দেখতে এ খবর পৌঁছে গেল গ্রামের অন্য সব পাড়ায় কৃষক, তাঁতী, জেলে সবাইকার কানে। সবাই বলতে শুরু করল, 'অইয়াজীতো কেবল বেণেদের ঘরেই ভিক্ষা করতেন না, আমরা সবাই তো তাঁকে ভিক্ষা দিয়েছি। সুতরাং ঐ ফসলের ভাগ আমাদেরও পাওয়া উচিত।' প্রথমে এই নিয়ে বচসা এবং তারপর মারামারিও হয়ে গেল। অবশেষে প্যাটেল শিবেগৌড় মীমাংসা করল যে সবাইকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে ঐ মড়ুয়া। একথা মেনে না নিয়ে উপায় ছিল না। প্রত্যেকে দু' সের করে মড়ুয়া পাবে এই ভাণ্ডার থেকে।

একদিন দুপুরবেলা সব পরিবার থেকে একজন করে লোক নিয়ে একটি দল গিয়ে ঢুকল গ্রামে। মন্দিরে গিয়ে দেখা গেল মহাদেবায়াজীর ঘরের দরজার তালাটি অদৃশ্য হয়েছে। ঘরের মধ্যে মড়ুয়ার বস্তা, ডালের থলি বা লঙ্কার হাঁড়ি কোন কিছুরই চিহ্নমাত্র নেই, শুধু পড়ে রয়েছে এল্যুমিনিয়মের বাসনগুলো।

'আরে, এর মধ্যেই কোন্ ব্যাটা এসে সব ঝেড়ে দিয়েছে!' সবাইকার মনেই প্রশ্নটা উঠল কিন্তু কাজটা কে যে করেছে তা বোঝার কোন উপায় নেই। হতাশ হয়ে সবাই ফিরে এল যে যার আস্তানায়।

জলাশয়ের তীরের শতমূলী শেষ হয়ে গেছে। আশেপাশের মাঠের এক আঙুল জায়গাও বাকি নেই, সমস্তটা লোকে খুঁড়ে ফেলেছে। এর মধ্যে শোনা গেল কেউ কেউ নাকি কেয়া ফুলের ঝোপের শেকড় তুলে সিদ্ধ করে খাচ্ছে, সেগুলোও নাকি শতমূলীর মতই খাওয়া চলে। সুতরাং এবার লোকে গ্রামের আশেপাশের সমস্ত কেয়া ঝোপ নির্মূল করতে লেগে গেল। শতমূলের কন্দ তো মাটি খুঁড়ে অনেক সন্ধান করে বের করতে হয়, কেয়া ঝোপের মোটা মোটা শেকড় সহজেই পাওয়া যায় তাই গ্রামের মানুষ বেশ পেট ভরে এই নতুন খাদ্যটি খেল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকেই তাদের দাস্ত শুরু হল। একেই উপবাস চলছিল, তার ওপর পেটের অসুখ সহ্য হল না অনেকেরই, ষোলজন মারা গেল শেষ পর্যন্ত। কেয়া গাছের শেকড় পেটে সহ্য হবে না বুঝে লোকে ওগুলো সংগ্রহের চেষ্টা ত্যাগ করতে বাধ্য হল।

৬

একদিন পার্বতী, নন্‌জম্মা ও সর্বক্কা পুকুরের ধারে শতমূলী খুঁজছে, হঠাৎ পার্বতীর ভীষণ মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হল। মাথায় আঁচল তুলে দিয়েও সে রোদে আর দাঁড়াতে পারছে না দেখে সর্বক্কা বলল, 'তুই বাড়ি চলে যা মা, আমি আর নন্‌জম্মা যাচ্ছি একটু পরে।' নন্‌জম্মাও সায় দিল এ কথায়, কাজেই পার্বতী ফিরে চলল বাড়ির পথে।

গরমে ফেটে ওঠা পুকুর পাড়ের মাটির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের কাছে এসে দেখা হয়ে গেল নরসীর সঙ্গে। পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করল সে, 'শতমূলী খুঁজতে গিয়েছিলে বুঝি?' পার্বতী বলে, 'আমার মাথা ব্যথা করছে তাই না তুলেই চলে এলাম।'

'চলো, আমার দোকানে চলো, একটু ছোলা দিচ্ছি, খেয়ে নাও।'

পার্বতী কোন উত্তর দিল না এ কথার, চুপচাপ নিজেদের কুঁড়ের দিকে এগিয়ে গেল। নরসী আবার বলল, 'লজ্জা কিসের? আমাদের ঘরের ছোলা খেলে কিচ্ছু হবে না।' ইতিমধ্যে দিদিকে দেখে বিশ্ব এসে হাজির হয়েছে সেখানে। ছোলার নাম শুনেই সে বায়না শুরু করেছে, 'চল না দিদি, ছোলা নিয়ে আসি।' অগত্যা দু'জনে এল দোকানে, নরসী দু'জনের হাতে দু মুঠো করে ভাজা ছোলা ও এক টুকরো করে গুড় দিল। বিশ্ব তো খাবার হাতে পাওয়ামাত্র খেতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু পার্বতী একটুখানি ছোলা মুখে দিয়েই কেঁদে ফেলল। 'ওকি রে, কান্না কিসের?' নরসীর এই প্রশ্ন শুনে সে এবার ফুঁপিয়ে উঠল। কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল নরসী। এবার পার্বতী বলে উঠল, 'রামন্না কিছু না খেয়ে কম্বনকেরে গেছে।'

নরসী বুঝতে পারে পার্বতীর ব্যথা। সে এবার আরো দু মুঠো ছোলা আর গুড় এনে পার্বতীর আঁচলে বেঁধে দিয়ে বলে, 'স্কুল থেকে ফিরলে ওকেও দিও।' চোখ মুছে পার্বতী বলে 'এবার আমি যাই।' বিশ্বর হাত ধরে নিজেদের কুঁড়ের দিকে চলে যায় সে। ঘরে ঢুকে মাদুরটা পেতে শোবার পর ভাবতে থাকে, 'এর আগে তো কোনদিন নরসীর সঙ্গে কথা বলিনি। সবাই বলে ও নাকি খুব খারাপ মেয়ে। ও নিজে থেকেই তো আমাদের ডেকে ছোলা দিল, কিন্তু খাওয়া বোধহয় উচিত হয়নি।' মা জানতে পারলে নিশ্চয় বকুনী দেবে। থাক, মাকে একথা বলে কাজ নেই। কিন্তু আঁচলে যে রামন্নার জন্য ছোলা, গুড় বাঁধা রয়েছে? সে তো এসেই জানতে চাইবে কোথায় পেলাম এসব, তখন কি বলব? তাছাড়া বিশ্ব তো মা এলেই সব বলে দেবে, তাহলে কি করা যায় এখন?— আধঘন্টা ভেবে একটা উপায় মাথায় এল। আঁচল খুলে ছোলা আর গুড়টা বিশ্বকে দিয়ে পার্বতী বলল, 'নে, এটা তুই খেয়ে নে।'

'রামন্না খাবে না এটা?' জানতে চায় বিশ্ব।

'ও যতক্ষণে আসবে তখন মার কন্দ সেদ্ধ করা হয়ে যাবে। তাছাড়া রামন্না ভালও বাসে না ছোলা।'

বিশ্ব এবার দিদিকেও একটু ভাগ দিতে চাইল, কিন্তু পার্বতী সবটাই খাইয়ে দিল ছোট ভাইকে, তারপর জল খাইয়ে কাছে বসিয়ে বলল, 'শোন, মা যদি জানতে পারে আমরা নরসীর দোকান থেকে ছোলা এনে খেয়েছি তাহলে কিন্তু খুব মারবে। তুই কাউকে বলিস না যেন একথা।'

'কেন মারবে?'

'কেন? সবাই বলে শুনিস না? নরসী খুব খারাপ মেয়ে। তুই কাউকে কিচ্ছুটি বলবি না বুঝলি?'

'হুঁ'।

'দিব্যি দিয়ে বল্।'

এবার বিশ্ব তার ছোট হাত দিদির হাতের ওপর রেখে শপথ করল, কাউকে বলবে না। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হতে পারল না পার্বতী। পাশেই গ্রামদেবীর মন্দির, ভাইকে

সেখানে নিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজা স্পর্শ করিয়ে শপথ করালো, ভয় দেখিয়ে বলল, 'দেখ ঠাকুরের নামে দিব্যি করেছিস্ কিন্তু। এরপর কাউকে যদি বলিস এই কালী মন্দিরের ভৈরব তোকে খেয়ে ফেলবে।'

'আমি কিছু বলব না বাবা, বলব না', একটু চটে গিয়ে জবাব দিল বিশ্ব। এরপর পার্বতী আর জ্বালাতন করল না তাকে।

মা ফিরল সন্ধ্যার পর। এসেই কন্দগুলো ধুয়ে রাঁধতে বসল। রামন্না ফিরল স্কুল থেকে। চেন্নিগরায় কোথায় গিয়েছিল কে জানে, সেও ফিরল এতক্ষণে। খেতে বসে অল্প একটু খেয়েই 'আর খাব না' বলে উঠে পড়ল বিশ্ব। 'কেন রে? কি খেয়েছিস শুনি?' জিজ্ঞাসা করল মা। পার্বতী ভয়ে একেবারে দম বন্ধ করে বসে আছে।

'আজ ভাল হয়নি মা, কেমন যেন গন্ধ লাগছে,' জবাব দিল বিশ্ব। সবাইকার খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর কুঁড়ের বাইরে গিয়ে চুপিচুপি দিদিকে বলল, 'দেখলি তো? আমি কি বলেছি কিছু?'

'তুই খুব বুদ্ধিমান ছেলে', ভাইকে আদর করে ভেতরে নিয়ে এল পার্বতী।

৭

প্লেগের প্রকোপ আর নেই। আশেপাশের সব গ্রামের লোক নিজের নিজের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে। রামসন্দ্রের মানুষজনও ফিরে এল। গ্রামের বাইরেও যে অবস্থা ভেতরেও তাই, কোন প্রভেদ নেই। সেখানেও উপোস, এখানেও উপোস।

অপ্পন্নায়া যেখানে ঘর তুলেছিল এবং নিজের হাতেই যে ঘর আবার পুড়িয়ে ছাই করেছিল সেই জায়গাটার মালিক গুণ্ডেগৌড়। নন্জম্মা এখন ঐ জায়গাটা কাজে লাগাবার কথা ভাবছে। এ বছর অনাবৃষ্টির জন্য অধিকাংশ জমিতেই ফসল হয়নি। যেসব জমিতে খালের জলের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা আছে সেগুলো ছাড়া অন্য সব জমির খাজনা এ বছর সরকার থেকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এ বছর খাজনা আদায় করতে কুরুবরহল্লী যাওয়াই হয়নি। কিন্তু প্রতি বছর যেভাবে গুণ্ডেগৌড়জী এবং আরো দু-একজনের খাজনার টাকা অগ্রিম নিয়ে তারপর বর্ষাসনের প্রাপ্য টাকা থেকে কাটিয়ে দেওয়া হয় সেটার ব্যবস্থা এ বছর কি করে করা যাবে?

গত আট দিন ধরে গ্রামে নেই চেন্নিগরায়, কোথায় গেছে কেউ জানে না। নন্জম্মা একদিন চলে গেল কুরুবরহল্লী, গুণ্ডেগৌড়জীকে গিয়ে বলল, 'গৌড়জী, এ বছর তো খাজনা পাওয়া যাবে না। আপনার টাকা আমি সামনের বছরের হিসেবে লিখে রাখছি।'

'ঠিক আছে। এখন তো চাইলেও টাকা দিতে পারবে না।'

'আর একটা কথা। আপনার যে বাগানটা পড়ে আছে ওখানে বেড়া দিয়ে আমি কিছু শাক-সব্জী লাগাব?'

'বেশ তো, লাগাও না। আমার কোন আপত্তি নেই।'

নন্জম্মা সধবা স্ত্রীলোক, তাই এ বাড়িতে তাকে একটি নারকেল ও এক সের মড়ুয়ার

আটা উপহার দিয়ে বিদায় দেওয়া হল। এ বাড়ির সবাইকে আশীর্বাদ ও শুভকামনা জানিয়ে বাড়ির পথে ফিরে চলল নন্‌জম্মা। যেতে যেতে ভাবছিল সে, 'খাজনা তো এবার মাফ করে দিল সরকার, কিন্তু পাটোয়ারীর বর্ষাসন তো পাওয়া যাবে। বর্ষাসনের সমস্ত টাকাটা যদি স্বামীর হাতে পড়ে তাহলে সবটা নিঃশেষে উড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সে তিপটুরের হোটেলেই পড়ে থাকবে এ তো জানা কথা। টাকাটা যাতে ওর হাতে না পড়ে সে ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু কে সাহায্য করতে পারে? অনেক চিন্তার পর স্থির করল কম্বন-কেরে গিয়ে এলাকাদারকেই মিনতি করে বলতে হবে, তিনি ছাড়া এ ব্যাপারে আর কেউ সাহায্য করতেও পারবে না।'

স্বামী আজ আট দিন গ্রাম ছাড়া। গঙ্গম্মা আর অপ্পন্নায়াও নেই গ্রামে। যেসব অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা আছে সেইদিকে ভিক্ষায় বেরিয়েছে তারা। মনে হচ্ছে স্বামীও হয়ত গেছে মা আর ভাইয়ের সঙ্গে, ভেবেছে ক'দিন অন্ততঃ খাওয়া-দাওয়াটা ভালই জুটবে।

পরদিনই রামন্নার সঙ্গে কম্বনকেরে চলে গেল নন্‌জম্মা। মা আর ছেলে এলাকাদারের বাড়িতে পৌঁছে নমস্কার জানাল তাঁকে। তিনি ওদের দেখে বললেন, 'কি ব্যাপার? এবার তো খাজনা আদায় মর্দুমশুমারী কোন কিছুই হবে না। দেখা যাক সামনের বছর কি অবস্থা দাঁড়ায়!'

নন্‌জম্মা নিজের স্বামীর সম্বন্ধে সব কথাই খুলে বলল। প্রতি বছর কিভাবে সে গুণ্ডেগৌড়জী ও অন্যান্য দু-চারজনের খাজনা অগ্রিম নিয়ে তারপর বর্ষাসনের প্রাপ্য থেকে সে টাকা কাটিয়ে দেয় তা জানাল এবং এ বছর সরকার থেকে খাজনা মাফ করে দেওয়ায় তাকে যে সমস্যায় পড়তে হয়েছে তাও বুঝিয়ে বলল।

'দেখ বোন, চেন্নিগরায়ের ব্যাপার আমার জানতে কিছু বাকি নেই। এ অঞ্চলে এমন কোন পাটোয়ারী নেই যে চেন্নিগরায়ের স্বভাব জানে না। কিন্তু আইনতঃ আমি কিছু করতে পারি না। সাহেবের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি।'

'আপনি যা হোক একটা উপায় করুন যাতে আমার ছেলেপেলেদের উপোস না করতে হয়।'

এলাকাদারের স্ত্রী স্বামীকে বললেন, 'তুমি তো আজ তিপটুরে যাচ্ছ, একেও সঙ্গে নিয়ে যাও না। সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বল। তিনিও বুঝবেন কি ধরনের মানুষ ঐ চেন্নিগরায়।'

এলাকাদার নন্‌জম্মাকে তাঁর সঙ্গে বেলা এগারটার বাসে তিপটুর যেতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু নন্‌জম্মা অত্যন্ত লজ্জিতভাবে জানাল বাস ভাড়ার পয়সা নেই তার কাছে। এলাকা-দার বলে উঠলেন, 'অত ভাববার কি আছে, টিকিট তো মোটে চার আনা। ছোট ছেলের হাফ টিকিট, দুজনকার জন্য ছ' আনা লাগবে, সে আমিই দিয়ে দেব।'

মা আর ছেলে এলাকাদার গৃহিণীর আতিথ্যে কফি আর উপ্‌মা খেয়ে বাসে উঠল, তালুক অফিসে ওরা পৌঁছে গেল বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ। ক্লার্কের কাছে খোঁজ-খবর করাতে সে এলাকাদারকে খবর দিল, 'স্যার, রামসন্দ্র উপবিভাগের বর্ষাসন তো দেওয়া হয়ে গেছে আট দিন আগে।'

শুনেই নন্‌জম্মার বুকটা ধক্ করে উঠল! এলাকাদার জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এখন কি করা যায় বোন?’

‘সে নিশ্চয় এখনো এখানেই আছে। সব টাকাটা হয়ত এখনও খরচ হয়নি। আপনি যদি দয়া করে একটু ধমক দেন তাহলে হয়ত কিছু টাকা উদ্ধার করা যাবে এখনো।’

এলাকা ক্লার্ক জানাল, ‘উনি তো মাধবভট্টের হোটেলের কাছেই থাকেন, স্যার। ওখানে গেলে হয়ত দেখা পাবেন, এখন বোধহয় হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করছেন।’

তিনজনে গিয়ে হাজির হলেন বড় অশ্বত্থ গাছটার তলায় মাধবভট্টের হোটেলের সামনে। নন্‌জম্মা আর রামন্না দাঁড়াল বাইরে, এলাকাদার খাবার ঘরের দরজায় উঁকি মেরে দেখলেন ক্লার্কের অনুমানই সত্য। সামনের সারিতে খেতে বসেছে চেন্নিগরায়—আলু, বেগুন, কচু ইত্যাদি সব্জী দেওয়া সম্বর মেখে পর্বতপ্রমাণ ভাত খেয়ে চলেছে। সেই ভাতের স্তূপের পাশে-পাশে ভাজা, চাটনী, আচার, পাঁপড় ইত্যাদি উপকরণেরও অভাব নেই। এলাকাদার কিছু না বলে চুপচাপ বাইরে একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। প্রায় আধ-ঘন্টা পরে পাটোয়ারীজী খেয়েদেয়ে বাইরে এসেই এলাকাদারকে দেখে চমকে উঠে হাতজোড় করে বলে উঠল, ‘প্রণাম হুজুর।’

‘পাটোয়ারীজী, আপনি হঠাৎ এখানে যে?’

‘আ-আ-আজ্ঞে, এ-একটু কাজ ছিল এখানে।’

‘আচ্ছা, খাওয়ার পয়সাটা চুকিয়ে আসুন, তারপর একটু কথা আছে আপনার সঙ্গে।’

চেন্নিগরায় দশ আনার বিল মিটিয়ে বাইরে এসে দেখে স্ত্রী আর পুত্রও সেখানে উপস্থিত। এলাকাদার বললেন, ‘দেখুন, পুলিশের ওয়ারেন্ট রয়েছে আপনার নামে, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে।’

ভয়ে কাঁপতে শুরু করল চেন্নিগরায়। এলাকাদার আবার বললেন, ‘কৃষাণদের কাছে অগ্রিম খাজনা আদায় করেন, সেগুলো বর্ষাসন থেকে কাটিয়ে দেবার কথা, অথচ আপনি বর্ষাসনের সমস্ত টাকা নিয়ে এখানে বসে খরচ করছেন? এটা কত বড় অপরাধ তা জানেন?’

‘ভুল হয়ে গেছে হুজুর। ঐ ··· ঐ ··· গালাগালটা দিতে গিয়েও বহু কষ্টে সামলে নিয়ে চেন্নিগরায় বলে ওঠে, ‘এরাই বলেছে বুঝি?’

‘যেই বলে থাক। চলুন এখন সাহেবের অফিসে।’

‘আপনার পায়ে পড়ছি হুজুর, পুলিশে দেবেন না আমাকে, মান-সম্ভ্রম সব যাবে আমার।’

‘আচ্ছা, কত টাকা আছে এখন আপনার কাছে? সব বার করে এখনই এই মুহূর্তে দিন আমার হাতে।’

‘এখুনি দিচ্ছি হুজুর, কাপড়ের মধ্যে আছে হুজুর।’

‘ঠিক আছে, এখানে এখনই বার করুন।’

চেন্নিগরায় জামা উঠিয়ে ধুতির কোমরের কষি ঢিলে করে অন্তর্বাসের সঙ্গে বাঁধা একটি থলি বের করল, তাতে রয়েছে ছ'খানা দশ টাকার ও একখানা পাঁচ টাকার নোট। টাকা-গুলো গুনে নিয়ে এলাকাদার বললেন, ‘বাকি টাকা কি হল?’

‘খরচ হয়ে গেছে হুজুর।’

'ঘরে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা অনাহারে রয়েছে, আর এখানে বসে বসে শুয়োরের মত গিলছ, লজ্জা করে না তোমার? ক্ষুধার্ত কুকুরকে খাবার দিলে সেও আগে তার বাচ্চাদের খাওয়াতে যায়। ছিঃ ছিঃ ··· ' এইভাবে বেশ কিছুটা ধমক দিয়ে এলাকাদার টাকাগুলো নন্‌জম্মার হাতে তুলে দিলেন। তারপর আবার চেন্নিগরায়কে বললেন, 'পাটোয়ারীর কাজ, হিসেবপত্র লেখা কিছুই তো তোমার দ্বারা হয় না, সব আমার এই বোনটি লেখেন, সে খবর আমার জানা আছে। আর কখনও যদি শুনি এভাবে নিজের পরিবারকে অনাহারে রেখে তুমি বর্ষাসনের টাকায় মজা লুটছ, তাহলে সেইদিনই তোমায় পুলিশে দেব আমি। আমার পরে যে এলাকাদার আসবে তাকেও সব কথা জানিয়ে যাব, সাহেবকেও বলে রাখব তোমার কীর্তি-কাহিনী।'

সেই রাস্তার ওপরই চেন্নিগরায় এলাকাদারের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, 'দোহাই হুজুর, সাহেবকে বলবেন না, আমি বড় গরীব হুজুর ···।' এলাকাদার এবার নন্‌জম্মাকে বললেন, 'ফিরতি বাস বিকেল চারটের সময়, এর মধ্যে যদি কিছু কেনাকাটা করার থাকে তো সেরে নিও বোন। আমি তালুক অফিসের কাজটা সেরে আসি ততক্ষণ। আমিও ঐ চারটের বাসেই ফিরব।' এদিকে অপমানিত চেন্নিগরায় তখন অশ্বত্থতলার বাঁধানো জায়গাটায় মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে। রামন্না মাকে বলে, 'আমি কখনো হোটেলে খাইনি মা, চল না আজ খেয়ে আসি।'

'বাড়িতে দিদি আর বিশ্ব যে কিছুই খায়নি রে? সেই কোন সকালে একটা করে রুটি দিয়ে এসেছি।' আর কিছু বলল না রামন্না, কিন্তু মুখটি ম্লান হয়ে গেল বেচারীর। ছেলের মুখ দেখে নন্‌জম্মার আজ ভারি কষ্ট হল, তার মনে হতে লাগল—বুকের মধ্যে কে যেন একটা তীক্ষ্ণ তীর বিঁধিয়ে দিয়েছে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সে ঢুকে পড়ল হোটেলের মধ্যে, জিজ্ঞাসা করল, 'এই ছোট ছেলের খাওয়ায় কত খরচ পড়বে?' উত্তর হল, 'ছ' আনা।' নন্‌জম্মা রামন্নাকে একটা থালা দিতে বলল। কিন্তু রামন্নার আবদার, মা যদি না খায় সেও খাবে না। অগত্যা নন্‌জম্মাকেও খেতে বসতে হল। খাবারের গন্ধও চমৎকার। খেতে খেতে নন্‌জম্মা ছেলেকে বলল, 'সব জিনিস পেলে বাড়িতেও তো এই-রকম রান্না করা যায়। তুই বড় হয়ে যখন রোজগার করে আনবি, তখন দেখিস এর চেয়েও ভাল খাবার তোকে রেঁধে খাওয়াব।' দু'জনের খাওয়ায় খরচ হল এক টাকা। বাড়িতে রেখে আসা ছেলে-মেয়েদের জন্য নন্‌জম্মা আট আনার নোন্‌তা খাবার ও আট আনার মৈসুর পাক কিনে মোড়কে বেঁধে নিল। এবার কাছের একটা বড় দোকানে খোঁজ নিয়ে জানতে পেল, এখানে এক পল্লা মড়ুয়ার দাম ত্রিশ টাকা, অথচ এই মড়ুয়া তাদের গ্রামে পঞ্চাশ টাকার কমে পাওয়া যাবে না। ষাট টাকা দিয়ে দু'পল্লা মড়ুয়া কিনে দোকান-দারকে অনুরোধ জানায় নন্‌জম্মা—বস্তা দুটো বাসের ওপরে তুলে দেবার জন্য। ঐ বাসেই এলাকাদারও ফিরে চলেছেন, তাঁরই অনুরোধে বাসওয়ালা মড়ুয়ার বস্তার জন্য আর কিছু বাড়তি পয়সা আদায় করল না শেষ পর্যন্ত। চেন্নিগরায় কোথায় গেছে, কেউ জানে না।

ওদের গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে বস্তা এবং মা ও ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে বাস এগিয়ে গেল অন্য দিকে। রামন্না গ্রামে গিয়ে পাটোয়ারীর 'কারিন্দার' সাহায্যে একটা

গরুর গাড়ি যোগাড় করে না আনা পর্যন্ত নন্‌জম্মাকে পথের ধারেই অপেক্ষা করতে হল মড়ুয়ার বস্তা পাহারা দিতে।

চেন্নিগরায় হাঁটা-পথে গ্রামে ফিরে এল পরের দিন। নন্‌জম্মা কোন কথাই বলল না তাকে দেখে। রামন্নার ইচ্ছে হচ্ছিল বাবাকে একটু কথা শোনায়, কিন্তু মা নিরস্ত করল তাকে, 'যাই করুন না কেন, উনি তোমার বাবা। তুমি তো আমার বুদ্ধিমান ছেলে, বাবার সঙ্গে কখনো ওভাবে কথা বলতে নেই, ছিঃ।'

দু'বস্তা মড়ুয়া দেখে এ বাড়ির সবাই এত খুশি যে, মনে হচ্ছে যেন কামধেনু পাওয়া গেছে একেবারে। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় নন্‌জম্মার দেহ তো একেবারে অস্থিচর্মসার হয়ে পড়েছে। পার্বতী ও রামন্নার স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল ছোটবেলা থেকে, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে শুকিয়ে গেছে তাদের বাড়ন্ত শরীর। বিশ্বর অমন সুন্দর গোলগাল চেহারার এখন যা দশা হয়েছে, তার দিকে আর তাকানো যায় না। কিন্তু এই অবস্থা শুধু এদেরই নয়, গ্রামের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ লোকেরই চেহারা এই রকম এখন। বাকি পঁচিশ ভাগের অবস্থা ওরই মধ্যে একটু ভাল। চেন্নিগরায়ও কিছুটা রোগা হয়েছে বটে, তবে অন্যদের চেয়ে অনেক ভাল আছে তার শরীর।

পেট ভরে খাওয়া শুরু করলে এ মড়ুয়া তো শেষ হয়ে যাবে দু'মাসের মধ্যে। সুতরাং নন্‌জম্মা স্থির করল দিনে দু'সেরের বেশী কিছুতেই খরচ করা হবে না। এ বছরও এখনও বর্ষা নামেনি, হয়ত আরও দুর্দিন আসবে ভবিষ্যতে, সুতরাং সে পার্বতীকে বলল, 'সকালে ঠিক এক মাপের সাতখানা রুটি গড়বি। সবাই একটা করে খাবে। একটা রামন্না স্কুলে নিয়ে যাবে, আর একটা দুপুরে খাবি তুই আর বিশ্ব দু'জনে ভাগ করে। ব্যস, তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কিছু খাওয়া চলবে না। রাত্রে এক সের মড়ুয়ার আটা পিষে পাঁচটা লোন্দা তৈরী করা হবে। প্রত্যেকের জন্য একটা করে, চাইলেও কেউ তার বেশী পাবে না।'

এই ব্যবস্থায় ছেলে-মেয়েদের মোটামুটি পেট ভরছে। নন্‌জম্মা তো উপোস করতে প্রস্তুতই আছে। কিন্তু মুশকিলে পড়েছে চেন্নিগরায়। স্ত্রীর ওপর রাগারাগি করলে আজকাল রামন্না আর পার্বতীও মায়ের হয়ে বাবাকে কথা শোনায়। এমনকি ছোট্ট বিশ্বও বলে ওঠে, 'তুমি তো বাবা, তুমি আমাদের জন্যে চাল নিয়ে এস না, আমার খুব ভাত খেতে ইচ্ছে করে।'

'দুত্তোর, তোর মায়ের ··· ' গালাগাল দিতে দিতে চেন্নিগরায় বাড়ি ছেড়ে বাঁধের দিকে চলে যায়।

রান্নার ভারটা পুরোপুরি পার্বতীর ওপর ছেড়ে দিয়ে নন্‌জম্মা এখন প্রাণপণে খাটছে তার সব্জীর বাগানে। অপ্পন্নায়ার সেই ঘর পোড়ানোর পর থেকে জায়গাটায় পোড়া দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে ছিল শুধু। দেওয়ালগুলো ভেঙে জমিটা সমান করে সকাল-সন্ধ্যা কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে জমিটা ভেজাচ্ছিল সে প্রথমটা। এক বছরের ওপর এ মাটিতে জল পড়েনি, জায়গাটা যেন পিপাসায় আকুল হয়ে রয়েছে, এক ঘড়া জল এক ফুট মাটিতেই নিমেষের মধ্যে শুষে নেয়। ধীরে ধীরে নরম হল মাটি, তখন সে নিজেই খুঁড়তে শুরু

করল একধার থেকে। অছুত বেলুরাকে দুটো টাকা দিয়ে এক গাড়ি বাঁশ আর কাঁটা আনিয়ে জমিটাকে ঘিরে ফেলল, তারপর বেড়ার ধারে ধারে ফণীমনসার ডাল পুঁতে দিল লাইন করে। ফণীমনসার দু'পাশে রইল বাঁশ আর খেজুর কাঁটার বেষ্টনী। তারও ফাঁক-ফোকরগুলোতে গুঁজে দিল বাবলা কাঁটার ডাল। এইভাবে বেড়াটা মজবুত করে বাগানের একটা ফটকও তৈরী করে ফেলল সে। তালা লাগাবার ব্যবস্থা রইল তাতে। কম্বনকেরের হাট থেকে বেগুন আর সীমের বীজ এনে পোঁতা হল। সব্জী খেয়েও অন্ততঃ কিছুটা ক্ষুধা মেটানো যায়। দু'বেলাই কিছু কিছু তরকারী রাঁধা চলবে। বর্ষা এ বছর মুখ ফিরিয়েছে বটে, কিন্তু কুয়োর মধ্যে এখনও 'গঙ্গামাইয়া'র দাক্ষিণ্য তো নাগালের মধ্যেই রয়েছে। পরম উৎসাহে কুয়ো থেকে জল তুলে নন্‌জম্মা দু'বেলা তার সব্জী খেতে জল ঢালে।

এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ শোনা গেল সর্বক্কার মেয়ে রুদ্রাণীর খুব বমি ও দাস্ত হচ্ছে। দু'দিনের মধ্যেই মারা গেল রুদ্রাণী। নন্‌জম্মা তো অসুখের খবরও পায়নি, যখন শুনল, ছুটে গেল সে সর্বক্কার বাড়ি। সেখানে তখন মৃতদেহ তুলে নিয়ে শ্মশান-যাত্রীরা বাড়ি থেকে রওনা হচ্ছে। মেয়ের শব-বাহকদের পেছনে মাথা নত করে চলেছে রেবন্নাশেট্টী। ওদের জাতের রীতি অনুসারে একজন মৃতদেহের পেছন পেছন চলেছে মুড়ি ছড়াতে ছড়াতে। সর্বক্কা ঘরের দরজায় মাথা কুটছে নিঃশব্দে, চেঁচিয়ে কাঁদতেও পারছে না সে।

রুদ্রাণী পার্বতীর চেয়ে চার বছরের বড়, বিয়ে হলে এতদিনে দুই ছেলের মা হত। সর্বক্কার মতই পুরন্ত গড়ন, এক ঢাল চুল মাথায়, পেছন থেকে দেখলে মা মেয়েতে তফাৎ বোঝা যেত না। সর্বক্কার পাশে বসে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল নন্‌জম্মা। ওকে দু'হাতে ধরে বলল, 'মাথা কুটে কি করবে ভাই? আর তো ফিরে পাবে না তাকে। অমন করতে নেই। কি হয়েছিল মেয়ের?' সদ্য সন্তানহারা মায়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল, 'বাপের পাপেই সে চলে গেছে', বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে ফেলল সর্বক্কা।

শবদাহ শেষ করে রেবন্নাশেট্টী ঘরে না ফেরা পর্যন্ত নন্‌জম্মা বসে রইল সর্বক্কার কাছে। আরো অনেক স্ত্রী ও পুরুষ বসেছিল এতক্ষণ। পাখির ঝাঁকের মধ্যে ঢিল ফেললে যেমনভাবে পাখিরা উড়ে যায়, ঠিক সেইভাবে রেবন্নাকে দেখা মাত্র অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়ের দল। পুরুষরা অবশ্য বসেই রইল। নন্‌জম্মাও ফিরে এল বাড়িতে। সর্বক্কাদের বাড়িটা ওর সব্জী খেতের কাছেই। পরদিন সর্বক্কাকে সে নিজের বাগানেই ডেকে কাছে বসিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলছিল, 'অমর তো কেউ নয়, যেদিন যমরাজার ডাক আসবে, সেদিন যেতেই হবে মানুষকে। আমরা যে কেবল "আমার ছেলে", "আমার মেয়ে" "আমার বাপ-মা" এমনি করে ভেবে মরি, এ সবই তো মায়ার খেলা।' নন্‌জম্মার যথা-সাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও সর্বক্কার অসহ্য শোকের ভার যেন কমছে না কিছুতেই। সে নিজেই এসে চুপ করে বসে থাকে নন্‌জম্মার কাছে, কিন্তু একটি কথাও বলে না। নন্‌জম্মা কুয়ো থেকে জল তুলে এক ঘড়া বাড়িতে রেখে আসে, তারপর অন্য ঘড়াটায় জল তুলে তুলে ঢালতে থাকে তার বেগুন খেতে। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই কথাও বলে যায় সর্বক্কার সঙ্গে। কিন্তু কোন উত্তরই দেয় না সর্বক্কা। অবশেষে একদিন নন্‌জম্মার গাছে জল

দেওয়া শেষ হবার পর সর্বক্কা বলে ফেলল, 'জন্মদাতা বাপই যদি মেয়েকে খুন করে তো ভাগ্য আর কি করবে?'

'এ কথার মানে কি সর্বক্কা?'

'ছেড়ে দাও ও সব কথা।'

'না, আমাকে বলতেই হবে। শপথ করছি কাউকে বলব না আমি।'

'একদিন তোমাকে একটু মড়ুয়া দিয়ে বলেছিলাম না, তিপটুরে কোর্টের কাজে গিয়ে দু'পল্লা মড়ুয়া, পঁচিশ সের চাল, কত কি এনেছে ··· ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'পরে বুঝলাম, ও সব কোর্টের রোজগারে আসেনি। ঐ বিদেশী হারামজাদা কাশিমবদ্দি, ওর নিজের বৌ-বাচ্চা সব থাকে কেরালায়, ওর কাছেই টাকা নিয়েছিল আমার কর্তা।'

'তা নিয়েছিল তো, হয়েছে কি?'

'আমি যখন তোমাদের সঙ্গে রোজ শতমূলী খুঁড়তে যেতাম, সেই সময় বাড়ির কর্তা নিজেই ঐ কাশিমবদ্দিকে ঘরে এনে ঢুকিয়েছে। রুদ্রাণী পোয়াতি হয়ে পড়েছিল।'

সর্বক্কার কথাগুলো ঠিকমত বুঝতে বেশ সময় লাগল নন্‌জম্মার। এই দুর্ভিক্ষে গ্রামের অনেক মেয়েই নাকি ইজ্জত বেচে পেট ভরিয়েছে—এ রকম একটা কথা কানে এসেছিল তার, কিন্তু বাপ হয়ে নিজের মেয়েকে এমনভাবে কাজে লাগাবে, এ যে অবিশ্বাস্য!

'নিজের স্বামীর সম্বন্ধে মিথ্যে বলে আমার লাভ কি? যাকে "বাপ" বলে মানে সেই যদি এমন সর্বনাশ করায় তো উপায় কি? শিবগেরে থেকে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল, কতবার বললাম, "বিয়েটা দিয়ে ফেল"। তা এখন নাকি লোক-জন খাওয়াবার টাকা নেই। বলল, "কিছুদিন অপেক্ষা কর, এরপর বিয়ে দেব"।'

'তারপর?'

'আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি আগে। তিন মাস হয়ে যাবার পর টের পেলাম। তখন তো মেয়ের ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে তাকেই মারধোর করল বাপ। তারপর রুদ্রাণী আমার কাছে শপথ করে বলে, 'মা জান, বাবা নিজেই কাশিমবদ্দিকে এনে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে বলল, "ভয়ের কিছু নেই" তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।' এরপর আর কি বলবে, বল? তারপর ঐ বাপই নরসীর কাছ থেকে কি সব ওষুধ এনে তিন দিন খাইয়েছে, তারপর কি রক্ত, কি রক্ত! সে আর বন্ধই হল না, দেখতে দেখতে মেয়েটা শেষ হয়ে গেল।'

সমস্ত শুনে একেবারে যেন বোবা হয়ে গেল নন্‌জম্মা। এতক্ষণে সর্বক্কা ডুকরে কেঁদে উঠে চোখ মুছে ফেলল। হঠাৎ নন্‌জম্মার মনে হল পার্বতীর কথা। তেরো পূর্ণ হতে চলেছে পার্বতীর। যদি এই দুর্ভিক্ষ না আসত, পেট ভরে খেতে পেলে, স্বাস্থ্য ভাল থাকলে এতদিনে সে নিশ্চয় ঋতুমতী হয়ে যেত। যদি এখন ঋতুমতী হয়, তাহলে কি হবে? এই দুর্দিনে কি করে বিয়ে দেওয়া যাবে? যতই সাদাসিধেভাবে বিয়ে হোক না কেন, অন্ততঃ সাত-আটশ' টাকা খরচ হবেই। দু'বেলা রুটি জুটছে না, এখন আসবে কোথা থেকে সাত-আটশ' টাকা?

'কাউকে বোল না যেন এ কথা, নন্‌জম্মা।'

'ভগবানের দিব্যি সর্বক্কা, কাউকে বলব না। তোমার ইজ্জত আর আমার ইজ্জত কি আলাদা?'

'এই রকম পুরুষের ঘর করতেও ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে ভাবি একে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যাব, কিন্তু সেখানেও ভাই-বৌদের সংসারে পরাধীন হয়ে থাকতে হবে। তুমিই বল আমার আর বেঁচে থেকে লাভ কি?'

সর্বক্কার মনে এ প্রশ্ন জাগবার বহু আগেই নন্‌জম্মা এ প্রশ্ন করেছে নিজেকে। 'কি আছে এ জীবনে? স্বামীর ভালবাসা? শাশুড়ীর স্নেহ? বাপের বাড়ির আদর? তবুও তো বেঁচে আছি, ছেলে-পিলেও হয়েছে। আজ যদি আবার নিজেকে এ প্রশ্ন করি তাহলে আমার ছেলে-মেয়েই চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় মূর্তিমান উত্তর হয়ে। সারাদিন সব্জী খেতে জল ঢেলে, কোনমতে বর্ষাসনের টাকাকটা স্বামীর গ্রাস থেকে লুকিয়ে, সকাল-সন্ধ্যা পলাশ পাতার থালা বানিয়ে, ফুটো এল্যুমিনিয়ামের থালায় একখানা রুটি নয়ত আধখানা লোন্দা বাচ্চাদের মুখের সামনে ধরে দেবার জন্যই এখনও বেঁচে থাকতে হবে। এই তো আমার জীবন, আর কি আছে এ জীবনে?' ভাবতে থাকে নন্‌জম্মা।

৮

প্লেগের প্রকোপ বন্ধ হবার পর দেখা গেল অনেক লোকের চর্মরোগ দেখা দিয়েছে। সবাইকারই চুলকানি নয়ত ফোড়া, ব্রণ ইত্যাদি হচ্ছে। যাকেই দেখ সে-ই শরীরের কোথাও না কোথাও চুলকোচ্ছে। যার উরুতে ফোড়া সে খুঁড়িয়ে হাঁটছে, সেঁক দিয়ে সেই ফোড়া না ফাটা পর্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা। ব্রণ আর চুলকানিতে লোকের মুখ, হাত, হাতের আঙুল ইত্যাদি ভরে গেছে।

নন্‌জম্মার বাড়িতেও সবাই এই নিয়ে ভুগছে। প্রথমে রামন্নার হল, তারপর পার্বতী ও বিশ্বর, অবশেষে তাদের মায়েরও। রোদে বসে সেঁক দেওয়া অথবা উনুনের পাশে বসে আগুনের সেঁক দেওয়াই ফোড়ার জন্য সহজ ঘরোয়া চিকিৎসা পদ্ধতি। মাঝে মাঝে সকালে উঠেই দেখা যায় মুখটা সাদা হয়ে উঠেছে ব্রণে। তখন ঐভাবে সেটাকে রেখে দেওয়া সম্ভব নয়, কোন রকমে মুখটা ফাটিয়ে পুঁজ বার করে দিতেই হয়। বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে পুঁজ বার করা এক জ্বালাতনের কাজ, আবার ঐ পুঁজ এদিক-ওদিকে লেগে আরো নতুন ফোড়া আর ব্রণ গজিয়ে ওঠে। এর ওপর আবার অসহ্য চুলকানি। বিশ্ব তো মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে কান্না শুরু করে দেয়, রামন্না আর পার্বতীরও কখনো-সখনো যন্ত্রণায় চোখে জল এসে যায়। এতদিন বাড়ির সব কাজই করছিল পার্বতী, কিন্তু তার দুই হাতেই ফোড়া, তাই বাসন মাজতে পারছে না সে। জাঁতা ঘোরানোও সম্ভব নয় এই হাত নিয়ে। ওদিকে নন্‌জম্মারও হাতে ফোড়া, কুয়োর দড়ি টেনে জল তোলা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এত সাধের বাগানের শাক-পাতা শেষ পর্যন্ত জলের অভাবে না শুকিয়ে যায় এই তার আশঙ্কা।

নাগদেবের পুজো মানত করেছে গ্রামের মানুষ। নন্‌জম্মাও বাচ্চাদের আট দিন ঠাণ্ডা জলে স্নান করাল, নিজেও করল; তারপর তম্মেগৌড়ের বাড়ি থেকে আধঘটি দুধ চেয়ে এনে কেয়া ঝোপে ঢেলে প্রণাম করাল ছেলে-মেয়েদের। কিন্তু এত করেও মনে হচ্ছে প্রসন্ন হলেন না নাগদেব, ফোড়ার উপদ্রব বেড়েই চলল।

এদের সবার ফোড়া শুরু হবার মাসখানেক পরে চেন্নিগরায়ও পড়ল ফোড়ার কবলে। প্রথম ফোড়াটা হতেই সে তো প্রায় নাচতে শুরু করল। আশ্চর্যের বিষয়, গ্রামের প্যাটেল ইত্যাদি বড়লোকদের বাড়িতে কিন্তু এই ধরনের চর্মরোগ হচ্ছে না। গঙ্গম্মা আর অপ্পন্নায়ারও কিছু হয়নি। হাতের দুই আঙুলের মধ্যে থেকে ফোড়ার পুঁজ বার করতে চেন্নিগরায় গিয়েছিল মায়ের বাড়িতে। গঙ্গম্মা শুনিয়ে দিল, 'শৃঙ্গেরী মঠের গুরু যাকে বহিষ্কৃত করেছেন, সেই পাপিষ্ঠা প্রায়শ্চিত্তটা পর্যন্ত করল না। মাসিকধর্মের সময়ও গাছ-পালায় হাত লাগায়, কোন আচার-বিচার মানে না, তাই তো নাগদেব রুষ্ট হয়েছেন। ঐ ছেনালটার ছোঁয়াচ্ লেগে তোরও হয়েছে ঐ রোগ। ওকে যদি ত্যাগ না করিস তাহলে তুইও আর কখনো সুস্থ হতে পারবি না চিন্নৈয়া, এই বলে দিলাম আমি!'

কিন্তু চিন্নৈয়া ভাল করেই জানে ত্যাগ করার হুমকি দিলে তার স্ত্রী কিছুমাত্র ভয় পাবে না। ওকে ত্যাগ করলে তার পেট চলবে কি করে? তার ওপর আবার এলাকাদারের কাছে গিয়ে যদি নালিশ করে বসে, তখন সামলাবে কে? সুতরাং মায়ের কথায় সে বিশেষ কান দিল না। কিন্তু এই ফোড়ার জন্য কিছু একটা উপায় তো করতেই হবে। মা আর ছেলেতে মিলে চলল অন্নাজোইসের কাছে। সেখানে একটু পরেই অইয়াশাস্ত্রীও এসে হাজির। শাস্ত্রীজীর অনেক বয়স হয়েছে, গ্রামের কারা, কোন সম্প্রদায়, কোন বাড়িতে কি শাস্ত্র অনুসারে পুজো হয়, সব তাঁর জানা আছে। তিনি বললেন, 'গঙ্গম্মা, তোমার মনে আছে কি, তোমার স্বামী বাড়িতে নাগপুজো করাতেন? তিনি গত হবার পর একবারও কি পুজো করিয়েছ? নাগদেব রুষ্ট হবেন---এ আর আশ্চর্য কি?'

গঙ্গম্মার মনে পড়ল, ঠিক তো! খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয় এ পুজো। কোন ষষ্ঠীর তিথিতে বাড়ির পুরুষেরা বাগানে গিয়ে ছোটমত একটা কুয়ো খুঁড়ে আসে, তারপর সেই কুয়োর জলে রান্না করতে হয় ভাত, সম্বর, পায়েস, বড়া পুরণপোলি ইত্যাদি পঞ্চ-ব্যঞ্জন। দুই পুরোহিত, তাদের পত্নীরা, একটি বিধবা, একটি অনাথ ও এক ব্রহ্মচারীকে নিমন্ত্রণ করে এনে খাওয়াতে হয়। প্রথমে গমের আটা ও চালের গুঁড়ো দিয়ে প্রস্তুত ফণা-তোলা নাগদেবের মূর্তি গড়ে যথাবিহিত তাঁর পুজো করে তারপর শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ ভোজনের মত নিষ্ঠাসহকারে পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের ভোজনে পরিতৃপ্ত করতে হবে। তাছাড়া, অন্ততঃ একটি করে রুপোর টাকা দক্ষিণা, পুরুষদের ধুতি, স্ত্রীদের শাড়ী, জামার কাপড়, ব্রহ্মচারীকে ধুতি ও উপবীত ইত্যাদিও দান করতে হবে। সন্ধ্যায় নাগদেবের মঙ্গলারতি সমাপ্ত করে তাঁর মূর্তি ও অবশিষ্ট চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে গিয়ে সেই কুয়োতে বিসর্জন দিয়ে মাটি ফেলে বুজিয়ে দিতে হবে কুয়োটা। তারপর একবারও পিছু ফিরে না দেখে অন্ধকারে সোজা ফিরে আসতে হবে বাড়িতে। এইভাবে পুজো করলে ফোড়া, ব্রণ সবই সেরে যাবে দেখতে দেখতে। 'তোমার স্বামীর আমলে কখনো এসব

হয়েছিল? তোমরা নিজেদের কর্তব্য ভুলে গেছ তাই এত দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে।' নিজের চুলকানি-ভরা হাত চুলকোতে চুলকোতে এই মন্তব্য করলেন অইয়াশাস্ত্রী। গঙ্গম্মা স্থির করে ফেলল নাগপুজোটা করিয়ে ফেলা অবশ্য প্রয়োজন।

অন্নাজোইস বললেন, 'কোন চিন্তা নেই, দুই পুরোহিত আমি আর খুড়োমশাই তো আছিই। খুড়ি আর আমার স্ত্রীও আছেন। আমাদের নরসিংহ রয়েছে ব্রহ্মচারী। কোডেনহল্লী থেকে আমার বিধবা বোনটাকে আর রঙ্গাপুর থেকে আমার অনাথ শালাটাকে আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি অন্য সব ব্যবস্থা করে ফেল।'

কয়েক দিনের মধ্যেই পুজো করাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে এল গঙ্গম্মা। ছেলেকে উপদেশ দিল, বৌয়ের কাছ থেকে অন্ততঃ অর্ধেক খরচ সংগ্রহ করে আনতে হবে। স্বামীর কাছে সব বিবরণ শোনার পর হিসেব করে নন্‌জম্মা দেখল, অন্ততঃ শ'খানেক টাকার ধাক্কা। তার অর্ধেক হলেও দিতে হবে পঞ্চাশ টাকা। তাছাড়া দুই পুরোহিত নিশ্চয় সেই বহিষ্কারের প্রশ্ন তুলে প্রায়শ্চিত্তের জন্যও টাকা চাইবে। পেট ভরে খাওয়া জুটছে না, এ সময়ে আসবে কোথা থেকে এত টাকা? সুতরাং 'নাগপুজোর দরকার নেই' এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল নন্‌জম্মা; কিন্তু মনটা একটু খচ্ খচ্ করতে লাগল, 'নাগদেব রুষ্ট হয়ে সত্যিই যদি পরিবারের কাউকে টেনে নেন কি হবে তাহলে?'

বৌ আর নাতি-নাতনী চুলোয় যাক, গঙ্গম্মার একমাত্র চিন্তা, তার আর অপ্পন্নায়ারও যদি ঐ রোগ ধরে তাহলে কি হবে? নদীর তটবর্তী প্রদেশ অক্কিহেবল্লীতে ভিক্ষা করতে চলে গেল সে, সঙ্গে এবার চেন্নিগরায়কেও নিয়ে গেল। 'ভগবানের পুজো হবে, তার জন্য দান কর' এই বলে বলে ভিক্ষা চাইতে শুরু করল। এ কথা শোনার পরও যদি কেউ কিছু পয়সা বা দু'সের ধান না দেয় তো তার পাপ হবে নিশ্চয়। এইভাবে ধান সংগ্রহ করে, সেই ধান বিক্রী করে শ'খানেক টাকার যোগাড় হবার পর দুই ছেলেকে নিয়ে প্রায় একমাস পরে গ্রামে ফিরে এল গঙ্গম্মা। নাগপুজোর দিন স্থির হয়ে গেল।

এত ব্রণ এবং ফোড়ায় ভুগছে তবু একদিনের জন্যও স্কুল কামাই করেনি রামন্না। এখন সে ইংরিজীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। তাদের স্কুলের বহু ছাত্রই এই রকম ফোড়া নিয়ে ভুগছে। প্লেগ যেমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, ঠিক সেই রকমভাবেই চর্মরোগও সর্বত্র ছড়িয়েছে। যাদের শরীরে ব্রণ বা ফোড়া রয়েছে, তাদের মাস্টারমশাই আলাদা জায়গায় বসতে দেন। ছাত্রদের কষ্ট দেখে শেষ পর্যন্ত হেড-মাস্টারমশাই একদিন সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে এলেন। এরপর ডাক্তার এবং গ্রাম-পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ দু'জনে মিলে লেখালিখি করে কিছু 'মিল্ক ইঞ্জেক্‌শন' আনিয়ে নিয়ে ছাত্রদের চিকিৎসা শুরু করে দিলেন। ডাক্তারবাবু দু'দিন দুটো ইঞ্জেক্‌শন দিয়ে একটা মলম লাগাতে দিলেন ছেলেদের। মলমে গন্ধক দেওয়া। মলমটা বিশেষ লাগাবার দরকারও হল না, শুধু ইঞ্জেক্‌শনেই চমৎকার কাজ হল। সব ছাত্রদের ফোঁড়ার ঘা শুকিয়ে দেখতে দেখতে খোসা পড়ে পরিষ্কার হয়ে গেল।

রামন্না এসে মাকে বলল, 'ইঞ্জেক্‌শন নিতে একটু লেগেছিল বটে কিন্তু দেখ তো কেমন সেরে গেছি আমি। তোমরা সবাই চল একদিন, হাসপাতালে গিয়ে ইঞ্জেক্‌শন নিয়ে নাও।'

পার্বতী আর বিশ্বকে নিয়ে নন্‌জম্মাও একদিন কম্বনকেরে চলে গেল। নিজেদের সংসারের দুর্দশা জানাল ডাক্তারকে। সব শুনে ডাক্তারবাবু ওদের বিনা পয়সাতেই ইঞ্জেক্‌শন দিয়ে দিলেন। বলে দিলেন দ্বিতীয় ইঞ্জেক্‌শনের জন্য আবার আসতে হবে চার দিন পরে। দ্বিতীয় ইঞ্জেক্‌শনটা নেবার পরই সবাইকার দেহের ফোড়াগুলো ক্রমশঃ সেরে গেল। রামন্না একদিন স্কুল থেকে এসে বলল, 'জান মা, আমাদের হেড-মাস্টার-মশাই বলেছেন গত বছর দুর্ভিক্ষের সময় কেউ দুধ-দই খেতে পায়নি, আর ঐসব কন্দ-মূল সিদ্ধ করে খেয়েছিল, তাইতে এই চর্মরোগ হয়েছে। "নাগদেবতার শাপে এই অসুখ হয়েছে" এটা একেবারে মিথ্যা কথা। কন্দমূল খেয়ে সবাইকার শরীরের রক্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গ্রামের সবাই যদি ইঞ্জেক্‌শন নেয়, সবাইকারই অসুখ সেরে যাবে।'

ইতিমধ্যে গঙ্গম্মা, চেন্নিগরায় আর অপ্পন্নায়া গ্রামে ফিরে এসেছে। দুই পুরোহিতকে ধুতি, শাড়ী ইত্যাদি দিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে মহা ঘটা করে নাগপুজো সুসম্পন্ন হল। নন্‌জম্মা ছেলে-পিলেদের নিয়ে ইঞ্জেক্‌শন নিয়ে এসেছে শুনে গঙ্গম্মা মন্তব্য করল, 'পুজো না করে ছেনালটা ডাক্তারী ওষুধ করাচ্ছে। দেখে নিও তোমরা, ও হাত-পা পচে মরবে এবার। নাগদেবকে চটানো কি ছেলেখেলা নাকি?'

নন্‌জম্মা আর তার ছেলেমেয়েরা সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে, শরীরে কারো এতটুকু দাগ পর্যন্ত নেই। ওদের দেখে গ্রামের লোক সবাই একে একে কম্বনকেরে যাচ্ছে ইঞ্জেক্‌শন নিতে। এক-একটা ইঞ্জেক্‌শন নিতে খরচ পড়ে পাঁচ টাকা।

৯

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় শেষ হতে চলল এখনও এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। এ বছরও কাটবে চরম দুর্দশার মধ্যে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। গত বছর ধনীদের ঘরে কিছু শস্য জমিয়ে রাখা ছিল, কিন্তু এ বছর তারাও বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘের দেখা পাওয়া যাচ্ছে বটে, কিন্তু কোথা থেকে ঝড়ো হাওয়া এসে সব মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যায়। পাঁজিতে নাকি লিখেছে এ বছর যা বৃষ্টি হবে তার তিনগুণ বেশী হবে ঝড়। সত্যিই এ বছর বাতাসের বেগ খুব প্রবল, কিন্তু তার এক-তৃতীয়াংশ দূরের কথা একশ' ভাগের এক ভাগ বৃষ্টিরও দেখা নেই। ফোড়াগুলো সেরে যাবার পর থেকে নন্‌জম্মা দু'বেলা খাটছে তার বাগানে। কিছুদিন ধরে কেবল এক সের মড়ুয়ার সঙ্গে সিম, বেগুন ইত্যাদি সব্জী রান্না করে সকলের পেট ভরাচ্ছে সে। আর কেউ এভাবে সব্জী খেত করেনি, তাই তার বাগানে চুরি হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী এটা জানা কথাই। রাত্রে অন্ততঃ বার চারেক সে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাগানের চৌকিদারী করে আসে রোজ। গত বছরের অনাবৃষ্টির জন্য এবার নারকেল গাছগুলোতেও ফল নেই। অনেক বাগানের মালিকই কাঁচা অবস্থায় নারকেলগুলো পেড়ে বেচে দিয়েছে তিপটুরের বাজারে। কাজেই চোরদের চুরি করার মত কোথাও কিছু নেই এখন।

হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে বর্ষা নামল। এত বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু

করেছে যে মনে হচ্ছে যেন শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। নৈর্ঋত কোণ থেকে যে মেঘ আসে সে মেঘের বর্ষার সময় পেরিয়ে গেছে, এমনকি এখন তো ঈশান কোণের মেঘেরও সময় প্রায় যেতে বসেছে, এই সময় হঠাৎ নৈর্ঋতে মেঘের বৃষ্টির চেয়েও প্রবল বেগে শুরু হল বর্ষণ। সমস্ত গ্রাম জেগে উঠল, ঘর থেকে বেরিয়ে সবাই দেখে বাতাস একেবারে স্তব্ধ, শুধু বৃষ্টি হয়ে চলেছে অজস্রধারে। আকাশ জুড়ে জমাট কালো মেঘ। পৃথিবীর বুকে হুড়হুড় করে জল ঢালা ছাড়া আর কিছুই যেন জানে না এই আকাশ। কোথায় ছিল এতদিন এত জল? হঠাৎ রাতারাতি কি করে এসে হাজির হল? গ্রামদেবতা চোলেশ্বরের কৃপা, নাহলে এই অসময়ে এ বর্ষা এল কোথা থেকে? আধ ঘন্টার মধ্যেই গ্রামের নদী-নালা, পুকুর সব ভরে গেল, পথের ওপর দিয়ে স্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে জল। নন্‌জম্মার ভাবনা হল এই বৃষ্টির তোড়ে ওর সব্জী খেত হয়ত ভেসে যাবে। কিন্তু তবু সে খুব খুশি, কারণ ভাল করে বৃষ্টি হলে তবেই তো ফসল ফলবে, সবাইকার রুটি জুটবে। তরকারী তো আবার লাগানো যেতে পারে, কিন্তু ফসল হওয়াটা বেশী জরুরী।

এতদিন তো বৃষ্টির নাম গন্ধও ছিল না, তাই বাড়ির ছাদের খাপরাগুলোর দিকে এতদিন কেউ নজর দেয়নি। এলোমেলো ঝড়ো হাওয়ায় সব বাড়িরই খাপরা এদিক-ওদিক সরে গিয়েছিল। সুতরাং সে রাত্রে প্রতিটি বাড়িরই ছাদের ফুটো দিয়ে জল পড়ে ঘর ভিজে গেল। তবু কেউ এতটুকু মেজাজ খারাপ করল না। ঘর ভিজে যাক, দেওয়াল পড়ে যাক, কারো তাতে কোন খেদ নেই, বৃষ্টি যে হচ্ছে এতেই সবাই ধন্য হয়ে গেছে।

ভোরের আগেই থামল বৃষ্টি। আলো ফুটতেই সবাই চলল নিজের নিজের খেতের অবস্থা দেখতে। এক রাত্রের বৃষ্টিতেই গ্রামের জলাশয় অর্ধেক ভরে উঠেছে, অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে উঁচু ডাঙা জমিতে অবস্থিত গ্রামগুলোতেও বৃষ্টি ভালই হয়েছে।

নন্‌জম্মা যাচ্ছিল তার বাগান দেখতে, হঠাৎ পথের মধ্যে দেখে মহাদেবায়াজী আসছেন। সবাইতো ওঁর ফেরার আশা ছেড়েই দিয়েছিল!

'অইয়াজী, কোথায় চলে গিয়েছিলেন আমাদের সবাইকে ছেড়ে?'

'কাশী গিয়েছিলাম মা, এতদিন সেখানেই ছিলাম। আবার এখানে ফিরতে ইচ্ছা হল, তাই তো চলে এলাম।'

মহাদেবায়াজীকে বাড়িতে নিয়ে গেল নন্‌জম্মা। চেন্নিগরায় বাড়িতে নেই। নন্‌জম্মা জিজ্ঞাসা করল, 'কবে এলেন আপনি?'

'রাত্রে এসেছি। ভাবছিলাম গিয়ে তোমাদের ডেকে তুলব, কিন্তু জোরে বৃষ্টি এসে গেল।'

কথাবার্তা হচ্ছে, ইতিমধ্যে সর্বক্কা এল। মহাদেবায়াজীকে দেখেই ওর মনে হল, 'কি আশ্চর্য ইনি ফিরেছেন আর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমাদেরই জাতের বেনে ব্যবসায়ীরা ওঁকে ভিক্ষা দেবে না বলেছিল, তাই দুঃখ পেয়ে উনি গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই তো অনাবৃষ্টি। কাল রাতে যেই ফিরেছেন অমনি বর্ষা নেমেছে! সাধু-সন্তের মাহাত্ম্য কি সোজা কথা!' তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সর্বক্কা মহাদেবায়াজীকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিল। নন্‌জম্মা বলল, 'অইয়াজী আমাদের ওপর রাগ করে আপনি কেন গ্রাম ছেড়ে গেলেন?'

'কোথাও যেতে ইচ্ছা হয়েছিল হঠাৎ। তা আমারই মত একজন সঙ্গীও পেয়ে গেলাম, চলে গেলাম কাশী, বাবা বিশ্বনাথের চরণে। সেখানে সন্ন্যাসীদের এক মঠ আছে, আমাদের এদিকের যে কোন সাধু-সন্ন্যাসী সেখানে গিয়ে থাকতে পারে। এখানে যেমন ভজন গাইতাম, ওখানেও তাই গেয়ে দিন কাটত। কিন্তু ওটা আমাদের দেশ নয়, লোকেরাও অন্যরকম। মঠাধিকারী অবশ্য আমাদের এদিকেরই মানুষ। যাই হোক, কিছুদিন পরে ফিরে আসতে ইচ্ছা হল তাই চলেই এলাম।'

'অইয়াজী, আপনার মড়ুয়া, ডাল সব চুরি হয়ে গেছে, দেখেছেন কি?' জিজ্ঞাসা করে সর্বক্কা।

'রাতে দিয়াশলাই জ্বেলে দেখেছিলাম কিছু নেই। দুর্ভিক্ষের দিন, যারা উপোস করছিল তারাই কেউ খেয়েছে। যেই খেয়ে থাক মাটির জিনিস মাটিতেই গেছে তাতে আর দুঃখ কি?'

এক সের আটা চাইতে এসেছিল সর্বক্কা। তার বাড়িতে অতিথি এসেছে। নন্‌জম্মার কাছে আটা নিয়ে সর্বক্কা চলে যাবার পর মহাদেবায়াজী বললেন, 'তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

'কোথায়?' চমকে উঠল নন্‌জম্মা। আজ প্রায় বারো বছর হয়ে গেল কণ্ঠীজোইসজী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন, এতদিন পরে কোথায় দেখা গেল তাঁকে? কতবার তার মনে হয়েছে, বাবা বেঁচে আছেন কিনা কে জানে?

কাশীতেই দেখলাম তাঁকে। প্রায় মাসখানেক আগে একদিন সকালে গঙ্গার ঘাটে গেছি, সে ঘাটের নাম 'হনুমান ঘাট', সেখানে আমাদের দেশের কয়েকজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। শুধু আমাদের দেশের কেন সারা ভারতবর্ষ থেকেই তো রোজ কত লোক কাশীতে আসে। তা, তাঁরা সব শ্রাদ্ধ তর্পণ করছিলেন, তোমার বাবা উচ্চকন্ঠে মন্ত্রপাঠ করাচ্ছিলেন, আমি গিয়ে কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। তার দু'দিন পরে উনি নিজেই মঠে এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিশ কি এখনো আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?' তখন উনি বললেন, 'সেই আমাদের গ্রামের পাটোয়ারী শ্যামন্নার মৃত্যুর জন্য?' আমি তো সব কথা জানতাম না, যেটুকু জানা ছিল বললাম ওঁকে—'আপনি তো মামলায় জিতে গিয়েছিলেন, তারপর হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন কেন?' এ কথার কোন জবাব দিলেন না উনি, কিন্তু বললেন, 'বারো বছর হয়ে গেল গ্রাম ছেড়েছি, এবার ফিরে যাব আমি।' এরপর আর আমার সঙ্গে দেখা হয়নি, কোথায় থাকেন তাও আমাকে বলেননি।

নন্‌জম্মা সবই বুঝল এতদিনে। শ্যামন্না গ্রামে ফিরে বলেছিল, 'ঐ ব্যাটাকে খুঁজে পাওয়া গেলেই জজসাহেব ওকে ফাঁসীতে চড়াবেন।' সেই ভয়েই নিশ্চয় বাবা দেশান্তরী হয়েছিলেন। এই ধরনের মামলা নাকি বারো বছর পরে তামাদি হয়ে যায়, তখন মামলা-সংক্রান্ত সব কাগজ-পত্র কোর্ট থেকেই পুড়িয়ে ফেলা হয়। পুরোন কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল নন্‌জম্মা—'হায় রে, এমনি করে দীর্ঘদিন ঘর-সংসার ছেড়ে দেশান্তরী হয়ে ঘুরে বেড়ানোই ছিল আমার বাবার ভাগ্যলিপি?' ইতিমধ্যে চেন্নিগরায় ফিরে এসেছে। মহাদেবায়াজীকে দেখে সেও খুব খুশি। ওঁর ভজন শুনে দিনগুলো

বেশ আনন্দে কাটত চেন্নিগরায়ের। মহাদেবায়াজী এতদিন কোথায় ছিলেন সেই ইতিহাস শুনতে শুনতে কাশীর নাম শুনেই কৌতূহলী হয়ে ওঠে চেন্নিগরায়। কাশীর সম্বন্ধে কত রকম গল্পই তো শোনা যায়, মহাদেবায়াজী এক বছর থেকে এসেছেন সেখানে, তিনি নিশ্চয় খাঁটি খবর জানবেন।

চেন্নিগরায় জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা অইয়াজী, শুনি নাকি বড় বড় রাজা-মহারাজারা "সমারাধন" করান কাশীতে, তখন এক একটা লাড্ডুর সঙ্গে একটা করে টাকা দান করেন?'

রাজা-মহারাজাদের ধর্মশালাতো সেখানে অনেক আছে। অতিথিরা সেই সব ধর্ম-শালায় তিন দিন বিনা পয়সায় আহার পায়। তাছাড়া পালা-পার্বণের দিনও সবাই খেতে পায় সেখানে। কোন কোন বার লাড্ডুর সঙ্গে টাকাও দেওয়া হয়।

'তাহলে তো সেখানে গিয়েই বাস করা উচিত।'

'পাটোয়ারীজী, তুমি কি ভাবছ কাশীতে ভিখারী নেই? কি এমন দরকার সেখানে গিয়ে থাকার শুনি? দিনের পর দিন বিনা পয়সায় কোন রাজাই খাওয়াবে না।'

'থুঃ তাহলে জুতো মার অমন রাজাকে। এই যদি মুরোদ, তাহলে আর রাজা কিসের?'

এ কথার পর আর কোন মন্তব্যও করলেন না মহাদেবায়াজী। কিছুক্ষণ বসে তারপর যাবার উদ্যোগ করতেই নন্‌জম্মা বলল, 'আপনার মন্দিরের ডাল, মড়ুয়া সব তো চুরি হয়ে গেছে। আজকের মত একটু আটা, ডাল, লঙ্কার গুড়ো দিই? আর নয়ত আমাদের এখানেই আজ খেয়ে যান।'

একটু ভেবে মহাদেবায়াজী বলেন, 'এ গ্রামে থাকব বলেই তো এলাম। আশেপাশের গ্রামে ভিক্ষায় যাব, এখানে আমার স্বজাতিদের তো কোন বিবেচনাবোধ নেই। খাবার এখানেই খেয়ে যাব'—এই বলে তখনকার মত বিদায় নিলেন তিনি।

মন্দিরে ফিরে আসার আধ ঘন্টার মধ্যেই বেনেরা একে একে আসতে শুরু করল। রেবন্নাশেট্টী, শেট্টপ্পা, মরুলপ্পশেট্টী, লিঙ্গদেব সবাই এসে মহাদেবায়াজীকে একেবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। রেবন্নাশেট্টী বলে ওঠে, 'অইয়াজী, আপনি সাধু-পুরুষ, রাগ করে চলে গেলেন, তারপর থেকেই গ্রামে বৃষ্টি নেই, ফসল হল না। কাল আপনি ফিরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা নেমেছে। আমরা ভুল বুঝে পাপ করেছিলাম। আমাদের অপরাধ নেবেন না, দয়া করে রোজ আমাদের বাড়ি ভিক্ষা গ্রহণ করবেন, তাতে ধন্য হব আমরা।'

সে কথা তো কবেই ভুলে গেছেন মহাদেবায়া। আজ এরা এসে বলছে, তিনি চলে গিয়েছিলেন বলেই নাকি অনাবৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু অনাবৃষ্টি তো কেবল রামসন্দ্রে হয়নি, সমস্ত পূর্বাঞ্চলেই হয়েছিল। এমনকি তামিল, তেলেগু অঞ্চলেও বর্ষা হয়নি—ট্রেনে আসবার পথেই দেখেছেন তিনি। কাজেই তাঁর আগমনের সঙ্গে বর্ষার সম্বন্ধ কোথায়? গতকাল তো শুধু এ গ্রামে নয়, আশেপাশের সমস্ত গ্রামেই বৃষ্টি হয়েছে। মহাদেবায়াজী বললেন, 'আমার কোনই মহত্ব নেই। বৃষ্টি হওয়া না হওয়া সবই শিবের ইচ্ছা। মানুষের পাপ-পুণ্য অনুযায়ী ঈশ্বর যাকে যা দেবার তাই দেন। সবাই নিজের নিজের ভাগ্যেই খেতে পায়।'

কিন্তু এসব কথা কেউ কানেই তুলল না। সবাই বার বার অনুনয় করতে লাগল, মহাদেবায়াজী যেন রোজ তাদের প্রত্যেকের বাড়ি ভিক্ষা গ্রহণ করে তাদের কৃতার্থ করেন। মহাদেবায়াজী সোজাসুজি 'না' বললেন না। উনি শুনেছেন এখন সকলেরই ঘরে অভাব। দুপুরে ভিক্ষার পর ঘুরে এসে মন্দিরে বসেই আহার করলেন। নন্‌জম্মার বাড়িতে খেতে যাবেন রাত্রে। নন্‌জম্মার ছোট ছেলে বিশ্বর মহাদেবায়াজীকে ভাল করে মনে নেই, তাকে সঙ্গে নিয়ে খেতে বসবেন আগের মত। দুপুরে সে আজকাল স্কুলে যায়।

সারা গ্রামের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল মহাদেবায়াজীর গ্রাম ত্যাগের ফলেই এই অনাবৃষ্টি আর দুর্ভিক্ষের অভিশাপ নেমে এসেছিল গ্রামে। কাল রাত্রে তিনি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষা নেমেছে। গ্রামের কামার, কুমোর, চাষা, রাখাল সব জাতের মানুষ মন্দিরে এসে প্রণাম করে গেল মহাদেবায়াজীকে। কিন্তু প্যাটেল শিবেগৌড়ের মত লোকেরা একথা মানতে চায় না। সেদিন রাত্রে মহাদেবায়াজী মন্দিরে শুয়ে আছেন, প্রায় মধ্য-রাত্রে কে যেন এসে 'অইয়াজী, অইয়াজী' বলে ডাকাডাকি শুরু করল। উঠে বসে দিয়াশলাই জ্বেলে দেখেন শিবেগৌড়ের চাকর গৌরব। সে তাঁর পা ছুঁয়ে বলে ওঠে, 'আমাকে শাপ দেবেন না, আমার কোন দোষ নেই।'

'কেন? কি হয়েছে? উঠে বস দেখি।'

'সারা গ্রাম যখন ফাঁকা সেইসময় গৌড়জী এসে আপনার মড়ুয়া আর ডাল নিয়ে গেছেন। তালাটা উনিই ভেঙেছিলেন। আমি শুধু মাথায় করে জিনিসগুলো নিয়ে গিয়েছিলাম, সব ওঁর কুঁড়েতে, আমার নিজের ঘরে কিচ্ছু নিয়ে যাইনি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে, তোর কোন দোষ হয়নি।'

'আমি বলে দিয়েছি কাউকে বলবেন না যেন।'

'না বলব না' ভরসা পাবার পর চলে গেল গৌরব। প্যাটেল শিবেগৌড় কি চরিত্রের লোক তা মহাদেবায়াজী ভাল করেই জানেন। মন্দিরের তালা ভেঙে মড়ুয়া চুরি করা কোন দুর্ভিক্ষপীড়িতের কাজ নয় এটা তিনি আগেই আন্দাজ করেছিলেন।

পরদিন সকালে বেলা দশটা নাগাদ একটা বিশেষ ঘটনা ঘটল। একশটা ভোমরা একসঙ্গে উড়লে যেমন শব্দ হয় তেমনি আওয়াজ শোনা গেল হঠাৎ। মাঠে-ঘাটে যে যেখানে ছিল সবাই ঘাড় তুলে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে বিরাট একটা সাদা গরুড় পক্ষীর মত কি যেন উড়ছে। ডানা দুটো নাড়ছে না কিন্তু, তাছাড়া চঞ্চুও নেই পাখিটার, কিন্তু লেজের কাছেও কি একটা ডানার মতই দুদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। পাখিটা গ্রামের ওপর এসে কি যেন নিচে ফেলে দিল। বাতাসে উড়ে আসা শুকনো পাতার মত এক গোছা কাগজ ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। এমন জিনিস গ্রামের কেউ আগে দেখেনি। তবে অনেকেই আন্দাজে বুঝল একেই বলে উড়োজাহাজ। একটা কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে পড়ে ফেলল নন্‌জম্মা।

মহীশূর রাজের তরফ থেকে সরকার এই নোটিস্ ছাপিয়ে বিলি করছেন। এতে জানানো হচ্ছে যে, 'য়ুরোপের যুদ্ধে জার্মানরা ক্রমেই এগিয়ে চলেছে। জাপানীরা হিন্দুস্থান দখল করতে আসছে। আমাদের মহীশূর রাজ্যেও বোমা পড়তে পারে। উড়োজাহাজ দেখলে কেউ বাইরে আসবে না, যে যেখানে আছ সেখানেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে।

শত্রুদের দমন করার জন্য যুদ্ধ ভাণ্ডারে সবাই অর্থদান কর।' ---সবশেষে লেখা আছে 'বিজয়' এই শব্দটি।

এর প্রায় এক সপ্তাহ পরে এলাকাদার এলেন রামসন্দ্র গ্রামে। যুদ্ধ ভাণ্ডারের জন্য অর্থসংগ্রহ করার আদেশ হয়েছে সরকার থেকে। এই রাজসরকারই গত বছর দুর্ভিক্ষের জন্য খাজনা মাফ করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন ইংল্যাণ্ডের রাজচক্রবর্তীর যুদ্ধজয়ের জন্য টাকা চাই, প্রজাদের যথাসাধ্য দিতেই হবে। এলাকাদার বেচারা না এসে আর কি করেন? শিবেগৌড়, কাশিমবদ্দি প্রভৃতি ধনীদের কাছে যথাসাধ্য আদায় করলেন। গ্রামের বাইরে দোকানের মালিক নরসীও দিল পাঁচ টাকা চাঁদা। সারা রামসন্দ্র থেকে পাওয়া গেল মোট একশ' টাকা। এলাকাদার যাবার সময় বলে গেলেন, 'যাক, আপনাদের গ্রামের মান রক্ষা হয়েছে।'

পরের দিন রামন্না স্কুল থেকে ফিরে দেখাল তার জামায় পিন দিয়ে লাগানো এক-টুকরো কাগজ তাতে ইংরিজী 'V' অক্ষর ছাপা। সব ছেলেরা নাকি স্কুল থেকে শোভাযাত্রা করে বেরিয়েছিল। 'এই দেখ মা একে বলে "ভি", তোমায় শিখিয়েছিলাম না?'

'তা, এর মানে কি?'

'V' মানে ভিক্টরি, অর্থাৎ যুদ্ধে আমাদেরই জয় হবে। হেড-মাস্টারমশাই বলে দিয়েছেন, যুদ্ধের জন্য সব ছেলেকে দু আনা করে চাঁদা নিয়ে যেতে হবে। রামন্না মাকে বোঝাচ্ছিল। মা তখন ভাবছে, 'দু আনা পয়সা যোগাড় করবে কোথা থেকে?'

একাদশ অধ্যায়

এত বছর কেটে গেল, এখনও কমলার সন্তান হল না। অক্কম্মার মনে দারুণ দুঃখ, নিজের হাতে মানুষ করা নাতি, সেই নাতির কিনা একটিও ছেলে-পিলে হল না? ছেলে-পিলে না হয় নাই হল, কিন্তু বৌটিও জুটল এমন যে, স্বামী আর দিদি-শাশুড়ীকে একটি দিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয় না।

নাগলাপুর গ্রামও রামসন্দ্রের মতই পড়েছিল অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কবলে। কিন্তু কল্লেশের সাংসারিক বুদ্ধি যথেষ্ট। সে প্রায় এক বছরের মত শস্য জমা করেছিল নিজেদের ভাঁড়ারে। গত বছর অনাবৃষ্টির সূচনা দেখেই সে খেতে 'কোদো'র চাষ করেছে; এতে বেশী জল লাগে না। কাজেই বৃষ্টি না হলেও তিন খণ্ডি কোদো পাওয়া গেল খেত থেকে। মড়ুয়া তো ঘরে ছিলই প্রচুর। কেবল ধানটাই ছিল একটু কম। কোদোর দানাও ভাতের মতই সুস্বাদু। কিন্তু কল্লেশের আবার ওটা সহ্য হয় না। তার বাঁ হাত-খানায় এমনিতেই জোর কম, তার ওপর কোদোর দানার ভাত খেলেই হাতটা কাঁপতে থাকে। তাই কোদো খায় না সে। এক পল্লা ধান ছিল ঘরে, তাই মাঝে মাঝে কুটে নিলে অন্ততঃ পঞ্চান্ন সের চালের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সেই ব্যবস্থাই হল। রুটির সঙ্গে রোজ আধপোয়া চালের ভাত রাঁধলেই কল্লেশের খাওয়া হয়ে যাবে ঠিক মতো। অক্কম্মা স্থির করল, সে আর কমলা কোদোর দানার ভাত খাবে।

বাড়িতে দু'রকমের ভাত হচ্ছে, স্বামীকে এক রকম আর তাকে অন্যরকম ভাত দেওয়া হচ্ছে দেখে খেপে উঠল কমলা। স্বামীর চেয়ে তার খাতিরটা কম কিসের? নাগলাপুরে বারো বছর বাস করার পরেও সে কিছুতেই ভুলতে পারে না যে, সে হাসানের শহুরে মেয়ে। এই জিদের বশে কমলা ভুলেও কোনদিন মড়ুয়ার রুটি স্পর্শ করেনি। এখন কিনা তাকে কোদোর দানার ভাত খেতে দেওয়া হচ্ছে? সেদিন রান্না শেষ করে অক্কম্মা বাগানে গিয়ে বসে পড়ল একটা পেঁপে গাছের তলায়। কল্লেশ কাজ করছিল বাগানে। মড়ুয়া, চাল, ডাল এসব জিনিসের দুর্ভিক্ষ হোক বা নাই হোক, কল্লেশের সব্জীর বাগান সর্বদাই ভরা থাকে। সে চুপচাপ কাজ না করে বসে থাকতেই পারে না। সব্জীর চারাগুলোর গোড়া থেকে মাটি সরিয়ে, গোবরের সার মেশানো মাটি ঢেলে তার ওপর আবার মাটি চাপা দিয়ে তাতে বেশ খানিকটা জল সেচ করে কল্লেশ ভাবল, এবার খেয়ে নেওয়া যাক; তারপর আবার বাগানের পরিচর্যা করা যাবে। 'অক্কম্মা খেতে দাও এবার' বলে কল্লেশ কুয়ো থেকে এক ঘড়া জল তুলে হাত-পায়ের মাটি ধুতে শুরু করল।

অক্কম্মা ভিতরে এসে দেখে কমলা রুপোর থালায় ভাত বেড়ে খেতে বসেছে। কল্লেশের জন্য রাঁধা ভাত সবটাই রয়েছে সেই থালায়, হাঁড়ি একেবারে খালি করে ভাত ঢেলে নিয়েছে। প্রচুর ঘি মিশিয়ে ডাল নিয়ে পরিপাটি করে মেখে গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে। কাণ্ড দেখে অক্কম্মা একেবারে যাকে বলে 'থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কমলার কোন ভ্রুক্ষেপই নেই সেদিকে, সে বেশ মন দিয়ে খাচ্ছে। এই সময় কল্লেশ এল ভিতরে। দৃশ্যটা দেখে কিছুই বুঝতে বাকি রইল না তার। সোজা উনুনের কাছে গিয়ে একখানা চ্যালাকাঠ তুলে নিয়ে স্ত্রীর গায়ে-মাথায় এলোপাতাড়ি প্রহার শুরু করল সে।

অক্কম্মা তাকে থামাতে গেল, 'মারিস নে, খাচ্ছে, খেয়ে নিক।' কিন্তু কল্লেশের হাতের ধাক্কায় সেও ছিটকে পড়ল দেওয়ালের কোণে।

কমলু চিৎকার করে উঠল, 'মারতে এসেছেন! ও'র ভাত খাচ্ছি, তাই মারতে এসেছেন। বৌকে ভাত দেবার মুরোদ নেই, কোদো খেতে দিতে লজ্জা করে না? কেবল মারতেই জান, আর তো কিছুই জান না!'

রেগে আগুন হয়ে উঠেছে কল্লেশ। মারতে মারতে কাঠখানা ভেঙে টুকরো হয়ে গেল, কাঠের চোকলা হাতে ফুটে রক্ত বেরিয়ে গেল কল্লেশের। কমলার ততক্ষণে সারা শরীর ফুলে উঠেছে, রক্তও বেরোচ্ছে জায়গায় জায়গায়। কাঠের ভাঙা টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, জামাটা গায়ে গলিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল কল্লেশ, খাওয়া হল না তার। এরকম ব্যাপার প্রায়ই ঘটে থাকে। এরকম সময়ে সে কোথায় যায় তা নিশ্চিতভাবে জানে না কেউ, কিন্তু কিছুটা আন্দাজ করতে পারে অক্কম্মা। কমলুও যে কিছু বোঝে না, তা নয়। মরুবনহল্লীতে আছে দেবী, হোসুরুর কাছে দোবরপাল্যাতে মুনিয়া, নাগলা-পুরেই আছে পুট্টি আর নয়ত পুলিশ কনস্টেবল মম্মিসাবীর তিন নম্বর বউ, এদের কারো কাছে এখন যাবে কল্লেশ। খাওয়া-দাওয়াও করবে সেখানেই। তবে যেখানেই যাক, মধ্যরাত্রির আগেই বাড়ি ফিরে আসবে, এক দিনের বেশী কোথাও থাকে না সে।

কল্লেশ চলে যাবার পর কমলা অক্কম্মার উদ্দেশ্যে বচনামৃত ঝাড়তে শুরু করল, 'ছেনাল বুড়ি, নাতিকে বলে আমাকে মার খাওয়াচ্ছে! বুড়ি তুই উপোস করে মর, তোর লাশ যেন রাস্তার কুকুরে ছিঁড়ে খায় ...।'

কোন জবাব দিল না অক্কম্মা। এ বাড়িতে ভাল রান্না-বান্না হলেও, দুপুরবেলা বাড়ির মানুষ যে তৃপ্তি করে বসে খেতে পাবে, এমন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কখনো কল্লেশের মেজাজ খারাপই থাকে, আবার কোনদিন কমলাই বিগড়ে দেয় স্বামীর মেজাজ। কিছু না কিছু খিটি-মিটি লেগেই থাকে। কিন্তু আজ বড় বাড়া-বাড়ি করেছে দু'জনেই। অক্কম্মা আবার বাগানে গিয়ে গাছের ছায়ায় বসে থাকে চুপ করে।

স্ত্রীকে প্রহার করার সময় হাতের সঙ্গে সঙ্গে মুখও সমানে চলে কল্লেশের। মারের শব্দ শোনে পাশের বাড়ির লোকেরা, আর গালাগালগুলো শুনতে পায় আরো অন্ততঃ বিশজন প্রতিবেশী। কল্লেশ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই এসে হাজির হল পাটোয়ারী শ্যামন্নার পুত্রবধূ। সে প্রায় কমলারই সমবয়সী, গত পাঁচ-ছ' বছর ধরে দু'জনের মধ্যে খুব ভাব, একসঙ্গে পুকুর-ঘাটে যায় তারা। কমলুও প্রায়ই যায় ওদের বাড়ি বেড়াতে।

শ্যামন্নার স্ত্রী মারা গেছে আজ প্রায় দু' বছর, পুট্টগৌরীই এখন ও-বাড়ির গৃহিণী। স্বামী তার খুবই অনুগত, যা বলে তাই শোনে। কমলার সব ব্যাপারেই পুট্টগৌরী হল পরামর্শ-দাত্রী। সে এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করে বলে কল্লেশ অবশ্য বিশেষ ভ্রুক্ষেপ করে না, তবে অক্কম্মা তাকে স্পষ্টই নিষেধ করেছিল। কিন্তু পুট্টগৌরী উদ্ধত ও বেপরোয়া, অক্কম্মাকে সে গ্রাহ্যই করে না। সে দিব্যি আসে, কমলার সঙ্গে গল্প করে; তারপর আবার কমলাকেও টেনে নিয়ে যায় নিজের বাড়ি। অক্কম্মার মনে হয়, কল্লেশের বৌকে কুমন্ত্রণা দিয়ে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করানোর উদ্দেশ্যেই শ্যামন্না বোধহয় যখন তখন পুত্রবধূকে পাঠিয়ে দেয় এ বাড়িতে। কল্লেশেরও তাই অনুমান। তবু সে এই নিয়ে আজকাল আর চেঁচামেচি করে না। অক্কম্মার এটা পছন্দ নয়, সে মনে করে ঐ পুট্টগৌরীর সঙ্গ ছাড়াতে পারলে কমলাকে হয়ত কিছুটা সংশোধন করা সম্ভব হবে।

কল্লেশ বাড়ি থেকে বেরোতেই এ দিনও পুট্টগৌরীর আবির্ভাব। শোবার ঘরে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়েছিল কমলা। পুট্টগৌরী নুনের পুঁটলী তৈরী করে আঘাতের জায়গাগুলোতে সেঁক দিতে দিতে বান্ধবীকে অনেক সান্ত্বনা দিল। বিকেলবেলা বাড়ি গিয়ে একথালা ডাল-ভাত নিয়ে এসে কমলাকে খাওয়ালো বসে বসে। অর্থাৎ এ বাড়ির অপমানের চূড়ান্ত করে ছাড়ল। 'কল্লেশ জোইস বউকে এত কষ্ট দেয়, আমি গিয়ে এখন তাকে খাইয়ে এলাম'—এ কথাটা সারা পাড়ায় বেশ ভালভাবে রাষ্ট্র করে শূন্য থালাখানা দেখাতে দেখাতে বাড়ি ফিরল সে।

পরদিন বাড়ি ফিরল কল্লেশ। দেখল স্ত্রী বাগানের দিক থেকে এসে হাত-মুখ ধুয়ে কফি তৈরী করে খেয়ে আবার ঢুকল গিয়ে তার গোঁসাঘরে। গতকাল প্রহারের সময় কমলার কানের কানফুল দুটো ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। আজ কমলা সন্দেহ প্রকাশ করেছে, সেই ভাঙা টুকরোগুলো অক্কম্মা হয় ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিয়েছে, আর নয়ত নাতনীকে দেবে বলে লুকিয়ে রেখেছে। অক্কম্মা চটে বলেছে, 'চুরি করার অভ্যাস নেই আমার বুঝলি?' কমলু জবাব দিয়েছে, 'তবে গেল কোথায় আমার বিয়েতে পাওয়া কর্ণফুল? আমাকে আবার নতুন করে গড়িয়ে দিতে হবে, না হলে আমি বাবাকে চিঠি লিখব বলে দিচ্ছি!'

বাড়িতে ফিরে আজ কল্লেশের মেজাজটা একটু নরম আছে। সকালবেলা ঘর ঝাঁট দিয়ে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়েছে, সে জায়গাটা কল্লেশ নিজেই খুঁজে দেখল। অক্কম্মা কমলার গয়না ননজুর জন্য লুকিয়ে রাখবে এটা সে মোটেই বিশ্বাস করে না। তার মনে হচ্ছিল, কাল মারটা শুধু পিঠের ওপর চালালেই হত, কানে মারাটাই ভুল হয়েছে।

দু' মাস ধরে কমলা কান খালি করে ঘুরছে, এটা স্বামীর পক্ষে সম্মানজনক নয়, অগত্যা কোন মতে সত্তর টাকা জোগাড় করে কল্লেশ বউকে নতুন একজোড়া কানফুল গড়িয়ে দিল।

২

বছরখানেক কেটে গেছে এরপর। ভাল বৃষ্টি হয়নি বলে গ্রামে এখন পানীয় জলের অভাব। অনেক দূরে একটা বড় পুকুর থেকে রোজ খাবার জল আনতে যায় কমলা। সে পুকুরও শুকিয়ে এসেছে; তাই পুকুরের মধ্যে ছোট ছোট চারটে কুয়ো খোঁড়া হয়েছে।

রোজ অনেকটা পথ যেতে হয়। সেদিনও কমলা গেছে জল আনতে। একাদশী বলে অক্কম্মাও গেছে গ্রামের বাইরে কেশবমন্দিরে পুজো দিতে। মাথায় একটা ও হাতে একটা কলসী নিয়ে পুট্টগৌরী এল কল্লেশদের বাড়িতে। 'কমলু' বলে ডাক দিয়ে ভিতরে এল কিন্তু দেখতে পেল না কাউকে। খিড়কি দরজা পর্যন্ত দেখে এল কেউ কোথাও নেই। ফিরে যাবে ভেবে পেছন ফিরতেই দেখে বাইরে যাবার দরজাটা কে বন্ধ করে দিয়েছে। 'এটা কি হল' ভাবতে ভাবতে আবার খিড়কির দিকে ফিরতে দেখে সে দরজাটাও ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। বাড়ির ভেতরটা ঝাপসা অন্ধকার। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গেল পুট্টগৌরী, কিন্তু তার আগেই কে যেন মুখ চেপে ধরল তার।

মুক্তি পেয়ে বাড়ির দিকে যখন পা বাড়াল পুট্টগৌরী তখনও বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। 'উঃ, লোকে বলে কল্লেশজোইস বাইরে গিয়ে যাই করুক নিজের গ্রামের মধ্যে নাকি কোন উপদ্রব করে না! আমি বামুন বাড়ির বৌ, ওরই স্ত্রীকে জল আনতে যাবার জন্য ডাকতে গেছি, আমাকে এইভাবে মুখ চেপে ধরে বন্দী করে ফেলল?' হাত-পা এখনও ঠক্-ঠক্ করে কাঁপছে, সারা অঙ্গে যেন অসহ্য জ্বালা অনুভব করছে পুট্টগৌরী।

নিজেদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই পথে চার-পাঁচজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ তোমার চিৎকার শুনলাম যেন? কি হয়েছিল?' শ্বশুর শ্যামন্না আর স্বামী নন্‌জুণ্ডয়া বাড়িতেই ছিল। সবাইকে বলল সে, 'কিছুই হয়নি। ওদের বাড়ির বেড়ালটা হঠাৎ আমার ওপর লাফিয়ে পড়েছিল।' একজন বলে উঠল, 'আমি তো কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে ভেবে ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি পথের ওপরের দরজাটা বাড়ির ভেতর থেকে বন্ধ।'

থত-মত খেয়ে পুট্টগৌরী বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, কমলা তো খিড়কির দিকে ছিল কি না!'

যারা খোঁজ নিতে এসেছিল, সবাই চলে গেল। কিন্তু এই সময় দেখা গেল কল্লেশের স্ত্রী কমলা পুকুর থেকে জল ভরে নিয়ে ফিরছে ওদেরই বাড়ির সামনে দিয়ে। শ্যামন্না সন্দিগ্ধভাবে ভেতরে এসে পুত্রবধূকে জেরা শুরু করল এবার, 'কি হয়েছে ঠিক-ঠাক বল দেখি? কেউ যদি বজ্জাতী করে থাকে ফাঁসীতে লটকে ছাড়ব আমি। কোন ভয় নেই, সব খুলে বল।'

'কমলাকে খুঁজতে পেছনের দরজা পর্যন্ত গেছি, গিয়ে দেখি কেউ নেই ওদিকে। ফিরে আসছি, এমন সময় হঠাৎ কল্লেশজোইস এসে বললে, 'কেন ঢুকেছিস আমার বাড়িতে?' আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠে পেছন দিকের দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছি। আমাকে "তুই" করে কথা বলেছে।'

পুত্রবধূর কথা কতটা বিশ্বাসযোগ্য কে জানে? কিন্তু শ্যামন্নার মনে হল এই নিয়ে বেশী হৈচৈ করলে তারই পরিবারের সম্মানহানির আশঙ্কা আছে যথেষ্ট। ছেলে নন্‌জুণ্ডয়াও তখন কিছু বলল না, কিন্তু স্ত্রীকে সে কড়া আদেশ জানিয়ে রাখল, 'আর কোনদিনও ঐ হারামজাদার বাড়ি যাবে না।'

কল্লেশের বাড়িতে এসে শ্যামন্নাজীর সঙ্গে দেখা হল কমলুর। অক্কম্মা তখনও মন্দির থেকে ফেরেনি। কল্লেশও বাড়িতে নেই। কমলাকেই শুনিয়ে দিল সে, 'আমাদের বৌ জল আনবার জন্য তোমাকে ডাকতে এসেছিল, কল্লেশ তাকে অপমান করে কথা বলেছে।

ওর নামে মামলা করে ওকে সাজা দেওয়াতে পারি আমি। যাক, সেসব কিছু করছি না। কিন্তু এরপর থেকে তুমি আর আমাদের বাড়ি যাবে না, আমাদের বৌও আর পা দেবে না এ বাড়িতে।'

দু'দিন কোথাও ঘুরে-ফিরে তৃতীয় দিন রাত দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরল কল্লেশ। অক্কম্মা উঠে তার জন্য ভাত আর তেঁতুলের ঝোল রেঁধে খেতে দিল। কল্লেশ জানতে চাইল, শ্যামন্না এসে ইতিমধ্যে কিছু উপদ্রব করেছে কি-না। কমলার কান বাঁচিয়ে নিচু গলায় অক্কম্মা বলল, 'শুনছি নাকি পরশু ওদের বৌ এবাড়ি এসেছিল, তুই নাকি তাকে "এখানে কেন ঢুকেছিস?" বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিস? শ্যামন্না বলে গেছে, তার পুত্রবধূর সঙ্গে এরকম অসভ্য ব্যবহার করা উচিত হয়নি। শাসিয়ে গেছে, কমলা যেন আর ওদের বাড়ি না যায়। ওদের বৌও আর এখানে আসবে না। বাঁচা গেছে। আরো বছর চারেক আগেই তো এ কথাটা বলে দিতে পারতিস, তাহলে আর এতদিন ধরে এ হতচ্ছাড়ির মাথাটা এভাবে খেতে পারতো না। এ মেয়েটাকে একটু বশে রাখা যেত।'

শ্যামন্না বেশী কিছু শোরগোল করেনি জেনে কল্লেশ নিশ্চিন্ত হল। আসল ব্যাপারটা মনে হচ্ছে অক্কম্মা এবং কমলা কেউই জানে না।

পুট্টগৌরী আর কমলুর বন্ধুত্ব একেবারেই ভেঙে গেছে। কুয়োতলাতে সেদিন দেখা হওয়ায় কমলা কথা বলতে এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পুট্টগৌরী মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। মনে হচ্ছে কমলার সঙ্গে আর এ-জন্মে সে কথা বলবে না। এতদিনের বান্ধবীকে হারানোর ব্যথা তো আছেই, কিন্তু তা ছাড়াও একটা দুশ্চিন্তা কমলাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ব্যাপারটা কাউকে বলাও যায় না আবার চুপ করে থাকাও সম্ভব নয়।

সাত-আট দিন মনে মনে অনেক চিন্তা করে অবশেষে কমলা সোজা গিয়ে হাজির হল শ্যামন্নার বাড়িতে। এ সময়ে শ্যামন্না বা নন্‌জুন্ডয়া বাড়িতে থাকবে না তা জানাই আছে। ভিতরে গিয়ে পুট্টগৌরীকে সে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, 'উনি না হয় রাগের মাথায় কিছু বলে বসেছেন, কিন্তু তাই বলে আমাদের এতদিনকার বন্ধুত্বের সম্পর্ক একেবারে মুছে ফেলতে হবে?'

সহসা কোন উত্তর যোগাল না পুট্টগৌরীর মুখে। একটু পরে বলল, 'তেমন তেমন কথা একটা বললেও যথেষ্ট। আর আমার দরকার নেই তোমার ভালবাসায়, আমি আর ওদিক মাড়াব না। তুমি এখানে এসেছো জানতে পারলে আমার শ্বশুর তোমায় কেটে দু'খানা করে ফেলবে। চুপচাপ চলে যাও।'

'ঠিক আছে যাচ্ছি, কিন্তু আমার কানফুল আর টাকাগুলো দিয়ে দাও।'

'কোন কানফুল? কিসের টাকা?' একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়ে পুট্টগৌরী।

'ও আবার কোনদেশী কথা? এক বছর আগে সেই যেদিন আমায় ধরে মেরেছিল, সেদিন যেগুলো তোমার কাছে এনে দিয়েছিলাম? তাছাড়া জল নিতে আসার সময় যে ঘড়ার মধ্যে ভরে চাল, কফির বীজ এসব এনে দিয়েছি তার দরুন পনেরো টাকা আমার পাওনা আছে না?'

'দেখ্ কমলু, মিথ্যে বললে জিভে পোকা পড়বে তোর। যা যা বাড়ি যা, এখনই এ

বাড়ির লোক এসে পড়বে, আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়াসনে। শ্বশুরমশাই তো এই এখনি এলেন বলে।'

রাগে সারা শরীর জ্বলছে কমলার, থরথর করে ঠোঁট কাঁপছে কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। 'অমন ভারী মজবুত কানফুল, অন্ততঃ আশি টাকা দাম হবে, তাছাড়াও পনেরো টাকা। এ ছেনাল সবটা হজম করবে ভেবেছে? এই মতলবেই আমার স্বামীর নামে বদনাম দিয়ে সেই ছুতোয় আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে। টাকা যদি না আদায় করতে পারি তো আমি হাসানের মেয়েই নই।' এইসব ভাবতে ভাবতে এদিক-ওদিক দেখছিল কমলা, নজর পড়ল পিছনের ঘরে বিরাট ঘড়াটার দিকে। কমলার আর যেন কোন কাণ্ডজ্ঞান রইল না। সে যা করছে তার পরিণাম কি হতে পারে, তাও ভেবে দেখল না সে। ছুটে গিয়ে ঘড়ার জল ফেলে দিয়ে দু'হাতে তুলে নিল ঘড়াটা। 'আমার টাকা ফেরত দিয়ে ঘড়া ছাড়িয়ে আনিস', বলেই বাড়ির দিকে চলল কমলা। কিন্তু এত সহজে হার-মানবার পাত্রী পুট্টগৌরী মোটেই নয়, সে কমলার পথ রোধ করে চিৎকার শুরু করে দিল, 'ওগো, কে আছ, দেখ আমার বাড়িতে ঢুকে ঘড়া চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছে!' কিন্তু দেখা গেল গায়ে শক্তি কমলারই বেশী, ধাক্কা দিয়ে পুট্টগৌরীকে মাটিতে ফেলে দিয়ে কমলা ঘড়াটা মাথায় তুলে ছুটতে ছুটতে চলে এল নিজেদের বাড়িতে।

রাস্তায় বেশ কিছু লোক এভাবে ঘড়া মাথায় নিয়ে কমলাকে ছুটতে দেখেছে। অবশ্য এটা তাদের কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়নি। কল্লেশ বাড়িতে ছিল না। কমলা ঘড়াটা রান্নাঘরের কোণে রেখে, বাড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিল চটপট। ব্যাপার বুঝতে না পেরে অক্কম্মা জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে, ও ঘড়াটা কাদের বাড়ির?' কিন্তু কোন উত্তর পেল না। এদিকে নিজের মনে কমলা বিড় বিড় করে বকে চলেছে, 'চোর কোথাকার, আমার টাকাগুলো হজম করার জন্য কত ঢংই করল! ওঁর মেজাজ কি-রকম তা যেন জানে না। 'কেন এসেছো' জিজ্ঞেস করা হয়েছে তো ভারী দোষ হয়েছে! টাকাগুলো মেরে দেবার জন্য একটা ছুতো খোঁজা হচ্ছিল আর কি! এবার ঘড়ার খোঁজে আসুক এ বাড়িতে, তখন মজা দেখাব জোচ্চোরটাকে।' অক্কম্মা শুনতে পেল কথাগুলো, কিন্তু মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝল না।

ইতিমধ্যে বাইরে একটা শোরগোল শোনা গেল—শ্যামন্না চেঁচাচ্ছে, 'চোর, ঘড়া চুরি করে এনেছে', আরো অন্ততঃ বিশ-তিরিশ জন লোক জড়ো করে এনেছে সে। বাইরের দরজায় ঘা পড়ল এবার। কমলা বলতে যাচ্ছিল, 'উনি না এলে দরজা খুলো না', কিন্তু অক্কম্মা কিছু না বুঝে আগেই দরজা খুলে দিয়েছে। বাড়ির সামনে তখন লোকে লোকারণ্য, যেন মেলা বসেছে। শ্যামন্না বলল, 'অক্কম্মা, আপনাদের বৌ আমার বাড়ি থেকে ঘড়া নিয়ে এসেছে, ফেরত দিন ঘড়াটা।'

কমলা ঘরের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার টাকা না পেলে ঘড়া কিছুতেই দেব না।'

কিছু বুঝতে না পেরে অক্কম্মা বলল, 'কল্লেশ মাঠের দিকে গেছে, কেউ তাকে ডেকে আন গিয়ে।' দু'জন তখনি ছুটল কল্লেশের খোঁজে। ফেরার পথেই তারা কল্লেশকে

জানিয়ে দিল তার স্ত্রীর কীর্তিকাহিনী। বাড়িতে ঢুকে কল্লেশ সোজা গিয়ে প্রশ্ন করে স্ত্রীকে, 'কি হয়েছে শুনি?'

'ঐ চোরটা আমার টাকা মেরে নিয়েছে।'

'কিসের টাকা? কোথায় পেল সে টাকা জিজ্ঞাসা কর দেখি', বলে উঠল শ্যামন্না।

'আমি ওকে এক জোড়া কানফুল আর পনেরো টাকা দিয়েছিলাম।'

'কোন কানফুল? কোথায় পেলে সে কানফুল?'

'আমার কানফুল ভেঙে গিয়েছিল, ওকে দিয়েছিলাম ঠিক করাতে।'

'কানফুল ভেঙেছিল তো মেরামত করাতে স্বামীকে না দিয়ে ওর হাতে দিয়েছিলে কেন? আর পনেরো টাকাটা কিসের?'

'আমার কাছে ও চাল আর কফি বীজ নিয়েছিল।'

'শোন সবাই। কেউ কখনো একথা বিশ্বাস করবে?' শ্যামন্না উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলল কথাটা।

'কেউ বিশ্বাস না করল তো বয়ে গেল। আমার টাকাগুলো মেরে নেবার মতলব করেই মিছিমিছি আমার স্বামীর নামে বদনাম করেছে আর সেই ছুতোয় কথা বন্ধ করেছে আমার সঙ্গে। কি এমন কথা বলেছে ওকে আমার স্বামী? ডেকে পাঠাও না তাকে, নিজের সন্তানের মাথায় হাত রেখে দিব্যি করে বলুক দেখি!'

'বাঁজা মেয়েমানুষ! তুই কার মাথায় হাত রেখে দিব্যি করবি শুনি?' গর্জে উঠল শ্যামন্না।

আলোচনাটা বেশ বিপজ্জনক পথে অগ্রসর হচ্ছে। কল্লেশের ভয় হল, এইসব শপথ করাকরি শুরু হলে পুট্টগৌরী ঘাবড়ে গিয়ে সত্যি কথাটা ফাঁস করে ফেলতে পারে। সে অক্কম্মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় রয়েছে সে ঘড়া?'

'ওই তো, রান্নাঘরে রেখে এসেছে।'

কল্লেশ আর কথা না বাড়িয়ে ঘড়াটা এনে রেখে দিল শ্যামন্নার সামনে। 'আমার টাকা, আমার কানফুল ফিরিয়ে না দিলে ঘড়া দিও না', বলতে বলতে ছুটে এল কমলা; কিন্তু এক ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিল কল্লেশ।

'ছেনাল চোর কোথাকার! মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেওয়া উচিত' মন্তব্য প্রকাশ করে শ্যামন্না সেখানে উপস্থিত চৌকিদারকে হুকুম দিল, 'ঘড়াটা বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যা।'

বাড়ির সামনের ভীড় ক্রমশ পাতলা হচ্ছে। কিন্তু এমন মুখরোচক ঘটনার সমালোচনা ছেড়ে চট করে চলে যাবার ইচ্ছে অনেকেরই নেই। কল্লেশের দরজার সামনে থেকে কিছুটা সরে গিয়ে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আবার এই নিয়ে টীকা-টিপ্পনি এবং হাসি-ঠাট্টা চলছে।

সদর দরজাটা বন্ধ করে দিল কল্লেশ। সামনে পড়েছিল একটা মোটা দড়ি। সেইটেই হাতে তুলে নিল সে, তারপর স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য পুলিশ যেভাবে ঠ্যাঙায় সেইভাবে এলোপাতাড়ি প্রহার শুরু করল, দড়ির আঘাত চাবুকের মত পড়তে লাগল কমলার সর্বাঙ্গে। অক্কম্মা বুঝল, এ সময়ে কল্লেশকে বাধা দিতে গেলে তাকেও খেতে হবে দু-চার ঘা,

সুতরাং সে চুপচাপ পিছনে গোয়ালের কাছে গিয়ে বসে রইল। 'কানফুল ওর কাছে কেন দিয়েছিলি বল শীগগীর' গর্জে চলেছে কল্লেশ। পনেরো-বিশ ঘা খাবার পর কমলা মুখ খুলল, 'ওটা রঙ্গমণিকে দেবার জন্য রেখেছিলুম।' রঙ্গমণি কমলার বিবাহযোগ্যা ছোটবোন।

'চাল আর কফির বীজ কেন দিলি, কি করে দিলি?'

প্রথমটা কিছুই বলে না কমলা। অবশেষে আরো প্রায় ডজনখানেক দড়ির চাবুক খাবার পর বলে উঠল, 'জল আনতে যাবার সময় ঘড়ায় ভরে নিয়ে যেতাম।'

কল্লেশ এবার দড়িটা ফেলে দিয়ে রান্নাঘর থেকে তুলে আনল বড় একটা চ্যালাকাঠ। সেটা দেখেই ভয়ে চিৎকার করে ওঠে কমলা, 'ও মাগো, আমায় মেরে ফেলল, আমায় খুন করে ফেলবে গো।' যে ভীড়টা কল্লেশের বাড়ির সামনে থেকে সরে গিয়েছিল, সেটা আবার এসে জমা হল বাড়ির সামনে। অমানুষিক প্রহারের শব্দ, কমলার আর্তনাদ, এবং মধ্যে মধ্যে কল্লেশের মুখনিসৃত অশ্রাব্য গালিগালাজ গ্রামের লোক সবাই শুনতে পাচ্ছিল বন্ধ সদর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। যারা দূর থেকে এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেকে ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলিয়ে কল্লেশকে নিরস্ত করতে চাইছিল, কিন্তু আশেপাশের প্রতিবেশীরা তাদের জানিয়ে দিল যে, এটা প্রায় নিত্যকার ব্যাপার; কিছুই করার নেই এক্ষেত্রে।

শেষ পর্যন্ত কাঠের টুকরোটা ভেঙে গেল অথবা ক্লান্ত হয়ে পড়ল কল্লেশ, কি কারণে কে জানে প্রহার বন্ধ হল। কমলার আর কাঁদবারও শক্তি নেই, সারা শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছে। গত বছর নতুন করে গড়িয়ে দেওয়া কানফুলটা খুলে নিয়ে কল্লেশ ছাদের ঘরে নিজের বাক্সে পুরে চাবি বন্ধ করেছে। চাবিটা বেঁধেছে নিজের পৈতার গোছায়। এবার দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সে, সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠল, 'এখানে এত ভীড় কিসের? ভিতরে কি ভালুক নাচ হচ্ছে নাকি?' ওর মেজাজ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সবাই এদিক-ওদিক কেটে পড়ল ততক্ষণে।

অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে স্বামীকে হাত, পা নষ্ট হবার ও ফাঁসীকাঠে চড়বার অভিশাপ দিয়ে অবশেষে একটু চিন্তা করে দেখবার মত অবস্থা হল কমলার। এতক্ষণে ওর হুঁশ হল, কানফুল আর টাকাগুলো হাতছাড়া হলেও ঘড়াটা তুলে আনা উচিত হয়নি। গত বছর কানফুল নিয়ে যা করেছিল, সে ব্যাপারটা এমনভাবে জানাজানি হয়ে গেল ঐ ঘড়াটার জন্যই। তাই তো এমন চোরের মার খেতে হল পড়ে পড়ে। কমলা মনে মনে স্থির করল কল্লেশকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। এমনভাবে মুখ বুঁজে মার খেয়ে গেলে স্বামীর অত্যাচার দিন দিন বাড়তেই থাকবে।

৩

মরুবনহল্লীর দেবীর ঘরে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে বাড়ি ফিরছিল কল্লেশ। বাগানের ঝোপের পাশ দিয়ে আসছে, এমন সময় পাঁচ ছ'টা ঢিল পড়ল আশেপাশে, ঘাড় তুলে দেখার চেষ্টা করতেই আরো একটা ঢিল খেতে হল। 'কে রে ব্যাটা, হারামজাদা ···' গর্জন করে উঠতে ঢিল বর্ষণ বন্ধ হল। ঝোপের ওপাশে গিয়ে দেখতে ভয় হল কল্লেশের।

যদি অনেকে একসঙ্গে হামলা করে? কিন্তু নিঃশব্দে এখান থেকে চলে গেলে তো জানা যাবে না লোকগুলো কে? দিনেরবেলা, তাই সাহস করে ওপাশে উঁকি দিল কল্লেশ, লোকগুলোর মুখ দেখা গেল এবার। কল্লেশ ওদের চিনে ফেলেছে আশঙ্কা করে সবকটা লোক সরে পড়ল সেখান থেকে।

এরা সব শ্যামন্নার খেত মজুর, গ্রামের ঝাড়ুদার, পাহারাদার ইত্যাদি। কল্লেশ ভাবে, 'এদের সঙ্গে আমার শত্রুতা কিসের? খামকা এভাবে ঢিল ছুঁড়ছিল কেন এরা? শ্যামন্নারই কারসাজি নিশ্চয় এসব। এই পাটোয়ারীটার স্বভাবই এইরকম। সামনাসামনি লড়বার সাহস নেই, পিছন থেকে লোক লাগায়। বাবার আমলেও একদিন এইভাবেই বাড়িতে পাথর ফেলিয়েছিল। তারপর বাবা দিন-দুপুরে গিয়ে ওর ছাদের খাপরাগুলো ভেঙে দিয়েছিলেন। বাবার মত অত সাহস কল্লেশের নেই। কিন্তু শ্যামন্নার এই ব্যবহারের মানে কি? কমলু ঘড়া নিয়ে এসেছিল, সেই রাগেই কি এসব করাচ্ছে? কিন্তু ঘড়া তো ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারজন্য এমন করার তো কথা নয়? ওর বৌয়ের ব্যাপারটা বুঝে ফেলেনি তো? ওই নিয়ে ঝগড়া করতে এলে তো ওর নিজের পারিবারিক মান-সম্মানে ঘা পড়বে। যাই হোক, এ হতচ্ছাড়া রাঁড়ের ব্যাটা এইভাবেই বদ্‌লা নেবার চেষ্টা করছে, এর সঙ্গে ঝগড়া করে লাভ হবে না। বুদ্ধি খাটিয়ে ওকে কাবু করতে হবে। ঐ পুট্টগৌরীটার সঙ্গে মাখামাখি না করলেই হত, কিছু এমন আহামরি রূপ নয়! যাক্‌গে, বহুদিন থেকেই বাসনাটা মনে ছিল, সেটা তো পূর্ণ হয়েছে।' এইসব ভাবতে ভাবতে বাড়িতে এসে শুনল, সেখানে আর এক ফ্যাসাদ ভুগতে হয়েছে অক্কম্মাকে। 'কোথায় চলে গিয়েছিলি বল তো? বৌতো সমানে শাসাচ্ছে আবার কুয়োতে ঝাঁপ দেবে, তোকে আর আমাকে ফাঁসীতে চড়াবে। কাল সারাটা রাত ভয়ে চোখ বুজিনি। শেষে হোন্নাকে ডেকে পাহারায় বসিয়ে রেখেছি' জানাল অক্কম্মা।

কমলু এখনও তার গোঁসাঘরেই পড়ে আছে। কল্লেশ, 'এই ছেনাল' বলে হাঁক দিতেই সেও সমান তেজে জবাব দিল 'তোমাদের ফাঁসীতে চড়িয়ে ছাড়ব।' আবার চ্যালাকাঠ খুঁজতে যাচ্ছিল কল্লেশ কিন্তু মনে হল, কাল অত মার খেয়েও তো কোন শিক্ষা হয়নি। যেদিন বৌ সত্যিই কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছিল, সেদিনকার কথাও মনে পড়ল। কি যেন ভেবে কল্লেশ বলে উঠল, 'কুয়োয় ডুবে মরবার সখ হয়েছে, না?'

'হ্যাঁ, হয়েছেই তো।'

'বেশ, আয় তাহলে', কমলুর হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল সে কুয়োর ধারে। অক্কম্মা ছুটে এসে সাবধান করল, 'কিছু অঘটন ঘটে গেলে লোকে আমাদেরই দোষ দেবে কিন্তু।' কল্লেশ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে। তারপর কুয়োর পাশে পড়ে থাকা নতুন দড়িটা তুলে নিয়ে তাতে বড় গোছের একটা ফাঁস দিয়ে কমলার কোমরে ফাঁসটা গলিয়ে বেশ করে কষে ফেলল। কমলা চেঁচামেচি করছে, সেদিকে কিছুমাত্র কান না দিয়ে দুই পায়ে কুয়োর উঁচু দেওয়ালে শরীরের ভর দিয়ে একটু একটু করে দড়িটা কুয়োর জল তোলার চাকাটার মধ্যে দিয়ে নামাতে লাগল কুয়োর মধ্যে। কমলা যত জোরে চেঁচায়, কল্লেশ ততই দড়ি ঢিলে করে তাকে ক্রমেই জলের কাছাকাছি নামিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত কমলার পায়ের গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত জলে ডুবল। 'বাবারে মারে' করে চিৎকার শুরু করতেই কল্লেশ দড়িটা ঢিলে করে কমলাকে একবার মাথা পর্যন্ত জলে চুবিয়ে আবার কিছুটা তুলে কোমর জলে রাখল। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে কমলা।

'কি এখনও ডুবে মরবার সখ আছে?' ওপর থেকে জিজ্ঞেস করে কল্লেশ।

'না-আঁ-আঁ-আঁ, না-আঁ-আঁ।'

'আমার সঙ্গে তুই-তোকারি করবি আর?'

'না, না, পায়ে পড়ি, তুলে নাও আমাকে।'

কুয়োর গায়ে পা লাগিয়ে এবার দড়ি টেনে ওপরে তুলতে শুরু করল কল্লেশ। মনে হচ্ছে একলা টেনে তোলা যাবে না, আর একজনের সাহায্য পেলে ভাল হয়। কিন্তু বাইরে থেকে লোক ডাকলেই এ নিয়ে আবার একটা হৈচৈ পড়ে যাবে। এই সময় হঠাৎ সদর দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল। কল্লেশ বলে উঠল, 'দাঁড়াও এখন দরজা খুলে দিও না।' এই সময় দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এল,—'দরজা খোলো, কল্লেশ, অক্কম্মা—' কন্ঠীর গলার আওয়াজ চিনতে এক মুহূর্ত দেরী হল না মায়ের। অক্কম্মা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল এবং ছেলে ভিতরে ঢুকতেই আবার বন্ধ করে ফেলল দরজাটা। বাঁ কাঁধের সামনে পিছনে ঝোলানো দুটো ভারী ভারী থলে এবং হাতের থলিটা নামিয়ে রাখলেন কন্ঠীজোইসজী। কোন কথা বলার আগেই অক্কম্মা বলল, 'একবার এদিকে এসো, কোন কথা বোল না।' এবার পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে টেনে তুললেন কমলাকে। ভিজে কাপড়ে সে নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে। কোন হৈচৈ হল না।

এতক্ষণে পরস্পরের কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করার অবসর হল। সন্ন্যাসীদের মত লম্বা দাড়ি রেখেছেন কন্ঠীজোইস, এতদিন নাকি কাশীতে ছিলেন। কেন দেশত্যাগ করেছিলেন, সে প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পাওয়া গেল না। গ্রামে প্রবেশ করার আগেই কন্ঠীজোইস আশেপাশের গ্রামে খোঁজ নিয়েছিলেন শ্যামন্না মারা গেছে না বেঁচে আছে।

মা জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁরে, এতবড় দাড়ি রেখেছিস কেন? সন্ন্যাসী হয়েছিস নাকি?'

'না তো, ওরে কল্লেশ, নাপিত ডেকে আন তো।' নাপিত এল। আগের মতই শিখাগুচ্ছটুকু রেখে চুল দাড়ি সব কামিয়ে ফেললেন কন্ঠীজোইস। দেখা গেল, এই বারো বছরে তাঁর চেহারার বিশেষ কিছুই পরিবর্তন হয়নি। বেশ হৃষ্টপুষ্ট পরিতৃপ্ত চেহারা। স্নান এবং সন্ধ্যাবন্দনার পর জপে বসলেন। এটা বোধহয় কাশীতে শিখেছেন। খাওয়ার সময় অক্কম্মা বলল, 'কন্ঠী, বারো বছর পরে দেশে ফিরে এলি তুই, তা, বাড়িতে প্রবেশ করার আগে কোন মন্দিরে গিয়ে দেবদর্শন করলে ভাল হত বোধহয়।'

'কাশী-গয়া তো সঙ্গেই নিয়ে এসেছি। এরপর আর কিছুই করার দরকার হয় না। হ্যাঁ, ভাল কথা "গঙ্গাসমারাধন" করতে হবে।'

'যা দিনকাল পড়েছে, "সমারাধন" করা বেশ কঠিন। গত বছর অনাবৃষ্টির ফলে ভাঁড়ার একেবারে খালি', বলল কল্লেশ।

'টাকা আমি সঙ্গে এনেছি। যতই হোক কত আর খরচ হবে?'

কন্ঠীজোইসজীর প্রত্যাবর্তনের খবর পেয়ে গ্রামের বহু লোক এসে দেখা করে গেল।

বারো বছর কাশীবাস করে উনি এখন আরো জ্ঞানী, আরো পণ্ডিত হয়ে এসেছেন। গ্রামের অনেকেরই কাশী দর্শনের বাসনা আছে, কিন্তু তা পূর্ণ করার সুযোগ হয়নি, তারা সবাই কন্ঠীজোইসজীর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল। এদের সবাইকে কন্ঠীজোইসজী একটি করে 'কাল-ভৈরব' গ্রন্থ দান করলেন। আট দিন ধরে মহাসমারোহে 'গঙ্গাসমারাধন' সুসম্পন্ন হল, গ্রামসুদ্ধ সবাই এল এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে, কেবল শ্যামন্নাদের পরিবারের কাউকে দেখা গেল না।

জোইসজী গ্রামে নিজের পুরোন বন্ধুদের সবাইকার বাড়িতে গিয়ে এই ক'বছরের সব খোঁজখবর নিলেন। সমারাধনের দিন রাত্রে চাঁদের আলোয় কুয়োতলায় বসে কথা প্রসঙ্গে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কল্লেশ, শুনলাম নাকি বৌকে তুমি মারধোর কর, তাই সে রাগ করে নিজের কানের গহনা চুপি চুপি ছোটবোনের জন্য বাপের বাড়িতে পাঠাবার চেষ্টা করছিল—শ্যামন্নার পুত্রবধূর সাহায্য নিয়ে, এসব কথা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ'।

'শুনলাম তুমি ওদের বৌকে অপমান করেছ?'

'না, তাকে শুধু আমাদের বাড়িতে আসতে বারণ করেছিলাম আমি।'

'দেখ, আমি কাশীবাস করে আসছি। আমি তোমার জন্মদাতা বাপ। আমি সত্য কথা জানতে চাই। কেবল বাড়িতে আসতে বারণ করেছিলে, না আরও কিছু ঘটেছিল?'

'আপনি কি শুনেছেন?'

'সারা গ্রামে অনেকরকম আলোচনা হচ্ছে। লোকে বলছে, শ্যামন্না নাকি লজ্জায় আসল কথাটা প্রকাশ করে বলতে পারছে না।'

'হ্যাঁ', এবার মাথা নিচু করে জবাব দেয় কল্লেশ, 'আমাদের বাড়ির বৌ-এর স্বভাব বিগড়ে দেবার জন্যই শ্যামন্না যখন তখন এ বাড়িতে ছেলের বৌকে পাঠিয়ে দিত। এ-রকম ক্ষেত্রে আর কি করা যায়?'

'দেখ, পুরুষ মানুষ নিজের পৌরুষ দেখিয়ে সর্বত্রই বিজয়ী হতে পারে, কিন্তু এই একটা বিষয়ে তার সংযম থাকা উচিত। এইখানে সংযম হারালেই সব গেল। আর মাথা উঁচু করে চলতে পারে না মানুষ। খুব অন্যায় কাজ করেছ তুমি।'

লজ্জিত হল কল্লেশ। নিজের দোষ-স্খলনের চেষ্টায় সে বলে উঠল, 'আপনি যেদিন এলেন, সেদিন সকালেই আমি মরুবনহল্লীর দিক থেকে ফিরছিলাম, এমন সময় শ্যামন্নার চাকর-বাকররা ঝোপের আড়াল থেকে আমার দিকে ঢিল ছুঁড়তে থাকে। এসব করানো কি উচিত হচ্ছে ওর?'

'হারামজাদা কোথাকার! আমার বাড়িতে পাথর-ফেলা নিয়েই তো এত কাণ্ড হয়ে গেল। ব্যাটা কি ভেবেছে কন্ঠীজোইস একেবারে মরে গেছে? ঠিক আছে, আমি দেখে নেব ওকে।' মনে মনে কন্ঠীজোইসজী একটা কিছু ভেবে ফেললেন, কিন্তু পরিকল্পনাটা খুলে বললেন না কাউকে।

দু'দিন পরে এল শুক্রবার, নাগলাপুরের সাপ্তাহিক হাটের দিন এটা। আশেপাশের সব গ্রাম থেকেই সেদিন বহুলোক আসে এখানে। দুপুর তিনটে নাগাদ পাটোয়ারী শ্যামন্নাও

বাড়ি থেকে বেরোল হাটের উদ্দেশ্যে। পরনে সাদা ধুতি, কামিজ, চাদর, কপালে তিলক, বেশ সুসজ্জিত হয়ে পাটোয়ারীজী চলেছেন পথ দিয়ে; এমন সময় কোথা থেকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন কন্ঠীজোইস, তাঁরও পরনে ধুতি ও গেরুয়া রঙের জামা। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, কন্ঠে জপমালা এবং হাতে একটি হাঁড়ি। হাঁড়ির বিকট দুর্গন্ধে আশেপাশের সবাই নাক টিপে ধরছে। 'আমার ছেলের মাথায় চিল ফেলিয়েছ, বেটা কাপুরুষ কোথাকার!' বলতে বলতে হাঁড়িটা কন্ঠীজোইস উপুড় করে দিলেন শ্যামন্নার মাথায়। সবাই দেখল হাঁড়ির বস্তুটি মানুষের বিষ্ঠা। ঐ জিনিস অতখানি উনি সংগ্রহ করলেন কিভাবে এবং কি কি অনুপান মিশিয়েছেন ওতে, তা উনিই জানেন আর ওঁর কাশীবিশ্বনাথই জানেন। দেখা গেল শ্যামন্নার সর্বাঙ্গ এবং জামাকাপড় বিষ্ঠায় মাখামাখি হয়ে গেছে। হাতের খালি হাঁড়িটা শত্রুর মাথায় আছড়ে ভেঙে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন কন্ঠীজোইসজী।

৪

এরপর মাসখানেক কন্ঠীজোইসকে আর দেখা গেল না নাগলাপুরে। কোথায় রয়েছেন কেউ জানে না, কেবল তিন-চারদিন অন্তর কল্লেশ কোথায় যেন যাওয়া-আসা করে। সবাই আন্দাজ করল, সে বাপকে গ্রামের খবরাখবর জানাতে যায়। সে যায় অন্ধকার রাতে, কাজেই তার পিছু নেবার সাহস হয় না কারো। দিনের বেলা ফিরে আসে কল্লেশ। তাছাড়া, কন্ঠীজোইসজীর গতিবিধি জেনে লোকে আর কি করবে? গত বারো বছরে তিনি তো ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন এ অঞ্চলে। গ্রামে ফিরে 'গঙ্গাসমারাধন' সুসম্পন্ন করবার তিন দিনের মধ্যে এমন একখানা কাণ্ড করলেন তিনি যা এ অঞ্চলের কেউ কখনো করতে সাহস করেনি। শ্যামন্না তো সেই মুহূর্তেই ছুটেছিল বাড়ির দিকে। সাবান আর নারকেলের ছোবড়া দিয়ে সারা শরীর রগড়ে রগড়ে স্নান করল সে। ব্যাপারটা চোখের সামনে দেখেছে অন্ততঃ দশ-বারোজন লোক। বাড়িমুখো তাকে ছুটতে দেখেছে আরো বোধহয় তিন-চারজন। কিন্তু এখন গ্রামসুদ্ধ প্রায় সবাই দাবী করছে যে, তারা নাকি ঘটনাটার প্রত্যক্ষদর্শী। কেমন করে কন্ঠীজোইস হাঁড়িটা উপুড় করলেন, শ্যামন্নার সারা শরীর দেখতে দেখতে মহরমের বাঘের মত কেমন হলুদ বরণ হয়ে উঠল, এই সবের বিচিত্র বর্ণনা ফিরতে লাগল সবার মুখে মুখে।

কন্ঠীজোইসের নামে মামলা ঠুকে দেওয়া যায় হয়ত! কিন্তু কারা কারা ঘটনাটা সত্যিই দেখেছে তাদের মুখগুলো মনে পড়ছে না শ্যামন্নার। তাছাড়া এই নিয়ে নালিশ করে হৈ হৈ করতে একটু লজ্জাও হচ্ছে। ওর সামনে অন্য কেউ তো এ ঘটনার উল্লেখ পর্যন্ত করছে না। শেষ পর্যন্ত শ্যামন্না এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না করাই যুক্তিযুক্ত স্থির করল। গতবারের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে গেল তার। মামলা করতে গিয়ে কতবার নরসীপুর ছুটতে হয়েছিল এবং মামলা শেষ হবার পরও ঐ লোকটার হাতে তাকে কিভাবে মার খেতে হয়েছিল, তা ভোলবার নয়। 'ভেবেছিলাম, ব্যাটা এতদিনে মরে গেছে। কল্লেশের বৌটাকে বিগড়োবার চেষ্টা না করলেই হত। বুড়ো বয়েসে আর কোন ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়াটা

উচিত হবে না। তাছাড়া আরো একটা কথা—কল্লেশটাও বাপের মতই গোঁয়ার হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আমাকে বিপদে ফেলবার হিম্মত আছে ওর। এদিকে আমার নন্‌জুড্ডা তো এক নম্বরের ভীতু গোবেচারা। এই অবস্থায় কারো সঙ্গে শত্রুতা জিইয়ে রাখাটা বিশেষ বুদ্ধির কাজ হবে না, আমার আর সে বয়স নেই।'

এক মাস পরে গ্রামে ফিরে এলেন কন্ঠীজোইসজী। কেউ ওঁকে ঐ বিষয়ে কোন প্রশ্নও করল না, উনিও কোন কথা বললেন না। কপালে ত্রিপুণ্ডক রেখা টেনে, গলায় জপের মালা পরে উনি যখন পথে বের হন গ্রামের লোক সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখে, আর সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

এ বছরও বর্ষা ভাল হল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও মড়ুয়ার ফসল কিছুটা উঠল। শোনা যাচ্ছে য়ুরোপে নাকি তুমুল যুদ্ধ চলেছে ইংরেজ আর জার্মানের মধ্যে। ওদিকে ব্রহ্মদেশেও লড়াই চলছে। সরকার থেকে খাদ্যশস্য বন্টনের জন্য রেশন-ব্যবস্থা চালু করা হল। এলাকাদার একদিন গ্রামে এসে ননজম্মাকে বুঝিয়ে দিলেন রেশন-ব্যবস্থার অর্থ কি, সামনের বছরের মর্দুমশুমারী কিভাবে লিখতে হবে তাও বলে দিলেন। এক একর জমিতে যদি ছ'খণ্ডি মড়ুয়া হয় তো তার ষোল আনা, সাড়ে চার খণ্ডি হলে তার বারো আনা এবং তিন খণ্ডি হলে তার আট আনা এইভাবে ফসলের পরিমাপ ঠিক করতে হবে। মড়ুয়া, ধান, কুলথি, ডাল সব কিছুরই এইভাবে একটা আন্দাজ দিতে হবে। সরকার সেই হিসেব অনুসারে প্রতি কৃষকের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নির্ধারণ করে রায়শুমারীর হিসেব থেকে তাদের পরিবারের খাওয়ার জন্য এবং বীজের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ফসল ছেড়ে দিয়ে বাকিটা নির্ধারিত মূল্যে কিনে নেবেন। অর্থাৎ পাটোয়ারীদের কাজ কিছুটা বেড়ে গেল এ বছর।

একদিন কুরুবরহল্লীতে গিয়ে ননজম্মা গুণ্ডেগৌড়কে এই নতুন ব্যবস্থার কথা জানাতে তিনি মন্তব্য করলেন, 'আমরা খেটে মরব, আর মেহনতের ফসল তুলে দিতে হবে ঐ হতভাগাদের হাতে!'

'সরকার থেকে নাকি আইন করে দিয়েছে। না মানলে পুলিশ আসবে।'

'অন্যত্র যা হয় হোক, কিন্তু কুরুবরহল্লীর মানুষের যেন বেশী অসুবিধায় না পড়তে হয়' ভাবে ননজম্মা। 'কারণ তাহলে গুণ্ডেগৌড়জীর এত বছরের প্যাটেলগিরির সুনামে দাগ পড়ে যাবে। যে গ্রাম ওর ক্ষুধার্ত সন্তানদের আহার যুগিয়েছে, তার কোন ক্ষতি ও সইবে কি করে? কিন্তু গ্রামের মানুষ ভেড়াও পালন করে। খেতের খড় ভেড়াও খায়, সেইজন্য প্রায় প্রতি কৃষকের ক্ষেত্রেই এক একরে ছ'খণ্ডিরও বেশী ফসল উৎপন্ন হয়। ফসলের পরিমাণ কম করে দেখাতেই হবে। কিন্তু এলাকাদার বলে গেছেন, পাটোয়ারীরা ফসলের পরিমাণ ঠিক মত দেখাচ্ছে কিনা, তা পরীক্ষা করার জন্য আমলাদার স্বয়ং খেত পরিদর্শনে আসতে পারেন।'

অনেক আলোচনার পর ননজম্মা এবং গুণ্ডেগৌড়জী ভেবে-চিন্তে স্থির করলেন, মর্দুমশুমারীতে ননজম্মা মোটের ওপর সবাইকারই আট আনা, ন'আনার মত হিসেব ধরে ফসলের পরিমাণ লিখবে। সারা গ্রাম থেকে শ'খানেক টাকা সংগ্রহ করে এলাকাদার ও আমলাদারকে দিয়ে একটা বন্দোবস্ত করে নিলেই হবে। ফসল কিনতে সরকারের লোক এলে নির্ধারিত মূল্যে দশ-বারো খণ্ডি ফসল তাদের কাছে বিক্রী করা হবে।

সে বছরটা এই ব্যবস্থাই চলল। কুরুবরহল্লীর চল্লিশটি পরিবার একশ' টাকা নগদ এবং বারো খণ্ডি মড়ুয়া সরকারী মূল্যে বিক্রী করেই নিষ্কৃতি পেয়ে গেল। এ গ্রামের লোকেরা আগে থেকেই দস্তুরী দেওয়ায় অভ্যস্ত ছিল, এ বছর তার ওপর আরো দশ সের করে মড়ুয়া দিতে হল। কিন্তু লিঙ্গাপুর আর রামসন্দ্র গ্রামে এই নতুন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ফলে যেন বিনামেঘে বজ্রপাত ঘটল। ফসলের পরিমাণ আন্দাজ করার ব্যাপারটা রামসন্দ্রের প্যাটেল শিবেগৌড় ও লিঙ্গাপুরের প্যাটেল পুরদপ্পা কিছুই বোঝে না। এই দুই গ্রামের মর্দুমশুমারী নন্‌জম্মা লিখল, একেবারে যথাযথভাবে। 'সুগ্গী' বা দ্বিতীয় ফসলের মরশুম শেষ হতে না হতেই একদিন এলাকাদার এসে হাজির, সঙ্গে দুই চাপরাশি এবং দুটি কনস্টেবল। এলাকাদারের হুকুমে চাপরাশি প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে রীতিমত তল্লাশ করে দেখল। ছাদের ওপর, বাক্‌সর ভিতর, হাঁড়ি-কলসির মধ্যে কিছুই খুঁজতে বাকি রাখল না। মড়ুয়ার গোলার মধ্যে লম্বা বাঁশ ঢুকিয়ে খোঁচাখুঁচি করল—গোলার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কতটা বুঝবার জন্য। নিজেদের খুশি মত ফসল বার করে নিয়ে জড়ো করল মহাদেবায়াজীর মন্দিরের সামনে। ছাদের ওপর থেকে নামবার আগেই বাড়ির কর্তার কাছে বিশ-পঞ্চাশ ঘুষ খেয়ে নিচে এসে অনেক কম করে ফসলের হিসেব লেখানোর কারসাজিও হয়ে গেল অনেক বাড়িতে। এরপর এলাকাদার ও চাপরাশিদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা হবে। তারপর পুলিশ দুটোকে কত দেওয়া হবে সেটা স্থির করবেন এলাকাদার।

একদিনের মধ্যে রামসন্দ্র থেকে মোট চারশ' পল্লা ও লিঙ্গাপুর থেকে একশ' পল্লা মড়ুয়া সংগ্রহ করে নিয়ে গেলেন এলাকাদার মশাই। কৃষকদের রসিদ দেওয়া এবং মড়ুয়া ওজন করার সময়ও চাপরাশিরা বেশ ঠকাল।

এর দিন পনের পরে একদিন প্যাটেল শিবেগৌড় কারিন্দাকে পাঠিয়ে ডেকে পাঠাল নন্‌জম্মাকে। প্যাটেল পাটোয়ারীকে ডেকে পাঠাবে, না পাটোয়ারী প্যাটেলকে ডেকে পাঠাবে সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তাদের নিজের নিজের জমি-জায়গা, অর্থ-সম্পদ, প্রতিপত্তি ইত্যাদির ওপর। এ গ্রামে বরাবর শিবেগৌড়ই ডেকে পাঠিয়েছে এবং চেন্নিগরায় দেখা করতে গেছে বিনীতভাবে। কিন্তু এবার ডেকে পাঠানো হয়েছে নন্‌জম্মাকে। বেশ রাগ হয়ে গেল নন্‌জম্মার, কিন্তু তবু সে মেজাজ না দেখিয়ে সহজভাবেই কারিন্দাকে বলল, 'যদি কিছু দরকার থাকে ওঁকেই এখানে আসতে বল গিয়ে।'

কিছুক্ষণ পরে প্যাটেল নিজেই এল নন্‌জম্মার কাছে। কারিন্দাও তার সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে রইল দরজার বাইরে। মাদুর পেতে বসতে দেওয়া হয়েছে প্যাটেলকে। শিবেগৌড় বেশ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল, 'শুনছি নাকি, কুরুবরহল্লী থেকে নিয়েছে মাত্র বারো খণ্ডি, তাহলে আমাদের এখান থেকে চারশ' পল্লা নেওয়া হল কেন?'

'তা আমি কি করে জানব বলুন?'

'হিসেব তো তুই লিখিস, তোরই জানার কথা।'

'দেখুন প্যাটেল মশাই, আমি আপনার বাড়ি ভিক্ষে করতে যাই না, তুই-তোকারি করবেন না, ভদ্রভাবে কথা বলুন,' কথাটা বলেই রান্নাঘরে ঢুকে গেল নন্‌জম্মা।

'চেন্নিগরায়কে আমি জন্মাতে দেখেছি।'

'বেশ তো, তাহলে তাকেই জিজ্ঞাসা করুন। কারিন্দাকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন! প্যাটেল হয়েছেন বলে নিজেকে কি মনে করেন আপনি?'

শিবেগৌড়ের মনে হল কেউ যেন একটা চড় কষিয়ে দিল ওর গালে। এর আগে এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে সে কখনও কথা বলেনি। ঘর-দোর সব গেছে এর, পাতা বানিয়ে, সব্জীর চাষ করে সংসার চালায় আর স্বামীর পাটোয়ারী কাজের হিসেব লেখে, কিন্তু কি তেজ! রাগে সর্ব শরীর জ্বালা করছে শিবেগৌড়ের। সে এবার জিজ্ঞাসা করে, 'আমাদের মর্দুমশুমারী লেখার সময় কম করে লেখনি কেন?'

নন্‌জম্মা ঘরের মধ্য থেকেই জবাব দিল, 'আপনি সে কথা জিজ্ঞাসা করছেন কোন অধিকারে?'

'সরকারকেই জিজ্ঞাসা করব আমি যে, এভাবে স্ত্রীলোককে দিয়ে হিসেব লেখানো উচিত কাজ কিনা!' বলতে বলতে উঠে চলে গেল শিবেগৌড়।

সারা গ্রামে রাজার মত একচ্ছত্র আধিপত্য তার, কিন্তু আজ যেন একটা বিরাট পরাজয় ঘটে গেছে। তাও আবার কারিন্দাটার সামনে, একটা মেয়েমানুষের হাতে এমন অপমান অকল্পনীয়। শালা শিবলিঙ্গেকে সঙ্গে নিয়ে সোজা কম্বনকেরে চলে গেল প্যাটেল শিবেগৌড়। এলাকাদারকে গিয়ে প্রশ্ন করল, স্ত্রীলোক সরকারী হিসেবপত্র লিখবার অধিকারী কিনা?

এলাকাদারটি এ অঞ্চলে এসেছেন মাত্র ছ'মাস আগে। কিন্তু আগেকার এলাকাদার এ অঞ্চলের সব গ্রাম সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য খবর এঁকে ভালকরেই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যাবার আগে। সুতরাং প্যাটেলের প্রশ্নের লক্ষ্য কে তা বুঝতে এলাকাদারের দেরী হল না, কিন্তু এলাকাদার সেকথা প্যাটেলকে বুঝতে দিলেন না। তিনি শিবেগৌড়কে প্রশ্ন করে করেই আসল কথাটা বার করে নিলেন। পাটোয়ারী মর্দুমশুমারী বাড়িয়েই লিখুক বা কম করেই লিখুক, উভয় ক্ষেত্রেই এলাকাদারের ভাগ্যে প্রাপ্তি যোগ ঘটে, সুতরাং এলাকা-দারের কোন প্রয়োজন নেই পাটোয়ারীর পিছনে লাগার। তিনি বললেন, 'দেখুন শিবে-গৌড়জী, স্বয়ং ডেপুটি কমিশনার পর্যন্ত জানেন যে, এই মহিলা হিসেব লেখেন। জমাবন্দীতে তিনি স্বয়ং লিখে দিয়েছেন, সারা তুমকুর জেলায় এত নির্ভুল হিসেব আর কেউ লিখতে পারে না। সরকারী আইনে কোথাও লেখা নেই যে স্ত্রীলোক হিসেব লিখতে পারবে না।'

মুখ চুন করে গ্রামে ফিরে এল শিবেগৌড়। পথে শালা শিবলিঙ্গের কাছে মন্তব্য করল, 'ঐ এলাকাদার হারামজাদা গাঁয়ে এলেই ছেনাল মাগীটা উপ্‌মা, কফি খাইয়ে তোয়াজ করে কিনা, তাই অত দরদ ওর জন্য।'

'শুধু কফি আর উপ্‌মাতে কি আর এত দরদ হয়? গ্রামে এলে আদর করে বিছানা পেতে শুতেও দেয় নিশ্চয় নিজের কাছে।'

পথে যেতে যেতে নন্‌জম্মাকে ছেনাল, রাঁড় ইত্যাদি নানারকম মধুর সম্ভাষণ করে নিজেদের গায়ের জ্বালা মেটাল শালা-ভগ্নীপতি দু'জনে মিলে। কিন্তু গ্রামে পৌঁছে অন্যদের সামনে এসব কথা উচ্চারণ করার সাহস দু'জনের মধ্যে কারোরই ছিল না।

শিবেগৌড়ের দাপট দেখে মনে মনে নন্‌জম্মা অত্যন্ত ঘৃণা অনুভব করে। সারা

গ্রাম জানে ওর এত দাপট কেবল প্যাটেলগিরির জন্য নয়; কাশিমবদ্দির মারফতে মহাজনী কারবারটাও চলছে ওরই টাকায়। কাশিমবদ্দি এ গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায় না, সে নিজের ভাগের সুদের টাকাটা পাঠিয়ে দেয় কেরালায় নিজের গ্রামে। আজকাল আর শুধু সোনা, রুপো, তামা, পিতলের বন্ধকী কারবার নয়, ছোট-খাট জমি-জমাও লোকে বন্ধক রাখছে, এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধকী জিনিস সবই গিয়ে ঢুকছে শিবেগৌড়ের ঘরে। এরা তিন মাসের সুদ প্রথমেই কেটে নেয়। অর্থাৎ এক হাজার ধার নিলে হাতে পাওয়া যায় পাঁচশ' টাকা মাত্র। গত দু'বছর দুর্ভিক্ষের ফলে শিবেগৌড়ের এই মহাজনী ব্যবসায় খুবই ফেঁপে উঠেছে এবং সেই জন্যই তার দাপটও বেড়েছে এত। সেই দম্ভকে খর্ব করার শক্তি এ গ্রামে কারোর নেই একথা নন্‌জম্মাও বোঝে। কিন্তু তার ওপর মেজাজ দেখাতে আসাটা নন্‌জম্মার অত্যন্ত অসহ্য মনে হওয়ায় সে মুখের মতো জবাব দিয়ে দিয়েছে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ-আইন ও রেশন-ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এলাকাদারকে আজকাল প্রায়ই গ্রামে আসতে হয়। তাঁর কাছেই নন্‌জম্মা খবর পেল যে, শিবেগৌড় কম্বনকেরে পর্যন্ত ছুটেছিল, কিন্তু সেখানেও উচিত জবাব শুনে মন-মরা হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু এ নিয়ে কোন হৈচৈ করল না নন্‌জম্মা।

২

বর্ষার পর ফসল মোটামুটি খারাপ হয়নি, কিন্তু খাদ্যশস্যের দাম কমবার কোন লক্ষণ নেই। যুদ্ধ চলছে। পাটোয়ারীগিরির হিসাব লেখা ছাড়াও এখন খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ, সরকারী তরফ থেকে ফসল সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য কাজ বেড়ে গেছে অনেক। তাই বর্ষাসন ছাড়াও এখন পাটোয়ারীরা অতিরিক্ত ভাতা পাচ্ছে। নন্‌জম্মাও আজকাল বর্ষাসনের একশ' কুড়ি টাকা ছাড়া আরো একশ' টাকা ভাতা পায়। কিন্তু কাজও বেড়েছে সেই পরিমাণে, কাজেই পাতা তৈরীর সময় পাওয়া যায় না এখন আর। সংসারের কাজকর্ম এবং সব্জী বাগানে জল দেওয়ার কাজ পার্বতীই সামলায়। গুণ্ডেগৌড়ের বাড়ি থেকে ফেরা গরুগুলোর দেখাশোনার ভারও পড়েছে পার্বতীর ওপর। রামন্না এখন পড়ছে মিডল স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে। ক্লাসে সে সেরা ছেলে। মায়ের হিসেব লেখার কাজেও বেশ সাহায্য করতে পারে আজকাল। যোগ-বিয়োগ করে নির্ভুলভাবে এমন কি মাঝে মাঝে মায়ের হিসেবে ভুল হলে ঠিক করে দেয়। একবার এলাকাদারও রামন্নাকে ডেকে একটা হিসেবের খাতা নকল করিয়েছেন। ছেলের যে বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল হয়েছে এতে অসীম তৃপ্তি পায় নন্‌জম্মা। কিন্তু ছেলেকে আর একটি পাটোয়ারী করে তোলা তার ইচ্ছা নয়, হাইস্কুলের পড়া শেষ করে সে যেন অন্তত এলাকাদার হতে পারে—এইটুকুই মায়ের অন্তরের বাসনা। মনে মনে ভাবে সে, 'ঠাকুরের কৃপা হলে সবই সম্ভব, আমার রামন্নার বুদ্ধি কি কিছু কম?'

বিশ্ব পড়ছে কন্নড় স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে। তার মতো ডানপিটে আর সাহসী ছেলে সারা গ্রামে আর দু'টি নেই। বড় জলাশয়ে সে বড়দের মতই পঞ্চাশ-ষাট গজ সাঁতার দিয়ে চলে যায়। একলা একলা শ্মশানে গিয়ে মৌমাছির চাক ভেঙে সুপারির বাকলে

জড়িয়ে মধু নিংড়ে বার করে আনে মাঝে মাঝে। কথাবার্তায়, সাহস আর চালচলনে বিশ্ব যেন কিছুটা দাদামশায় কন্ঠীজোইসজীর মতই হয়ে উঠছে। মহাদেবায়া এখনও খুব স্নেহ করেন তাকে। তাঁর ভজন গানের সঙ্গে বিশ্ব একতারা বাজায় প্রায়ই। তিনি যে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে আনেন, তাতেও ভাগ বসায় বিশ্ব আগের মতই।

আজকাল আর এই পরিবারে খাওয়া-পরার কষ্টটা অন্তত নেই। খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ আইনের সঙ্গে সঙ্গে প্যাটেল পাটোয়ারীদের সবাইকার মত এদেরও আয় বেড়েছে। এখন বাড়ির সবাইকারই দু'জোড়া করে পরিধেয় বস্ত্র আছে। শীতের দিনে গায়ে দেবার জন্য কুরুবরহল্লী থেকে নন্‌জম্মা চারখানা কম্বলও কিনে এনেছে। কিন্তু একটা চিন্তা সর্বদাই ওকে উদ্বিগ্ন করে তোলে আজকাল—পার্বতীর বয়স যে তেরো হয়ে গেল, গত দু'বছরের দুর্ভিক্ষে পেট ভরে খাওয়া জোটেনি, না হলে এতদিনে কবেই ঋতুমতী হয়ে পড়ত নিশ্চয়। এখনও সে রোগা ছোটখাট দেখতে। তবে আজকাল দু'বেলা পেটভরে খেতে পাচ্ছে, সকালে রুটি আর মাঠা খায় সকলে। কিন্তু বিয়ের আগে ঋতুমতী হলে কি উপায় হবে—এই দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় না নন্‌জম্মার।

কিন্তু বিয়ে দেওয়া কি সোজা কথা? খুব নম নম করে সারলেও অন্তত সাত-আটশ' টাকার ধাক্কা। তাছাড়া পুরুষ মানুষ উদ্যোগী না হলে পাত্রের সন্ধান করবে কে? নিজের স্বামীর মুরোদ তো জানা আছে। কি করে যে কন্যাদায় উদ্ধার হবে ঈশ্বরই জানেন, ভেবে কূলকিনারা পায় না নন্‌জম্মা।

একজন খবর দিল তিরুমগোণ্ডনহল্লীতে একটি ভাল ছেলে আছে। গ্রামের নতুন স্কুলমাস্টার ভেঙ্কটেশায়াজীর সঙ্গে স্বামীকে ছেলে দেখতে পাঠাল নন্‌জম্মা। দু'দিন পরে ফিরে এসে মাস্টারমশাই বললেন, 'নন্‌জম্মাজী দেখুন, এই পাটোয়ারীমশাইকে নিয়ে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাওয়া এক বিড়ম্বনা। পাত্রের বাড়িতে গিয়ে আমি তো ছেলের জন্ম-পত্রিকা দেখতে চাইলাম প্রথমেই। তাতে তাঁরা বললেন, 'আগে কন্যার জন্মপত্রিকা দেখান।' তা, আমি দিয়ে দিলাম মেয়ের কোষ্ঠীখানা। তারপর তাঁরা খাওয়া-দাওয়ার অনুরোধ করায় আমি বললাম, কন্যাদানের উদ্দেশ্যে এসেছি, শাস্ত্রে বলে, সে উদ্দেশ্য সফল না হলে এখন এখানে আমাদের জলগ্রহণ পর্যন্ত উচিত নয়। কিন্তু পাটোয়ারীজীকে কিছুতেই থামানো গেল না, আমি হাজারবার বারণ করা সত্ত্বেও উনি দিব্যি হাত-পা ধুয়ে খেতে বসে গেলেন। আমি অবশ্য কিছু খাইনি। কিন্তু আহারাদির পর ছেলের বাপ আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, "শাস্ত্রের বিধি তো আপনার অজানা নয়, কন্যার পিতা স্বয়ং আমার বাড়িতে আহার গ্রহণ করেছেন. এরপর বিয়ের কথা আর চলতে পারে না"।'

মাস্টারমশাই-এর কথাগুলো শুনে নন্‌জম্মার রাগ যেমন হল, তেমনি হল দুঃখ। স্বামী তো এসেই মাদুরের ওপর গড়াচ্ছেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করে ঝাঁঝিয়ে উঠল সে, 'মাস্টার-মশাই বারণ করা সত্ত্বেও অমন করলে কেন শুনি?' চেন্নিগরায়ও খিঁচিয়ে উঠল, 'খিদে পেয়েছিল তো, কি করব?' এর সঙ্গে তর্ক করা নিষ্ফল জেনেই আর কিছু বলে না নন্‌জম্মা। কে উদ্যোগী হয়ে এই মেয়ের বিয়ে দেবে সেইটেই চিন্তা করতে থাকে সে।

এমনই ভাগ্যের খেলা যে হঠাৎ সেই রাত্রেই প্রথম ঋতুদর্শন করল পার্বতী। ব্যাপারটা

অবশ্য অপ্রত্যাশিত কিছু নয়, কিন্তু প্রথমটা নন্‌জম্মা বেশ ব্যাকুল হয়ে পড়ল—কে এখন বিয়ে করবে এই মেয়েকে? অবশ্য শোনা যাচ্ছে, আজকাল নাকি তিপটুরের মত বড় বড় জায়গায় ঋতুমতী মেয়েদেরও বিয়ে হচ্ছে। কিন্তু সেসব তো বড় ঘরের ব্যাপার। পাড়া-গাঁ জায়গা, গরীবের মেয়ে, এখানে খবরটা যদি জানাজানি হয়ে পড়ে তো সমূহ বিপদ। গ্রামের পুরোহিত তো কবেই নন্‌জম্মাকে ছেলে-মেয়েসুদ্ধ একঘরে করে রেখেছে। যদি কোথাও বিয়ের ঠিক হয়, তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করার মত টাকাও যোগাড় করতে হবে বিয়ের খরচ ছাড়া। জরিমানা দিয়ে জাতে না উঠলে কেউ বিয়ে করবে না। তার ওপর এই ব্যাপার জানতে পারলে তো আর রক্ষা নেই। যেখানেই সম্বন্ধ হবে, লোকে ভাংচি দিতে শুরু করবে। ঘন্টাখানেক চুপ করে ভাবল নন্‌জম্মা। ওদিকে চেন্নিগরায় পড়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে, তাকে কিছু বলা পণ্ডশ্রম মাত্র।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই স্থির করল নন্‌জম্মা। পার্বতীকে নিজের বিছানার পাশে শুইয়ে কাউকে কিছু বলতে বারণ করে দিল। সকালে তাকে বাড়ির কাজ কিছু করতে না দিয়ে শুইয়েই রাখল, কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলা হবে পেট ব্যথা করছে। রামন্না জানলেও ক্ষতি নেই, সে বুদ্ধিমান ছেলে, কারো সামনে মুখ খুলবে না। বিশ্ব তো অবোধ শিশু। আর চেন্নিগরায়কে কিছু বলার দরকার নেই। ছেলে-পিলে সুস্থ আছে না অসুস্থ হয়েছে, তা নিয়ে কোনদিনই সে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না। কিন্তু বিশ্ব তো দিদিকে স্পর্শ করেছে, তারপর এসে ঢুকেছে রান্নাঘরে। মেয়ে সংসারের কাজকর্ম শিখে নেবার পর থেকে নন্‌জম্মা মাসিক ঋতুর সময় একটু আলাদা হয়েই থাকত। তাছাড়া রান্নাঘরে ঠাকুরের বেদীতে একটি শালগ্রাম শিলাও রেখেছিল শুচিশুদ্ধভাবে। এখন বিশ্ব তো দিদিকে ছুঁয়ে এঘরেও যাতায়াত করছে। অগত্যা নন্‌জম্মা পুজোর কাপড় পরে শালগ্রাম শিলাটিকে একটি তাম্রপাত্রে রেখে তুলে রাখল কড়িকাঠের খাঁজে। এমনিতে নন্‌জম্মা আচার-বিচার বিশেষ মানে না, কিন্তু শালগ্রাম শিলা ঘরে রাখলে একটু সাবধান হতেই হয়!

রামন্না রোজই কম্বনকেরে যায়, তাকে দিয়ে তিল আনালো নন্‌জম্মা। একদিন নিজেই কুরুবরহল্লী গিয়ে পুজোর নাম করে কয়েক বাড়ি থেকে চেয়ে আনল নারকেল। পার্বতীকে চুপি চুপি রান্নাঘরে বসিয়ে রোজ গুড় মেশানো তিলের নাড়ু, নারকেল, মেথির শরবৎ ইত্যাদি খাওয়াত সে। মাখনের সের এখন দশ আনা, কিন্তু তবুও সে রামন্নাকে দিয়ে মাখন আনিয়ে মেয়েকে খাওয়াতে লাগল রোজ। ঋতুর ব্যাপারটা জানাজানি হলে চলবে না বটে কিন্তু মেয়ের স্বাস্থ্যের প্রতিও দৃষ্টি রাখা দরকার—সেটা খেয়াল ছিল নন্‌জম্মার।

পাঁচমাস কেটে গেল এইভাবে। বাইরের লোকে এখনও কিছু জানে না। কিন্তু পার্বতীর বাড়ন্ত গড়ন দেখে আজকাল সবাইকারই মনে হচ্ছে মেয়ে আর ছোটটি নেই। মায়ের মতই লম্বা, ভরাট গড়ন তার। দরিদ্রের সংসার হলেও মেয়েকে যথাসাধ্য ভাল খাওয়াচ্ছে এবং তেল মালিশ ইত্যাদি করে শরীরের যত্ন নিচ্ছে মা। এখন আর পার্বতীকে বাগানে জল দিতে পাঠায় না সে। মেয়ের রঙ আর রূপ যেন দিন দিনই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, মানুষের নজর থেকে এই শারীরিক পরিবর্তন তো লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়! কি যে মুশকিলে পড়েছে নন্‌জম্মা। মেয়ের ফুটন্ত ফুলের মত রূপ দেখে মায়ের মনটা

তৃপ্তিতে ভরে উঠতে চায়, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেদের অবস্থার কথা ভেবে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে সে—কি করে বিয়ে হবে এই মেয়ের? মান রক্ষা হবে কি করে?

পার্বতীও বুদ্ধিমতী মেয়ে, মায়ের সমস্যা সে বেশ বোঝে। সমস্যাটা তো তাকে নিয়েই। বিয়ে তো হওয়াই উচিত। লোকে বলে, আগেকার দিনে মেয়েরা বিয়ের আগে ঋতুমতী হয়ে পড়লে তাদের নাকি চোখ বেঁধে জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসা হত। মা যেমন করে হোক বিয়ে নিশ্চয় দেবে। কিন্তু বর কেমন হবে তার? এই বাবা আর কাকার মত? মামা কল্লেশের মত? রেবন্নাশেট্টী, শিবেগৌড় ইত্যাদি গ্রামের সব পরিচিত লোকগুলোর মুখ মনে পড়ল তার—না, না এদের কারো মত স্বামী একটুও পছন্দ নয় পার্বতীর। পছন্দটা কিরকম তা মাকে বলা যায় অবশ্য, কিন্তু মা বেচারী কি করবে? পছন্দমত বর খুঁজে বিয়ে দেবার সাধ্য কি আছে মায়ের? পার্বতীর মাঝে মাঝে মনে হয় সে না জন্মালেই বোধহয় ভাল হত। এখনও যদি সে মরে যায় তাহলে সবদিক থেকেই সুবিধে হয়। কিন্তু মরে যাওয়া মানে তো মা, রামন্না, বিশ্ব সবাইকে ছেড়ে চলে যাওয়া। সে কথা মনে পড়তেই মৃত্যুর কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে পার্বতী। বর যেমনই হোক, তাকে নিয়েই ঘর করতে হবে। মা যেমন করে দিন কাটাচ্ছে, হয়ত তেমনি করেই। ভাগ্যে থাকলে স্বামী ভালও তো হতে পারে। এই তো গ্রামের মাস্টার-মশাই ভেঙ্কটেশায়াজী তো কখনো স্ত্রীকে মারধোর করেন না। বিড়ি, তামাক কোন বদ অভ্যাস নেই। একটা খারাপ কথা কখনো উচ্চারণ করেন না। স্বামী যদি ঠিক ঐ রকম হয়, তাহলে কি ভালই না হয়! নানা রকম চিন্তা আর আশার মধ্যে দুলতে থাকে পার্বতীর মনটা।

একদিন চেন্নিগরায় বাড়িতে ফিরেই প্রশ্ন করল, 'পার্বতী ঋতুমতী হয়েছে নাকি?'

পার্বতী সামনেই ছিল। নন্‌জম্মা রেগে উঠল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কে জিজ্ঞাসা করেছে এ কথা?'

'অন্নাজোইসজী বলছিলেন, "তোমার মেয়েকে আজকাল যে সব্জী খেতে আর দেখতে পাই না। বাড়ি থেকে বেরোয় না, ঋতুমতী হয়েছে নাকি"?'

'তুমি কি জবাব দিলে শুনি?'

'আমি বললুম, "আমি তো কিছু জানিনে, বাড়িতে জিজ্ঞেস করব"।'

'সোজাসুজি "না" বলে দিলে না কেন?'

'আমি এসব খবর জানব কি করে?' চটে গিয়ে বলে উঠল চেন্নিগরায়।

নন্‌জম্মা এবার মাথা ঠাণ্ডা করে উত্তর দিল, 'এখনও কিছু হয়নি। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে বাড়িতে বসে পাতা তৈরী করে, তাই বাইরে যায় না।' ব্যস, আর কিছু কৌতূহল প্রকাশ করল না পার্বতীর বাবা।

কিন্তু গ্রামের ব্রাহ্মণদের মনে ক্রমেই সন্দেহ বাড়ছে। এসব কথা কি বেশী দিন গোপন থাকে? বেলফুলের কুঁড়ি ফুটলে তার গন্ধ কি লুকোন যায়? তেমনিই একটি কিশোরীর মুকুলিত হয়ে ওঠার খবর কিছুতেই লুকিয়ে রাখা যায় না পাঁচজনের কৌতূহলী দৃষ্টির আড়ালে।

৩

একদিন দুপুরবেলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল একখানা ছই দেওয়া গরুর গাড়ি। গাড়ির বলদগুলোর গলার ঘন্টা বাজছে টুং টাং করে। গাড়িখানা ঠিক করে থামাবার আগেই পেছন দিক থেকে নেমে এলেন লম্বা-চওড়া একটি পুরুষ---কপালে ত্রিপুণ্ডক, কন্ঠে জপমালা। পার্বতী এঁকে কখনো দেখেছে কিনা ঠিক মনে করতে পারে না। বলদ খুলে গাড়িটা নিচু করার পর নেমে এল অক্কম্মা, চার বছর পরে এখানে এসেছে সে, আগের চেয়ে আরো ঝুঁকে পড়েছে এবার। 'মা, অক্কম্মা এসেছে', পার্বতীর চিৎকার শুনে ছুটে বাইরে এসেই নন্‌জম্মা দেখল সামনে দাঁড়িয়ে তার বাবা।

'নন্‌জা কত রোগা হয়ে গিয়েছিস তুই? এই তো সেই মেয়ে, যেটি আমাদের ওখানে হয়েছিল?' কন্ঠীজোইস জিজ্ঞাসা করেন।

পার্বতী আর তার ভাইরা তাদের দাদামশায়ের সম্বন্ধে কত গল্পই যে শুনেছে এতদিন ধরে। এতদিনে তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল। কোডবোলে, চাকলী আরো কত কি খাবার এনেছে অক্কম্মা। দাদামশাই নাতনী আর মেয়ের জন্য এনেছেন শাড়ী, নাতিদের জন্য জামা-কাপড়। এক ঘটি গঙ্গাজলও এসেছে। স্কুল থেকে ফিরে এঁদের দেখে বিশ্ব তো আহলাদে আটখানা।

'বাবা তেরো বছর পরে বাড়ি ফিরলেন। প্রথমে কোন মন্দিরে গিয়ে, সেখানেই আমাদের ডেকে পাঠালেন না কেন?'

'যে কাশীবাস করে আসছে তার জন্য ওসব কিছুই দরকার হয় না। গঙ্গাজল তো সঙ্গেই রয়েছে।'

'কাউকে একটা খবর না দিয়ে এতদিন ধরে কাশীতে গিয়ে থাকলেন কেন?' এ প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে কন্ঠীজোইস বললেন, 'বিশ্বনাথ টানলেন, তাই চলে গেলাম। যেখানেই থাকি, তাতে কি আসে যায়!'

অক্কম্মা সারাদিন ধরে গল্প করে নাতনীর সঙ্গে, সারা গ্রামের খবরাখবর শোনায়। কন্ঠীজোইস গ্রামের এক পুরোহিতের বাড়ি গিয়ে এই বারো বছরের কাশীবাসের অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়ে আসেন। পুরোহিত তাঁকে শ্রদ্ধা জানায় তাম্বুল, নারকেল ইত্যাদি উপহার দিয়ে।

অক্কম্মা এবার ওদের এখানে আসার আসল কারণটা জানায়---বলে, 'চৌদ্দ বছর হয়ে গেল, ঐ বাঁজা বউয়ের তো ছেলেপিলে হল না। ও অবশ্য মা হবার যোগ্যও নয়, কিন্তু এদিকে যে বংশ লোপ হতে চলেছে। আমাদের জল-পিণ্ড দেবার কেউ থাকবে না? তাই আমরা ঠিক করলাম কল্লেশের আবার বিয়ে দেওয়া উচিত।'

'ভাইয়া রাজি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কেন রাজি হবে না? সেই তো গাড়ির ব্যবস্থা করে আমাদের পাঠাল।'

'আমি আর কি বলব এ ব্যাপারে? কি-ই বা বুঝি আমি?'

'পার্বতীকে আমাদের দে। একদিনে বিয়ে হয়ে যাবে', বলে ওঠে অক্কম্মা। পার্বতী তখন সেখানেই দাঁড়িয়ে। কথাটা সে বুঝতেই পারে না। নন্‌জম্মারও প্রস্তাবটা বুঝতে

একটু সময় লাগে। অক্কম্মা আবার বলে, 'কন্ঠী কাশী থেকে এত সোনার আংটি, তিন হাজার টাকা, কত কি এনেছে। সব আমাদের মেয়েই পাবে, রাজরানী হয়ে থাকবে একেবারে।'

'অক্কম্মা, কতটুকু মেয়ে পার্বতী? আর ভাইয়ার কত বয়স ভাবো তো? একেবারে নিজের মামা ওর। ভাইয়ার ছেলে থাকলে তার সঙ্গে বিয়ে হতে পারত।'

'ছেলে থাকলে আর দ্বিতীয়বার বিয়েই বা করতে হবে কেন? মামার সঙ্গে কি বিয়ে হয় না নাকি? আর কিই বা বয়স এমন? ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ হবে বড়জোর, এখনও তো রাজপুত্তুরের মত চেহারা।'

'বৌদি কিছু বলবে না? চুপ করে থাকবে?'

'চুপ থাকবে না তো করবেটা কি শুনি? এর পেটে একটা সন্তান আসুক না, তখন এরই পদসেবা করবে। আর না পারে তো পোটলা-পুঁটলি বেঁধে চলে যাবে নিজের বাপের বাড়ি।'

নন্‌জম্মা সম্মতি দেবে কিনা বুঝতে পারছে না, মনটা চঞ্চল হয়ে উঠছে। অক্কম্মা আবার বোঝায়, 'দেখেছিস তো আমাদের ঘরে খাওয়া-পরার এতটুকু অভাব নেই। খেত-খামারের জন্য কত খাটে কল্লেশ, অমন ভাল বাড়ি। কন্ঠী এত টাকা এনেছে, ও যদি চায় তো সমস্ত সোনার গহনা দেবে, একদিক থেকে নাতনী আবার ওদিকে ছেলের বৌ। কল্লেশের সন্তান না হলে আমারও মৃত্যুর পর সদ্‌গতি হবে না। তোমাদের জন্ম দিয়েই তো মা চলে গেল, এই আমিই মানুষ করলুম দু'টিকে। আজ আমিই আবার তোর কাছে চাইতে এসেছি। পর তো কেউ নয়, তুই রাজি হয়ে যা, অমত করিস নে।'

মনটা নরম হয়ে এল নন্‌জম্মার। কিন্তু অন্তর থেকে কিছুতেই সায় দিতে পারছে না সে এ প্রস্তাবে। উপস্থিত কোন কথাই বলল না সে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কন্ঠীজোইস নিজেই কথা পাড়লেন। চেন্নিগরায়ও সেখানেই ছিল, সে তো প্রথম থেকেই শ্বশুরের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। শিবলিঙ্গের হাত থেকে পাটোয়ারীগিরিটা শ্বশুরই পাইয়ে দিয়েছেন ওকে। সকালে অক্কম্মা যা যা বলেছিল, সেই কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করলেন কন্ঠীজোইসজী। তারপর জামাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, 'চেন্নৈয়া, তোমার কি মত? গ্রামের বাড়ি, জমি-জমা, তিন হাজার টাকা সবই পাবে তোমার মেয়ে। তাছাড়া, কোথায় আবার বর খুঁজে বেড়াবে, তার চেয়ে মতটা দিয়ে ফেল, ঝামেলা চুকে যাবে।'

চেন্নিগরায়ের মত না দেবার কোন কারণই নেই। 'বেশ তো, আপনাদের যা অভিরুচি, আমার কোন আপত্তি নেই' অনায়াসে বলে দিল সে।

'দেখ্, তোর স্বামীর তো আপত্তি নেই। নন্‌জা তুই কি বলিস?'

নন্‌জম্মা এখনও মন স্থির করতে পারছে না। সে বলল, 'এত তাড়ার কি আছে, একটু চিন্তা করে কাল বলব।'

'এতে আবার চিন্তার কি আছে? আমরা সবাই ঠিক করেছি, সুতরাং এই সিদ্ধান্তই রইল। গ্রামে ফিরেই সব ব্যবস্থা করে ফেলছি, আজ থেকে আট দিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে' কন্ঠীজোইসজী নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করে দিলেন।

'ঠিক আছে, এখন ক'দিন থাকবেন তো? পরে কথা বললেই হবে।'

'না, না, এখন এখানে বসে থাকলে চলবে না। গাঁয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে তো। তুই এখানে এক পয়সাও খরচ করিস নে', বলে উঠল অক্কম্মা।

অক্কম্মা রাত্রে ফলাহার করবে। তাকে উপ্‌মা খাইয়ে, অন্য সবাইকার শোবার ব্যবস্থা করল নন্‌জম্মা। অতিথিরা দু'জনেই একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন। চেন্নিগরায় তো কখন থেকে নাক ডাকাচ্ছে। ছেলেরাও ঘুমিয়ে পড়েছে। অক্কম্মার পাশে শুয়েছে নন্‌জম্মা, কিন্তু দু'চোখের পাতা থেকে ঘুম কোথায় উধাও হয়ে গেছে। একেবারে আচমকা এসেছে এই বিয়ের প্রস্তাব, তার সম্মতি-অসম্মতির অপেক্ষা না করেই ওঁরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। নাগলাপুরে খাওয়া-পরার কষ্ট নেই, সবদিকেই প্রাচুর্য। ধান, মড়ুয়া, সব শস্যই এত হয় যে, সারা বছরের মত সঞ্চয় ঘরেই থাকে। তাছাড়া তিন হাজার টাকাও পাবে। এত টাকা নন্‌জম্মা এক সঙ্গে কখনো চোখেও দেখেনি। মেয়েটা তো জন্মাবধি দুঃখই পেয়ে এসেছে শুধু। খাওয়া জোটে তো পরনের কাপড় জোটে না, আবার কাপড় জোটে তো পেটের ভাত জোটে না! অনেকক্ষণ এই সব কথাই ভাবল নন্‌জম্মা। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে এ অন্যায়,—'আপন মায়ের পেটের ভাই, তার স্ত্রী বর্তমান, তবু তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি উচিত? ভাইয়া আমার চেয়ে সাত বছরের বড়, তার মানে পার্বতীর সঙ্গে তার বয়েসের তফাৎ বাইশ বছর। অবশ্য লোকে তিরিশ বছরের তফাতেও বিয়ে করে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিবাহ করলে বয়সের পার্থক্য তো হবেই। সন্তান না হলে, এক স্ত্রী বর্তমানে আবার বিয়ে করাও কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু কেন সন্তান হয়নি ভাইয়ার? বউ কি সত্যিই বাঁজা? ভাইয়ার উচ্ছৃঙ্খল জীবন ও অনাচার এই সন্তানহীনতার কারণ নয় তো? বৌয়ের স্বভাবও অতি নীচ, এ বিয়ে হলে মেয়ে আমার সুখী হতে পারবে কি?'

এই সব প্রশ্নের উত্তর এখনই পাওয়া দরকার। কাল সকাল হলেই বাবা ও অক্কম্মাকে মতামত জানাতে হবে। কে পরামর্শ দেবে এই পরিস্থিতিতে? খাওয়া-পরার সুখ আর তিন হাজার টাকার কথা শুনেই তো মেয়ের বাপ সম্মতি দিয়ে বসে আছে। অথচ মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে বাপ-মা দু'জনে মিলে পরামর্শ করে তবে মতামত জানানো উচিত। যাক্, তার নিজের ভাগ্য নিয়ে ভেবে তো কোন লাভ নেই, এখন কার কাছে যাওয়া যায়? হঠাৎ মনে পড়ল, 'ঠিক তো, মহাদেবায়াজী আছেন, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক, কি করা উচিত?' সন্তর্পণে শয্যা ছেড়ে উঠল নন্‌জম্মা, তারপর আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ করতে গিয়ে দেখে পার্বতীও উঠে এসেছে। মেয়েকে দেখে অবাক হল না নন্‌জম্মা, শুধু ইশারা করে কথা বলতে মানা করে দিল। দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে দিয়ে অগ্রসর হল সে, পার্বতী অনুসরণ করল মাকে।

মন্দিরে এসে মহাদেবায়াজীকে ডেকে তোলা হল। প্রদীপ জ্বেলে মহাদেবায়াজী দেখেন, মা ও মেয়ে এসেছে, মেয়ের চোখে জল। তিনি সস্নেহে বলে ওঠেন, 'কি রে মেয়ে, মামাকে বিয়ে করতে হবে বলে কান্না পাচ্ছে নাকি?'

নন্‌জম্মা আশ্চর্য হয়ে বলে, 'আপনি কি করে জানলেন অইয়াজী?'

'এই তো সন্ধ্যাবেলা তোমার বাবা এসেছিলেন, তাঁর কাছেই শুনলাম সব। তা, তুমি কি ঠিক করলে?'

'কিছু বুঝতে পারছি না আমি। তাই তো এলাম আপনার কাছে' বলে নন্‌জম্মা।

ইতিমধ্যে দেখা গেল রামন্নাও এসে হাজির হয়েছে। 'তুই আবার চলে এলি কেন বাড়ি ছেড়ে?' মা বলে ওঠে। কিন্তু হাতের চাবিটা দেখিয়ে ছেলে জবাব দেয়, 'বাইরে থেকে দরজায় তালা দিয়ে এসেছি। আমার ঘুম আসছিল না, তোমরা এখানেই আসবে তা বুঝতে পেরেছিলাম।'

মহাদেবায়াজী এবার রামন্নাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'দিদির বিয়েতে তোমার কি মত বাবা?'

'না, না অইয়াজী, কল্লেশ মামা তো নরসীর বাড়িতে ···' বলতে বলতে থেমে যায় রামন্না, বড়দের সামনে এসব বলা উচিত নয়। একটু পরে বলে, 'ওখানে বিয়ে হয়ে দরকার নেই।'

এতক্ষণে মহাদেবায়াজী বলেন, 'দেখ মা, তুমি যা ভাবছ, আমারও সেই মত। নিজের ভাই হলেও ওকে মেয়ে দিও না। আমার কথা যদি শোন তো, এ অঞ্চলে বিয়েই দিও না। এখানে ভাল ছেলে কোথায়? যারা সরকারী চাকরী করে তারা সাধারণতঃ লোক ভাল হয়ে থাকে। যেমন করে হোক, যদি একটি স্কুল মাস্টারের সঙ্গে বিয়ে দিতে পার, মেয়ে সুখী হবে। অন্য যাদের সব দেখি, তাদের স্বভাব তো জানাই আছে।'

ঠিক যেন পার্বতীর মনের কথাটিই উচ্চারণ করলেন মহাদেবায়াজী। নন্‌জম্মারও পছন্দ হল কথাটা। 'কিন্তু', নিচু স্বরে সে বলল, 'মেয়ের বয়স তো হচ্ছে, যদি বড় হয়ে যায় তখন?'

'আজকাল বড় বড় জায়গায় ওসব প্রথা কেউ মানে না। সেই রকম জায়গাতেই পাত্রের খোঁজ কর। এখন তো পাটোয়ারীর কাজেও রোজগার বেড়েছে, গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুললেও পাঁচ-ছ'শ' টাকার যোগাড় হয়েই যাবে।

'বড় বড় শহরে আজকাল অনেক যৌতুক দিতে হয়। আমি কি শেষ পর্যন্ত মেয়ের বিয়ে দিতে পারব? বড় ভয় করে আমার।'

রামন্না বলে উঠল, 'মা, আমি তো এখন উঁচু ক্লাসে পড়ি, আমি দিদিকে পড়াব। প্রাইভেটে পড়ে দিদি যদি লোয়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে নেয়, তাহলে দিদিও বাচ্চাদের স্কুলে পড়াতে পারবে। বিয়ে না হল তো বয়েই গেল।'

'সেকথা পরে ভাবা যাবে। এখন মাস্টার ভেঙ্কটেশায়াজীকেও একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ, তারপর সকালে বাপকে যা জবাব দেবার, বলে দিও।'

মায়ের আদেশে রামন্না ডাকতে গেল মাস্টারমশাইকে। 'দেখিস কেউ যেন টের না পায়' সাবধান করে দিল মা। একটু পরেই এসে পৌঁছলেন মাস্টারমশাই। পার্বতী থামের আড়ালে সরে বসল। সব কথা শোনার পর মাস্টারমশাই বললেন, 'দেখ বোন, আজকাল বাণাবর অরসিকেরে এসব ছোট-খাট গ্রামেও কত মেয়ে বিবাহের পূর্বেই ঋতুমতী হচ্ছে। সবাই জানে, তবে প্রকাশ্যে বলা হয় না। সুতরাং ও নিয়ে চিন্তার কারণ নেই। বল তো

আমিই পাত্রের সন্ধান করতে পারি। প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারের মাইনে অবশ্য কম, কিন্তু পাত্র পাওয়া যাবে। পাঁচ-ছ'শ' টাকার ব্যবস্থা করে ফেল তাহলেই বিয়ে হয়ে যাবে।'

'ছেলের স্বভাবটি কিন্তু ভাল হওয়া চাই মাস্টারজী, গোঁয়ার-গোবিন্দ হলে চলবে না। রোজগার কম হলেও ক্ষতি নেই, মেয়ে আমার খুব কাজের, ঘরে বসে পাতা বানিয়েই ও মাসে অন্ততঃ পনের টাকা রোজগার করতে পারবে।'

'সে আমি জানি। পার্বতীকে যে বৌ করবে, সে ছেলের অনেক তপস্যার জোর থাকা চাই।'

সুতরাং এটা স্থির হয়ে গেল যে, মামার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হবে না।

মাস্টারমশাই পরামর্শ দিলেন, 'সোজাসুজি "মেয়ে দেব না" একথা বলতে যেও না, বরং মেয়ের নাম করেই বলে দিও, পার্বতী কল্লেশকে বিয়ে করতে আপত্তি করছে, সুতরাং তুমি আর কি করবে। এ সম্বন্ধ ভাগ্যে নেই তাই হল না।'

সবাই চুপি চুপি বাড়িতে ফিরে এসে নিঃশব্দে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। ভোর না হতেই রওনা হবার জন্য তাড়াহুড়ো শুরু করলেন কন্ঠীজোইস। বললেন, 'ওরে নন্‌জা, আট দিন পরেই একটা ভাল দিন আছে, তা বিয়েটা তোর এখান থেকেই দিতে চাস, না নাগলাপুরে গিয়ে দিবি?'

'মেয়েকেও তো একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত বাবা? মেয়ের মত আছে কিনা, না জেনেই আমরা সব ঠিক করে ফেলছি, এটা কি ঠিক?'

'মেয়ের আবার মত কি? তোর বিয়েতে তোকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেছিল?' কন্ঠীজোইস এবার নাতনীকে ডাক দেন, 'কই রে খুকী, এদিকে আয়, তোর আবার কিছু মতামত আছে না কি?'

প্রথমটা পার্বতী চুপ করেই রইল। দাদামশাই দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করায় বলল, 'বিয়ে করব না।'

'কেন করবি না শুনি?'

'আমার পছন্দ নয়, আমি করব না দাদামশাই', কোনরকমে উত্তরটা দিয়েই পার্বতী পালাল রান্নাঘরে।

'নন্‌জা, ব্যাপার কি বল্‌ত? একথা বলছে কেন?'

'ওর যখন ইচ্ছে নেই, এ সম্বন্ধ ছেড়ে দিন না বাবা?'

এবার চটে গেলেন কন্ঠীজোইসজী। সোজা রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে পার্বতীকে আবার প্রশ্ন করলেন, 'কেন বিয়ে করবি না বল?' পার্বতী বলে উঠল, 'আমার পছন্দ নয়, কেন বার বার বলছেন?' তার মুখের কথা শেষ হতে না হতে গালের ওপর পড়ল এক থাপ্পড়। আজ পর্যন্ত পার্বতী নিজের মায়ের হাতে কখনো একটা চড়-চাপড়ও খায়নি। চড়ের আওয়াজ কানে যেতেই নন্‌জম্মা রান্নাঘরে এসে বলে ওঠে, 'কেন শুধু শুধু মেয়েটাকে মারছেন বাবা? আপনার যখন যা ইচ্ছে হয়, জিদ করে সেটা করে বসেন। আমার বিয়ে দেবার সময়ও অগ্রপশ্চাৎ কিছুই ভাবেননি। ভাইয়ার বেলাও প্রথম বিয়েটা কি ভেবে-চিন্তে স্থির করেছিলেন? সন্তান হওয়া না হওয়া তো ভাগ্যের অধীন, কিন্তু বিয়েটা

দেবার আগে মেয়ের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে যদি একটু খোঁজখবর করতেন তাহলে অন্ততঃ এই রকম বৌ জুটত না ওর কপালে।'

'কেন, তোর কি খারাপটা হয়েছে শুনি?'

'এর চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে? তোমার জামাই তো জমি-জমা সর্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখিরি করে ছেড়েছে আমাদের। আমি খেটে-খুটে রোজগার না করলে ছেলেপিলে তো উপোস করে মরত।'

'সেই জন্যই তো বলছি, কল্লেশের সংসারে মেয়ে খেয়ে-পরে সুখে থাকবে, ওকেই কন্যাদান করে ফেল।'

'মেয়ে নিজে যখন আপত্তি করেছে তখন আপনারা সবাই মিলে বললেও আমি এখানে বিয়ে দিতে পারব না। ভাইয়ার আবার যদি বিয়ে দিতেই হয়, অন্য পাত্রী খুঁজে নিন আপনারা।'

'বেশ, আজ থেকে তুই আমার মেয়ে ন'স, আমিও তোর বাপ নই', গর্জে উঠলেন কন্ঠীজোইস। বাইরে এসে বললেন, 'চলো অক্কম্মা, এই হতচ্ছাড়ির বাড়িতে আর জল গ্রহণও করব না আমরা।' জিনিসপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন তিনি। অক্কম্মারও সাধ পূর্ণ হল না---তাই সেও বেশ বিরক্ত, সেও গাড়িতে গিয়ে উঠল নিজের পুঁটলিটা নিয়ে। রওনা হবার সময় গাড়ির কাছে এসে নন্‌জম্মা মিনতি করে বলে, 'ভাগ্যে নেই, তাই বিয়ে হবে না। কিন্তু তোমরা এত রেগে চলে যাচ্ছ কেন? আজকের দিনটাও কি থেকে যাওয়া যায় না?'

অক্কম্মা বলে ওঠে, 'তোকে নিজের হাতে মানুষ করলাম, এত বার আঁতুড় তুললাম, তার উপযুক্ত প্রতিদান দিলি বটে তুই!' কন্ঠীজোইসজী বললেন, 'আমার আর মুখ খোলাস নে। স্পষ্ট কথা বলে দিয়ে গেলাম, আজ থেকে তুই আমার মেয়ে ন'স, আমি তোর বাপ নই।' এরপর আর কোন অনুনয় করল না নন্‌জম্মা।

৪

প্রায় আট দিন কেটে গেছে। সেদিন দুপুরে মা-মেয়েতে বসে জাঁতা ঘুরিয়ে মড়ুয়া পিষছিল। আর কেউ নেই বাড়িতে, হঠাৎ মনে হল কে যেন ঢুকল। পেছন ফিরে নন্‌জম্মা দেখে, নরসী এসেছে। এর আগে নরসী কখনো এ বাড়িতে আসেনি। তার দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময়ও নন্‌জম্মা কখনো কথা বলে না তার সঙ্গে। নরসী নিজেই হয়ত প্রশ্ন করে, 'কি গো কুরুবরহল্লী যাচ্ছ বুঝি?' নন্‌জম্মা এক অক্ষরের জবাব দিয়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু আজ একেবারে বাড়িতে এসে হাজির, এখন কথা না বলে তো উপায় নেই! অবশ্য ওর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়নি কখনো, কিন্তু যা চালচলন, ওর সঙ্গে মেলামেশা করা কি উচিত? ভাবছিল নন্‌জম্মা। শেষ পর্যন্ত ওকে বসতে বলল সে। নরসী বারান্দার থামে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। পার্বতী উঠে চলে গেল রান্নাঘরে। শুধু শুধু নিশ্চয় আসেনি, কিছু দরকারেই এসেছে, সুতরাং নন্‌জম্মা নিজেই এবার প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ আমার কাছে এলে যে?'

'একটা কথা বলতে এলুম ভাই। তুমি নাকি নিজের ভাইয়ের সঙ্গে পার্বতীর বিয়ে দিচ্ছ? সত্যি?'

'কে বলল তোমাকে?'

'আমাদের আপনার লোক একজন থাকে শিঙ্গেহল্লীতে, তার আবার আত্মীয়দের বাড়ি নাগলাপুরে। সেই তো বললে, নাগলাপুরে নাকি সবাইকার মুখেই এই আলোচনা।'

নরসীর কাছে বাড়ির কথা বলার ইচ্ছা নন্‌জম্মার একেবারেই নেই, তাই সে শুধু বলল, 'ওসব যা শুনেছ, সব বাজে কথা।'

'সেদিন তোমার বাবা আর ঠাকুমা এসেছিলেন না? ওঁদের দেখে আমি তো ভাবলাম এইজন্যই এসেছেন বুঝি। তাহলে বাজে কথাই হবে হয়ত। তোমাদের ভাই-বোনে সম্পর্ক ভাল থাকলেই ভাল। কিন্তু ওর হাতে কখনো মেয়েকে দিও না। আমি যে একথা বলেছি তাও কাউকে বোল না যেন।'

এ কথার কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে নন্‌জম্মা নরসীর মুখের দিকে চেয়ে রইল অবাক হয়ে। নরসী আবার বলল, 'ওর হাতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়াও ঢের ভাল।'

'আমার ভাই কি এখনো তোমার ঘরে আসে?' 'না, আর আসে না, চার বছর আগে আমি তাকে একদিন লাথি মেরে দূর করে দিয়েছিলাম। আমার মত এক বেশ্যার লাথি খেয়েও ওর লজ্জা হয়নি।' নন্‌জম্মা কথা বলতে পারছে না। পার্বতী বড় হয়েছে এসব কথা ওর কানে না যাওয়াই ভাল, একটু গলা নামিয়ে কথা বললেই হয়, কিন্তু সেসব হুঁশ কি আছে নরসীর? কোনরকমে নন্‌জম্মা বলল, 'যাক গে যাক, এসব কথা বলে লাভ কি?'

'আমি কোন খারাপ মতলবে এসব কথা বলতে আসিনি বোন। কত লোকই তো আসে আমার ঘরে, সবাইকার দুর্ব্যবহার আমি মনেও রাখি না। পার্বতী আমারও মেয়ের মত, তাই বলছি, কোন ভাল বাপের সচ্চরিত্র ছেলে দেখে ওর বিয়ে দিও।' নরসী এরপর নন্‌জম্মাকেই প্রশ্ন করে, 'আমার সঙ্গে শুয়ে, তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লে আমারই দোকানের টাকা চুরি করে পকেটে ভরাটা কি উচিত কাজ, তুমিই বল দেখি?'

নন্‌জম্মা কোন উত্তর দিতে পারে না। নরসী বিদায় নিতে গিয়ে বলে, 'চলি ভাই, কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারলুম না, মনে হল কথাগুলো তোমায় জানানো উচিত, তাই বলে গেলুম।'

নরসী চলে যাবার পর পার্বতী আবার এসে জাঁতা ঘোরাতে বসল। একসঙ্গে জাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে মা আর মেয়ে দু'জনেই ভাবছিল একই কথা,—বিয়ের প্রস্তাবে ভাগ্যিস 'না' বলে দেওয়া হয়েছে! কিন্তু মুখ ফুটে কেউই কথাটা উচ্চারণ করল না।

৫

যেমন করে হোক মেয়ের বিয়েটা এবার দিয়ে ফেলতেই হবে। কিন্তু টাকার যোগাড় না করে বর খুঁজতে যাওয়ার একটা বিপদ আছে। হঠাৎ যদি কোথাও সম্বন্ধ পাকা হয়ে

যায় তখন হাতে টাকা না থাকলে অপদস্থ হতে হবে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ আইনের জন্য যখন থেকে শস্যের হিসাব লেখা শুরু হয়েছে তখন থেকেই আর খাজনার টাকার আগাম রসিদ দিয়ে কুরুবরহল্লী থেকে মড়ুয়া সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না। বাড়তি হিসাব লেখার জন্য সরকার থেকে বছরে একশ' টাকা অতিরিক্ত ভাতাও পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং বর্ষাসন ও অতিরিক্ত ভাতা মিলিয়ে দুশ' কুড়ি টাকা পাওয়াই যাবে। কিন্তু নন্‌জম্মার দুশ্চিন্তা তার স্বামীকে নিয়ে। ঐ টাকাটা স্বামীর হাতে না পড়ে, তাহলেই তিপটুরে গিয়ে সব উড়িয়ে দিয়ে আসবে। এবার গুণ্ডেগৌড়জী গ্রামে আসতে নন্‌জম্মা তাঁকে অনুরোধ করল, এ বছরের পাওনা খাজনার জন্য কুরুবরহল্লীর মোট ছ'জনের নামে রসিদ লিখে চেন্নিগরায়কে দিয়ে তিনি যেন স্বাক্ষর করিয়ে নেন। স্বামীকে একথা বলতেই সে বেঁকে বসল, বলল, 'সই করব না আমি কিছুতেই।'

নন্‌জম্মা নিরুপায়ভাবে সমস্যাটা বোঝাল গুণ্ডেগৌড়জীকে, 'গৌড়জী, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। আপনি কোনরকমে সইটা করিয়ে নিন, তারপর টাকাটা আপনার কাছেই রেখে দেবেন।'

গৌড়জী এবার এক ধমক লাগালেন, 'এই চিন্নয়া, চুপচাপ সইটা করবে, না দু-চার ঘা দিতে হবে?'

'এ তো দেখছি মহা মুশকিল, আপনারা দু'জনে মিলে একটা পয়সাও আমাকে নিতে দেবেন না? কেন, আমি কি পাটোয়ারী নই? যদি সই না করি তো কি করতে পারেন আপনারা?'

'তাহলে মারধোর করতেই হবে দেখছি। এরপর আমাদের গাঁয়ে ঢুকতে গেলে কি দশা করি তা দেখিস এখন' বলতে বলতে হাতের লাঠিটা তুলে তেড়ে ওঠেন গুণ্ডেগৌড়জী। ব্যাস, এতেই কাজ হয়, ঘাবড়ে গিয়ে চেন্নিগরায় চুপচাপ সই করে দেয় সব কটা রসিদে। কিন্তু তারপর রাগ সামলাতে না পেরে শুরু করে অকথ্য গালাগালি। বকবক করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে।

গৌড়জী হেসে ফেলে মন্তব্য করেন, 'এ সংসারটা যেন একটা মজার নাটক, তাই না?'

'সত্যি কথা গৌড়জী' নন্‌জম্মা বলে ওঠে, 'ভাগ্যে আপনার মত মানুষ দু-একটি আছে এখনও নাহলে এই নাটকে শেষ পর্যন্ত মঞ্চে আগুন ধরে যেত। এই তো দেখুন মোটে দুশ' টাকার ব্যবস্থা হল, কিন্তু সবসুদ্ধ অন্ততঃ ছ'-সাতশ' টাকার দরকার। কি যে করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না, আপনিই ভরসা আমার।'

'মেয়ে তো তোমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপ্রতিমা। আমাদের জাতে হলে এতদিনে এক গা গহনা দিয়ে সাজিয়ে বৌ করে নিয়ে যেতাম। তোমাদের জাতের নিয়ম-কানুন বড় খারাপ মা।'

'কি করব বলুন, যে জাতের ঘরে জন্মেছে সেই জাতের নিয়ম মানতেই হবে।'

'নারকেল, ডাল এসব জিনিসপত্রের জন্য চিন্তা কোর না। তুমি পাত্র ঠিক করে ফেল। আমাদের গ্রাম থেকে পাঁচ-দশ টাকা করে চাঁদা তুলে দেব। চল্লিশ ঘর লোকের বাস, গ্রামের পাটোয়ারীর মেয়ের বিয়ে, একথা বললে শ' তিনেক টাকা ঠিক উঠে যাবে। ফসলের হিসাব দেখানোর সময় তুমি আমার গ্রামের মানুষের মঙ্গল চিন্তা করেছিলে সেকথা

সবাইকার মনে আছে। তাহলে হল মোট পাঁচশ' টাকা, বেশী ঘটা কোর না, তাহলে ওতেই কুলিয়ে যাবে কোনরকমে।'

গৌড়জীর কাছে এতটা আশ্বাস পেয়ে অনেক হাল্কা হয়ে গেল নন্‌জম্মার মন। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে সে পাত্রের সন্ধান করবে। যাবার আগে গুণ্ডেগৌড়জী পার্বতীকে ডেকে আশীর্বাদ করে বলে গেলেন, 'তুই বড় সুন্দর হয়েছিস মা, তোর উপযুক্ত বর নিশ্চয় পাওয়া যাবে।'

এক সময় নন্‌জম্মা ভাবত কল্লেশকে দিয়েই পাত্রের সন্ধান করাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কল্লেশ নিজেই বর হতে চাইল, আর শেষ পর্যন্ত বাবা, ঠাকুমা সবাই পর হয়ে গেল রাগ করে। এখন পার্বতীর বর খোঁজার জন্য প্রয়োজন একটি বিশ্বাসী এবং ভাল লোক, নাহলে সৎ পাত্র পাওয়ার আশা কম। নন্‌জম্মা শেষ পর্যন্ত মাস্টার ভেঙ্কটেশায়াজীকেই এই দায়িত্ব অর্পণ করে বলল, 'আপনিই সৎ পাত্র খুঁজে দিন, কন্যাদানের পুণ্য আপনারই হবে।'

মাস্টার দু'-চারখানা গ্রামে ঘুরে এলেন, কিন্তু সুবিধামত পাত্র চোখে পড়ল না। অরসীকেরের কাছের এক গ্রামের বেশ নামকরা এক জমিদার তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের জন্য নিজে থেকেই এখানে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু মাস্টার ভেঙ্কটেশায়াজী বললেন, 'আমি এদের পাকা কথা দিইনি, কারণ আমার মনে হচ্ছে এ ছেলের নিশ্চয় কিছু দোষ আছে, নাহলে এত বড় জমিদার গরীবের ঘরে সেধে কাজ করতে চাইবে কেন?'

নন্‌জম্মারও মনে হল কথাটা যুক্তিসঙ্গত। 'কথায় বলে, বিবাহ আর বিবাদ দুইই হয় সমানে সমানে। না বাপু, এত বড়লোকের বাড়ি বিয়ে দিয়ে দরকার নেই।'

মাস চারেক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল একটি ভাল সম্বন্ধ। নন্‌জম্মার পাটোয়ারী-গিরি শিক্ষার গুরু সেই তিম্‌লাপুরের দাবরসায়াজীর বাড়ি থেকে সম্বন্ধটা এসেছে। পাত্র দাবরসায়াজীর স্ত্রীর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। এস, এস, এল, সি (ম্যাট্রিক) পাশ করে মিডল স্কুলে শিক্ষকতা করে, বয়স প্রায় সাতাশ বছর। প্রথম স্ত্রী মারা গেছে চার মাস আগে, তিন বছরের একটি মেয়ে রেখে। পাত্রের বাবা-মা নেই। কাজেই শিশুটিকে দেখবার কেউ নেই, স্কুল যাবার সময় তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। পাত্র সুপুরুষ, মাইনে পায় ষাট টাকা, বেশ পরিশ্রমী ছেলে, নাম সূর্যনারায়ণ। দাবরসায়াজী এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, এতদূর হাঁটতে পারেন না, তাই ছেলেকে দিয়ে নন্‌জম্মাকে বলে পাঠিয়েছেন, 'ছেলে একেবারে খাঁটি সোনা, কোন চিন্তা কোর না, মেয়ে তোমার সুখী হবে। আগের পক্ষের মেয়েটিকে নিজের সন্তানের মত করেই যেন পালন করে তোমার মেয়ে, আর কিছু চাই না।'

নন্‌জম্মা জানে দাবরসায়াজী অতি বিচক্ষণ লোক, তাঁর কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। তাঁর ছেলেকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'পাত্রটিকে আপনি নিজে দেখেছেন কি?'

'আমি নিজে ভাল চিনি না, শুনেছি আমার মায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। গুব্বী তালুকের বাল্লেকেরে মিডল স্কুলে মাস্টারী করে। আপনি ডেকে পাঠান যদি তো মেয়ে দেখতে আসতে পারে এখানে।'

ভেঙ্কটেশায়াজীকেই অনুরোধ জানাল নন্‌জম্মা। তিনি দাবরসায়াজীর ছেলের সঙ্গে তিম্‌লাপুর গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে এসে বললেন, 'ছেলেটি আমার পূর্বপরিচিত। আমিও

কিছুদিন ছিলাম গুব্বী তালুকের কডব গ্রামে, মাইনে আনতে গিয়ে তালুক অফিসে কয়েক-বার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আলাপও হয়েছিল, চমৎকার ছেলে। বেচারার স্ত্রী মারা গেছে জানতাম না। ছেলেটি মৃতদার, এইটুকু খুঁত বাদ দিলে আর সব দিক থেকে এমন বর পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।'

পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করায় সে জবাব দিল, 'মা তুমি যা ভাল বুঝবে তাই কর, আমার কিছু বলার নেই।' নন্‌জম্মা এবার স্বামীর জবানীতে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিল তিম্‌লা-পুরে। কারিন্দা চিঠি নিয়ে গেল।

প্রায় দিন পনেরো পরে গরুর গাড়ি করে দাবরসায়াজী, তাঁর স্ত্রী, পুত্র এবং পাত্র সূর্যনারায়ণ মেয়ে দেখতে এলেন। ছেলেটির চেহারা দেখে সাতাশের বেশী বয়স মনে হল না, একটু গম্ভীর প্রকৃতি, বেশী কথা বলে না। কিন্তু তিন বছরের ছোট্ট মেয়েটি এক মুহূর্ত তার বাবাকে ছাড়ে না। মাস্টার ভেঙ্কটেশায়াজীও এলেন। তিনি সূর্যনারায়ণের থেকে বয়সে অনেক বড়, তবে পরিচয় ছিল তাই গল্পগুজব করলেন পাত্রের সঙ্গে। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার সময় পায়েস পরিবেশন করতে করতে সূর্যনারায়ণের বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে নন্‌জম্মার বেশ ভাব হয়ে গেল। নন্‌জম্মার কোলে উঠে ঘুরতে লাগল সে। একটু পরে রান্নাঘরে পার্বতীর সঙ্গেও তার ভাব হতে দেরী হল না, তারপর দেখা গেল বিশ্বর হাত ধরে বাড়ির বাইরে সে দিব্যি খেলা করছে। সূর্যনারায়ণ বলল, 'এখানে এসে বেশ আধঘন্টার মধ্যে সবাইকার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে গেছে দেখছি, কিন্তু সাধারণতঃ কারো কাছে ও যেতে চায় না।'

'মেয়ে দেখা' পর্ব শেষ হল। সূর্যনারায়ণ নন্‌জম্মাকে বলল, 'আমার জন্মপত্রিকা এনেছি, আপনার যদি ইচ্ছা হয় মিলিয়ে দেখতে পারেন। আমার নিজের তো কোষ্ঠী-বিচারের ওপর সব বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। সেবারে জন্মপত্রিকা মিলিয়ে দেখে দু'-তিন-জন পুরোহিত বলেছিল, এর চেয়ে ভাল মিল নাকি আর হতেই পারে না। কিন্তু বিয়ের চার বছর পরেই তো এই অঘটন। আমার কথা তো দাবরসায়া মামার কাছে সবই শুনেছেন। আমিও ওঁর কাছেই আপনাদের কথা শুনেছি। ইচ্ছা হলে আপনি আরো খোঁজখবর করতে পারেন। আপনাদের যদি অমত না থাকে যথাসম্ভব সাদাসিধেভাবে বিয়েটা দেবেন। একটি কথা শুধু আমি আগে থেকে বলে রাখতে চাই, আমার মেয়েটিকে একেবারে নিজের সন্তানের মত করে পালন করতে হবে, এটা আপনার মেয়েকে বলে দেবেন।'

দাবরসায়াজী এবং ভেঙ্কটেশায়াজী দু'জনেই অল্প-স্বল্প কোষ্ঠীবিচার করতে জানেন, ওঁরা পাত্র-পাত্রীর জন্মপত্রিকা মিলিয়ে দেখলেন মোটামুটিভাবে মিলছে। এর বেশী দেখা সম্ভবও ছিল না। সূর্যনারায়ণকে মাস্টার নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। এই অবসরে দাবরসায়াজী প্রশ্ন করেন চেন্নিগরায়কে, 'কি পাটোয়ারীজী, আপনার কি মতামত?'

'আমি আর কি বলব? আমাকে জিজ্ঞাসা করে কিছু করা হয়েছে নাকি?'

'আপনি হলেন বাড়ির কর্তা। কাজটা যেই করুক কর্তার স্থান তো আপনাকেই নিতে হবে।'

'এত যে নাচছে, টাকার ব্যবস্থা কি করেছে সেটা জিজ্ঞাসা করুন তো একবার।'

'আপনার স্ত্রীকে আপনি নিজেই তো সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

স্ত্রীর দিকে ফিরে 'এই ছেনা ···' বলেই কোন মতে সামলে নিয়ে চেন্নিগরায় এবার ভদ্র সুরে জিজ্ঞাসা করে, 'টাকার যোগাড় হবে কি করে?'

'এ বছরের বর্ষাসনের টাকা গৌড়জীর কাছে জমা আছে, তাছাড়া কুরুবরহল্লী থেকে উনি চাঁদা তুলে দেবেন বলেছেন।'

পাটোয়ারী মশায়ের মনে পড়ে গেল কিভাবে ভয় দেখিয়ে ওকে দিয়ে রসিদে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। 'ঐ এক ঘরভাঙানে হারামজাদা' মন্তব্য করল সে। নন্‌জম্মা কথা বলল না। দাবরসায়াজীও চেন্নিগরায়কে চেনেন ভাল করেই, তাই তিনিও কথা বাড়ালেন না আর।

ভেঙ্কটেশায়াজী মহাদেবায়াজীকেও ডেকে এনে বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনজনে এলেন নন্‌জম্মার বাড়িতে। বিবাহ স্থির হয়ে গেল। এক মাস পরে বিয়ে হবে, সূর্যনারায়ণের ইচ্ছা, লগ্নপত্রিকা ইত্যাদি অনুষ্ঠান একেবারে পাণিগ্রহণের দিন সম্পন্ন করলেই চলবে। বেশী খরচপত্র করার কোন প্রয়োজন নেই। কন্যার জন্য যা আনতে হয় সূর্যনারায়ণ নিয়ে আসবে। বরাভরণে একজোড়া মিলের ধুতি, তামার পঞ্চপাত্র ও আচমন ছাড়া আর কিছু চাই না। যাবার সময় সূর্যনারায়ণ চেন্নিগরায় ও নন্‌জম্মাকে প্রণাম করল। তার মেয়ে তখনও বিশ্বর সঙ্গে খেলায় মত্ত। তাকে কোলে তুলে নিল সে। গাড়ি থাকলেও গ্রামের পথটুকু পুরুষরা সবাই হেঁটেই চললেন, বেশ কিছুটা পথ তাঁদের এগিয়ে দিয়ে এলেন ভেঙ্কটেশায়াজী ও মহাদেবায়াজী।

৬

বিয়ে স্থির হয়েছে, এখন পাঁজিতে শুভলগ্ন দেখে দিনক্ষণ স্থির করতে হবে। তারজন্য চাই পুরোহিত। গ্রামের দুই পুরোহিত তো এই পরিবারকে রেখেছে একঘরে করে। বাবার কাছেও সাহায্য নেবার উপায় নেই, নন্‌জম্মার ওপর চটে আছেন তিনি। গ্রামের পুরোহিত দুটিকে সামলে না রাখতে পারলে ওঁরা অনেক কিছু অনিষ্ট করতে পারেন। হয়ত ছেলের বাড়িতে গিয়ে বলে আসবেন কন্যা এবং তার মা সমাজ থেকে বহিষ্কৃত। আরো কত কি ভাংচি দিতে পারেন। ছেলে যদিও খুবই বিবেচক এবং বুদ্ধিমান কিন্তু ভাংচির ফলে তার মত পরিবর্তন হতে কতক্ষণ?

কিন্তু পুরোহিত দুটিকে বশ করা বেশ কঠিন কাজ। শস্যের পরিমাণ লেখার কাজ আরম্ভ হবার পর থেকে, নিজের নিজের খেতের ফসল কম করে লেখানোর জন্য অনেকেই নন্‌জম্মাকে খোসামোদ করতে আসে। অন্নাজোইসজী স্বয়ং না এলেও পাট্টাদারকে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহু বার অনুরোধ করে পাঠিয়েছে। সবাই জানে এ গ্রামের আসল পাটোয়ারী নন্‌জম্মা, হিসাব-নিকাশ সমস্তই তার হাতে। সারা দুপুর ধরে নন্‌জম্মা ভাবল, তার নিজেরই ওদের কাছে যাওয়া উচিত কিনা। অবশেষে সন্ধ্যাবেলা কারিন্দাকে

ডেকে আদেশ দিল, 'যাও, অন্নাজোইসজী আর অইয়াশাস্ত্রীজীকে গিয়ে বল যে, আমি ওঁদের ডেকেছি।'

নন্‌জম্মার এ আদেশ যে যথেষ্ট ধৃষ্টতাপূর্ণ তাতে আর সন্দেহ কি? যাঁরা নিজেদের সাক্ষাৎ শৃঙ্গেরীমঠের প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেন তাঁদের দরজায় গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ে থাকার কথা এদের মত গরীবদের। সুতরাং দুই পুরোহিত আসবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল নন্‌জম্মার মনে। যদি না আসে? তারপর কি করা উচিত সেটাই ভাবছিল সে। কিন্তু দেখা গেল আশঙ্কা অমূলক। দশ মিনিটের মধ্যে অইয়াশাস্ত্রীজী, এবং আর পাঁচ মিনিট পরে কারিন্দার সঙ্গে এসে হাজির হলেন অন্নাজোইসজী।

নন্‌জম্মা বেশ ভারিক্কিচালে কারিন্দাকে আদেশ করল, 'মাইগা, তুই বারান্দায় বস গিয়ে।' তারপর সে দুই পুরোহিতের জন্য আসন পেতে দিল। কুশল প্রশ্নাদির পর ওঁরা নিজে থেকেই কথা তুললেন, 'শুনলাম মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছে? তা বেশ, বেশ, অতি আনন্দের সংবাদ!'

'সেইজন্যই তো ডেকেছি আপনাদের। এখন কোষ্ঠী দেখতে হবে, লগ্ন স্থির করতে হবে। আপনারা তো জানেন, বাবা ফিরে এসেছেন কাশী থেকে, ওঁকে খবর দিলে এক্ষুণি ঘোড়ায় চড়ে এসে যাবেন, বিয়ের সমস্ত কাজের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নেবেন। কিন্তু আমি ভাবলাম আপনারা স্থানীয় পুরোহিত, আপনারা থাকতে আর ওঁকে ডাকব কেন? আপনারা যা বলেন সেইভাবেই কাজ করব।'

'আহা, কি মুশকিল, তাই কখনো হয়? আমরা উপস্থিত থাকতে তাঁকে কষ্ট দেবার কি দরকার? এ গ্রামের সমস্ত শুভ কাজ সুসম্পন্ন করানো তো আমাদেরই কর্তব্য। তা দাও, বরের জন্মপত্রিকাখানা দেখি একবার' বলে উঠলেন অইয়াশাস্ত্রীজী। একে তো ফসলের হিসাব লেখা পুরোপুরি নন্‌জম্মার হাতে, তারপর কন্ঠীজোইস যদি এ গ্রামে এসে মাসখানেক বাস করেন তাহলে এই দুই পুরোহিতকে অস্থির করে মারবেন। তিনি তো শুধু পৌরোহিত্য করেন না, যার ওপর রাগ হয় তার দফা একেবারে শেষ করে ছাড়েন।

বাড়িতে পাঁজি ছিল, দেখে-শুনে বিচার করে দুই পুরোহিত রায় দিলেন, 'কোষ্ঠী মিলেছে, আজ থেকে ছাব্বিশ দিনে বেশ ভাল বিবাহযোগ।' আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বিয়ের জন্য কোন চিন্তা নেই, বরপক্ষের পুরোহিত না এলেও চলবে, আমরা দু'জনে সব সামলে নেব।'

'আমি ভাবছিলাম রামন্নার উপনয়নও এই সঙ্গে সেরে ফেলব। বিয়ের দিনে ওটা সম্ভব হবে?'

আবার পাঁজি দেখা হল। বিধান হল, বিবাহের পূর্বে যে কোনদিন উপনয়ন দেওয়া চলবে।

এত সহজে এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে তা নন্‌জম্মা ভাবতেই পারেনি। এইবার টাকাটা সংগ্রহ করে জিনিসপত্র কেনাকাটা শুরু করতে হবে। পরদিনই সে কুরুবরহল্লী চলে গেল। গুণ্ডেগৌড়জী গ্রামবাসীদের ডেকে চাঁদার কথা বললেন। নন্‌জম্মাই চাঁদার তালিকা তৈরী করল, তাতে দেখা গেল দুশ' সত্তর টাকা উঠছে। গৌড়জী আশ্বাস দিলেন

বাকি ত্রিশ টাকা তিনি নিজেই দেবেন এবং পুরো তিনশ' টাকা কয়েকদিনের মধ্যেই একত্র করে নিজেই পৌঁছে দিয়ে আসবেন। 'বর্ষাসনের দুশ' টাকা তুমি আজই নিয়ে যাও মা। তাছাড়া সবাইকে আমি বলব নিজের নিজের বাগান থেকে দু'-চারটে করে নারকেল দিতে। শ' দেড়েক নারকেল হলেই কাজ চলে যাবে মনে হয়, তাই না?'

'যথেষ্ট হবে গৌড়জী।'

'বাজার করতে যেতে হবে তিপটুরে। যেদিন দরকার খবর পাঠিও, গাড়ি পাঠিয়ে দেব। গুড় একটু বেশী করে কিনে নিও।'

গ্রামে ফিরে এল নন্‌জম্মা। এইবার বাজারের ফর্দ করতে হবে। কতজন বরযাত্রী আসবে জানা নেই। পাত্রের নিকট আত্মীয় তেমন কেউ নেই, তাছাড়া এটা তার দ্বিতীয় বিবাহ। দশ-পনেরো জনের বেশী নিশ্চয় আসবে না। এ পক্ষে তো নাগলাপুরের ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। এ গ্রামে ব্রাহ্মণ আছে সাত ঘর। তবে কুরুবরহল্লীর প্রত্যেক পরিবার থেকে একজনকে অন্ততঃ নিমন্ত্রণ করতেই হবে। খাবার জিনিসের ফর্দটা একটু দরাজ হাতেই করল নন্‌জম্মা, তারপর শুরু করল সোনা, রুপো এবং কাপড়-চোপড়ের ফর্দ। ভেঙ্কটেশায়াজী ও রামন্নাকে নিয়ে গাড়ি করে তিপটুরে গেল বিয়ের বাজার করতে। বরের জন্য কেনা হল জরীপাড় ধুতি, রেশমী জামা, কোট আর জরী দেওয়া পাগড়ি। আচমনের জন্য একটি রুপোর ঘটি। কনের জন্য তিরিশ ও পঁচিশ টাকা দামের দুখানি শাড়ী, রামন্না ও বিশ্বর জামা, রামন্নার জন্য লুঙ্গি, উপনয়নের ভিক্ষাপাত্র করার জন্য ছোট একটি রুপোর থালাও কেনা হল। বিয়ের দিন পরার জন্য নিজের একখানি শাড়ী এবং চেন্নিগরায়ের জামা-কাপড় কিনে এতক্ষণে নন্‌জম্মার মনে হল, আর বোধহয় কিছু কিনতে হবে না। মাস্টার সাবধান করে দিলেন, 'সব কেনাকাটার পরও অন্ততঃ দেড়শ' টাকা হাতে থাকা দরকার, একটু বুঝে-সুঝে খরচ কর, নন্‌জম্মা।'

কারিন্দার হাতে চিঠি দিয়ে তাকে বাপেরবাড়ি নাগলাপুরে পাঠাল নন্‌জম্মা। মোরগ-ডাকা ভোরে রওনা হয়ে, কারিন্দা ফিরে এল যখন বেশ রাত হয়ে গেছে। এসে বলল, 'ওঁরা বললেন যে ওঁরা কেউ আসবেন না।'

'কে বলল এ কথা।'

'আপনার বাবাই তো বললেন।'

'আর কি বললেন তিনি?'

বললেন, 'আমি যখন চাইলাম তখন মেয়ে দিতে রাজি হল না। এখন অন্য জায়গায় বিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রইল না!'

বাবাকে ভালভাবেই চেনে নন্‌জম্মা। নিজের জিদ কিছুতেই ছাড়বেন না তিনি। মা, মেয়ে, স্নেহ, ভালবাসা সব কিছুই তুচ্ছ ওঁর জিদের কাছে।

'ঠাকুমা কি বললেন?'

'তিনি তো কথাই বললেন না আমার সঙ্গে।'

খুব আঘাত লাগল নন্‌জম্মার মনে। বাবার ব্যবহার কিছু নতুন নয়, কিন্তু অক্কম্মা? যে অক্কম্মা ওকে মানুষ করেছে, বিয়ে দিয়েছে, ওর আঁতুড় তুলেছে, সেও যদি পার্বতীর

বিয়েতে না আসে তাহলে নন্‌জম্মার মন মানবে কেন? একবার ভাবল নিজেই গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। কিন্তু গাড়ি নিয়ে গেলেও যেতে একদিন, আসতে একদিন। এদিকে বিয়ের আর মাত্র তের দিন বাকি। কত কাজ পড়ে আছে। কাঠ, সব্জী এসব যোগাড় করতে হবে। চাকলি, বড়া এসব তৈরীর জন্য ডাল পিষতে হবে। ভাজতে হবে প্রচুর চিঁড়ে, মুড়ি, গুড়ো করতে হবে লঙ্কা আর মশলা। বাজনদারও ঠিক করা হয়নি এখনও।

ভেবে-চিন্তে নন্‌জম্মা আবার কারিন্দার হাতে চিঠি পাঠানোই স্থির করল। তাকে ডেকে বলে দিল, 'দু-তিন দিন পরে আর একবার নাগলাপুর যেতে হবে। কিন্তু ওরা যে আসবে না বলেছে একথা সারা গ্রামে কেউ যেন না জানতে পারে।'

কিন্তু দ্বিতীয়বার লোক পাঠিয়েও কোন ফল হল না। এবার কারিন্দা বেচারা ফিরে এল কণ্ঠীজোইসজীর কাছে কড়া ধমক খেয়ে। নন্‌জম্মা আবার তাকে সতর্ক করে দিল, কেউ যেন জানতে না পারে এই পারিবারিক গোলযোগের খবর। গ্রামের দুই পুরোহিত যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় বাপে-মেয়েতে মনোমালিন্য চলেছে তাহলেই তারাও নন্‌জম্মাকে বিপদে ফেলবে।

আর তো কোন আত্মীয়স্বজন নেই ওদের। শাশুড়ীকে এতদিন খবর দেওয়া হয়নি, তিনি নিজে থেকেও আসেননি। তবে কি কি কেনাকাটা হচ্ছে সেসব খোঁজ নিচ্ছেন বড় ছেলের কাছে। বিয়ের দুদিন আগে নন্‌জম্মা গিয়ে বলল শাশুড়ীকে, 'মা, আপনি আর অপ্পন্নায়া চলুন, কাজকর্ম তো আপনাকেই সামলে দিতে হবে।'

গঙ্গম্মা খর্‌খর্ করে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'স্বার্থপর মেয়েমানুষ! বাজার করা, বর ঠিক করা সবই হয়েছে আমাকে বাদ দিয়ে। দুনিয়ায় আর পাত্তর জুটল না? একটা দোজবরেকে মেয়ে দিচ্ছিস!'

'পাত্র তো দুনিয়ায় অনেক আছে মা, কিন্তু তাদের সঙ্গে বিয়ে দেবার মত টাকা তো নেই আমাদের! আপনি আর অপ্পন্নায়া অবশ্যই আসবেন।' অনুরোধ জানিয়ে চলে এল নন্‌জম্মা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তর্ক করবার ইচ্ছা ছিল না তার।

চেন্নিগরায়ও বেশ চটে রয়েছে স্ত্রীর ওপর। কল্লেশের সঙ্গে বিয়ে দিলে শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির ভাগ পাওয়া যেত, সে আশা সমূলে নষ্ট করে দিয়েছে এই বৌ। এখানেও বিয়ে স্থির হয়ে যাবার পর আর একটি কথাও জিজ্ঞাসা করা হয়নি তাকে। নন্‌জম্মা পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছিল কোন ব্যাপারে স্বামীর মতামত নিতে গেলেই সে যথাসাধ্য বাগড়া দিতে চেষ্টা করবে। তাকে যে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না এটার সে অন্য কোনভাবে প্রতিশোধ নিতে চাইবে।

অপ্পন্নায়া কিন্তু সেদিন থেকেই এসেছে এ বাড়িতে। বৌদির নির্দেশ অনুসারে খাটতে শুরু করে দিয়েছে। রান্নার উনুন তৈরী করা, কাঠ কাটানো, কারিন্দাকে দিয়ে অস্থায়ী চালা তৈরী করানো ইত্যাদি সবই করছে। দু'বার কুরুবরহল্লী গিয়ে গাড়ি ভরে নিয়ে এসেছে নারকেল ও অন্যান্য ফলমূল। উপনয়নের দিন অবশ্য গঙ্গম্মাও এল, কিন্তু কোন কাজে হাত লাগানো প্রয়োজন মনে করল না, গম্ভীরভাবে সে বসে রইল রান্নার জায়গায়।

বরযাত্রী খুব বেশী আসেনি। পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করাতে এসেছেন তিম্‌লাপুরের দাবরসায়াজী ও তাঁর স্ত্রী, এছাড়া ওদের পুত্র ও পুত্রবধূ, তিনটি নাতি, বরের দু'জন বন্ধু এবং পুরোহিত সব মিলিয়ে এই ক'জন মাত্র। বেশ সুশৃঙ্খলভাবে বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে। পাণিগ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য বর-বধূকে মণ্ডপে আনার পূর্বে বধূর পিতামাতাকে একত্রে মণ্ডপে বসতে হবে কিছু শাস্ত্রীয় আচারের জন্য। পুরোহিত ডাক দিলেন, 'কই চেন্নিগরায় গেলে কোথায়? চট করে এসে বস মণ্ডপে।' কিন্তু চেন্নিগের দেখা নেই। নন্‌জম্মা এসে তাড়া দিল, 'লগ্নের সময় হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি এস।' জবাবে চেন্নিগরায় বলে উঠল, 'একলা একলাই দাও না গিয়ে বিয়েটা। আমি মোটেই যাব না মণ্ডপে।' নন্‌জম্মা তো হতভম্ব। মাস্টার ভেঙ্কটেশায়াজী বললেন, 'ব্যাপার কি পাটোয়ারীজী, কেন যেতে চাইছেন না কারণটা তো বলবেন?'

'ওই তো সমানে কর্তাত্বি করছে, বাজার করার সময় একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেছে আমায়?'

'আপনিই তো বাড়ির কর্তা, সব কাজ আপনার নামেই তো হচ্ছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন? চলুন, চলুন, উঠুন এখন।'

'এই তো, কি ছিরির ধুতি কেনা হয়েছে আমার জন্য। কেন, জরীপাড় ধুতি কিনলে কি হত? ঐ পরে আমি যাব না মণ্ডপে।' জিদ ধরে বসে রইল চেন্নিগরায়। এছাড়া আরেকটা কারণেও মেজাজ চড়ে গেছে তার। বিয়ে বাড়ির জন্য প্রস্তুত বহুবিধ মিষ্টি-মিঠাই, চাকলী, ভাজা-ভুজি ইত্যাদি একটা ছোট ঘরে গুছিয়ে রাখা আছে। বিয়ে বাড়ির রীতি অনুসারেই নন্‌জম্মা এ ঘরের দায়িত্ব দিয়েছে একটি রাশভারী মহিলাকে। মাস্টার ভেঙ্কটেশায়ার স্ত্রীর কাছে রয়েছে এই ঘরের চাবি। খুব বেশী জিনিস তো প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি, এরই মধ্যে বুঝে-সুঝে সবাইকে দিতে হবে। কুটুম্বরা বিদায় নেবার সময় তাদের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে কিছু খাবার। গ্রামের সধবা স্ত্রীলোকদের, বিয়েতে যারা খাটাখাটুনী করছে তাদের সবাইকেই মিষ্টিমুখ করাতে হবে। নাড়ু, চাকলী ইত্যাদি দেবার কাজটা নন্‌জম্মা মাস্টারমশাই-এর স্ত্রীকেই দিয়েছে। এখন চেন্নিগরায় প্রশ্ন করে বসল, 'খাবারের ঘরের চাবি আমাকে দেওয়া হয়নি কেন?' এবার নন্‌জম্মা অবাক হয়ে বলে, 'ও তো মেয়েদের কাজ, চাবি নিয়ে তুমি কি করবে?'

'আমি বাড়ির কর্তা, চাবি আমার চাই।'

নন্‌জম্মার বারণ সত্ত্বেও, মাস্টার ভেঙ্কটেশায়াজী স্ত্রীর আঁচলে বাঁধা চাবিটা এনে সমর্পণ করলেন পাটোয়ারীজীর হাতে। তৎক্ষণাৎ খাবারের ঘরের দরজা খুলে চেন্নিগরায় একটা ঝুড়িতে বেশ কিছু মিষ্টি আর নোনতা খাবার ভরে নিয়ে বাড়িসুদ্ধ লোকের সামনে দিয়ে সেই ঝুড়ি নিয়ে গিয়ে তার খাতাপত্র রাখার বাক্‌সটার মধ্যে ভরে চাবি লাগিয়ে ফেলল। অইয়াশাস্ত্রীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি হোল চেন্নৈয়া?' উত্তর হল, 'বিয়ে হয়ে যাবার পর আমার খাবার জন্য ওগুলো রইল।' এরপর আবার সে আগের বায়নার ছুতো ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে রইল, 'কেন আমার জন্য জরীপাড় ধুতি আনা হয়নি?'

'কি মুশকিল! কত রকম খরচ রয়েছে। আমার নিজের জন্যও তো দামী শাড়ি কিনিনি, অত দামী ধুতি কি করে কিনব?' বোঝাতে চেষ্টা করে নন্‌জম্মা।

'তাহলে আমিও যাচ্ছি না মণ্ডপে।'

ওদিকে বরপক্ষের পুরোহিত খবর পাঠিয়েছেন, লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে, এখনও কেউ বরকে নিতে আসছে না কেন? বরযাত্রীদের রাখা হয়েছে মাস্টারের বাড়িতে। এদিকে কন্যা-কর্তা স্বয়ং মান করে বসে আছেন। এ বাড়ির আচার-অনুষ্ঠান শেষ হলে তবে তো বরকে আনা হবে। মাস্টার এবং মহাদেবায়াজী দু'জনে বোঝাবার চেষ্টা করে হার মানলেন। দুই পুরোহিতও সাধ্য-সাধনা করলেন কন্যাকর্তাকে, কিন্তু এঁরা দু'জনে মনে মনে তামাশাটা বেশ উপভোগও করছিলেন। খবর পেয়ে দাবরসায়াজী স্বয়ং এলেন বোঝাতে, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। দরজার পাশে বসে ছিলেন গুণ্ডেগৌড়জী, তিনি এবার লাঠিটা হাতে তুলছেন দেখে নন্‌জম্মা কোন মতে শান্ত করল তাঁকে। অপ্পন্নায়া এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবার সে হঠাৎ সামনে এসে বলল, 'এই চিন্নৈয়া, চুপচাপ উঠে মণ্ডপে যাবি, না ধরে লাগাব দু' ঘা?'

চেন্নিগরায় আরো খেপে গেল, 'বড় ভাই পিতৃতুল্য, তাকে কিনা হারামজাদা শাসাচ্ছে? আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে হবে ওকে।'

নন্‌জম্মা অপ্পন্নায়াকে শান্তভাবে বোঝাল, 'তুমি কিছু বলতে যেও না অপ্পন্নায়া।' কিন্তু গঙ্গম্মা এবার ফোড়ন কাটে, 'ঠিকই তো, বাড়ির কর্তা জরীপাড় ধুতি না পরে পাণিগ্রহণ করাবে কি করে? এটুকুও বুদ্ধি নেই তোমাদের? এখনই না হয় আনিয়ে দাও একজোড়া।'

একজনকে অন্ততঃ নিজের তরফে পেয়ে উৎসাহ বেড়ে গেল চেন্নিগরায়ের, বলে উঠল— 'তিপটুরে লোক পাঠিয়ে এক্ষুণি ধুতি আনিয়ে দাও, নাহলে কিছুতেই উঠব না আমি।'

রাগারাগি করলে ব্যাপার আরো খারাপে দাঁড়াবে। অগত্যা নন্‌জম্মা ভগবানের নামে শপথ করে বলল, 'বিয়েটা হয়ে গেলেই ধুতি আনিয়ে দেব।' কিন্তু চেন্নিগরায়ের এই মুহূর্তে জরীপাড় ধুতি চাই, কোন কথা শুনবে না সে। দিশাহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ফেলল নন্‌জম্মা। মহাদেবায়াজী সবই শুনছিলেন, এবার মন্দিরে গিয়ে কুড়িটা টাকা এনে চেন্নিগরায়কে দিয়ে বললেন, 'এই টাকা রাখো, বিয়েটা হয়ে গেলেই ধুতি আসবে।'

কিন্তু পাটোয়ারীজীর আবদার—'টাকা চাই না, আমার ধুতিই চাই।'

দাবরসায়াজী এবার নন্‌জম্মাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'এক কাজ কর, বরের জন্য আনা জরীপাড় ধুতির জোড়া একেই দিয়ে দাও। আমি বরকে উপহার দেবার জন্য একজোড়া রাজা মিলের ধুতি এনেছি, সেইটে এনে দিচ্ছি, বরকে তাই দাও। ও ছেলে কোনদিন জিজ্ঞাসাও করবে না এমন ধুতি বিয়েতে কেন দেওয়া হল?'

'এঁর আক্কেলটা দেখুন একবার মামাজী। এখন না হয় তাই করলাম, কিন্তু মান-সম্ভ্রম তো থাকবে না? "তোমাদের বাড়িতে মিলের ধুতি দিয়ে পাণিগ্রহণ হয়েছে" এই খোঁটা খেতে হবে পরে আমার মেয়েকে।'

'আমি বলছি, সে অমন কথা কখনো বলবে না। আর বলেই যদি, সইতেই হবে। কারণ এছাড়া আর কিছু উপায় তো নেই এখন। তোমার স্বামীর সম্বন্ধে সব কথাই আমি ছেলেটিকে বলেছি। কত রকমের মানুষ যে থাকে সংসারে! যা হোক, এখন যা বলছি তাই কর।'

নন্‌জম্মা ঘরের মধ্যে থেকে বরের জন্য রাখা জরীপাড় ধুতির জোড়া এনে ফেলে দেয় স্বামীর সামনে, বলে, 'নাও, উঠে পরে নাও।'

'একখানা আছে, না একজোড়া?'

'কোন ভয় নেই, একজোড়াই আছে।'

এতক্ষণে তৃপ্তি হল চেন্নিগরায়ের। একখানা পরে অন্যটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিল সে। এক ঢিলে তিন পাখি মারা হয়ে গেল। প্রথমতঃ স্ত্রীর ওপর ভাল প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ জরীপাড় ধুতি লাভ আর তৃতীয়তঃ এক ঝুড়ি খাবার-দাবার হাতানো গেছে। বিয়ের পর ওর খাবার মত আর কিছু বাকি থাকত কিনা কে জানে! বিজয়ীর মত মুখ করে চেন্নিগরায় এবার বসল গিয়ে মণ্ডপে।

কন্যাকর্তার অঙ্গে জরীপাড় ধুতি আর বর বসেছে মিলের ধুতি পরে। কিন্তু বিয়েটা নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হল। বিয়ে যখন চলছে, দেখা গেল এলাকাদার সাইকেল চড়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছেন। শ্বশুর এবং জামাইয়ের পরিধেয় বস্ত্রের বৈষম্য নজরে পড়তেই দাবরসায়াজীকে ডেকে এর কারণ জানতে চাইলেন তিনি। আসল কথাটা চাপা দিয়ে তাঁকে বলা হল, ওটা চেন্নিগরায়ের নিজের বিয়ের সময়কার পুরোন ধুতি!

ইতিমধ্যে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একখানা ছই দেওয়া গরুর গাড়ি। গাড়ি থেকে অক্কম্মাকে নামতে দেখে রামন্না ছুটে এসে খবর দিল মাকে। বুকের মধ্যেকার অবরুদ্ধ বেদনার ভার যেন এক মুহূর্তে হাল্কা হয়ে গেল, মনে হল নন্‌জম্মার। ভিতরে এসে অক্কম্মা নাতনীকে জানায়, 'কন্ঠী আর কল্লেশ তো কিছুতেই আসতে দেবে না। কিন্তু আমার খুকীর বিয়ে, আমি কি না এসে পারি? জোর করে চলে এসেছি। বিয়ে শুরু হয়ে গেছে বুঝি? তা, নে, এটা পরিয়ে দে পার্বতীকে' বলতে বলতে কাপড়ের মধ্যে থেকে নিজের বধূ জীবনের একখানি সোনার গহনা বার করে নন্‌জম্মার হাতে তুলে দেয়। তারপর রেশমের কাপড় পরে শুচি-শুদ্ধ হয়ে বসে সে। গঙ্গম্মাও রেশমের শাড়ি পরে বসে আছে, কিন্তু কোন কথাই বলল না সে অক্কম্মার সঙ্গে। অক্কম্মাও আলাপ করার চেষ্টা করল না, বিয়ে দেখতে দেখতে এক ফাঁকে নন্‌জম্মাকে কাছে ডেকে নিচু গলায় বলে উঠল, 'বেশ করেছিস তুই, রাজপুত্তুরের মত জামাই হয়েছে, ইংরিজী ইস্কুলের মাস্টার—কত সম্মানের চাকরী! আগের পক্ষের মেয়ে আছে তো কি হয়েছে?'

বিয়ের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হল। সূর্যনারায়ণের মেয়ে রত্না বিশ্বর সঙ্গে খুব খুশি মনে খেলছে। এখন তো সে বিশ্বর দিদির মেয়ে। মাস্টার ভেঙ্কটেশায়াজী বললেন, 'এদের দুটোরও বিয়ে দিয়ে দিলেই হয়।' বিশ্ব এবার লজ্জা পেয়ে রত্নার কাছ থেকে পালাল। সূর্যনারায়ণ হেসে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনি দিয়ে ফেলুন, ওকে এখানেই রেখে দিয়ে যাই।'

পরের দিন নাগবল্লী বা বরোপচার অনুষ্ঠান। বিয়ের দিন সন্ধ্যাতেই ভেঙ্কটেশায়াজী ও তাঁর স্ত্রী নন্‌জম্মাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'দেখ নন্‌জম্মা, কিছু মনে কোর না কিন্তু, বরপক্ষ কি করে যেন বুঝে ফেলেছে "কনে বড় হয়ে গেছে"।'

নন্‌জম্মার মুখ শুকিয়ে গেল। মাস্টার ভরসা দিয়ে বললেন, 'কোন ভয় নেই,

সূর্যনারায়ণ তিপটুর, তুমকুর এসব বড় জায়গায় ঘুরেছে, মহীশূরে ছিল এক বছর ট্রেনিং-এর সময়। ওসব জায়গায় আজকাল ষোল-সতের বছর বয়সে বিয়ে হয়। কালকেই দ্বিরাগমন করিয়ে মেয়েকে স্বামীর সঙ্গেই পাঠিয়ে দাও। আজকাল তো শুনি বাঙ্গালোরে বিয়ে, বরোপচার সবই একদিনে হয়ে যায়। সূর্যনারায়ণই বলেছে একথা। কাল বরোপচারের পর রাত্রে দ্বিরাগমনের অনুষ্ঠানও সেরে ফেল, নাহলে পরে আবার এর জন্য এক-দফা খরচ করতে হবে, লোকজন খাওয়াতে হবে। একসঙ্গেই সব কাজ চুকিয়ে ফেলা ভাল। বলতো কালই কম্বনকেরে থেকে নতুন বিছানাপত্র কিনে আনছি।'

মেয়েকে এখনই একেবারে পর করে দিতে হবে এটা ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে নন্‌জম্মার। কিন্তু আশঙ্কাও হচ্ছে যথেষ্ট। কাউকেই তো সে কিছু বলেনি, তবু কি করে একথা বরপক্ষের কানে উঠল? হয়ত পুরোহিত দু'টিরই কুবুদ্ধি এটা। কিন্তু ওঁরা যে এর জন্য আমাদের ভুল বোঝেননি বা কোন রকম ঝামেলা করেননি এই রক্ষা। এখন দ্বিরাগমন করানো মানেই এটা স্বীকার করে নেওয়া যে, মেয়ে বিয়ের আগেই ঋতুমতী হয়েছিল এবং এতদিন একথা গোপন রাখা হয়েছে। অবশ্য হয়ে থাকলে লজ্জার কি আছে? কিন্তু বহুদিনের সংস্কারকে এত সহজে ঝেড়ে ফেলা যায় না। নন্‌জম্মার সাংসারিক বুদ্ধি বলছে, বিয়ের দু-তিন মাস পরে সবাইকে খবরটা জানিয়ে প্রচলিত রীতি অনুসারে সধবা স্ত্রীদের দিয়ে আচার-অনুষ্ঠান করিয়ে দ্বিরাগমন করালেই তো সবদিক দিয়ে ভাল হত! নন্‌জম্মা বলল, 'দেখুন কথাটা অবশ্য সত্যি। কিন্তু বড় বড় শহরে যা হচ্ছে, এখানে তা করা কি সম্ভব? এ গ্রামের পুরোহিতদের তো জানেন, আর আমার কর্তা-টিকেও ভাল করেই চেনেন আপনারা। উনিও পাগলের মত যা তা বলতে শুরু করে দেবেন। ওঁকে কথাটা জানাইনি আমি। দ্বিরাগমন না হয় তিন মাস পরেই করাব।'

'তাই কর তাহলে। সূর্যনারায়ণ অবশ্য জোর করতে চায় না, তোমাদের খরচ বাঁচাবার জন্যই বলছিল। তাছাড়া, আরো তিন মাস তাহলে ওকে রাঁধা-বাড়া, বাচ্চার দেখাশোনা সবই করতে হবে।'

'বাচ্চাকে আমার কাছে রেখে যেতে বলুন না?'

'সূর্যনারায়ণকে সমস্যাটা বুঝিয়ে বলতে সে এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। গ্রামের হাল-চাল তার ভালই জানা আছে। কিন্তু বিয়ে হতে না হতেই মেয়েকে এখানে রেখে যেতে মন চাইল না তার। সেটা ভালও দেখায় না।'

পরদিন বরোপচার অনুষ্ঠানে কন্যাকে বরের হাতে সমর্পণের সময় নন্‌জম্মা আর অক্কম্মার সঙ্গে রামন্নাও কান্না শুরু করে দিল। একসঙ্গে বড় হয়েছে দুই ভাই-বোনে, দু'জনে গলায় গলায় ভাব। সবই জানে, তবু রামন্না মাকে বলে, 'দিদি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে কেন মা?'

'মেয়ে হয়ে জন্মেছে যে বাবা, যেতে তো হবেই', সান্ত্বনা দিয়ে বলে নন্‌জম্মা।

হঠাৎ অপ্পন্নায়াও কান্না চাপতে পারল না। এ বাড়িতে সে বিশেষ আসে না, পার্বতীর সঙ্গেও কথাবার্তা বলেই না একরকম। আগে যখন পার্বতী সব্জী বাগানে জল দিতে যেত, তখন হয়ত কোনদিন বলেছে, 'আমাকে একটু পালং শাক দিবি?' পার্বতীও বলেছে,

'নাও না কাকা, যতটা দরকার নিয়ে নাও।' ভাইঝির সঙ্গে এর চেয়ে বেশী কথা কখনো বলত না সে। কিন্তু ওর বিয়েতে নিজে থেকেই প্রচুর খেটেছে অপ্পন্নায়া। নন্‌জম্মা ছাড়া আর কেউ যদি প্রাণ দিয়ে খেটে থাকে তো সে ঐ অপ্পন্নায়া। কি করতে হবে তার নির্দেশ দিয়েছে নন্‌জম্মা, মাস্টারের স্ত্রী, কখনো অক্কম্মা আবার কখনো পুরোহিত। অপ্পন্নায়া যে যা বলেছে সব করেছে, বাসনপত্র টানাটানি, বড় বড় ঘড়ায় জল ভরা, উঠোন পরিষ্কার, সব রকম কাজই মাইনে করা চাকরদের চেয়েও বেশী যত্ন করে করেছে। বিদায়ের সময় পার্বতী প্রণাম করতেই অপ্পন্নায়ার চোখ থেকে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরে পড়ল তার মাথার ওপর।

পরদিন বরপক্ষ বিদায় নিল। গ্রামের বাইরে অম্বাদেবীর মন্দির পর্যন্ত বর-কনে হাত ধরাধরি করে হেঁটে গেল, তাদের আগে আগে চলল বাজনদারেরা। পেছনে অন্যদের সঙ্গে নন্‌জম্মাও চলল মেয়েকে এগিয়ে দিতে, কোলে তার রত্না। গ্রামদেবীর পুজো ও প্রণামের পর সকলে এল গাড়ির কাছে। স্ত্রীর হাতখানি নিজের মুঠি থেকে ছাড়ার সময় হাতে অল্প চাপ দিয়ে নিচু গলায় বলল সূর্যনারায়ণ, 'তিন মাস পরে এসে নিয়ে যাব।' শিউরে উঠল পার্বতীর সারা দেহ, মাথা নত করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। স্ত্রী কথা বলবে এটা অবশ্য প্রত্যাশাও করেনি সূর্যনারায়ণ।

নতুন জামাই শ্বশুর, খুড়-শ্বশুর, শাশুড়ী, পুরোহিত, ভেঙ্কটেশায়াজী, মহাদেবায়াজী ইত্যাদি সবাইকে প্রণাম করল যাবার আগে। মহাদেবায়াজীর সঙ্গে এর মধ্যেই বেশ হৃদ্যতা হয়ে গেছে তার। পার্বতী উভয় পক্ষের গুরুজনদের পদধূলি নেবার পর সবাই উঠে বসল গাড়িতে। তিম্‌লাপুরে পৌঁছে 'চপ্পর' অনুষ্ঠানের পর সূর্যনারায়ণ ফিরে যাবে নিজের কর্মস্থল বাঙ্গালোরেতে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পার্বতীর বিয়েটা এমন নির্বিঘ্নে হয়ে যাওয়ায় অসীম তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে নন্‌জম্মার মন। যারা তাকে সাহায্য করেছে আন্তরিকভাবে তাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছে সে। বরযাত্রী বেশী আসেনি তাই চাল, ডাল, মশলা ইত্যাদি সবই বেশ কিছুটা করে উদ্বৃত্ত থেকে গেছে। স্বামীর চোখ বাঁচিয়ে রাখতে হবে ওগুলোকে, নাহলে প্রতিদিনই তিনি ভাল চালের ভাত আর মশলা দেওয়া ডাল খাওয়ার আবদার ধরবেন। তিন মাস পরে আবার দ্বিরাগমনের অনুষ্ঠান আছে, এসব জিনিস কাজে লাগবে তখন। সুতরাং চাল, ডাল ইত্যাদি এবং আধ টিন তেলও খুব সুরক্ষিতভাবে ঢাকনা বন্ধ করে সরিয়ে রাখল নন্‌জম্মা। দ্বিরাগমনের সময় আর গোটা কুড়ি টাকা খরচ করলেই সব কুলিয়ে যাবে। পঞ্চাশ টাকা আন্দাজ খরচ হবে বিয়ের আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিসপত্রে, কিন্তু বাসনের কি ব্যবস্থা করা যায়? ওর নিজের বিয়ের বাসন বেশ কিছু আছে শাশুড়ীর কাছে, কিন্তু সে বাসন একখানাও আদায় করা যাবে না। নতুন বাসন কেনার মত টাকাও নেই। বাড়িতে যা আছে তার থেকেই কিছু কিছু দিতে হবে মেয়ের সঙ্গে। তারপর আবার সুবিধামত সেগুলো একটা-দুটো করে কিনে নিলেই হবে। অবশ্য জামাইও তেমন ছেলে নয়, বাসন নিয়ে যেতে না পারলে সে কখনই পার্বতীকে খোঁটা দেবে না, এটা ঠিক।

আজকাল পার্বতীর হাতভরা কালো চুড়ি, গলায় মঙ্গলসূত্র, কানে বড় বড় মুক্তোর কানফুল, নাকেও সাদা ধপধপে মুক্তো বসানো বেশর—এটা তার স্বামী দিয়েছে 'বরোপচার' অনুষ্ঠানে। মেয়ের টিকোল নাকে বেশরটি মানিয়েছে বড় সুন্দর। কানবালা, নথ ইত্যাদি সব গহনা পরলে ওর নিটোল মুখখানি এত সুন্দর দেখায় যে, নন্‌জম্মা অবাক হয়ে ভাবে, তার মেয়ে যে এমন সুন্দরী এটা এতদিন তো তার চোখে পড়েনি। পার্বতীর সুন্দর পা-দুখানিতে একজোড়া বিছুয়াও আছে। সর্বক্কা একদিন বেড়াতে এসে পার্বতীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'মেয়ের রূপ যে ফেটে পড়ছে গো।' তারপর নন্‌জম্মাকে সাবধান করে দিল, 'কাঁচা বয়সের মেয়ে, একলা ওকে পুকুর-ঘাটে, এদিক-ওদিক পাঠিও না যেন।'

রামন্না একদিন বলে, 'মা দেখেছ, কানবালা আর বেশর পরে দিদিকে কি সুন্দর লাগছে! তহশিলদারের বৌয়ের মত সোনার চুড়ি পরলে বোধহয় আরো ভাল লাগবে, না মা?'

মা জবাব দেয়, 'তুই বড় হয়ে তহশিলদার হলে পরে তখন দিদিকে সোনার চুড়ি গড়িয়ে দিস।'

আয়নায় মুখ দেখে পার্বতী নিজেই যেন আজকাল নিজেকে চিনতে পারে না, কেমন নতুন নতুন লাগে নিজের মুখখানা। আর দু-তিন মাস পরেই এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে—

কথাটা ভাবলেই উতলা হয়ে ওঠে মনটা। মা একদিন ওকে বলে, 'জামাই বড় ভাল হয়েছে রে, খুব আক্কেল-বিবেচনা আছে ছেলেটির। তুই তো ঘর-সংসারের সব কাজই শিখেছিস, ওর মেয়েকে কিন্তু খুব যত্ন করবি, তাহলেই ও তোর ওপর সন্তুষ্ট থাকবে। মা-হারা মেয়েটাকে কখনো যেন কাঁদাসনে মা।'

'হ্যাঁ মা, খুব যত্ন করব আমি।'

'মেয়েটাও ভারি লক্ষ্মী, পরে আমাদের বিশ্বর সঙ্গে তো ওর বিয়ে হতে পারে, না মা?' রামন্না জিজ্ঞাসা করে।

'বিশ্বটা দিন দিন যা দুষ্টু হচ্ছে। মন দিয়ে লেখাপড়া করে পাশ-টাশ না করলে পার্বতীর বর ওকে মেয়ে দেবে কেন?' বলে নন্‌জম্মা।

'না মা, তুমি জান না। মাস্টারমশাই বলেন, দুষ্টু ছেলেরাই বেশী বুদ্ধিমান হয়।'

'তাই বুঝি?' পার্বতী বলে ওঠে, 'তাহলে তুই এত লক্ষ্মী-শান্ত হয়েও ক্লাসে ফার্স্ট হোস কি করে?'

রামন্না জবাব দেয়, 'দুষ্টু হলে হয়ত এর চেয়ে বেশী বেশী নম্বর পেতাম।'

বাড়িতে যখন এইসব গল্প চলেছে তখন বিশ্ব ওদিকে মহাদেবায়াজীর গুড়ের হাঁড়ি হাঁটকাচ্ছে।

বিয়ের মাসখানেক পরে সূর্যনারায়ণ নিজের কুশল সমাচার জানিয়ে শ্বশুরমশাইকে চিঠি লিখল। এই সময় নন্‌জম্মার মনে পড়ে গেল, পার্বতীর বিয়েটা ভালয় ভালয় হয়ে গেলে সে গ্রামদেবীর মন্দিরে পায়েস, দই-ভাত ইত্যাদি দিয়ে পুজো দেবে বলে মানত করে রেখেছিল। মা-কালীর কাছে মানত, বেশী দিন ফেলে রাখা উচিত নয়। বেশী কিছু খরচও নেই। চাল, গুড়, নারকেল, দই সব ঘরেই আছে। শুধু এক টুকরো নতুন চেলীর কাপড় চাই, মনে পড়ে গেল তাও বাড়িতে আছে। পরশু শুক্রবার, রামন্নাকে সেদিন স্কুল থেকে ছুটি নিতে বলল নন্‌জম্মা। স্বামীকে মন্দিরে পুজো দিতে যাবার জন্য বাড়িতে থাকতে বলায় বেশ সহজেই রাজি হয়ে গেল সে, বোধহয় পায়েস আর দই-ভাতের লোভেই।

গঙ্গম্মা আর অপ্পন্নায়া গ্রাম থেকে বেরিয়েছে আজ আট দিন হয়ে গেল, গণ্ডসীর দিকে ভিক্ষার চেষ্টায় গেছে তারা। দেবীমন্দিরের পুজারী কাল্লাকে নন্‌জম্মা আগেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছে যে, শুক্রবারে সে যাবে পুজো দিতে। পুজোর দিন ভোরে উঠে জল গরম করল অনেকটা। নিজে স্নান করে শুচি-বস্ত্র পরে নিল এবং রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল ভোগের আয়োজনে। বিশ্বকে স্নান করিয়ে পার্বতীও প্রস্তুত হল। রামন্না এবং চেন্নিগরায়ও স্নান সেরে নিল একে একে। তিন সের চালের অর্ধেকটা গুড়ের রসে পাক করে তাতে নারকেল, এলাচ, চিনে বাদাম, কাজু ইত্যাদির সম্বরা দেওয়া হল। বাকি চালটায় নারকেল, কারিপাতা, দই ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হল দৈ-ভাত। দুটি বড় বড় পাত্রে পরিপাটি করে ভোগ সাজিয়ে রাখল নন্‌জম্মা। হলুদ, কুঙ্কুম, ফুল সব থালায় সাজিয়ে নিয়ে পার্বতীকে বিয়েতে স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া শাড়ীখানা এবং গহনাগাঁটিগুলো পরতে বলল মা। কপালে হলুদ, কুঙ্কুমের রেখা, চিকন-কালো চুলের গোছায় পুষ্প-শোভা, সুসজ্জিতা পার্বতী পুজোর

উপচার-ভরা থালাখানি হাতে নিয়ে যখন মন্দিরের পথে চলেছে, পথের লোকে এমন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল ওকে যে, নন্‌জম্মার ভাবনা হল, মেয়েটার নজর না লেগে যায়। কপালে চন্দন-ভূষিত রামন্নার দুই হাতে অন্নপাত্র। চেন্নিগরায় চলেছে সবার পেছনে।

পুজারী কাল্লা এদের প্রতীক্ষায় ছিল। মন্দিরের গর্ভগৃহে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে নন্‌জম্মা পার্বতীকে দিয়ে দেবীর পুজো করাল ভক্তিভরে। হলুদ, কুঙ্কুম আর করবী ফুল তো ছিলই, তাছাড়া মন্দিরের সামনের গাছ থেকে রামন্না পেড়ে দিয়েছে আরো কিছু লাল ফুল। ছোট্ট অন্ধকার গর্ভগৃহের প্রায় সবটাই জুড়ে রণচণ্ডী মূর্তিতে বিরাজিতা দেবী। নতুন কাপড়ের টুকরোটাও রাখা হল দেবী প্রতিমার কোলের কাছে, তারপর মস্ত প্রদীপ জ্বেলে করল মঙ্গলারতি। আরতির প্রদীপের তাপ গ্রহণ করে প্রণাম করল সবাই। পুজারীকে দক্ষিণা এবং কলা-পাতা ভরে ভোগের প্রসাদ দিয়ে ওরা বেরিয়ে এল মন্দির থেকে। প্রসাদের আশায় অনেকেই দাঁড়িয়ে ছিল মন্দিরের বাইরে, তাদের সবাইকে এক এক মুঠি দিয়ে নন্‌জম্মা সপরিবারে মন্দিরের পেছনের পুকুর-ঘাটে এসে বসল। সেখানে কলাপাতা পেতে সবাই পেট ভরে গ্রহণ করল দেবীর প্রসাদ। বাড়িতে নিয়ে যাবার মত একটু উদ্বৃত্তও রইল। চেন্নিগরায় এখান থেকেই রওনা দিল বাঁধের দিকে। মা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে এসে আরো কিছুক্ষণ বসে, দরজার ফাঁক দিয়ে আবার একবার দেবীকে দর্শন ও প্রণাম করে বাড়ির পথ ধরল। ফেরার পথেও সবাই বার বার চেয়ে চেয়ে দেখল পার্বতীকে। দু-একজন স্ত্রীলোক তো বলেই বসল নন্‌জম্মাকে, 'একেবারে বিয়ের কনেটি সাজিয়ে নিয়ে এসেছ মেয়েকে, দেখো আবার কারো নজর না লেগে যায়!' নন্‌জম্মার কেমন যেন আশঙ্কা হতে লাগল, 'সত্যি যদি তাই হয়?'

বাড়িতে সেদিন আর কিছু রান্না হয়নি, বিকেলের দিকে সবাই আবার প্রসাদই খেল একটু করে। বাড়িতে ফিরেই বিয়ের শাড়ীখানা খুলে রেখেছে পার্বতী, তবে কপালের কুঙ্কুম, হলুদ আর গায়ের গহনাগুলো পরাই আছে। কেমন যেন ঝিমুনি আসছিল ওর, মাদুরটা পেতে শুয়ে পড়ল। রামন্না ঘরের মধ্যে বসে ইংরিজীর পড়া তৈরী করছে, বিশ্ব গেছে স্কুলে। চেন্নিগরায় মহাদেবায়াজীর মন্দিরের বারান্দায় ঘুমোতে চলে গেছে। সর্বক্কা এল বেড়াতে। মাদুরের ওপর ঘুমন্ত পার্বতীর মুখখানা দেখে ওর মনে পড়ে গেল মেয়ে রুদ্রাণীকে। বাপ যদি অমন শত্রুতা না করত, তাহলে তারও এতদিনে কবে বিয়ে হয়ে যেত, ছেলেপিলেও হত, ভাবতে ভাবতে বুকের মধ্যেটা যেন ব্যথায় টনটন করে ওঠে সর্বক্কার।

একটু পরে ঘুম ভেঙে গেল পার্বতীর। চোখ দুটো ওর বেশ লাল হয়ে উঠেছে। উঠে বসে বলল, 'মা, বড্ড শীত করছে, আগুন তাপতে ইচ্ছে করছে।' শীত প্রায় শেষ হয়ে এল, এখন তো এত ঠাণ্ডা লাগার কথা নয়! নন্‌জম্মা তাড়াতাড়ি কাছে এসে কপাল স্পর্শ করে দেখল, বেশ জ্বর আসছে মেয়ের। কাঁপুনিও দিচ্ছে। সর্বক্কা বলে উঠল, 'আজ অমন বিয়ের কনেটি সাজিয়ে কেন মন্দিরে নিয়ে গেলে নন্‌জম্মা? সবাইকার নজর তো ভাল নয়! তুমি একটু নজর ঝেড়ে দাও বাপু।'

নন্‌জম্মা একটা ঝাঁটার কাঠি ভেঙে তাতে আগুন ধরিয়ে মেয়ের মুখের চার পাশে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল এক কোণে। ঝাঁটার কাঠিটা বেশ চড়-বড় শব্দ করে পুড়ে ছাই হয়ে গেল দেখতে দেখতে। সর্বক্কা ঘাড় নেড়ে বলল, 'নির্ঘাত নজরই লেগেছে গো, কাঠিটা কি রকম শব্দ করে পুড়ল দেখলে?' পার্বতী চুপ করে বসে রইল। একটু পরে সর্বক্কা চলে গেলে নন্‌জম্মা রাত্রের রান্নার জন্য ঢুকল রান্নাঘরে। পার্বতী আর যেন বসতে পারছে না, একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে গুটি-সুটি মেরে পড়ে রইল সে। মাথার কাছে বসে রামন্না দিদির কষ্ট যাতে কমে সেজন্য চেষ্টা করছিল যথাসাধ্য। কিন্তু রাত্রে পার্বতীর জ্বর আর কাঁপুনি দুই-ই বাড়ল। রান্না শেষ করে সেই উনুনেই নন্‌জম্মা জিরে, লঙ্কা, লবঙ্গ, তুলসী পাতা সব একত্রে ফুটিয়ে পাঁচন তৈরী করে খাওয়ালো মেয়েকে। 'সত্যিই তো সবাইকার দৃষ্টি তো এক রকম নয়, নজরই লেগেছে—বিয়ের শাড়ীখানা না পরালেই হত,' মনে মনে ভাবে নন্‌জম্মা, নিজেকেই দুষতে থাকে সে।

জ্বর কমল না সারা রাত, 'সারা শরীরে ব্যথা করছে', বলছে মেয়ে। মুখ ফুলো ফুলো, চোখ লাল টকটক করছে। পার্বতীকে আবার কিছুটা পাঁচন খাওয়ালো নন্‌জম্মা। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল মেয়ে। মাও একটুক্ষণ চোখ বুঝল। ঘুম যখন ভাঙল রোদ উঠে গেছে। পার্বতীর জ্বর একটু কম মনে হচ্ছে, কিন্তু একেবারে ছাড়েনি। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে পার্বতী বলে, 'সারা শরীর যন্ত্রণায় যেন মোচড়াচ্ছে মনে হচ্ছে।'

'এত জ্বরের জন্য ওরকম লাগছে মা। এবার তো জ্বর কমছে, চুপ করে শুয়ে থাক। জল গরম করছি, তারপর উঠে মুখ-হাত ধুয়ে নিস' বলতে বলতে ওপাশে ফিরেই নন্‌জম্মা দেখল রামন্না এখনও শুয়ে রয়েছে। প্রতিদিন মোরগ ডাকার আগে উঠে আলো জ্বেলে পড়তে বসে যে ছেলে, সে আজ এখনো বিছানায়? 'হ্যাঁরে, আজ এখনো উঠলি না যে?' জিজ্ঞাসা করতে চাদরের তলা থেকে জবাব দেয় রামন্না, 'বড্ড শীত করছে মা, আমারও জ্বর আসছে বোধহয়।' ভয় পেয়ে যায় নন্‌জম্মা, তাড়াতাড়ি চাদর সরিয়ে দেখে ছেলের মুখের চেহারাও হয়েছে ঠিক মেয়েরই মত। মুখ ফুলেছে, চোখ আগুনের মত লাল। একই সঙ্গে দু'জনের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল কেন? চিন্তিত মনে উনুন ধরাতে গেল নন্‌জম্মা। গরম জল করে দু'জনকারই মুখ-হাত ধুইয়ে পাশাপাশি বিছানা পেতে শুইয়ে দিল। আবার পাঁচন তৈরী করল আদা, লঙ্কা ফুটিয়ে। তার আগে চালের খুদ দিয়ে পাতলা মণ্ড তৈরী করে খাওয়ালো ছেলে-মেয়েকে। দু'জনের কেউই খেতে চায় না, জোর করেই খাওয়াতে হল। ঠাণ্ডালাগা, জ্বর-জাড়ি এসব তো হয়েই থাকে, কিন্তু রামন্নার যে পরীক্ষা সামনে। পার্বতীর না হয় নজর লেগেছে, কিন্তু রামন্নার জ্বর হল কেন? সে তো শুদ্ধ-শুচি কাপড় পড়ে গামছা জড়িয়ে মন্দিরে গিয়েছিল। তারও অবশ্য সদ্য উপনয়ন হয়েছে, কিন্তু তাতে কি এসে যায়? বিয়ে বাড়িতে অবশ্য খাটুনী গেছে খুব। তারপর এই রোদে রোজ এতখানি পথ স্কুল যাওয়া-আসা। আরো মাসখানেক পরে পরীক্ষা হয়ে গেলে গরমের ছুটি হবে, তখন দেড় মাস বিশ্রাম নিতে পারবে।

সন্ধ্যার দিকে জ্বরটা আবার খুব বাড়ল পার্বতীর, এখন তার চোখ দুটো দেখলে ভয়

করে, গ্রামদেবী মা-কালীর চোখের মতই জ্বলন্ত দৃষ্টি তাতে। দুই কানের আর নাকের গহনা ঝকঝক করছে, সেই জ্বরতপ্ত মুখের দিকে তাকালে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। মেয়ের গা থেকে গহনাগুলো খুলে বাক্‌সে তুলে রাখল নন্‌জম্মা। রাত্রে পার্বতী বলল, 'মা দেখ, ডান দিকের কুঁচকির পাশে যেন ফোড়া উঠছে।'

বিয়ের পর থেকে বেশী পরিশ্রম বা হাঁটা-চলা কিছুই তো করেনি। নন্‌জম্মা ভাবল, কাল মন্দির পর্যন্ত হাঁটার ফলে হয়ত পায়ে ব্যথা হয়েছে। কিন্তু মন্দির তো দূরে নয়! দশ মাইল পথ হাঁটলেও কখনো ক্লান্ত হয় না পার্বতী। তাছাড়া ফোড়া উঠবে কেন হঠাৎ? যাক, হলে আর কি করা যাবে, নুনের পুঁটলী গরম করে সেঁক দিয়ে দিল সে। তারপর আবার খুদের মণ্ড আর পাঁচন খাইয়ে শুইয়ে দিল ছেলে-মেয়েকে। রামন্নারও জ্বর একটুও কমেনি, সে উঃ, আঃ পর্যন্ত করছে না—নিঃশব্দে পড়ে আছে। মহাদেবায়াজীর মন্দিরে রোজকার মত ভজন শুনে চেন্নিগরায় বাড়ি ফিরল রাত প্রায় আটটার সময়। বিশ্ব তো আগেই এসেছে। ওদের দু'জনকে দুপুরে রাঁধা খাবারই খেতে দিল নন্‌জম্মা। সে নিজে কিছুই খায়নি, তার ওপর গত রাতে ঘুমও হয়নি। এখন বেশ ঘুম আসছে তার। অসুস্থ ছেলে-মেয়েদের কপালে হাত রেখে জ্বর দেখল সে, তারপর ওদের গায়ে ভাল করে ঢাকা দিয়ে ওদের মাথার কাছেই শুয়ে পড়ল। প্রথম কিছুক্ষণ ঘুম এল না, তারপর কিন্তু গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেল নন্‌জম্মা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখল সে।

গ্রামদেবীর মন্দির। দেবীর মুখখানাও যেন অসুস্থ পার্বতীর মুখের মত ফুলে উঠেছে। দুই কানে ঝল-মল করছে কর্ণভূষা। চোখ জ্বলছে অঙ্গারখণ্ডের মত। মন্দিরের সমস্ত গর্ভগৃহ জুড়ে পা ছড়িয়ে বসে আছেন দেবী, তাঁর দুই উরুতে মাথা রেখে শুয়ে আছে পার্বতী আর রামন্না—দু'জনেই নবজাত শিশুর মত সম্পূর্ণ নগ্ন। নন্‌জম্মা নিজে যেন প্রাণপণে চেষ্টা করছে ছেলে-মেয়ের নগ্ন শরীর কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে, কিন্তু গর্ভগৃহে কিছুতেই ঢুকতে পারছে না সে, অথচ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ নয়, কোন বাধাও নেই সামনে। কিন্তু কিছুতেই ও ঢুকতে পারছে না, আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও না। হঠাৎ অস্ফুট আর্তনাদের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। রামন্না কাতরাচ্ছে যন্ত্রণায়। নিভে-আসা বাতিটার পলতে একটু বাড়িয়ে নন্‌জম্মা ছেলের মাথায় হাত রাখল—'কি, কষ্ট হচ্ছে বাবা?'

'দুটো উরুর পাশেই ফোড়া বেরিয়েছে মা, বড্ড ব্যথা করছে।'

বুকটা ধড়াস্ করে উঠল নন্‌জম্মার। তার মানে এ ফোড়া সাধারণ ফোড়া নয়! তবে কি প্লেগ? তাই কি গাঁট ফুলে উঠছে? কিন্তু আশেপাশে কোথাও প্লেগ হয়েছে বলে শোনা যায়নি তো এখনও! ইঁদুরও মরেনি গ্রামে! চাদর সরিয়ে রামন্নার কুঁচকির পাশে ফোলা জায়গায়টা টিপে দেখল সে। জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন রামন্না বাধা দেবার চেষ্টাও করল না। দুই দিকের কুঁচকিতেই কাঁঠাল বিচির আকারে দুটো ফোঁড়ার মত কিছু উঁচু হয়ে উঠেছে। মা জায়গাটা স্পর্শ করতেই ব্যথায় কাতরে উঠল সে। মিনিট পাঁচেক হতভম্ব হয়ে বসে রইল নন্‌জম্মা। তারপর ঘুমন্ত স্বামীর কাছে গিয়ে ঠেলে তুলল তাকে। ব্যস্তভাবে বলল, 'শোন, পার্বতী আর রামন্না দু'জনকারই কুঁচকিতে ফোড়ার

মত উঠেছে, প্লেগ হতে পারে, উঠে এসে দেখ একবার।' কিন্তু ঠেলাঠেলি সত্ত্বেও চেন্নিগরায়কে তোলা গেল না। চাদরটা ভাল করে মুড়ি দিতে দিতে সে ঘুম জড়ানো গলায় বলে উঠল, 'কাল সকালে দেখব, এখন বড় ঘুম পাচ্ছে।' নন্‌জম্মা বুঝল মহাদেবায়াজীকে খবর দেওয়া দরকার, কিন্তু একলা যেতে ভয় করছে ওর। অন্ধকারে কোনদিনই ভয় করে না, আজ এত ভয় করছে কেন? বিশ্বকে ডেকে তুলে বলল, 'চল্ তো বাবা, অইয়াজীকে ডাকতে যেতে হবে।' ঘুম-ভরা চোখেই চট্ করে উঠে দাঁড়ায় বিশ্ব, বলে ওঠে, 'আমিই ডেকে আনছি।' একদৌড়ে গিয়ে ছিটকিনি খোলে বিশ্ব। নন্‌জম্মা বলে, 'বাইরে খুব অন্ধকার, দাঁড়া আমি সঙ্গে যাচ্ছি।' কিন্তু তার আগেই বিশ্ব ছুট লাগিয়েছে মন্দিরের দিকে। মধ্যরাত্রি এখন, সারা গ্রাম নিস্তব্ধ।

একটু পরেই বিশ্বর হাত ধরে এসে গেলেন মহাদেবায়াজী। দুই ছেলে-মেয়ের অবস্থা জানিয়ে নন্‌জম্মা বলল, 'আমি তো বুঝতে পারছি না কিছু। প্লেগ হল নাকি, আপনি দেখুন একবার।'

মহাদেবায়াজী দু'জনকারই নাড়ী দেখলেন। রামন্নার কুঁচকি স্পর্শ করে দেখলেন, তারপর বললেন, 'পাটোয়ারী তো সন্ধ্যা পর্যন্ত বসেছিল মন্দিরে, ছেলে-মেয়ের অসুখের কথা বলেনি তো একবারও।'

'ওঁর কোন সম্পর্ক আছে নাকি এদের সঙ্গে! সে যাক্, এদের কি হয়েছে বলুন?'

'কাল বিকেলেই গ্রামের বাইরে গুরুবন্না আর কুরুবরহল্লীর পুট্টয়া বলাবলি করছিল, ওদের পাড়ায় দু'দিন আগেই ইঁদুর মরেছে।'

ভয়ে প্রাণ উড়ে গেল নন্‌জম্মার, নিস্পন্দ হয়ে গেল সে কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মহাদেবায়াজী সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন, 'ধৈর্য ধর মা, তুমি ভেঙে পড়লে কে দেখবে এদের?' কিন্তু কান্না থামল না নন্‌জম্মার, আকুল হয়ে বলে উঠল সে, 'প্লেগ হলে কি কেউ রক্ষা পায় অইয়াজী?' মায়ের কান্নার শব্দ রামন্নার কানে গেছে, সে বলে ওঠে, 'ওষুধ পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে মা, কাঁদছ কেন তুমি?' সে একটু ভাল বোধ করছে এখন, কিন্তু পার্বতীর এটুকু কথা বলারও শক্তি নেই আর।

মহাদেবায়াজীও বললেন, 'প্লেগ হলেও বেঁচে যায় লোকে। একবার প্লেগের কবল থেকে বেঁচে উঠলে আর দ্বিতীয়বার ওই রোগের ভয় থাকে না।'

একটু ভরসা পেল নন্‌জম্মা। সত্যিই তো ভাই কল্লেশ তো প্লেগ হয়েও বেঁচে গেছে। সে কথা মনে পড়তেই কিছুটা সাহস এল মনে। চেন্নিগরায়ের নাসিকা গর্জনের আওয়াজ ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নেই। বিশ্ব চুপ করে বসে আছে নিজের বিছানায়। 'তুই আর কেন জেগে বসে আছিস বাবা, শুয়ে পড়' বলে সস্নেহে তাকে শুইয়ে দিলেন মহাদেবায়াজী। একটু পরে রামন্নাও ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু এসময়ে এদের ফেলে মন্দিরে ফিরে যাওয়া চলে না, অথচ এখানে বসে কি যে করা যায় তাও ভেবে পেলেন না তিনি। তবু এখানে থাকলে নন্‌জম্মা কিছুটা সাহস পাবে, ভরসা পাবে, এই ভেবে বসেই রইলেন। একটু পরে নন্‌জম্মা বলল, 'অইয়াজী, একটা বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম আজ রাত্রে— যেন দেবীর মন্দিরে দেবীর কোলে শুয়ে আছে পার্বতী আর রামন্না, দু'জনেরই গায়ে কোন

কাপড় নেই, আমি কত চেষ্টা করছি ওদের গায়ে ঢাকা দিতে, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারছি না মন্দিরে। সামনে কোন বাধা নেই অথচ কে যেন পথ আটকাচ্ছে আমার---এ স্বপ্নের অর্থ কি অইয়াজী?'

'মায়ের কোলে শুয়ে আছে যখন তার অর্থ মায়ের দয়া আছে ওদের ওপর। রোগও তিনিই দিয়েছেন, রক্ষাও তিনিই করবেন, এ স্বপ্নের এই একমাত্র ব্যাখ্যা!'

নন্‌জম্মা একটু নিশ্চিন্ত হল, কিন্তু প্রশ্ন করল, 'আমি ভিতরে ঢুকতে পারলাম না কেন?'

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন না মহাদেবায়াজী। একবার মনে হল বলেন, 'ভগবান যাদের কৃপা করেন মানুষের তাদের কাছে যাবার অধিকার থাকে না', কিন্তু একথা শেষ পর্যন্ত বললেন না তিনি। নন্‌জম্মাও চুপ করে ভাবতে লাগল। স্বপনটার মধ্যে কি যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত রয়েছে, অন্য রকম ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলেও মন মানতে চাইছে না কিছুতেই। হয়ত দেবী বলতে চান, 'আমার কোলে যে রয়েছে তাকে কোন অধিকারে তুই স্পর্শ করতে চাস? আমার কাছে যে আছে তার কোন ভয় নেই।' সত্যিই কি তাই?

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই।'

'কিন্তু অইয়াজী, এদের কিছু ওষুধ দেওয়া প্রয়োজন তো?'

'নিশ্চয়, ওষুধ তো দিতেই হবে।'

'কিন্তু দেবী যদি রুষ্ট হন? যদি ভাবেন, "আমি যাকে কোলে স্থান দিয়েছি তাকে আবার ওষুধ খাওয়াবার ধৃষ্টতা কেন এদের?" তাহলে?'

এও তো এক সমস্যা! কিছুক্ষণ দু'জনেই চিন্তা করতে করতে অবশেষে মহাদেবায়াজী বললেন, 'দেখ সেই যখন সবাইকার ফোড়া আর ব্রণ হয়েছিল, তখন দেবতার তুষ্টির জন্য নাগপুজো করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তোমরা ইঞ্জেক্‌শনও তো নিয়েছিলে? এখনও সেইভাবেই চলতে হবে। কাল ডাক্তারকে ডাকতে হবে, আর নয়ত এদেরই গরুর গাড়ি করে নিয়ে যেতে হবে কম্বনকেরে।'

নন্‌জম্মা তখনই কারিন্দাকে ডেকে গাড়ি ঠিক করতে বলে দিল। কিন্তু মহাদেবায়াজী বললেন, 'এত বেশী জ্বরে রোগীদের এতখানি পথ না নিয়ে গিয়ে ডাক্তারকেই বরং এখানে নিয়ে আসা উচিত। গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া যাক, বরং আমি নিজেই গিয়ে ডাক্তারকে নিয়ে আসছি।'

মোরগ ডাকার আগেই কারিন্দা গিয়ে দেড় টাকা ভাড়ায় একখানা গাড়ি ঠিক করে নিয়ে এল এবং সূর্যোদয়ের আগেই মহাদেবায়াজী সেই গাড়িতে পৌঁছে গেলেন কম্বনকেরে।

এদিকে দুই ছেলে-মেয়েরই জ্বর আরো বেড়েছে। কুঁচকি ছাড়া এখন পার্বতীর বগলেও ব্যথা আরম্ভ হয়েছে। তার মুখের চেহারা দেখলে ভয় করে। ভাল করে যেন জ্ঞান নেই তার, কথা শুনে বুঝতে পারছে না। গরম খুদের মণ্ড খাওয়াবার জন্য মা তাকে নাড়া দিয়ে একটু সচেতন করার চেষ্টা করায় সে বলে উঠল, 'আমার হাতে-পায়ে একটুও জোর নেই।'

'জ্বর বেশী হয়েছে বলে ওরকম লাগছে, মণ্ডটুকু খেয়ে নে, একটু ভাল লাগবে।'

'না খাব না ···।'

'না খেলে শরীরে শক্তি থাকবে না যে মা, খেয়ে নে লক্ষ্মী মা আমার!'

বেশী প্রতিবাদ করবার শক্তি নেই পার্বতীর। কোন রকমে মণ্ডটুকু গিলে, তখনি আবার বমি করে ফেলল, তারপর চোখ বুজে পড়ে রইল নির্জীবভাবে। রামন্নার ঘুম ভেঙেছে, সে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, ডাক্তার কখন আসবে?'

'বোধহয় ন'টা নাগাদ এসে যাবেন বাবা।'

'আসবেন কি না কে জানে? প্লেগের গ্রামে ডাক্তারও আসতে ভয় পান। ইনি আবার নতুন লোক, আগের ডাক্তার বদলী হয়ে গেছেন।'

'দেখা যাক।'

মায়ের কথায় কিছুটা মণ্ড খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল রামন্না। তার ফুলে-ওঠা গাঁট-গুলোতে এখন খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। মাঝে মাঝে ব্যথা অসহ্য হলে আর্তনাদ করে উঠছে সে। ভোরে উঠে সেই যে পুকুর ধারে গেছে চেন্নিগরায়, এখনও ফেরার নাম নেই। বিশ্ব বেচারা ভেবে পাচ্ছে না কি করবে। মায়ের পিছু পিছু ঘুরছে আর নয়ত অন্য ঘরে বসে খেলছে। এই সময় দেখা গেল বেলুরা আসছে ডুগ্‌ডুগি বাজাতে বাজাতে, সেই সঙ্গে কি যেন বলছে সে জোর গলায়। বারান্দায় এসে দাঁড়াল নন্‌জম্মা। দূর থেকে ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ শব্দ করতে করতে বেলুরা এসে দাঁড়িয়ে গেল ওদের বাড়ির পাশে। তারপর চিৎকার করে ঘোষণা শুরু করল, 'গ্রামে প্লেগ ঢুকেছে। পঞ্চায়েৎ বলে দিয়েছে, সবাই গ্রাম ছেড়ে বাইরে চলে যাও, কুঁড়ে বেঁধে নাও। আগামী শুক্রবারের মধ্যে গ্রাম খালি করতে হবে, আগামী শুক্রবার---মনে রেখ, আগামী শুক্রবার ···' ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্ ডুগ্, শব্দ করতে করতে এগিয়ে যায় বেলুরা।

গতকাল রাত্রি পর্যন্ত প্লেগের খবর কিছুই জানত না নন্‌জম্মা। এবার সব থেকে প্রথমে ওর বাড়িতেই নজর পড়েছে প্লেগমাতার। নব বিবাহিতা ফুলের মত সুন্দর মেয়েটাকে নিয়ে গ্রামদেবীর মন্দিরে মানতের পুজো দিতে গিয়েছিল সে। সেই মেয়েকেই কি দেবী প্রথম বলি নিলেন? কিন্তু গ্রামদেবী তো মা-কালী আর প্লেগমাতার নাম তো 'সুঙ্কল দেবী।' এঁরা কি দু'জনে আলাদা নন? কেন? সমস্ত গ্রামের মধ্যে পার্বতীই বা কেন এই রোগের কবলে পড়ল সবার আগে? তার পরেই রামন্না! লোকে কত কি বলে, সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জানেন। কিন্তু কেন এই মহামারী এসে দেখা দেয় প্রতি দু'-তিন বছর অন্তর? এর কি কোন প্রতিকার নেই? নন্‌জম্মার মনে হল, 'নিশ্চয় ওষুধ আছে, ডাক্তার এসে এখনি দেবেন সেই ওষুধ। তারপর তাড়াতাড়ি কুঁড়ে তৈরী করে গ্রাম ছেড়ে বাইরে যেতে হবে' স্থির করে ফেলল সে।

বেলা প্রায় এগারটার সময় ফিরে এলেন মহাদেবায়াজী। ডাক্তার আসেননি। ওখানেও নাকি ইঁদুর মরেছে, তাই ডাক্তার এখন প্লেগের প্রতিষেধক ইঞ্জেক্শন দিতে ব্যস্ত। সুতরাং তিনি এখানে আসতে পারবেন না, রোগীদেরই নিয়ে যেতে হবে কম্বনকেরে।

'কিন্তু এই অবস্থায় কি করে নিয়ে যাব অইয়াজী?'

'ছই দেওয়া গাড়ি, নরম করে খড় বিছিয়ে তার ওপর বিছানা করে শুইয়ে ধীরে ধীরে নিয়ে যেতে হবে, এছাড়া আর উপায় কি?'

এক মুহূর্তও আর সময় নষ্ট করলে চলবে না। গাড়োয়ান খড় বিছিয়ে দিলে, তার ওপর বিছানা পাতা হল। অসুস্থ ছেলে-মেয়েকে অল্প করে গরম মণ্ড খাওয়ালো নন্‌জম্মা। তারপর গাড়োয়ান আর মহাদেবায়াজী দু'জনে মিলে ওদের গাড়িতে তুলে শুইয়ে দিলেন। কম্বল দিয়ে ভাল করে ঢেকে দেওয়া হল দু'জনকে। বিশ্বকে মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে থাকতে বলে নন্‌জম্মা উঠে বসল ছেলে-মেয়ের মাথার কাছে। একটুক্ষণ কি ভেবে চেন্নিগরায় শেষ পর্যন্ত গাড়ির পেছনে হাঁটতে শুরু করল মহাদেবায়াজীর সঙ্গে সঙ্গে।

উঁচু-নিচু, এবড়ো-খেবড়ো পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে কব্বল্লীর টিলা পেরিয়ে, গৌড়কোপ্পল ঘুরে, দু'পাশে ফণিমনসার ঝোপের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে বেলা প্রায় একটার সময় গাড়ি পৌঁছল কম্বনকেরের হাসপাতালে। ডাক্তার ততক্ষণে বাড়ি চলে গেছেন। হাসপাতালের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চেন্নিগরায়কে ছেলে-মেয়ের দিকে নজর রাখতে বলে নন্‌জম্মা মহাদেবায়াজীকে সঙ্গে নিয়ে ডাক্তারের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। তিনি তখন খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করছেন। প্রথমটায় বেশ বিরক্তি প্রকাশ করে অবশেষে চাবিটা নিয়ে আবার এলেন হাসপাতালে। গাড়ির মধ্যেই রোগীদের পরীক্ষা করে বলে উঠলেন, 'এতটা বাড়াবাড়ি হওয়া পর্যন্ত বসেছিলে কেন?'

'আমরা তো বুঝতে পারিনি ডাক্তারবাবু, আমরা ভাবছিলাম ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে। কাল রাত থেকে গাঁটগুলো ফুলেছে।'

'এখন আর ইঞ্জেক্‌শন দেওয়া চলবে না। ওষুধ দিচ্ছি, নিয়ে যাও। বোতল এনেছ?'

'না তো, আমরা জানতাম না বোতল আনতে হবে।'

'হাসপাতালে এসেছ, অথচ বোতল আননি?' আবার হাসপাতাল খুলে একটা খালি বোতলে ওষুধ ভরে ওদের দিয়ে বলে দিলেন ডাক্তার, 'তিন বার করে খাওয়াবে দু'জনকেই। আজ আর কাল দু' দিনকার মত ওষুধ আছে এতে। পরশু আবার নিয়ে আসবে।'

এরপর ডাক্তারও আর কোন নির্দেশ দিলেন না, এরাও ভেবে পেল না আর কি জিজ্ঞাসা করা যায়। গাড়িতে উঠে আবার সবাই ফিরে চলল গ্রামে। সেই কষ্টকর পথ পার হয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছল বিকেল চারটের সময়। বাড়ি এসে নন্‌জম্মা দেখে বিশ্ব মাস্টারের বাড়িতে যায়নি। দরজা খোলা পড়ে আছে, ঘরের মধ্যে মাদুর পেতে শুয়ে রয়েছে বিশ্ব। সেই কোন সকালে মা রুটি দিয়েছিল, তারপর আর কিছু খায়নি সে। সমস্ত শরীরে ব্যথা, তারও প্রবল জ্বর এসে গেছে। ওর চোখ-মুখ দেখে ছুটে এসে কপাল স্পর্শ করল নন্‌জম্মা, এরও দেহে রোগের লক্ষণ ফুটে উঠছে। ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল নন্‌জম্মা, 'অইয়াজী, রাক্ষসী-মা আমার সব কটা বাচ্চাকে খেতে এসেছে! এই দেখুন বিশ্বরও কি রকম জ্বর!'

পার্বতী আর রামন্না তখনও গাড়িতে। কাঁচা রাস্তায় দশ মাইল গরুর গাড়ির ঝাঁকুনি খেয়ে তারা এখন প্রায় অর্ধ-অচৈতন্য। ওদের ভিতরে আনা হল। মহাদেবায়াজী বললেন, 'এ গাড়ির বলদ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, আমি অন্য গাড়ি ঠিক করে তাইতে বিশ্বকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। তুমি এদের দু'জনকে দেখ। বিশ্বর এখনো গাঁট ফোলেনি, ওর চিকিৎসা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করা দরকার।

নন্‌জম্মা যেন একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়েছে। মহাদেবায়াজী মন্দিরে গিয়ে নিজের বাক্‌স খুলে পয়সা-কড়ি যা ছিল সব বার করে নিলেন। ফিরে এসে নন্‌জম্মার হাতে দশটি টাকা দিয়ে অবশিষ্ট গোটাকুড়ি টাকা নিজের পকেটে ভরলেন। ততক্ষণে গাড়োয়ান বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে অন্য একজোড়া বলদ গাড়িতে জুতে নিয়ে এসেছে। এ গাড়িতে অন্য বিছানা পেতে বিশ্বকে তাতে শুইয়ে রওনা হয়ে গেলেন মহাদেবায়াজী।

কম্বনকেরে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। গাড়ি সোজা ডাক্তারবাবুর বাড়িতেই নিয়ে যাওয়া হল। ডাকাডাকি শুনে বাইরে এসে ডাক্তারবাবু রাগ করলেন, 'প্লেগের রোগীকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে এসেছো কেন?'

'স্যার, আপনি তো হাসপাতালে ছিলেন না।'

'দিবারাত্রি আমাকে হাসপাতালেই বসে থাকতে হবে নাকি? এই কারিয়া, যা দেখি, হাসপাতাল খুলে টেবিলের ওপর যে বোতলগুলো আছে তার ডানদিকের বোতলটা থেকে একে তিন আউন্স ওষুধ দিয়ে দে', ভৃত্যকে নির্দেশ দিয়েই ডাক্তারবাবু ঢুকে গেলেন বাড়ির মধ্যে।

হাসপাতালে আসতে আসতে মহাদেবায়াজীর গেরুয়া বস্ত্র দেখে কারিয়ার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হল। সে বলল, 'সাধুজী এ ওষুধে কিছুই হবে না। তিপটুরে হেমাদি সিরাপ পাওয়া যায়, তিন টাকা করে বোতল, বেঙ্কটাচল শেট্টীর দোকানেই পেয়ে যাবেন। বাজারের রাস্তায় বাড়িগুলোর পেছন দিকে দোকানটা। বাচ্চাটাকে এখনও যদি খাওয়াতে পারেন গাঁট এখনও বিশেষ ফোলেনি, হয়ত বেঁচে যাবে।'

'কিন্তু ডাক্তার তো একথা বললেন না, ভাই?'

'উনি ঐ রকমই বলবেন। আমি যা বলি তাই করুন আপনি। যদি চান তো এই বোতলের জলও দিয়ে দিচ্ছি খানিকটা, কিন্তু এতে কোন ফল হবে না।'

মহাদেবায়াজী স্থির করলেন, তিপটুর চলে যাবেন। গাড়োয়ান একটু আপত্তি করছিল কিন্তু মহাদেবায়াজী বললেন, 'দেখ বাপু, মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি, এ সময় পিছু হটতে চাওয়া পাপ। তোমারও ঘরে ছেলেপিলে আছে সেটা মনে রেখ।' কিছুটা ভয়ে এবং কিছুটা চক্ষুলজ্জায় রাজি হয়ে গেল গাড়োয়ান। কম্বনকেরে থেকে তিপটুর পর্যন্ত সোজা রাস্তা আছে। দশ-এগারো মাইল পথ, ছেলেটার যদি খিদে পায়, মহাদেবায়াজী এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন।

গাড়ি যখন তিপটুর পৌঁছল তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। বেঙ্কটাচল শেট্টীর দোকান চেনা ছিল মহাদেবায়াজীর। দোকান এখন বন্ধ, কিন্তু ঐ দোকানের সঙ্গেই শেট্টীর বাড়ি, তা জানেন উনি। দরজায় আঘাত শুনে উঠে এল শেট্টী। সব ব্যাপার শুনে বলল, 'হেমাদি সিরাপ আয়ুর্বেদে এ রোগের একমাত্র ওষুধ। মাদ্রাজের বেঙ্কটাচার্লু কোম্পানী থেকে আনাই আমি। গাঁট ফুলবার আগেই খাওয়ালে রোগী সেরে ওঠে। বেশী দেরী হয়ে গেলে ফল হবে কি না বলতে পারি না। তা ক' বোতল চাই আপনার?'

'রোগীকে কতটা পরিমাণে খাওয়াতে হবে?'

'দিনে চারবার, চার চামচ হিসেবে। এক বোতলে তিন দিন চলে, প্রতি বোতল তিন টাকা।'

কুড়িটা টাকা ছিল মহাদেবায়াজীর কাছে। আঠারো টাকায় ছ'বোতল ওষুধ কিনে নিলেন তিনি। শেট্টী বলল, 'বাচ্চাকে এখনই চার চামচ খাইয়ে দিন, মধুর মত মিষ্টি ওষুধ। কিন্তু একে এখন আর প্লেগের ছোঁয়াচ্ লাগা জায়গায় বা বাড়িতে নিয়ে যাবেন না। গ্রামের বাইরে রাখা উচিত।'

শেট্টী উপদেশটা দিয়েই ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে এবং দরজা বন্ধ করে দিল। বলদ-গুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গাড়োয়ান এবং মহাদেবায়াজীও যথেষ্ট পরিশ্রান্ত। এই গভীর রাতে কোথাও যদি কিছু খাবারের আশা করা যায় তো তার জন্য একমাত্র স্থান হল রেল স্টেশনের হোটেল। গাড়ি নিয়ে ওরা গেলেন সেখানেই। প্রথমেই এক ঘটি জল সংগ্রহ করে বিশ্বকে ওষুধ খাওয়ানো হল, তারপর দেওয়া হল কফি। এত রাতে ঠাণ্ডা পকৌড়া ছাড়া আর কোন খাবার নেই। তাই আট আনার কিনে খেয়ে নিলেন মহাদেবায়াজী এবং গাড়োয়ান। হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল গাড়োয়ানের, সে বলল, 'অইয়াজী, আমাকেও তো কুঁড়ে বাঁধতে হবে, বাড়ি খালি করতে হবে। বলদ দুটো খুব কাহিল হয়ে গেছে, কিন্তু উপায় নেই, ধীরে ধীরে ফেরা যাক।' মহাদেবায়াজীও এ বিষয়ে একমত।

আবার ফিরে চলল গাড়ি। বিশ্বর জ্বর আছে যথেষ্ট, তবে জ্ঞান আছে। মহাদেবায়াজী ওর বগল, কুঁচকি সব টিপে টিপে পরীক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, ব্যথা করছে কি কোথাও?' বিশ্ব জবাব দিল, 'না তো।' খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলেন মহাদেবায়াজী। তাহলে বোধহয় রোগটাকে কাবু করা গেছে। গাড়ির ছাউনিতে ঠেস দিয়ে উনি ঢুলছিলেন। ক্লান্ত বলদগুলো চলছে খুব ধীরে ধীরে। গাড়োয়ানও অর্ধনিদ্রিত, কোন রকমে চোখ বুজে বুজেই গাড়ি চালাচ্ছে।

সকাল হল। এতক্ষণে অর্ধেক পথ এসেছেন ওঁরা। পথের ধারেই এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে বিশ্বর মুখ ধুইয়ে আবার ওষুধ খাওয়ানো হল। জ্বর এখনও আছে তবে শরীরের কোথাও ফুলে ওঠেনি। দেখে অনেকটা ভরসা হল। বিশ্বকে দুটো বিস্কুট খাইয়ে, নিজেরা প্রাতঃকৃত্য সেরে আবার রওনা দিলেন। একটা কথা মনে হল মহাদেবায়াজীর —সবাই এখন গ্রাম ত্যাগ করছে, ঐ প্লেগগ্রস্ত গ্রামে বিশ্বকে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। ওঁর মন্দির তো গ্রামের ঠিক বাইরেই, গাড়িটা সেইখানেই নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। মন্দিরে বিশ্বকে বিছানা পেতে শুইয়ে বোতল থেকেই আর একবার ওষুধ খাইয়ে দিলেন, বেলা তখন এগারোটা। গাড়োয়ানকে একটুক্ষণ বিশ্বর কাছে থাকতে বলে চার বোতল ওষুধ নিয়ে গ্রামে প্রবেশ করলেন মহাদেবায়াজী।

২

সমস্ত গ্রামবাসী বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি নিয়ে চলেছে কুঁড়ে তৈরী করতে। অনেকে কুঁড়ে প্রস্তুত হবার আগেই জিনিসপত্র মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মহাদেবায়াজী দেখলেন পার্বতী রামন্না দু'জনেই জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, যন্ত্রণায় পার্বতী ক্ষীণ আর্তনাদ করছে মাঝে মাঝে। মহাদেবায়াজীকে একা ফিরতে দেখে ভয় পেয়ে গেল নন্‌জম্মা। উনি অভয়

দিয়ে বললেন, 'চিন্তা কোর না মা, তিপটুর পর্যন্ত ছুটেছিলাম। বিশ্বর জ্বর আছে এখনও কিন্তু গাঁট ফোলেনি। ভাল ওষুধ এনেছি তিপটুর থেকে। বিশ্বকে গ্রামের বাইরের মন্দিরে শুইয়ে রেখেছি। প্লেগের গ্রামে ওকে নিয়ে আসা উচিত নয়। এই ওষুধ এদের দু'জনকেও দিনে চারবার চার চামচ করে খাওয়াও।'

বোতল খুলে ঝিনুকে করে ছেলে-মেয়ের মুখে ওষুধ ঢেলে দিতে হল, চুমুক দিয়ে খাবার আর শক্তি নেই তাদের। 'এই একমাত্র ওষুধ, যদি শিবের ইচ্ছা হয় তো, এতেই সারবে', মহাদেবায়াজী বলেন, 'কিন্তু তোমরা এখনও গ্রাম ছাড়বার কোন ব্যবস্থা করনি কেন?'

'সবাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত, কে করবে আমাদের জন্য?'

'চিন্নৈয়া কোথায় গেল?'

'জানি না। সকাল আটটায় বেরিয়েছে, এখনও আসেনি।'

'আমি এখানকার মন্দিরের থেকে আমার বিছানা, কম্বল ইত্যাদি বাইরের মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি। বিশ্বর জন্য কোন চিন্তা নেই। কারিন্দাকে ডেকে বলছি, তোমাদের কুঁড়ে বানিয়ে দেবে।' ওষুধের বোতলগুলো নন্‌জম্মাকে দিয়ে, বিশ্বর জন্য ভাতের মণ্ড প্রস্তুত করার মত আধ সেরটাক চাল নিয়ে চলে গেলেন মহাদেবায়াজী। পার্বতী আর রামন্নার জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছে নন্‌জম্মা। ঈশ্বরের অসীম কৃপা থাকলে বাঁচতেও পারে। দু'জনেরই কুঁচকি এবং বগলে বড় বড় গ্রন্হি ফুলে উঁচু হয়ে উঠেছে, জ্বরও বেড়ে চলেছে অবিরাম গতিতে। পার্বতী মাঝে মাঝে চোখ মেলে তাকাচ্ছে, কিন্তু সে দৃষ্টি যেন এ পৃথিবীর নয়। তার ফুলে-ওঠা বীভৎস মুখখানা দেখলে ভয় করে। রামন্না পড়ে আছে নিঃশব্দে। তারও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্হিগুলো ফুলে উঠেছে ঠিক শাঁকালুর মত। সকাল থেকে দু'জনেরই মুখে কোন শব্দ শোনা যায়নি। 'মহাদেবায়াজীর আনা ওষুধে কিছু কাজ হবে কি? তিপটুর থেকে ওষুধ এনেছেন, কম্বনকেরের ডাক্তার কি বলেছে কে জানে? তিনিই কি বলেছেন বিশ্বর জন্য চিন্তার কারণ নেই? বিশ্বকে অন্ততঃ একবার দেখে আসা দরকার! কিন্তু এখানে কে থাকবে তাহলে?' নন্‌জম্মা ভাবছিল এইসব সমস্যা—এমন সময় একটা পাত্র হাতে মাস্টারমশাই-এর স্ত্রী এলেন। মাস্টার সকালে এসে দেখে গেছেন রোগীদের। মাস্টারের স্ত্রী বললেন, 'সব খাবার-দাবার নাকি অন্য বাড়ি থেকে আনাতে নেই, তাই শুধু একটু ভাত আর সম্বর এনেছিলাম, রেখে যাচ্ছি। উনি কুঁড়ে তৈরী করাচ্ছেন। এখন কেমন আছে ওরা?'

'সেই রকমই। সকাল থেকে তো কথাও বলছে না।'

'তুমি কারিন্দাকে বলে দাও জনচারেক মজুর নিয়ে ওঁর কাছে চলে যাক, তোমাদের জন্যও একটা কুঁড়ে তৈরী করিয়ে দেবেন। তারপর বাচ্চাদের নিয়ে যেও তুমি। জিনিস-পত্র সবাই মিলে পৌঁছে দেবে। পাটোয়ারী গেলেন কোথায়?'

'কে জানে কোন চুলোয়!'

কুঁড়ে তৈরীর জন্য বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি নন্‌জম্মার ছাদের ওপর রাখাই আছে, কেবল কিছু নারকেলপাতা দরকার। সবাই ঘর ছাওয়ার জন্য নারকেলপাতা কাটছে, তাই এগ্রামে নারকেলপাতারও অভাব। একটা গাড়ি পাঠাতে পারলে কুরুবরহল্লী থেকে

আনানো যায়। কিন্তু সেখানেও হয়ত সবাই গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ছে। নন্‌জম্মা উঠে দুই ছেলে-মেয়েকে ঝিনুক ভরে নতুন ওষুধ খাওয়ালো। জিজ্ঞাসা করল, 'একটু মণ্ড খাবি?' কিন্তু ওর কথা যেন বুঝতেই পারল না ছেলে-মেয়ে। 'ওষুধটা এইমাত্র পেটে গেছে, এখন আধঘন্টা কিছু খাইয়ে কাজ নেই।' চুপ করে বসে রইল নন্‌জম্মা। এত-ক্ষণে চেন্নিগরায় বাড়ি ঢুকল, তার মাথায় কাচা জামা-কাপড়ের পুঁটলি। পরিধানে ভিজে গামছা এবং কপালে বিভূতির রেখা, অর্থাৎ স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনা সারা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে আজ সন্ধ্যাপুজোটা হয়েছে বেশ দীর্ঘকাল ধরে।

'বাড়িতে ছেলে-মেয়ে দুটো মরছে। সারা গ্রাম খালি হয়ে গেল, আজকে এতক্ষণ ধরে কাপড় না কাচলে চলত না?'

'আর কদিন ধরে নোংরা জামা-কাপড় পরে থাকব শুনি? সেই দু'-তিন দিন আগে তো কাপড় কেচেছিস, তারপর থেকে তো নিজেও কাপড় ছাড়িসনি, বামুনের ঘরের মেয়ে না তুই?'

এ লোকের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, কাজেই চুপ করে রইল নন্‌জম্মা। রান্নাঘরে ঢুকতেই মাস্টারের বাড়ির খাবারের পাত্রটা নজরে পড়ল চেন্নিগরায়ের। চটপট ঢাকনা সরিয়ে থালায় ভাত, ডাল বেড়ে নিয়ে পঞ্চপাত্রের জলে আচমন সেরে নিল সে—চিত্রায় নমঃ, চিত্রগুপ্তায় নমঃ, যমায় নমঃ ইত্যাদি এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে খেতে বসে গেল। চেন্নিগরায়ের ক্ষুধার বহর তো আর জানা নেই মাস্টারমশাইয়ের পত্নীর। তিনি যা রেখে গিয়েছিলেন, সেটা নিঃশেষ করেও পুরো পেট ভরলই না তার। খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরে মুখ ধুতে এসে দেখে মহাদেবায়াজী এসেছেন। পার্বতী এখন কেমন যেন টেনে টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। কি করবে বুঝতে না পেরে নন্‌জম্মা চুপ করে বসে আছে মেয়ের হাতখানা ধরে। মহাদেবায়াজী বললেন, 'চিন্নৈয়া, সোজা এখান থেকে বাঁধের ওপরের মন্দিরে চলে যাও, মাঝের ঘরে বিশ্ব শুয়ে আছে। গাঁয়ের বাইরে নন্‌জার ছেলে ছাগল চরাচ্ছিল, তাকে বসিয়ে রেখে এসেছি। সেখানে গিয়ে তুমি শুধু বসে থাক, আর কিছু করতে হবে না তোমায়।'

'ওখানে একা একা বসে থাকতে থাকতে আমি হাঁফিয়ে উঠব যে, আমার ভাল লাগে না।'

মহাদেবায়াজী চটে গেলেন, 'বলি, তুমি কি একটা মানুষ, না জানোয়ার? যা বলা হচ্ছে তাই কর গিয়ে।' কোনদিন কারো সঙ্গে চড়া গলায় কথা বলেন না মহাদেবায়াজী, আজ তাই ওঁর রাগ দেখে চেন্নিগরায় ঘাবড়ে গেল। থতমত খেয়ে বলল, 'ঠিক আছে যাচ্ছি, যাচ্ছি। একটু তামাকপাতা থাকে তো দিন, খাওয়ার পর একটু তামাক না খেলে আবার থাকতে পারি না।'

'ওঃ খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে? রান্না করল কে?'

'ওই রেঁধেছে বোধহয়।'

নন্‌জম্মা বলল, 'মাস্টারজীর বৌ দিয়ে গিয়েছিলেন।'

'আমার জিনিসপত্র সব ঐ মন্দিরে নিয়ে গেছি। পান, তামাকের থলিও ওখানেই আছে, যত খুশি খাও আর থুথু ফেল গিয়ে।' মহাদেবায়াজীর ধমক খেয়ে পাটোয়ারী চুপচাপ

নিজের অর্ধেক শুকনো ধুতিটা বারান্দার খুঁটি থেকে তুলে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল। এবার উনি নন্‌জম্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুঁড়ে তৈরীর কিছু ব্যবস্থা হয়েছে নাকি, মা?'

'কুঁড়ে চুলোয় যাক। আপনি এদিকে এসে দেখুন, মেয়েটা কেমন করে যেন শ্বাস টানছে!'

কাছে গিয়ে পার্বতীর নাকের কাছে হাত রেখে দেখলেন মহাদেবায়াজী—শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক নিয়মিতভাবে পড়ছে না। প্রশ্ন করলেন, 'কখন মণ্ড খেয়েছে?'

'খাচ্ছেই না তো কিছু।'

'খালি পেটে রয়েছে তাই কাহিল হয়ে পড়েছে বোধহয়। একটু মণ্ড তৈরী করে খাওয়াও আগে। আমি ততক্ষণে কুরুবরহল্লী থেকে নারকেলপাতা আনাবার ব্যবস্থা করি।' মহাদেবায়াজী গেলেন মাস্টারের বাড়ি। মাস্টারের ছেলে বিশ্বর চেয়ে বছর দুয়েকের বড়, খুব চালাক-চতুর। তাকে বললেন, 'একলা একলা কুরুবরহল্লী যেতে পারবি বাবা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একদৌড়ে যাব আর চলে আসব।'

'তাহলে একবার গুণ্ডেগৌড়জীর কাছে যা। গিয়ে বলবি—পাটোয়ারীজীর বাড়িতে তিন ছেলে-মেয়ের প্লেগ হয়েছে। কুঁড়ে তৈরীর জন্য আর সব জিনিস আছে, শুধু নারকেল-পাতা নেই, এক গাড়ি নারকেলপাতা আর দু'জন লোক যেন পাঠিয়ে দেন। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারবি তো? বলিস, নন্‌জম্মা বসে বসে কাঁদছে।'

'সব ঠিকঠাক মনে করে বলব আমি।'

মাস্টারমশাই তখনি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন। মহাদেবায়াজী আবার ফিরে এলেন এ বাড়িতে। রান্নাঘরে উনুনে ফুটছে ভাতের মণ্ড। গুণ্ডেগৌড়জী খবর পাওয়ামাত্র পাতা এবং লোক পাঠিয়ে দেবেন। মহাদেবায়াজীর মনে হল, ততক্ষণে ছাদ থেকে বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি নামিয়ে রাখা যাক, তাহলে আজ সন্ধ্যাতেই কুঁড়েটা তৈরী হলে, কাল সকালে সেখানে যাওয়া যেতে পারে। গ্রাম ত্যাগ না করলে ছেলে-মেয়েরা সুস্থ হবে না। ছাদে উঠে গেলেন উনি। ছাদের কোণে বাঁশের গাদার ওপর প্রচুর ধুলো জমেছে। নন্‌জম্মাকে ডেকে বললেন, 'ঘরে বাচ্চাদের মাথায় একটু কাপড় চাপা দাও, বাঁশগুলো নামাচ্ছি, চালের ফাঁক দিয়ে ওদের চোখে-মুখে ধুলো পড়বে। বেশী আওয়াজ করব না, আস্তে আস্তে বাঁশগুলো উঠোনে নামিয়ে রাখি।' বাঁশ নামিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন মহাদেবায়াজী। নন্‌জম্মা ততক্ষণে মণ্ড ঠাণ্ডা করে বাটিতে ঢেলে ঝিনুক নিয়ে ঘরে এসেছে। পার্বতীর মাথার কাপড় সরিয়ে দেখে নিঃশ্বাস পড়ছে অত্যন্ত ক্ষীণভাবে। ঝিনুকে করে মুখের মধ্যে মণ্ড ঢেলে দিতেও পার্বতী গিলতে পারল না। নন্‌জম্মা চিৎকার করে ডাকল, 'অইয়াজী, বাঁশ রেখে এদিকে আসুন একবার।' মহাদেবায়াজী এসে পার্বতীর মুখ দেখে ভাল বুঝলেন না। বললেন, 'ফুলোগুলো কেমন আছে দেখ, আমি হাতের ধুলোটা ধুয়ে আসছি।'

নন্‌জম্মা দেখল ডানদিকের কুঁচকির ফুলে-ওঠা গাঁট ফেটে পুঁজ, রক্ত বেরোচ্ছে। মহাদেবায়াজীও দেখলেন এসে। ঠিক ফোড়া ফেটে যাওয়ার মত পুঁজ, রক্ত বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কাপড় সরিয়ে দেখা গেল, অন্য দিকের গ্রন্থিও ফাটতে আর বেশী দেরী নেই। মহাদেবায়াজী কিছু না বলে পার্বতীর গায়ের ঢাকাটা বুক পর্যন্ত টেনে দিলেন। ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে নন্‌জম্মা, 'কেমন দেখছেন অইয়াজী?'

'সবই তাঁর ইচ্ছা মা, অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু তো করার নেই।' অবস্থা যে ভাল নয়, তা নন্‌জম্মাও বুঝতে পারে। পার্বতীর শ্বাস পড়ছে এখন জোরে জোরে। এর আগে চোখের সামনে মৃত্যু কখনো দেখেনি সে। এতক্ষণ যে নিঃশ্বাস ছিল অতি ক্ষীণ তাই এখন ঘন ঘন পড়ছে, এরকম কেন হচ্ছে বুঝতে পারছে না নন্‌জম্মা। চোখের দৃষ্টি দেখেও কিছু বোঝেনি সে। মহাদেবায়াজীর অনেক অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু কি বলা উচিত ভেবে না পেয়ে তিনিও বসে রইলেন চুপ করে। অবশেষে কি যেন ভেবে বললেন, 'তোমার বাবা কাশী থেকে যে গঙ্গাজল এনেছিলেন, তা কি আছে ঘরে?'

'কেন?' চমকে ওঠে নন্‌জম্মা, এবার অবস্থাটা বুঝেছে সে।

'ভয় পেয়ো না, যদি পারেন মা-গঙ্গাই বাঁচাবেন, গঙ্গাজল একটু নিয়ে এসো মা।'

ছুটে গিয়ে গঙ্গাজল নিয়ে এল নন্‌জম্মা। ঘটির মুখটা মোম দিয়ে বন্ধ করা, মোম কুরে একটা কোণে ফুটো করল সে। মহাদেবায়াজী বললেন, 'তুমি বস, আমি খুব সাবধানে মেয়ের মাথা তোমার কোলে তুলে দিচ্ছি।' পার্বতীর মাথাটি নন্‌জম্মার কোলে তুলে মণ্ড খাওয়াবার ঝিনুকটি মুছে তাতেই একটু গঙ্গাজল ঢেলে নন্‌জম্মার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি ঠোঁট ফাঁক করে ধরছি, তুমি মুখে ঢেলে দাও।'

হাত কাঁপছে নন্‌জম্মার, ঝিনুকের গঙ্গাজল ছল্‌কে পড়ে যাচ্ছে। মহাদেবায়াজী ওর হাত ধরে কোন রকমে ঝিনুকের গঙ্গাজলটুকু পার্বতীর মুখে ঢেলে দিলেন। পার্বতীর সেই ঘন ঘন শ্বাস নেওয়া এখন কমে গেছে, ক্রমেই স্থির হয়ে যাচ্ছে সে। চোখ দুটি আধ-খোলা, কিন্তু মুখের ওপর ঝুঁকে-পড়া মায়ের মুখখানাও আর দেখতে পাচ্ছে না সে। মায়ের কোলে সে শুয়ে আছে এটাও আর বোঝার শক্তি নেই তার। ক্রমে আরো ক্ষীণ হয়ে এল তার শ্বাস-প্রশ্বাস। শেষে একবার জোরে নিঃশ্বাস ফেলেই একেবারে স্থির হয়ে গেল সে, পরের বার নিঃশ্বাস আর টেনে নিল না। প্রাণবায়ু বেরিয়ে আসার সময় ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে গিয়েছিল, সেই আধখোলা মুখ আর বন্ধ হল না।

'অ-ই-য়া-জী!' বুকফাটা চিৎকার করে মেয়ের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল নন্‌জম্মা। এখন সব সান্ত্বনা বাক্যই অর্থহীন। মহাদেবায়াজী কিছু না বলে ছুটলেন মাস্টারের বাড়িতে। মাস্টার তখন বাড়ির অবশিষ্ট জিনিসপত্র গাড়িতে বোঝাই করছিলেন, পার্বতীর খবর শুনে মর্মান্তিক দুঃখ পেলেন তিনি।

মহাদেবায়াজী বললেন, 'সন্ধ্যা আসন্ন, আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এখনি কাঠের যোগাড় করতে হবে। আপনি আপনার স্বজাতিদের খবর দিন।'

মাস্টার ও তাঁর স্ত্রী যখন এ বাড়িতে এলেন, তখনও নন্‌জম্মা পার্বতীর মাথাটি কোলে নিয়ে বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। মহাদেবায়াজী কাছে এসে বললেন, 'এখন রামন্নার দিকে তাকাও মা। ও খায়নি অনেকক্ষণ, ওকে খাওয়াও। এ এখন মৃতদেহ, একে এবার ছাড়তে হবে তো।'

'অইয়াজী—আমার পার্বতী!'

'পার্বতী স্বয়ং মহাদেবের কাছে চলে গেছে মা, এখন তুমি রামন্নার সেবা কর।' মহাদেবায়াজী এবার মৃতা পার্বতীকে ধীরে ধীরে নামিয়ে দেন মায়ের কোল থেকে। দেরী

করা উচিত নয় ভেবে মাস্টারমশাই শবযাত্রার আয়োজন শুরু করেন। হঠাৎ নন্‌জম্মা কেমন যেন শক্ত হয়ে যায়, আর কাঁদে না, কথাও বলে না। নিঃশব্দে রান্নাঘরে গিয়ে মণ্ড গরম করে নিয়ে আসে। রামন্নার মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে তাকে খাওয়াতে বসে। ছেলের জ্ঞান আছে কিনা জানে না সে। তবে মণ্ড গিলতে পারছে, এটা দেখে ভরসা পায়। সেই ঝিনুকেই হেমাদি সিরাপ ঢেলে খাওয়ায়, তারপর কম্বল দিয়ে ঢেকে দেয় ছেলেকে। বগলে আর কুঁচকিতে হাত দিয়ে দেখে ফুলে-ওঠা গাঁটগুলো ফাটেনি। গাঁটগুলো ফোলেই বা কেন আর ফাটেই বা কেন? ওগুলো ফেটে গেলেই কি রোগী মারা যায়? আর না ফাটলে বাঁচতেও পারে? কোন প্রশ্নেরই উত্তর জানা নেই তার। কিন্তু গাঁটগুলো ফেটে যাবার পরই মারা গেল পার্বতী। রামন্নার কোন গাঁটই ফাটেনি। তার শ্বাস-প্রশ্বাসও স্বাভাবিক আছে, এসব দেখে একটু ভরসা হচ্ছে মনে। মৃতা কন্যার পাশ থেকে উঠে জীবিত পুত্রের মাথাটি কোলে নিয়ে বোবারমত নিঃশব্দে বসে থাকে নন্‌জম্মা।

কিছুক্ষণ আগেই মহাদেবায়াজী ছাদের ওপর থেকে যে বাঁশ নামিয়েছেন, তাই দিয়েই এখন শবদেহ বহন করার খাটিয়া তৈরী করতে হবে। দুই পুরোহিত এবং গ্রামের অন্যান্য ব্রাহ্মণদের খবর দিতে গেলেন মাস্টার। সবাই এখন গ্রাম ত্যাগের আয়োজনে ব্যস্ত, কিন্তু তাড়াতাড়ি শব দাহ না করতে পারলে রাত হয়ে যাবে, তখন আবার ভোর না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দেখতে দেখতে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণেরা সবাই এসে পড়লেন। এখন চেন্নিগরায়ের আসা দরকার। মহাদেবায়াজী ভাবছিলেন, বিশ্বর কাছে কাকে থাকতে বলা যায়। মন্দিরের ধারে-কাছে তো এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না, যাকে কিছুক্ষণ বিশ্বর কাছে বসতে বলবেন। গ্রামের বাইরে নিজের দোকান-ঘরের দরজার কাছে বসে আছে নরসী। মহাদেবায়াজীকে দেখে সে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'পাটোয়ারীজীর মেয়ে পার্বতী নাকি মারা গেছে?'

মহাদেবায়াজীর মনে হল, এর কাছে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। ওকে সব কথা বলে তিনি অনুরোধ করলেন, 'তোমার তো গ্রামের বাড়ি খালি করার হাঙ্গামা নেই। দোকানটা বন্ধ করে তুমি কিছুক্ষণ এসে বাচ্চাটার কাছে বসতে পারবে? আমরা না ফেরা পর্যন্ত থাকতে হবে।'

দরজায় তালা দিয়ে চলে এল নরসী। চেন্নিগরায় তখন মহাদেবায়াজীর থলি থেকে ছ'বারের বার পান বের করে চুন মাখিয়ে সাজতে বসেছে, এমন সময় ওঁরা মন্দিরে এলেন। মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে প্রদীপ বার করে এনে নরসীকে দিয়ে মহাদেবায়াজী বললেন, 'অন্ধকার হয়ে গেলে জ্বেলে দিও। আর এই বোতল থেকে তিন ঘন্টা অন্তর ওষুধ খাওয়াতে হবে। চালের খুদ রাখা আছে, যদি ছেলেটার খিদে পায়, একটু ভাতের মণ্ড করে দিও।'

'আমি সব করে দেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

বিশ্ব চুপ করে শুয়ে আছে। মহাদেবায়াজী এবার চেন্নিগরায়কে বললেন, 'পার্বতী মারা গেছে। তুমি চলো, এখন যথাকর্তব্য করতে হবে।'

'কেন? কি করে মারা গেল?'

'সে সব ওখানে গিয়েই শুনো। চল এখন।' ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন মহাদেবায়াজী।

ততক্ষণে শবযাত্রার আয়োজন হয়ে গেছে। অন্নাজোইসজীই অগ্রণী হয়ে সব কাজ করাচ্ছেন। অইয়াশাস্ত্রীজী একটু ভীতু মানুষ, তিনি শবদেহের থেকে দূরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছেন। নন্‌জম্মা ছেলের মুখের দিকে চেয়ে পাথরের মূর্তির মত বসে রয়েছে, তার সমস্ত শরীর যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, একটুও স্পন্দন নেই সে দেহে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে মেয়ের মৃতদেহ এবং এই শবযাত্রার আয়োজন সম্পর্কে তার যেন কোন চেতনাই নেই।

'সত্যি কথা বলতে কি, এর স্বামীই এর পারলৌকিক ক্রিয়ার অধিকারী, তাকে খবর না দিয়ে দাহ করে ফেলাটা কি উচিত হবে?' প্রশ্ন তুললেন অন্নাজোইসজী।

মাস্টার জবাব দিলেন, 'তাকে এখন কি করে খবর দেওয়া যাবে? তার ওপর প্লেগের রোগী, বেশীক্ষণ মৃতদেহ ফেলে রাখা উচিত নয়। আমি এ ব্যাপারের দায়িত্ব নিচ্ছি। বিয়ের সম্বন্ধ আমিই করেছিলাম, তাকে চিঠি লিখে এ খবর দেবার ভারও আমি নিচ্ছি। এখন আর বিলম্ব করবেন না আপনারা।'

মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী পার্বতীর কপালে হলুদ কুঙ্কুমের টিকা এঁকে দিলেন। নতুন কাপড়ের টুকরো রাখা হল দেহের ওপর। গতকাল মহাদেবায়াজী যে টাকা দিয়েছিলেন, তার থেকে পাঁচ টাকা নন্‌জম্মা এনে দিল মাস্টারের হাতে। পার্বতীর শেষ বিদায়ের সময় মাস্টারের স্ত্রী কেঁদে ভাসিয়ে দিলেন, কিন্তু নন্‌জম্মার চোখে একফোঁটা জল নেই। 'হতভাগী মরল যে কেন!' বলতে বলতে চেন্নিগরায়ও চোখ মুছছিল।

বাঁধের ওপারে কাঠ কেটে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বিবাহিতা কন্যা, কাজেই দাহ-সংস্কার যথাশাস্ত্র করতে হবে। অন্নাজোইসজী এসব কাজে বেশ পোক্ত। অইয়াশাস্ত্রীজী সঙ্গে সঙ্গে গেলেন বটে কিন্তু বাঁধের নিচে নামলেন না। চিতার আগুন যখন লক্ লক্ করে জ্বলে উঠল, তখনও তিনি ওপরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। শববাহকেরা শ্মশানের কুয়োতে স্নান করে ওপরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। এবার তাদের প্রশ্ন করলেন, 'খুলিটা তাড়াতাড়ি ফেটেছে তো?' তারপর বললেন, 'চিন্নৈয়া, কত করে দক্ষিণা দিয়েছ শব-বাহকদের?'

'আট আনা করে।'

'দেখ, আমারও অবশ্য নিচে পর্যন্ত যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহলে আবার এই সন্ধ্যা-বেলা স্নান করতে হত, বয়স হয়েছে তো, ঠাণ্ডাটা আর সহ্য হয় না। তা যাক, এতখানি পথ এসেছি, আমার দক্ষিণাটাও দিয়ে দাও।'

কথাটা শুনে মাস্টারমশাইয়ের আপাদমস্তক জ্বলে উঠল রাগে। কিন্তু অন্নাজোইসজী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিয়ে দাও, দিয়ে দাও।' চেন্নিগরায় চুপচাপ একটা আট আনি তুলে দিল অইয়াশাস্ত্রীজীর হাতে। বৃদ্ধ পুরোহিত এবার বেশ খুশি মুখে প্রশ্ন করলেন, 'তা শ্রাদ্ধাদি এ গ্রামেই করাবে তো?'

মাস্টারমশাই এবার বলে উঠলেন, 'এঁরা কেন শ্রাদ্ধ করবে? সে তো ওর শ্বশুর বাড়ির লোকেদের কর্তব্য।'

'ও হো, তা বটে, তা বটে, ভুলেই গিয়েছিলাম' বলতে বলতে শববাহকদের সঙ্গে ফিরে চলেন অইয়াশাস্ত্রীজী।

৩

শ্মশানযাত্রীরা চলে যাবার পর নন্‌জম্মার কাছে রয়েছেন মহাদেবায়াজী। মাস্টারের বাড়ির বেশীর ভাগ জিনিস কুঁড়েতে চলে গেছে, যা এখনও বাড়িতে পড়ে আছে সেগুলোর ব্যবস্থা করতে মাস্টারের স্ত্রী বাড়ি গেছেন। ইতিমধ্যে মাস্টারের ছেলে কুরুবরহল্লী থেকে ফিরে এসে খবর দিল, 'কাল সকালেই দু'গাড়ি নারকেলপাতা এসে যাবে, বাইরে মন্দিরের কাছে যেন কেউ অপেক্ষা করে, তাহলে কোথায় কুঁড়ের খুঁটি পুঁততে হবে সেটা গৌড়জীর চাকরদের বলে দিতে পারবে।'

রামন্নার নিঃশ্বাস পড়ছে বড় ক্ষীণভাবে। ওকে কখন ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে, জানতে চাইলেন মহাদেবায়াজী। পার্বতীর মৃত্যুর পরই একবার খাওয়ানো হয়েছিল। এখন আবার ঝিনুকে ওষুধ ঢেলে খাওয়াতে চেষ্টা করল নন্‌জম্মা, কিন্তু ওষুধটা মুখে ঢালাই গেল না। নন্‌জম্মা বলে উঠল, 'ওষুধ তো খেতে চাইছে না, জ্বরটাও বোধহয় কমছে, দেখুন তো অইয়াজী।' প্লেগের রোগীর জ্বর ওটা-নামা করা কিছু অস্বাভাবিক নয়। মহাদেবায়াজী কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, মনে হচ্ছে যেন জ্বরটা একেবারেই ছেড়ে গেছে। এটা রোগ একেবারে সেরে যাবার লক্ষণও হতে পারে। মহাদেবায়াজী বললেন, 'মনে হচ্ছে, দুটি রোগীর মধ্যে একটিকে আহুতিস্বরূপ নিয়েই ঈশ্বর ক্ষান্ত হয়েছেন! রামন্না বোধহয় সেরে উঠবে, জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে।' নন্‌জম্মা এ কথায় এত খুশি হয়ে উঠল যেন পার্বতীও আবার বেঁচে উঠেছে। খুশিতে দিশাহারা হয়ে সে বলে উঠল, 'তা যদি হয় মা-কালীকে আমি নতুন শাড়ী পরিয়ে গ্রামের পথে শোভাযাত্রা বার করব।' কিন্তু মহাদেবায়াজী পরীক্ষা করে দেখছেন, রোগীর দেহের তাপ যেন বড় তাড়াতাড়ি নেমে যাচ্ছে। প্রথম মিনিট পাঁচেক মহাদেবায়াজীও ভাবছিলেন এটা বুঝি সুলক্ষণ। কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হওয়ায় চাদরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দেখলেন, রামন্নার পা-দুটো খুব ঠাণ্ডা। জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটু গরম ছাই আছে?'

'রান্নাঘরে উনুনে আছে।'

মহাদেবায়াজী তাড়াতাড়ি একমুঠো গরম ছাই এনে রামন্নার পায়ে মালিশ শুরু করলেন। পাঁচ মিনিটের চেষ্টার পরও যখন পা গরম হল না, তখন তাঁর আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না। চাদর সরিয়ে কুঁচকি আর বগল দেখলেন, ফুলো তেমনিই আছে, কিন্তু কোনটাই ফাটেনি। আবার চাদর ঢেকে দিয়ে নাড়ী দেখলেন, অতি ক্ষীণ—চলছে কি চলছে না বোঝাই যায় না। একেও এখন গঙ্গাজল পান করানো উচিত, কিন্তু সেকথা ওর মাকে বলার সাহস নেই মহাদেবায়াজীর। কিন্তু শেষ সময়ে একটু জল পাবে না ছেলেটা? প্রাণই

যখন যাচ্ছে, তখন জল পাওয়া না পাওয়াতে কি সত্যিই কিছু আসে যায়? সবই মনের ভ্রম মাত্র! কিন্তু হঠাৎ আবার মনে হল, পরে যদি নন্‌জম্মার আফশোষ হয়, 'আহা মরণের মুহূর্তেও ছেলেটার মুখে একটু জল দিইনি!' তখন? ঝিনুকের ওষুধ ফেলে তাতে গঙ্গাজল ঢেলে নন্‌জম্মার হাতে দিয়ে বলেন, 'এর ওপরই ভরসা রাখো মা।' ছেলের ঠোঁটে মায়ের হাতের ঝিনুক স্পর্শ করিয়ে দেন তিনি। নন্‌জম্মা চমকে ওঠে, 'তবে কি রামন্নাও চলল অইয়াজী?'

'এখন কান্নার সময় নয় মা, যা কর্তব্য তাই কর' বলতে বলতে গঙ্গাজলটুকু ছেলের মুখে ঢেলে দিতে কিছুটা ভিতরে গেল, কিছুটা গড়িয়ে পড়ল বাইরে। এক হাতে নাড়ী চেপে, অন্য হাতটি নাকের তলায় ধরে চুপ করে রোগীর পাশে বসে থাকেন মহাদেবায়াজী। নন্‌জম্মা তার দ্বিতীয় সন্তানটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে আছে পাথরের মূর্তির মত। দু'জনের অনিমেষ দৃষ্টির সামনেই ঠিক কোন সময়ে যে রামন্নার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল, তা কিন্তু কেউই বুঝতে পারলেন না। নাড়ীর গতি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে কখন এক সময় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

এবার তো এই হতভাগিনী মাকে বলতেই হবে। এখনই হাত-পা ঠিকঠাক না করে দিলে পরে দেহ শক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কি করে বলা যায়? ও যে কিছুই বোঝেনি তা তো নয়! কিন্তু পার্বতী মারা যাবার পর যেমন করে কেঁদে উঠেছিল, এখন যে তাও করছে না। ছেলের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েনি, তার হাতখানাও চেপে ধরেনি, শুধু ছেলের মাথাটা কোলে নিয়ে বসে আছে নিস্পন্দভাবে।

পার্বতীর শব দাহ করে এতক্ষণে বোধহয় ফিরে আসছে শ্মশানযাত্রীরা। এখনই তাদের খবর দেওয়া দরকার, আবার কাঠ যোগাড় করা দরকার। এদিকে রাতও হয়ে গেছে। এখন তারা যেতে রাজি হবে, না সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে—তাই বা কে জানে! যাই হোক এখন দেহকে সোজাভাবে শুইয়ে দেওয়া উচিত। এবার মহাদেবায়াজী বললেন, 'মা প্রাণ যখন শিবের পাদপদ্মে স্থান পেয়েছে, তখন এই খাঁচাটার মায়া করে তো লাভ নেই। এবার হাত-পাগুলো ঠিকঠাক করে দিই?'

'যা যা করতে হয় করুন অইয়াজী' শান্তভাবে ছেলের মাথাটি কোল থেকে নামিয়ে সরে বসে সদ্য সন্তানহারা মা। যা করবার করে দেহের ওপর চাদর টেনে দেন অইয়াজী। এরই মধ্যে বাইরে মাস্টার ও চেন্নিগরায়ের গলা শোনা যায়। উনি বাইরে এসে বলেন, 'রামন্নাও চলে গেল মাস্টারজী!'

'হায় ভগবান!'

'ভগবানের কাছেই গেছে, আমাদের তো কিছু করার নেই। যাক, আবার পুরোহিতদের খবর দিন।'

মাস্টার আবার ছুটলেন জোইসজীর বাড়ির দিকে। ততক্ষণে তারা গ্রামের বাড়ি খালি করে কুঁড়ে ঘরে চলে গেছে। চেন্নিগরায় ভেবে পেল না, কি করবে। রামন্নার মৃতদেহের পাশে বসে কাঁদতে শুরু করল সে।

অন্নাজোইসজী এসে পৌঁছলেন মাস্টারের সঙ্গে। মহাদেবায়াজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি মত? রাত্রে কি দাহ করা সম্ভব হবে, না সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে?'

'রাত্রে তো আর সম্ভব নয়।'

মাস্টারমশাই এবার বললেন, 'কেন, সে বারে যে মড়ক লেগেছিল---সেই অগ্নি-জ্বর? তখন তো দিনে-রাতে কোন ভেদ ছিল না। মড়া পড়লে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পোড়াতে হত। এমনকি সবাইকার কাঠের যোগাড় না হলে অনেক সময় একই চিতায় তিন-চারটি শব এক সঙ্গে দাহ করা হয়েছে। মহামারীর সময় অত শাস্ত্রবিচার করতে গেলে চলে না, রাত্রেই দাহ করতে হবে।'

জোইসজী রাজি হয়ে গেলেন। আগের শববাহকদের আবার ডাকতে গেলেন তিনি। মহাদেবায়াজী গেলেন কাঠের যোগাড়ে। শব বহনের জন্য বাঁশ কেটে বাঁধতে শুরু করলেন মাস্টার। শুধু চেন্নিগরায় চুপ করে বসেই রইল।

রামন্নারও উপনয়ন হয়ে গেছে, সুতরাং তারও দাহক্রিয়া শাস্ত্রানুসারেই করতে হবে। শববাহকরা পৌঁছে গেছে। একটু পরে মহাদেবায়াজী এসে জানালেন, 'সুরেগৌড়ের বাড়িতে অনেক শুকনো নারকেলের ডাঁটা আছে, সে বলেছে যত খুশি নিয়ে যান, এখনতো বাড়ি ছেড়েই যেতে হচ্ছে। সে আর তার ছেলে নিজেদের গাড়িতে ভরে সোজা শ্মশানেই পৌঁছে দেবে কাঠগুলো।'

সব আয়োজন সম্পূর্ণ। শব তুলে বাইরে এনে বাঁশের মাচার সঙ্গে বাঁধা হল। মুখে দেওয়া হল কয়েক দানা তণ্ডুল। হঠাৎ মহাদেবায়াজী লক্ষ্য করলেন, নন্‌জম্মাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তিনি বলে উঠলেন, 'নন্‌জম্মা কোথায় গেল?' কেউ জানে না। এই হৈচৈ-তে কেউ নজর রাখেনি তার দিকে।

জোইসজী সতর্কতামূলক স্বরে বললেন, 'আগে পুকুর আর কুয়োর দিকে খুঁজে দেখ।'

মাস্টার বললেন, 'কোন দরকারে গেছে হয়ত।'

কিন্তু মহাদেবায়াজীর অন্য একটা কথা মনে পড়ল। তিনি বললেন, 'তোমরা এদিকটা দেখ, আমি বাঁধের ওপরের মন্দিরে দেখছি। ছোট ছেলেটা আছে সেখানে, নিশ্চয় ওখানেই গেছে।' বড় বড় পা ফেলে মন্দিরে এসে পৌঁছে দেখেন, তাঁর আন্দাজই ঠিক। বিশ্ব কম্বলের বিছানায় শুয়ে, তার মাথাটি রয়েছে নরসীর কোলে। আর নন্‌জম্মা প্রায় গজ তিনেক দূরে মন্দিরের থামে ঠেস দিয়ে বসে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে তার শেষ সন্তানটির দিকে। চোখে কিন্তু এক বিন্দু অশ্রু নেই, সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসাড় দৃষ্টি।

নরসী বলল, 'এই অন্ধকারে নন্‌জম্মা একলা চলে এসেছে। আমি ছেলেকে মণ্ড খাওয়াচ্ছি, এমন সময় এসে প্রথমে ছেলেকে কোলে নিল, তারপর আবার কি ভেবে বলল, "নরসী এ ছেলে আমার নয়। আমার বললেই ঠাকুর একেও কেড়ে নেবে। একে তুই নিয়ে নে, তোকে দিলাম। তোর সন্তান নেই, তুই মানুষ কর। তুই কোলে নিয়ে বস, সেবা কর। আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই ওর সঙ্গে।" আমি যত বলছি, "না না, ও আমার ছেলে কেন হতে যাবে?" কিছুতেই শুনবে না। জোর করে আমার কোলে শুইয়ে দিয়ে নিজে দূরে বসে আছে।'

'যা বলছে তাই কর নরসী। রামন্নাও মারা গেছে। আমরা শ্মশানে যাচ্ছি। তুমি দু'জনের দিকেই নজর রাখ। আরো কাউকে পাঠিয়ে দেব কি?'

'কোন দরকার নেই, আমি তো আছি। কোন চিন্তা করবেন না।'

বিশ্বর কপালে হাত দিয়ে মহাদেবায়াজী জ্বর দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথাও ব্যথা করছে বলেছে কি একবারও?'

'একটু আগেই আমি বগলে, কুঁচকিতে টিপে দেখেছি, ওর কোথাও ব্যথা নেই। তবে জ্বর বেশ আছে।'

'যাই হোক দু-তিন ঘন্টা পর পর ওষুধটা খাইয়ে যাও।' মহাদেবায়াজী এবার ননজম্মাকে বলেন, 'ভয় পেয়ো না, এর কোথাও ফোলেনি, তার মানে ওষুধে কাজ হচ্ছে।' সান্ত্বনা দিয়ে তিনি ফিরে গেলেন শ্মশানযাত্রীদের কাছে।

গ্রামের মেয়ে-বৌরা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যায় ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে। মাস্টার একবার সেদিকে গিয়ে দূর থেকেই ননজম্মার নাম ধরে দু-চারবার ডাকাডাকি করে ফিরে এসেছেন। বাকি সবাই বসে বসে এই পরিবারের দুর্ভাগ্যের কথাই আলোচনা করছে, ইতিমধ্যে মহাদেবায়াজী এসে জানালেন, 'ননজম্মা মন্দিরে আছে। আপনারা যাত্রা শুরু করুন।' চারজনে তুলে নিল শবদেহ, চেন্নিগরায় গেল তাদের সঙ্গে। মহাদেবায়াজী এবার বাকি ওষুধের বোতলগুলো, সামান্য কিছু বিছানা ইত্যাদি নিয়ে এ বাড়িতে তালা দিয়ে ফিরে চললেন তাঁর মন্দিরে। বাঁধের ওপর থেকে দেখা গেল, আগেকার চিতার আগুন এখনও ভাল করে নেভেনি। বাঁধ থেকে নিচে নামার পথটার পাশে ন্যুব্জদেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ পুরোহিত।

মহাদেবায়াজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার পুরোহিতমশাই, এই অন্ধকারে এখানে একলা দাঁড়িয়ে আছেন যে?'

'ঐ যে ওরা দাহ করতে গেছে, ওদের অপেক্ষায় রয়েছি।'

ইনি কেন ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন, তা বুঝতে পারলেন না মহাদেবায়াজী। কিন্তু আর প্রশ্ন করতেও রুচি হল না। হাতের জিনিসপত্র নিয়ে তিনি জোর কদমে এগিয়ে গেলেন নিজের মন্দিরের দিকে।

৪

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ কুরুবরহল্লী থেকে দু'গাড়ি বোঝাই নারকেলপাতা নিয়ে এসে পৌঁছল দু'জন লোক। গ্রামের ভিতরে অবশ্য ঢুকল না তারা। রামসন্দ্র গ্রামের কারিন্দা পাটোয়ারীর বাড়ির উঠোনে জমা করে রাখা বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি গাড়িতে করে নিয়ে এল, তারপর দেবীমন্দিরের পেছনে ঝোপ-ঝাড়গুলোর পাশে মাঠের মধ্যে দেখতে দেখতে একখানা কুঁড়েঘর খাড়া করে ফেলল সবাই মিলে। মাস্টারমশাই বাঁধের ওপরের মন্দিরে গিয়ে পাটোয়ারীর বাড়ির চাবি চেয়ে নিয়ে এলেন এবং তিনিই সে বাড়ির জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে কুঁড়েতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সেদিন সন্ধ্যার মধ্যেই খালি হয়ে গেল রামসন্দ্র গ্রাম।

বিশ্বর জ্বর এখনও প্রবল, কিন্তু শরীরের কোন গ্রন্থি ফোলেনি। পার্বতী আর রামন্নার

জ্বর আসার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই গাঁট ফুলে উঠেছিল। বিশ্বর জ্বর হয়েছে দু'দিন আগে। হয়ত ঐ হেমাদি সিরাপ কাজ করেছে, জ্বর হবার অল্পক্ষণ পর থেকেই ওষুধ পড়েছে তো! মনে হচ্ছে আর বোধহয় ভয়ের কারণ নেই। তবে জোর করে কিছুই বলা যায় না। মহামারী যে বাড়িতে একবার প্রবেশ করেছে, সেখানে সে কি মোটে দুটি প্রাণ আহুতি নিয়েই সন্তুষ্ট হবে? অবশ্য মহাদেবায়াজী ভরসা দিয়ে বলেছেন, 'বিশ্ব রয়েছে দেবতার মন্দিরে, সেখানে মহামারী প্রবেশ করতে পারবে না, সেই জন্যই হয়ত বিশ্বর গাঁট ফোলেনি। ভয়ের কোন কারণ নেই।'

নন্‌জম্মা কোন কথা বলেনি। পাথরের প্রতিমার মত স্থির হয়ে দূরে বসে একদৃষ্টে বিশ্বর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। একবারও বোধহয় চোখের পলক পড়েনি তার। আজ সকাল থেকে মহাদেবায়াজীর শরীর ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়ছে। গত দু'দিন ধরে কিছুই প্রায় খাওয়া হয়নি। সেই পরশু রাত্রে গরুর গাড়িতে কিছুক্ষণমাত্র চোখ বুজে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, তারপর থেকে আর দু'চোখের পাতা এক হয়নি। ওঁর সঠিক বয়স কত কেউ জানে না, তবে পঁচাত্তর পার হয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দু'দিন ধরে ক্রমাগত ছুটে বেড়িয়েছেন। একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে বিশ্রাম করতে করতে নিজের অজান্তেই কখন মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন মহাদেবায়াজী। নরসী হঠাৎ নন্‌জম্মাকে বলল, 'দেখ ভাই, ভগবান আমার কোলে সন্তান দেননি, তাই মনে বড় কষ্ট হত। এখন দেখছি সন্তান থাকলেও কত দুঃখ পেতে হয়।'

একথারও কোন উত্তর দিল না নন্‌জম্মা। ইতিমধ্যে মাস্টারমশাই এসে মহাদেবায়াজীর কাছ থেকে নন্‌জম্মাদের বাড়ির চাবি নিয়ে গেলেন। নন্‌জম্মা বহুক্ষণ ধরে সেই একই-ভাবে বসে আছে। নরসী ভেবে পাচ্ছে না, ওকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে। সে শুধু সময়-মত বিশ্বকে ওষুধ ও পথ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বর মাথাটি এখনও রয়েছে নরসীর কোলে। মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী এলেন একটু পরে, নন্‌জম্মাকে দেখে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন, কিন্তু নন্‌জম্মার চোখে একফোঁটা জলও এল না।

'চল, আমার কুঁড়েতে গিয়ে কাপড়-চোপড় বদলে একটু কিছু মুখে দেবে। কাল থেকে কিছু খাওনি যে।' কিন্তু নন্‌জম্মা শুধু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী এবার নিজেই গিয়ে তাঁর কুঁড়ে থেকে একটা বাটিতে করে একটু উপ্‌মা নিয়ে এলেন। কিন্তু উঠে মুখ-হাত ধোবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না নন্‌জম্মার। নরসী জিজ্ঞাসা করল, 'চিন্নয়াজী কোথায়?'

'কাল রাতে শ্মশান থেকে ফিরে আমাদের কুঁড়ের সামনেই একটা চট বিছিয়ে ঘুমিয়ে-ছিলেন। তাঁকেও খাইয়ে এসেছি।'

'তিনি জানেন কি, যে ছেলে এখানে আছে?'

'হ্যাঁ জানেন। আমার কর্তা বলেছেন ওঁকে। হয়ত এখনি আসবেন এখানে।'

'কিছু মনে করবেন না দিদি, আমার কথা শুনতে হয়ত খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু না বলেও পারছি না,—আমার মত রাঁড় মেয়েমানুষের যদি ছেলে-পিলের অসুখ করত কেউ দেখতে আসত না আমি জানি। কারণ তাদের তো বাপেরই ঠিক থাকত না! কিন্তু এই

চিন্নয়াজী নিজের অসুস্থ ছেলেটার কাছে না এসে এখন কোন মুখে বসে বসে উপ্‌মা খেলেন বলুন তো?'

নন্‌জম্মা শুধু হাতের ইশারায় নরসীকে চুপ করতে বলল। মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী এবার নন্‌জম্মাকে বললেন, 'দেখ বোন, এই সব "মারম্মা", "সুঙ্কলম্মা" যাঁদের সবাই গ্রামদেবী বলে ভয়ে ভয়ে পুজো দেয়, এঁরা কারো মঙ্গল করতে পারেন না, কিন্তু অমঙ্গল ঘটাবার শক্তি এঁদের বেশ আছে। বিশ্বর জন্য তুমি শৃঙ্গেরীর শারদামায়ের কাছে পুজো মানত করো। বিশ্ব সেরে উঠলে ওখানে গিয়ে মায়ের পায়ে কুঙ্কুম দিয়ে পুজো দিয়ে আসবে। এখন তোমার অশৌচ চলছে, তুমি কিছু কোর না। আমি বাড়ি গিয়ে শুদ্ধবস্ত্র পরে মানতের পয়সা আলাদা করে বেঁধে তোমার নাম করে তুলে রেখে দিচ্ছি আজই।'

কিন্তু নন্‌জম্মা এবারও মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল।

'কেন, এতে আপত্তি করছ কেন তুমি?'

'ভগবান মিথ্যে, ঠাকুর কিছুই করবে না। ওর যদি আয়ু থাকে তো বাঁচবে, নয়ত যাবে।'

নরসী সভয়ে বলে উঠল, 'নন্‌জম্মা, রাগের মাথায় ও কি বলছ? এখনি ক্ষমা চেয়ে মানত কর, দোষ-ঘাটের জন্য মাফ চাও দেবতার কাছে।'

'দোষ-ঘাট কিছুই করিনি, কারো কাছে কোন মানত করব না আমি', স্পষ্ট ঘোষণা করে নন্‌জম্মা। কিন্তু ওরা দু'জনেই খুব বেশীরকম পীড়াপীড়ি শুরু করায় শেষ পর্যন্ত বলে ওঠে, 'তোমাদের যা খুশি কর গিয়ে।' মাস্টারের স্ত্রী ফিরে যাবার পর গ্রামের আরো অনেকেই আসে নন্‌জম্মাকে সান্ত্বনা দিতে। সবাই পার্বতীর রূপ গুণ, রামন্নার বুদ্ধি ইত্যাদির কথা বলতে থাকে। রামন্নার মত বুদ্ধিমান ছেলে বেঁচে থাকলে নিশ্চয় একদিন এলাকাদার হতে পারত। অত গুণবান ছেলে, তাই হয়ত ভগবান তাকে নিজের কাছে টেনে নিলেন! পার্বতীর অমন কাঁচা শরীর, নতুন শাড়ী পরিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে মন্দিরে নিয়ে যেতেই সর্বনাশী মায়ের নজর পড়ে গেল মেয়েটার ওপর! এইরকম সব নানা ধরনের মন্তব্য উচ্চারিত হচ্ছিল মুখে মুখে। গ্রামে নাকি আরো আটজনের প্লেগ হয়েছিল, তারমধ্যে চারজন গত রাত্রে ও দু'জন আজ সকালে মারা গেছে। নরসী আর নন্‌জম্মা গ্রামের বাইরে রয়েছে বলে এতক্ষণ এসব খবর শোনেনি। যারা সান্ত্বনা দিতে এসেছিল, সবাই চলে গেল একে একে। শুধু সর্বক্কা থেকে গেল নন্‌জম্মার কাছে।

সর্বক্কা আর নন্‌জম্মা যেন পরস্পরের সুখ-দুঃখের সাথী। সর্বক্কাও হারিয়েছে তার ডাগর বয়সের মেয়েকে। মেয়ের কথা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ে নরসীর কথা। সেই নরসী তো এখন সামনেই বসে রয়েছে নন্‌জম্মার ছেলেকে কোলে নিয়ে। আর নন্‌জম্মা নিতান্ত পরের মত দূরে বসে আছে এক কোণে। নরসীর কথা ভাবলেই সর্বক্কার সর্ব শরীর জ্বলে ওঠে, মনে হয় ওকে ঝাঁটাপেটা করতে পারলে বোধহয় তার গায়ের জ্বালা মেটে। কিন্তু ওকে দেখেও সে কিছু না বলে এখন চুপচাপ রইল। নন্‌জম্মাকে একা ফেলে যেতেও মন চাইছে না সর্বক্কার, কিন্তু সান্ত্বনা দেবারও কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে।

বিশ্ব হঠাৎ বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল, জ্বর কি আরো বাড়ছে নাকি? নরসী বলে উঠল, 'নন্‌জম্মা দেখ, ছেলের গায়ের তাপে আমার পায়ে যেন ছ্যাঁকা লাগছে। এত জোরে শ্বাস ফেলছে কেন? আমার ভয় করছে বাপু, তুমি এসে দেখ।'

নন্‌জম্মা বলল, 'আমি ওকে ছোঁব না, তুমি দেখ সর্বক্কা।'

সর্বক্কা কাছে গিয়ে চাদরের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বিশ্বর জ্বর পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে ছেলের বেশ ঘাম হচ্ছে। হাত ঘামে ভিজে গেল। এটা ভাল লক্ষণ কিনা বুঝল না সে। অন্য সময় হলে নন্‌জম্মা হয়ত বুঝত, কিন্তু এখন তার মাথা কাজ করছে না। নরসী ডাকল মহাদেবায়াজীকে। কিন্তু তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সর্বক্কা এবার কাছে গিয়ে ঠেলে তুলল তাঁকে। ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ মুছতে মুছতে একটু পরে উনি বুঝলেন সর্বক্কা কি বলছে। বাচ্চার বুকে হাত রেখে বললেন, 'ঘাম হচ্ছে, জ্বর ছাড়বার আগে এই রকমই হয়। কোন গাঁট ফোলেনি, বিশ্ব বেঁচে গেল নন্‌জম্মা, আর ভয় নেই।'

নন্‌জম্মা এখনও বোবার মত চেয়ে আছে ছেলের মুখের দিকে। সর্বক্কা বলে ওঠে, 'যাক, ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন তাহলে।' বেশ ঘাম হচ্ছে, দেখতে দেখতে জ্বর নেমে গেল বিশ্বর। এই সময় রেবন্নাশেট্টী এল। নন্‌জম্মার সঙ্গে কোনদিনও সে সোজাসুজি কথাবার্তা বলেনি। সেও বাচ্চার শরীর ছুঁয়ে জ্বর দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, 'যাক, ফাঁড়া কেটেছে।' নন্‌জম্মাকে সে এবার বলল, 'নন্‌জম্মাজী, সারা গ্রামের লোককে বোঝাবার ক্ষমতা রাখেন আপনি, আপনাকে আর কি বলে বোঝাব আমরা।' রেবন্না এবার নিজের স্ত্রীকে বলে, 'দু'দিন এঁদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি, চল, বাড়ি গিয়ে এদের জন্য মড়ুয়ার লোন্দা তৈরী করে নিয়ে এস।' মহাদেবায়াজী বিশ্বকে উঠিয়ে তার মুখ ধুইয়ে দিলেন। নন্‌জম্মাকে বললেন, 'বিশ্বর সেবা করতে হবে এখন, তুমি কিছু না খেলে শরীরে শক্তি পাবে কি করে?' উপ্‌মার বাটি তখনও তেমনি পড়ে আছে, নন্‌জম্মা কিছুই খাবে না। শেষ পর্যন্ত নরসী ও মহাদেবায়াজী জোর করায় একটুখানি মুখে তুলেই সে তৎক্ষণাৎ মুখ থেকে ফেলে দেয়, গলা দিয়ে কিছু নামছে না তার। বাটিটা ঠেলে সরিয়ে দেয় সে। অবশেষে মহাদেবায়াজী নিজের জিনিসপত্র হাঁটকে একটা কৌটো বের করলেন, তার থেকে সামান্য কালো রঙের কি চূর্ণ বার করে নন্‌জম্মার হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা খেয়ে নাও।'

'এটা কি অইয়াজী?'

'ভগবানের প্রসাদ, কাশী থেকে এনেছি। এই একটুখানি অবশিষ্ট ছিল। খেয়ে ফেল, দেখবে সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। ছেলে তো সেরেই উঠছে এবার, ওটুকু জ্বর দেখতে দেখতে ছেড়ে যাবে।'

নন্‌জম্মা আর তর্ক না করে গিলে ফেলল সেই চূর্ণটা—কেমন যেন তেতো আর মিষ্টি মিশ্রিত স্বাদ। তারপর আবার সেই থামের গায়ে ঠেস দিয়ে ছেলের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। চেন্নিগরায় এসে পৌঁছল এই সময়।

নরসী জিজ্ঞাসা করে বসল, 'এতক্ষণ কি করছিলেন পাটোয়ারীজী?'

'এখানে আসবার জন্যই তো বেরিয়েছিলাম, কিন্তু এত লোক সান্ত্বনা দিতে এসে গেল যে, আবার বসে পড়তে হল।'

'চমৎকার! ধন্যি বাপ বটে আপনি', বলে ওঠে নরসী। চেন্নিগরায় চোখ পাকিয়ে তাকায় তার দিকে। মহাদেবায়াজী বলে ওঠেন, 'নরসী, তুমি কোন কথা বোল না।'

মিনিট দশেক পরেই নন্‌জম্মা ঢুলতে শুরু করল। এতক্ষণ থামের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছিল, এবার সেখানেই শুয়ে পড়ল সে। গত রাত্রে আনা বিছানাটা পেতে তাড়াতাড়ি তাকে ভাল করে শুইয়ে দেওয়া হল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রা নেমে এল তার দু'চোখে।

নরসী প্রশ্ন করল, 'অইয়াজী, নন্‌জম্মাকে কি খেতে দিলেন আপনি?'

'ঘুমের ওষুধ। কাশীতে লোকে ওটা ব্যবহার করে। ওখান থেকে আসার সময় কিছুটা এনেছিলাম।' শুনেই চেন্নিগরায় বলে উঠল, 'আমাকেও একটু দিন।' কিন্তু মহাদেবায়াজী জানালেন, 'ছেলেদের ওতে কোন কাজ হয় না।' নন্‌জম্মার ঘুম কালকের আগে ভাঙবে না। চেন্নিগরায়কে মহাদেবায়াজী মন্দিরেই থাকতে বললেন। মাস্টারের স্ত্রী তার খাবার এখানেই দিয়ে যাবে। এবার নরসীকে তিনি নির্দেশ দিলেন, 'নরসী, আর কোন ভয় নেই। ছেলেকে এবার কোল থেকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও। তুমি এবার বাড়ি গিয়ে কিছু মুখে দাও। সারারাত জেগে আছ, কিছু খেয়ে তারপর ঘুমিয়ে নাও কিছুক্ষণ।'

'অইয়াজী, ছেলের প্রাণ রক্ষা হয়েছে, আর কিছুই চাই না। আমি আরো দু'-তিন দিন এমনি বসে থাকতে পারব।'

'এখন বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে ঘুমোও।'

মহাদেবায়াজী একটা ছোট কম্বল বালিশের মত করে মুড়ে দিলেন। বিশ্বর মাথা সেটার ওপর সাবধানে নামিয়ে দিয়ে নরসী উঠে এবার বাড়ি চলে গেল। নন্‌জম্মা তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। দুপুরবেলা কুরুবরহল্লী থেকে গুণ্ডেগৌড়ের সঙ্গে আরো দশ-বারোজন দেখা করতে এলেন। মহাদেবায়াজী তাদের ইশারায় জানালেন কোন আওয়াজ না করতে, তারপর চেন্নিগরায়কে বাইরে ডেকে দিলেন। ওঁরা সবাই চেন্নিগরায়কেই যথাসাধ্য সান্ত্বনাবাণী শোনাতে লাগলেন। জল-ভরা চোখে চেন্নিগরায় বলল, 'আমরা তো প্রাণপণ চেষ্টা করলাম, কিন্তু হতভাগাদের বাঁচানো গেল না কিছুতেই।'

মাস্টারমশাই এই শোক-সংবাদ জানিয়ে সূর্যনারায়ণকে চিঠি লিখে দিলেন একখানা। কুশল সমাচারের জায়গায় একটা কালো কালির ছাপ দেওয়া রইল চিঠিতে।

৫

ছেলে-মেয়ের মৃত্যুর পর কেটে গেছে ছ'টি দিন। নন্‌জম্মা নিজেদের কুঁড়েতে এসেছে। এখানে রয়েছে কেবল সে আর চেন্নিগরায়। বিশ্ব এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু মহাদেবায়াজী বলেছেন, অশৌচের বাড়িতে এখন তাকে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই, এই দশ দিন সে মন্দিরেই থাকুক। নন্‌জম্মাও আপত্তি করেনি, ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে তার ভয় করছে এখনও। সকালে, দুপুরে বার বার মন্দিরে গিয়ে সে দেখে আসে ছেলেকে। অশৌচের অবস্থা চলছে, তাই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে না। অবশ্য অশৌচ তো বিশ্বরও, কিন্তু

সে ছোট ছেলে, তার সম্বন্ধে অত কড়াকড়ি নেই। বিশ্ব এখন বেশ হাঁটা-চলা করতে পারে, কিন্তু মহাদেবায়াজী তাকে ঘোরাঘুরি করতে দেন না। মন্দিরের দরজার কাছ থেকেই ছেলেকে দেখে ফিরে আসে নন্‌জম্মা, মহাদেবায়াজীর সঙ্গেও বিশেষ কথাবার্তা বলে না। পার্বতী আর রামন্নার জন্য আনা হেমাদি সিরাপ মহাদেবায়াজী এখনও নিয়মিতভাবে খাইয়ে চলেছেন বিশ্বকে।

মায়ের চোখের সামনে সন্তান কেন মারা যায়? এ প্রশ্নটা কেবলই কষ্ট দিচ্ছে নন্‌জম্মাকে; সমস্ত বিচার-বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করেও কোন উত্তর খুঁজে পায় না সে। অবশেষে একদিন মহাদেবায়াজীকেই জিজ্ঞাসা করে। তিনি বলেন, 'দেখ মা, এসবই ঈশ্বরের মায়া। শ্রীকৃষ্ণ যখন বালক তখন নাকি তিনি নানাভাবে মা যশোদাকে পরীক্ষা করতেন। তিনি দুধ পান না করলে মাও উপবাসী থাকতেন।' একদিন কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা মা, যদি আমি মরে যাই তখন তুমি কি করবে?'

'ওরে বাছা, তোকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? আমিও তাহলে তোর সঙ্গে মরব।'

'সত্যি বলছ?'

'তোর নামে শপথ করে বলছি বাছা।'

এরপর একদিন শ্রীকৃষ্ণ পা পিছলে নদীতে পড়ে গেলেন। একটু পরেই ভেসে উঠে চিৎকার করলেন, 'মা, আমি ডুবে যাচ্ছি, আমাকে বাঁচাও, আমাকে তুলে নাও, তুমিও জলে ঝাঁপিয়ে পড়, আমি মরছি।'

মা কূলে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগল, 'ওগো কে আছ, বাঁচাও আমার ছেলেকে।' কিন্তু কেউ শুনতে পেল না সে ডাক। তখন মা নিজের শাড়ী খুলে, তার এক প্রান্ত জলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল, কিন্তু ছেলে শাড়ী ধরতে পারল না---মা, মা করে ডাকতে ডাকতে শেষ পর্যন্ত ডুবেই গেল। মা শাড়ীটা আবার পরে নিয়ে নদীকূলে বসে বসে অনেকক্ষণ কাঁদল, তারপর ডুবে মরবার সঙ্কল্প নিয়ে উঠে দাঁড়াল; কিন্তু কে জানে কেন, বড় ভয় হল মনে। শেষ পর্যন্ত পারল না ঝাঁপ দিতে। ছেলেকে গ্রাস করেছে বলে রাক্ষুসী নদীকে অনেক গাল দিল, তীরে বসে রইল, কিন্তু জলে ডুবতে পারল না। একদিন যায়, দু'দিন যায়, রোজই মা যশোদা নদীর তীরে এসে বসে বসে কাঁদে কিন্তু নদীতে আর ঝাঁপ দেয় না। অবশেষে তৃতীয় দিনে শ্রীকৃষ্ণ জল থেকে উঠে এসে বললেন, 'এই তোমার সন্তানের প্রতি স্নেহ? আমার মৃত্যু দেখেও তুমি মরতে পারলে না? আমি অভিশাপ দিচ্ছি, আজ থেকে মায়ের সামনে সন্তানের মৃত্যু হবে।' লোকে বলে, সেই থেকেই নাকি মানুষকে এ দুঃখ পেতে হচ্ছে।

গল্পটা শুনে মা যশোদার ওপর বড় রাগ হল নন্‌জম্মার। তিনি যদি মনে জোর করে সেদিন নদীতে ঝাঁপ দিতে পারতেন, তাহলে তো আর সংসারে কোন মাকে এ দুঃখ পেতে হত না। যশোদা ছিলেন পৃথিবীর মানুষ আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই তো ভগবানের এইসব লীলা। যশোদা যদি দেবতা হতেন, তাহলে নিশ্চয় মরতে পারতেন! কিন্তু দেবতারা যে অমর—তাহলে তো ছেলেরও মৃত্যু হত না—পুরো ঘটনাটাই ঘটত না।

কুঁড়েতে ফিরে এসেও এই কাহিনীই ঘুরতে লাগল নন্‌জম্মার মনের মধ্যে। নিজের মনেই প্রশ্ন জাগল, এ কি কখনো সত্যি হয়? এ নিশ্চয় গল্প! কিন্তু পার্বতী আর রামন্নার মৃত্যু দেখেও আমি তো মরিনি? কেন মরতে পারলাম না? ভাবতে ভাবতে ওর মনে হতে লাগল, ওর এখন মরে যাওয়াই উচিত। রাত আটটা বেজেছে। কুঁড়ের সামনে একটা বড় পাথরে বসে তামাক চিবোচ্ছে চেন্নিগরায়। কুঁড়ের মধ্যে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল নন্‌জম্মা, কিন্তু ঘুম এল না চোখে। কেবলই মনে হতে লাগল, 'মরতে হবে, আজই মরতে হবে, পার্বতী আর রামন্নাকে অনুসরণ করাই আমার একমাত্র কর্তব্য।' এরকম একটা অদ্ভুত আশাও দেখা দিল মনে যে, 'যদি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মরতে পারি, তাহলে হয়ত ঈশ্বর দুই ছেলে-মেয়েসহ তিনজনকেই বাঁচিয়ে দেবেন আবার।' যক্ষগানের নাটকে, পুরাণের গল্প-কথায় এমন কত কাহিনীই তো জানা আছে, তবে তার ভাগ্যেই বা অমন হবে না কেন? কিন্তু একই দিনে দু'টি সন্তান হারিয়ে দেবতার ওপর বিশ্বাসও টলে গেছে তার। কৃষ্ণর জন্য প্রাণ দিতে মা যশোদা ইতস্ততঃ করেছিলেন, কিন্তু তার মনে তো কোন দ্বিধা নেই। এই ছ'দিন দুই ছেলে-মেয়ের অভাবে যে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করছে তা অসহনীয়। মরতে পারলেই তো এ নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি! সুতরাং মৃত্যুই কাম্য এখন।

চেন্নিগরায় ভিতরে এসে শুয়ে পড়েছে, আর নাক ডাকছে জোরে জোরে। রাত এখন প্রায় এগারটা। নন্‌জম্মা উঠে কুঁড়ের দরজা খুলে বাইরে এল। কোথায় যাবে? কিভাবে মরতে হবে? কিছুই ভাবতে পারছে না সে। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে সে সোজা চলে এল শ্মশানে, যেখানে ক'দিন আগে তার দুই সন্তানের দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পার্বতী ও রামন্নাকে দাহ করার সময় নন্‌জম্মা এখানে আসেনি, মেয়েদের নাকি শ্মশানে যেতে নেই। আজ কিন্তু দ্বিধাহীন চিত্তে সে চলে এসেছে, মনে এতটুকু ভয় নেই, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিছুই নেই। ভূত-প্রেতের কথা মনেও হচ্ছে না। দু'টি চিতা যেখানে জ্বালানো হয়েছিল, সে জায়গাটা অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার সন্তানদের পর আর কোন ব্রাহ্মণদের মৃত্যু হয়নি গ্রামে। সুতরাং ও দু'টি তারই ছেলে-মেয়ের চিতা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর মধ্যে কোনটি পার্বতীর আর কোনটি রামন্নার? কিন্তু কি-ই বা হবে সে কথা জেনে? তৃতীয় দিনে দু'টি চিতাস্থলেই ভস্মসংস্কার অনুষ্ঠান করা হয়ে গেছে। তবু মা গিয়ে দু'টি চিতা থেকে দু'মুঠো ছাই তুলে বেঁধে নিল নিজের আঁচলে। পাশেই একটি পুকুর। শবদাহের পর লোকে এখানেই স্নান করে ফিরে যায়। অন্য কোন কাজে এ জল ব্যবহার করা হয় না, তাই জলটা বেশ অপরিষ্কার। এই পুকুরেই ঝাঁপ দিতে হবে, ওপরের ওই উঁচু পাথরটা থেকে লাফ দিলেই হবে! দু'চোখ বন্ধ করে ফেলল নন্‌জম্মা, ঝাপসা অন্ধকারের বদলে এখন দু'চোখের ওপর নেমে এল যেন গভীর কালো একটা পর্দা। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে, শিরায় শিরায় রক্তস্রোত তীব্র হয়ে উঠছে। নিস্তব্ধ অন্ধকারে শুধু শোনা যাচ্ছে কূলে এসে আছড়ে পড়া জলের মৃদু শব্দ। একটু পরে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল ওর শরীর, কাঁপুনি বন্ধ হল। বিচার-বুদ্ধি, বোধশক্তি কিছুই যেন নেই, মনের ভিতরটা একেবারে শূন্য। এই কি মৃত্যু? সেখানে কি

কেউ আছে? পার্বতী, রামন্না যেখানে গেছে, শেষ পর্যন্ত আমিও কি যাচ্ছি?---না, আর কোন চিন্তা নয়! আর এক পা অগ্রসর হলেই নিচে জল, মাঝে কোন বাধা নেই, কত সহজ!

সেই একটা পা বাড়াতে গিয়েই হঠাৎ মনে হল যারা এখনও বেঁচে আছে তাদের কথা। দু'জন আছে এখনও---স্বামী, তার জন্য কিছুই যায় আসে না, কিন্তু বিশ্ব? বিশ্বকে মনে পড়তেই চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। প্লেগ তাকে নিতে পারেনি, সে তো বেঁচে আছে। কে দেখবে তাকে? মহাদেবায়াজী তো আছেন! ছেলে-মেয়ের শোকে আত্মহত্যা করেছি জানলে মহাদেবায়াজী নিশ্চয় বিশ্বর ভার নেবেন। কিন্তু আমি না থাকলে ছেলেটা অনাথ হয়ে যাবে। মায়ের জায়গা কেউ কি পূর্ণ করতে পারে? পার্বতী আর রামন্নার সঙ্গে আমারও অসুখ করল না কেন? হয়ত বিশ্বর জন্যই ঠাকুর আমায় বাঁচিয়ে রাখলেন। আমাকেই এখন বিশ্বকে মানুষ করে তুলতে হবে, তাই বোধহয় বিশ্ব বেঁচে গেল। বিশ্বর মুখখানা মনে পড়ছে, পার্বতীর রূপ আর রামন্নার বুদ্ধি দুই-ই একসঙ্গে আছে বিশ্বর মধ্যে। ওদের দু'জনকে নিয়ে একে রেহাই দিয়েছে প্লেগ। এখন আমি মরলে ওর কি গতি হবে?

ভাবতে ভাবতে সেই পাথরখানার ওপরেই ধপ্ করে বসে পড়ল নন্‌জম্মা। নিজের বিয়ের কথা, প্রথম শ্বশুরবাড়ি আসা, ছেলে-মেয়ের জন্ম সব একে একে মনে পড়ছে। কতদিনের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি---সেই প্রচণ্ড খরা, অভাব, দুর্ভিক্ষ---কত কষ্ট সহ্য করেছিল পার্বতী আর রামন্না! অত ভাল ছিল বলেই বোধহয় ঠাকুর ওদের নিজের কাছে টেনে নিলেন। বিশ্বতো খিদে পেলেই উৎপাত শুরু করে, ওর স্বভাবই ঐ রকম। বুদ্ধি আর মেজাজ দুই ব্যাপারেই সারা গ্রামে তার জুড়ি নেই। কিন্তু বাপের মত হীন আর স্বার্থপর নয় সে। কোথাও ফল-মূল কিছু পেলে মা-ভাই-বোন সবাইকে না দিয়ে খায় না কখনো। ওকে এভাবে অনাথ করে আমার কি স্বর্গলাভ হবে? পরলোকে গিয়ে পার্বতী আর রামন্নার সঙ্গে দেখা হলে তারা যদি বলে, 'মা বিশ্বকে একা ফেলে এলে, কে দেখবে তাকে?' কি জবাব দেব তাদের তখন?

অন্যমনস্কভাবে পাথরখানা থেকে নেমে এল নন্‌জম্মা, অন্ধকারে কোনমতে পথ খুঁজে আবার ফিরে এল শ্মশানে, চিতার কাছে। চুপ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর বাগানের মধ্যে দিয়ে উঠল বাঁধের ওপর, কিন্তু নিজের কুঁড়ের দিকে না গিয়ে চলতে শুরু করল মন্দিরের দিকে। বাঁধের ওপরের পথটা অন্ধকারেও বেশ বোঝা যাচ্ছে, গরুর গাড়ি যাতায়াতের উপযুক্ত চওড়া পথ। মন্দিরের মধ্যে রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বলছে। বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে বিশ্ব, গায়ে কম্বল ঢাকা। মাথার কাছে বসে একতারা নিয়ে ভজন গাইছেন মহাদেবায়াজী।

দরজার কাছে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে মনে হতেই ফিরে তাকালেন তিনি। চিনতে পেরে বললেন, 'এই তো সন্ধ্যাবেলাই এসে দেখে গেছ, আবার এত রাত্রে এলে কেন? কোন চিন্তা নেই, বিশ্ব একেবারে লোহার মত মজবুত ছেলে, "বিশ্ব" না বলে ওকে সাক্ষাৎ "গুণ্ডান্না" বলেও ডাকতে পার। দেখবে ও লোহার মতই শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠবে।'

মহাদেবায়াজীর কথায় সব সময় শুভফল হয়। এবার থেকে বিশ্বকে গুণ্ডান্না নামেই ডাকতে হবে---মনে মনে স্থির করে ফেলে নন্‌জম্মা। মুখে বলে, 'এমনি একবার এলাম, এখন যাই।'

'হঠাৎ এলে যে?'

'এমনিই চলে এলাম।'

'যদি ইচ্ছা হয়, এখানে থাকতে পার অবশ্য। তবে জানই তো, লোকে পাঁচকথা বলতে ছাড়বে না, কাজেই বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল।'

'হ্যাঁ যাই', বলেই চলতে শুরু করে নন্‌জম্মা।

'একটু দাঁড়াও মা, একটু এগিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'না না, ছেলে এখানে একলা থাকবে যে', বলতে বলতে দ্রুতপায়ে নন্‌জম্মা বাঁধের ওপর উঠে যায়। চলতে চলতে মনে পড়ে আঁচলে বাঁধা চিতাভস্মের কথা। বাঁধের কিনারায় দাঁড়িয়ে আঁচলের ছাইটুকু জলাশয়ের বুকে ঢেলে দিয়ে বলে ওঠে, 'মা গঙ্গা, তোমার কোলেই ওদের স্থান দিও।' কুঁড়েতে ফিরে এসে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ে নন্‌জম্মা।

৬

সকালবেলা বিশ্বকে একবার দেখে এসে নিজের কুঁড়েতে চুপ করে বসেছিল নন্‌জম্মা। আজ সপ্তম দিন। শাস্ত্র অনুসারে রামন্নার শ্রাদ্ধের কাজকর্ম আজ থেকেই শুরু হওয়া উচিত, কিন্তু কেই বা মনে রেখেছে সেসব কথা! ওদের মনেও পড়েনি, আর অন্য কেউ মনে করিয়েও দেয়নি। পার্বতীর শ্রাদ্ধ করানো তার স্বামীর কর্তব্য।

দুপুর বারোটা বেজে গেছে। হাঁটুর ওপর মাথা নামিয়ে নন্‌জম্মা নিঃশব্দে বসে আছে। চেন্নিগরায় কোথায় গেছে কে জানে। হঠাৎ সাদা কাপড়-পরা কে যেন ঢুকল এসে। মাথা তুলে দেখে সূর্যনারায়ণ—পার্বতীর স্বামী, মেয়ে রত্নার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধ থেকে ঝুলছে একটা ভারী থলে আর হাতে রয়েছে বড়-সড় একটা ঝুড়ি। নন্‌জম্মা জামাইকে দেখে কোন কথাই বলতে পারল না, শিষ্টাচার দেখিয়ে উঠে দাঁড়ানো বা বসতে বলা কিছুই না করে শুধু চেয়ে রইল। সূর্যনারায়ণ রত্নাকে বলল, 'দিদিমার কাছে যাও রত্না।'

শিশু এই নতুন দিদিমাকে ভোলেনি। সে কাছে যেতে নন্‌জম্মা তাকে কোলে টেনে নিল। সূর্যনারায়ণ এবার ঝুড়ির ঢাকনা খুলে বলল, 'এগুলো তুলে রাখুন, না হলে শুকিয়ে যাবে।' সে নিজেই একে একে সব জিনিস বার করে রাখতে শুরু করল—মোড়কে বাঁধা সুগন্ধী বেল ফুল, পান, লেবু-কলা। হোটেল থেকে তৈরী করিয়ে আনা খাবারের প্যাকেট ---এইসব দেখতে দেখতে যেন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল নন্‌জম্মার। রত্নাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে হু হু করে কেঁদে উঠল সে। চমকে মাথা তুলে তাকাল সূর্যনারায়ণ। রত্নাকে কোল থেকে নামিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল নন্‌জম্মা, সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। ব্যাপার কি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শেষে সূর্যনারায়ণ বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে মা? কাঁদছেন কেন?'

কোন উত্তর নেই। রান্নাঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করতেও সঙ্কোচ হচ্ছে ওর। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে কেমন একটা অব্যক্ত আশঙ্কা আর ভয়ে মনটা ভরে উঠছে। কিছুক্ষণ পরে সূর্যনারায়ণ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'মা, কি হয়েছে আমাকে খুলে বলতে

কিছু বাধা আছে কি?' নন্‌জম্মা কোন উত্তর দিতে পারছে না। সে কুঁড়ের বাইরে গিয়ে পাশের প্রতিবেশীর একটি ছোট ছেলেকে বলল, 'ছুটে গিয়ে একবার মাস্টারমশাইকে ডেকে আনত বাবা।' ছেলেটি তৎক্ষণাৎ ছুটল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই এসে গেলেন মাস্টার। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে কি ডেকে পাঠিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, আমার বাড়িতে ঢুকে দেখুন গিয়ে', বলেই নন্‌জম্মা চলে গেল মন্দিরের দিকে।

মাস্টার কুঁড়ের ভিতরে ঢুকে দেখেন সূর্যনারায়ণ বসে আছে হতভম্বের মত, সামনে ছড়ানো রয়েছে ফুল, পান আর খাবারের প্যাকেটগুলো। মেয়ে রত্না বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'কখন এলে? আমার চিঠি পাওনি নাকি?'

'কিসের চিঠি? না, কোন চিঠি তো পাইনি?'

'আজ পাঁচ দিন হল ডাকে দিয়েছি।'

'আমাদের গ্রামে তো সপ্তাহে একবার ডাক বিলি হয়।'

মাস্টারমশাইও কথা খুঁজে পান না এবার। সূর্যনারায়ণ জিজ্ঞাসা করে, 'ব্যাপার কি বেঙ্কটেশায়াজী? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না?'

'কোন মুখে বলব তাই ভেবে পাচ্ছি না।'

'আপনি বলুন, কোন চিন্তা নেই', বলতে বলতে সূর্যনারায়ণের গলা কেঁপে উঠল।

'পার্বতী, রামন্না কেউ নেই, আজ সাত দিন হয়ে গেল।'

'কি বললেন!' কথাটা উচ্চারণ করে আর মুখ বন্ধ করতেও যেন ভুলে গেল সূর্যনারায়ণ।

'প্লেগ! মহামারী সবার আগে এ বাড়িতেই থাবা মেরেছে। ভাই-বোন একই দিনে পর পর মারা গেল। বিশ্ব এখন সেরে উঠছে ধীরে ধীরে।' সব ঘটনা খুলে বললেন মাস্টার।

বোবার মত বসে শুনল সূর্যনারায়ণ। শেষে মাস্টার যখন বললেন, 'কি করবে বল, ভাগ্যের ওপর তো কারো হাত নেই', তখন আর সামলাতে পারল না সে। আত্মসম্বরণের চেষ্টা সত্ত্বেও অশ্রু আর বাধা মানল না। বাবার কান্না দেখে রত্নাও কান্না শুরু করল, কি বুঝেছে সে কে জানে।

'আমি বড় দুর্ভাগা বেঙ্কটেশায়াজী' বলতে বলতে মেয়েকে কোলে নিয়ে তারই মুখের আড়ালে মুখ লুকোল সূর্যনারায়ণ।

একটু পরে মাস্টার বললেন, 'চল আমার বাড়িতে বিশ্রাম করবে।'

'না, আর কিছু দরকার নেই। এখনই ফিরে যাব আমি।'

'যাবে তো নিশ্চয়। কিন্তু একবার চল, বাচ্চাটাকেও একটু খাওয়াতে হবে তো?' জোর করে তাকে উঠিয়ে দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে ওঁরা বেরিয়ে পড়লেন। রত্নারও অশৌচ, কাজেই মাস্টারের স্ত্রী পলাশ পাতায় করে রত্নাকে খেতে দিলেন। একটু কফিও খেল না সূর্যনারায়ণ। রত্নার খাওয়া হয়ে গেলে পাতাটি তুলে ফেলে দিয়ে জায়গাটা গোবর দিয়ে শুদ্ধ করল সে। তারপর মেয়েকে কোলে তুলে বলল, 'চলুন, মন্দিরে বিশ্বকে দেখে আসি।'

ততক্ষণে নন্‌জম্মা মন্দির থেকে কুঁড়েতে ফিরে গেছে। মাস্টারের বাড়ি থেকে চাবি আনিয়ে ঘরে ঢুকেছে। চেন্নিগরায় এখনও মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করছে।

নন্‌জম্মার জন্যও অবশ্য খাবার আসে ও-বাড়ি থেকে, কিন্তু সে একগ্রাসও মুখে দেয় কিনা সন্দেহ—সবটাই পথের কুকুরদের ভোগে লাগে। দরজা খুলে ঢুকতেই চোখে পড়ল, সামনেই পড়ে রয়েছে জামাইয়ের আনা ফুল, মিষ্টির প্যাকেটগুলো। নন্‌জম্মা তাকাতে পারে না ওগুলোর দিকে, কোনমতে মুখ ফিরিয়ে ঢুকে যায় ভিতরে। যে বাক্সে পাটোয়ারীর খাতাপত্র আছে তারই মধ্যে রাখা আছে পার্বতীর বিয়ের শাড়ীগুলো আর সূর্যনারায়ণের দেওয়া গহনা—কর্ণফুল, বেশর, রুপোর চুড়ি ইত্যাদি। সেগুলো বের করে একটা সাদা ঝাড়নে বেঁধে রেখে দিল সে।

প্রায় একটার সময় মন্দির থেকে ফিরে এসে মাস্টার বললেন, 'ও বলছে এখনই ফিরে যাবে। কাল সব ব্যবস্থা করে পরশু নবম দিনে শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া শুরু করে দেওয়া উচিত।' সূর্যনারায়ণ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। নন্‌জম্মা মাস্টারের কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঝাড়নে বাঁধা পুঁটলিটা সামনে এনে রাখল, তারপর বলল, 'এর মধ্যে তার শাড়ী-গহনাগুলো আছে, তোমারই জিনিস, থলিতে ভরে নাও।'

জল-ভরা চোখে সূর্যনারায়ণ বলে ওঠে, 'আসল মানুষটাই চলে গেল, এসব নিয়ে আমি কি করব মা? এ আমি নেব না।'

'পাণিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সে তো তোমারই হয়ে গিয়েছিল। তার জিনিস আমার বাড়িতে রেখে কি করব? ওগুলোর দিকে এখন আমি আর তাকাতেও পারি না।'

মাস্টারমশাইয়ের অনুরোধে পুঁটলিটা জামাই তার থলিতে ভরে নিল। দূর থেকেই মাটিতে প্রণাম করে মেয়ের হাত ধরে ধীর পদক্ষেপে ফিরে চলল সূর্যনারায়ণ। বাসরাস্তা পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে গেলেন মাস্টারমশাই।

তিনখানা বাস চলে এ পথে। মুদালিয়র কোম্পানীর একখানা এবং সি. পি. সি. কোম্পানীর দু'খানা। দশ মিনিট পরেই তিপটূর যাওয়ার বাস এসে গেল। ওদের বাসে তুলে দিয়ে ফিরে এসে মাস্টার বললেন, 'পার্বতীর শ্রাদ্ধ তো পরশু ওখানে শুরু হবে। কিন্তু রামন্নারও যখন উপনয়ন হয়েছিল, তখন শ্রাদ্ধও হওয়া উচিত। তবে এই দুই পুরোহিত তো মানুষের সুখ-দুঃখ দেখেন না, এঁদের কেবল মোচড় দিয়ে আদায় করার ফিকির। আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন, পঁচিশ টাকায় সব করিয়ে দেব। যে চলে গেছে তার এতে কিছুই যায় আসে না, এসব করা তো কেবল দেশাচার লোকাচারের প্রয়োজনে।'

'হাতে তো কিছু নেই। আপনিই চলে যান কুরুবরহল্লী, এ সময় গুণ্ডেগৌড়জী ঠিকই সাহায্য করবেন, সামনের বছরের খাজনা থেকে শোধ করে দেব।'

সেইদিনই কুরুবরহল্লী চলে গেলেন মাস্টারমশাই।

৭

সেদিন সন্ধ্যায় গরুর গাড়িতে এসে পৌঁছল অক্কম্মা আর কল্লেশ। অক্কম্মাকে দেখেই বোঝা গেল সারাটা পথ সে কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। কল্লেশেরও মুখ ম্লান। ভিতরে এসেই কাঁদতে কাঁদতে অক্কম্মা বলে, 'নন্‌জা, আমরা কি মরে গেছি? আজ নাকি সাত দিন হয়ে গেল? আমাদের একটা খবরও কি দিতে নেই?'

বাপের বাড়ির মানুষ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে নন্‌জম্মা, তারপর একটু সামলে বলে ওঠে 'একি কোন শুভ খবর যে বলে পাঠাব।'

'সুখ-দুঃখের সময় কাছে ডাকবি না, এতই কি পর হয়ে গেছি আমরা? চল্ আমাদের কাছে কিছুদিন ঘুরে আসবি, মনটা একটু ভাল হবে', বলে ওঠে কল্লেশ।

কিন্তু এখন বাপের বাড়ি কি করে যাওয়া যায়! বিশ্ব সবে সেরে উঠছে। পরশু দিন যা হোক নম-নম করেও রামন্নার শ্রাদ্ধ করতেই হবে। তাছাড়া, কেন কে জানে, বাপের বাড়ি যেতে ওর মোটেই ইচ্ছে করছে না। অবশ্য বহু বছর সে নাগলাপুর যায়নি, কল্লেশও খুবই জোর করছে। কল্লেশ আর অক্কম্মা দু'জনেই মন্দিরে গিয়ে বিশ্বকে দেখে এল। একমাত্র জীবিত প্রদৌহিত্রকে বুকে নিয়ে অনেক চোখের জল ফেলল অক্কম্মা।

এগারো দিনের অশৌচান্ত পর্যন্ত দু'জনেই থেকে গেল এখানে। অক্কম্মা আর কল্লেশের মাত্র তিন দিন অশৌচ মানতে হবে, কাজেই অক্কম্মা এ বাড়িতে রান্না শুরু করল। কল্লেশ বেরিয়ে পড়ল রেবন্নাশেট্টীর খোঁজে। অক্কম্মা নন্‌জুকে খবর দিল, 'কন্ঠী এখন গাঁয়ে নেই। আগেকার ঘোড়াটা তো কন্ঠী কাশী যাবার চার বছর পরেই মরে যায়, এখন আবার নতুন ঘোড়া কেনা হয়েছে। ওদিক থেকে কত কি নতুন মন্ত্র-তন্ত্র শিখে এসেছে কে জানে, এখন তো চেন্নরায়পট্টন, শান্তিগ্রাম, হাসন কত জায়গা থেকে লোকে ঝাড়ফুঁক করাবার জন্য ডেকে নিয়ে যায়। এই তো এবারে বেরিয়েছে আজ কুড়ি দিন হয়ে গেল।'

কিছুক্ষণ পরে অক্কম্মাই আবার বলল, 'কুরুবরহল্লীর নিঙ্গেগৌড়ের মেয়ের বিয়ে হয়েছে আমাদের গাঁয়ের চিক্কন্নার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে। কাল নাকি নিঙ্গেগৌড় এসেছিল ওদের বাড়ি। আজ সকালে চিক্কন্না এসে বলল, "তোমার নাতনীর দুই ছেলে-মেয়ে মারা গেছে, সবাই গ্রাম ছেড়ে বাইরে বাস করছে, তোমরা সেখানে যাবে না না-কি?" আমি তো শুনে অবাক, ভাবলুম বাজে কথা বলছে বুঝি। বলে, ওদের বেয়াই নাকি এসে বলে গেছে। কল্লেশকে বলতেই হোন্নাকে ডেকে গাড়ির ব্যবস্থা করল, তক্ষুণি বেরিয়ে পড়েছি।'

'ভাইয়ার জন্য আর কোথাও পাত্রী পেলে?'

'এক জায়গায় তো কন্ঠী ঠিকঠাক করেছিল। আনেকেরের কাছে আলনহল্লীর মেয়ে। তা সেই লক্ষ্মীছাড়ি কি করে টের পেয়ে গেছে, আর বাপকে চিঠি লিখিয়ে আনিয়েছে। বাপ এসে কল্লেশের হাতে ধরে কান্নাকাটি; বলে, "তোমার বিপদের সময় নিজের ছেলের মত করে তোমার সেবা করেছিলাম। ভগবান দেননি, তাই সন্তান হল না। আবার বিয়ে কোর না···" হ্যানো-ত্যানো। কল্লেশের আগে তো বিয়েতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেও মত বদলাল, বলে দিয়েছে আর বিয়ে করবে না। আমি আর কন্ঠী অনেক বুঝিয়েছি, কোন ফল হল না।'

মাস্টারমশাইয়ের সুব্যবস্থায় পঁচিশ টাকার মধ্যেই রামন্নার শ্রাদ্ধাদি হয়ে গেল। অশৌচান্তের পর বিশ্বকে আনা হল কুঁড়েতে। এখন সে হাঁটা-চলা করে বেড়াচ্ছে। অমন হৃষ্ট-পুষ্ট ছেলে এখন রোগা ডিগ্‌ডিগে হয়ে গেছে। কল্লেশ ওদের গাড়িটা এসেই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে আবার অনুরোধ করল, 'নন্‌জা একটা ছই দেওয়া গাড়ির ব্যবস্থা করছি, আমাদের সঙ্গে তোরাও চল্।'

নন্‌জুর যাবার ইচ্ছে নেই, কিন্তু ভাইয়ার মনে কষ্ট দিতেও চায় না সে। 'বৌদি না হয় কষ্ট দেয় কিন্তু ভাইয়া তো কখনো তাকে দুঃখ দেয়নি! মেয়েকে চেয়েছিল, আমি আপত্তি করেছিলাম---তাইতে রাগ করে বিয়েতে আসেনি। এখন আদর করে ডাকছে, যাওয়াই উচিত বোধহয়', ভাবছিল নন্‌জম্মা। কিন্তু এদিকে আবার খাজনা আদায়ের সময় এসে গেল, এতদিন এদিকে নজর দেওয়া হয়নি। এখন সে বাপের বাড়ি চলে গেলে স্বামী এখানে কিছুই করবে না, তা জানা কথা। ভেবে-চিন্তে সে বলল, 'অক্কম্মাকে রেখে যাও। এবারে খাজনা আদায়ের কাজটা সেরেই অক্কম্মার সঙ্গে চলে যাব আমি। অন্ততঃ দশ-পনের দিন ওখানে থেকে এসে তারপর আবার এখানকার আদায়-উশুলের কাজ শুরু করব না হয়।'

সুতরাং এখনকার মত কল্লেশ একলাই পায়ে হেঁটে ফিরে গেল নাগলাপুরে।

চতুর্দশ অধ্যায়

গণ্ডসী, দুদ্দ প্রভৃতি এলাকার গ্রামগুলো পর্যটন করে প্রায় দেড় মাস পরে নিজেদের বাড়ির পথে ফিরছিল গঙ্গম্মা আর অপ্পন্নায়া। গ্রাম থেকে মাইল দশেক দূরেই ওরা খবর পেয়ে গেল যে, প্লেগের মড়কের জন্য সবাই ঘর-বাড়ি ছেড়ে গ্রামের বাইরে চলে গেছে, সুতরাং এখন গ্রামে ফিরলে কাঠ, বাঁশ, নারকেলপাতা ইত্যাদি যোগাড় করে ওদেরও কুঁড়ে তৈরী করতে হবে। এদিকে বাসনপত্র সবই তো আছে হনুমান মন্দিরে। এখন মন্দিরের দ্বার খুলিয়ে সে সব বার করে আনা সম্ভব হবে কিনা তাই বা কে জানে। এসব ঝামেলা এড়াতে তারা সোজা দক্ষিণমুখো চলতে শুরু করে দিল। সেদিকে বহুদিন যাওয়া হয়নি, তাই হব্বনঘট্ট, হারনহল্লী ইত্যাদি ধীরে-সুস্থে ঘুরে ঘুরে মোট তিন মাস পরে মা আর ছেলে ফিরে এল নিজেদের গ্রামে। ততদিনে দু'-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে এবং কুঁড়েঘর ছেড়ে লোকজন আবার ফিরে এসেছে নিজের নিজের আস্তানায়।

নাতি-নাতনীর মৃত্যুসংবাদ শুনে ভীষণ রেগে গেল গঙ্গম্মা, প্রচুর কটূক্তি বর্ষণ করল পুত্রবধূর উদ্দেশ্যে। কিন্তু সামনা-সামনি নন্‌জম্মাকে কিছু বলতে আজকাল গঙ্গম্মার কেমন যেন ভয় করে। ওদের বাড়িতে হঠাৎ কেঁদে ফেলল গঙ্গম্মা—'দোজবরে ছেলের হাতে মেয়েটাকে তুলে দিলি, তাতেই মরে গেল। বিয়েটা ঠিক করার আগে একবার অন্ততঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারতিস', সখেদে বলে উঠল সে। নাতি-নাতনী বেঁচে থাকতে গঙ্গম্মা তো কখনও তাদের খোঁজও নিত না, বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানই তো ছিল তার কাজ। গ্রামে থাকলেও সে ছেলের বাড়ি আসত না, ছেলে-মেয়েরাও যেত না ঠাকুমার কাছে। দৈবাৎ কোনদিন সব্জী বাগান বা পুকুরপাড়ে পার্বতীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে গঙ্গম্মা হয়ত প্রশ্ন করত, 'তোর মা নাকি কুরুবরহল্লীতে খাজনা আদায় করতে গেছে? তা কত করে দস্তুরী আদায় করে বল দেখি?' পার্বতী উত্তর দিত, 'আমি তো জানি না ঠাকুমা!' নাতনী আর ঠাকুমার আলাপের সেইখানেই হয়ে যেত ইতি। রামন্নাকে দেখলে হয়ত বলে বসত, 'তুই নাকি ইংরিজী শিখে তসিলদারী করবি? তা, আমাকে তখন একখানা লাল রঙের রেশমী শাড়ী কিনে দিবি তো?' রামন্নাও জবাব দিত, 'আচ্ছা ঠাকুমা, দেব।' এর বেশী কথাবার্তা কখনই হয়নি। কিন্তু এখন যেন বড় বেশী করে মনে পড়ছে ছেলে-মেয়ে দুটোকে।* তিন-চার দিন ধরে মন্দিরে কেউ এলেই গঙ্গম্মা তার নাতি-নাতনীর কথা বলে আর বউকে শাপশাপান্ত করে। সবাই বোঝে সে বেশ বিচলিত হয়েছে।

কিন্তু তার চেয়েও বেশী উতলা হয়ে পড়েছে অপ্পন্নায়া। পার্বতীর বিয়েতে সে প্রাণ দিয়ে খেটেছিল। সেই সময় থেকেই পার্বতীর জন্য সে কেমন একটা স্নেহ অনুভব করত।

রামন্না ক্লাসে প্রথম হয় শুনে গর্ব হত অপ্পন্নায়ার। ছেলেটা এলাকাদারের হয়ে একবার হিসেবের খাতা লিখেছে, ইংরিজী শিখে সে নিজেও নিশ্চয় ভবিষ্যতে এলাকাদারের পদ পাবে একথা ভাবতেও খুব ভাল লাগত অপ্পন্নায়ার। রামন্নার সঙ্গে তার কাকার কথাবার্তা যদিও বিশেষ হত না কিন্তু কাকার মনে ভাইপোর জন্য গর্ব আর স্নেহ দুইই বেড়ে উঠছিল ক্রমশঃ। নন্‌জম্মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জল-ভরা চোখে অপ্পন্নায়া বলে ওঠে, 'আমি বড় পাপী, ওদের বাঁচাবার জন্য কিছুই করতে পারলাম না।'

বর্ষা ভাল হয়েছে এ বছর। মর্দুমশুমারী লেখা সমাপ্ত হল। এরই মধ্যে একদিন মাস্টারের গৃহিণী এসে মনে করিয়ে দিলেন, 'বিশ্বর জন্য শৃঙ্গেরীর শারদা মায়ের কাছে পুজো মানত করা আছে। মানতের পয়সা আমি তুলে রেখেছি ঠাকুরের বেদীতে। আর আট দিন পরেই তো নবরাত্রি, ছেলেকে নিয়ে ঘুরে এসো ওখান থেকে। যেদিন মানত করেছি সেইদিনই জ্বর কমতে শুরু করেছে, মানসিক পুজোয় দেরী করা উচিত নয়।'

নন্‌জম্মা স্থির করে ফেলল শৃঙ্গেরী যাবে। কোন দেবতার শক্তি কতখানি কে জানে। মানত করে ভুলে গেলে আবার না জানি কি বিপত্তি ঘটে যায়, এখন বিশ্বই তো একমাত্র শিবরাত্রির সলতে। অবশ্যই যেতে হবে। পথ-ঘাটের হদিশ বাতলে দিলেন মাস্টারমশাই। তিপটুরে ট্রেনে চড়ে, তরীকেরে স্টেশনে গিয়ে নামতে হবে, পথে অবশ্য বীরুর স্টেশনে গাড়ি বদল করার ব্যাপার আছে। তরীকেরে পৌঁছে রাতটা সেখানেই কাটিয়ে ভোরবেলা ছোট লাইনের ট্রেন ধরে নরসিংহরাজপুরে গিয়ে নামতে হবে। সেখান থেকেই পাওয়া যাবে শৃঙ্গেরী যাবার বাস, কোপ্পা হয়ে যায় সেটা। তিপটুর থেকে তরীকেরে পর্যন্ত ভাড়া পনের আনা, সেখান থেকে নরসিংহরাজপুর পৌনে সাত আনা, তারপর বাসের ভাড়া লাগবে দু'টাকা। শৃঙ্গেরীতে ধর্মশালা আছে---তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য। মঠে দু'বেলা আহারও পাওয়া যাবে।

নন্‌জম্মা বেশ চিন্তায় পড়েছে। বিশ্বর সঙ্গে সে নিজে তো যাবেই, কিন্তু সেইসঙ্গে রেলযাত্রা ও বিদেশভ্রমণে অভিজ্ঞ একটি সঙ্গী পাওয়া দরকার। যাতায়াতের খরচ, সেখানে কুঙ্কুমার্চনার জন্য লাগবে অন্ততঃ পাঁচ টাকা, কোথায় পাবে এসব? হঠাৎ একদিন অপ্পন্নায়া এসে বৌদিকে চুপিচুপি জানায়, 'কাউকে বোল না, আমার কাছে কুড়িটা টাকা আছে, এখন ধার দিচ্ছি, পরে আমাকে ফেরত দিও। আমিই নিয়ে যাব তোমাদের।'

বহু দূরের গ্রামগুলোতে ভিক্ষায় পাওয়া মড়ুয়া অনেক সময়ে মা ও ছেলে বিক্রী করে দিত। ওরই মধ্যে মাঝে মাঝে মায়ের নজর এড়িয়ে কিছু কিছু মড়ুয়া অপ্পন্নায়া নিজেই বেচে ফেলত তার পান তামাকের পয়সা জোটাতে।

কিন্তু কুড়ি টাকায় তো সব খরচ কুলোবে না। মেয়ের বিয়ের পর থেকে নন্‌জম্মার হাত একেবারে খালি। কুরুবরহল্লীর থেকেই বা আর কত বার চাওয়া যায়! শেষে অপ্পন্নায়াই বলল, 'তিপটুর পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যাক, তারপর নরসিংহরাজপুর পর্যন্ত তো ট্রেনে যেতেই হবে। ওদিকে মোটরের পথটাও হেঁটে গেলেই হবে তাহলে ঐ টাকাতেই কোনমতে কুলিয়ে যাবে।'

অনেক হিসেবপত্র করে নন্‌জম্মা, বিশ্ব ও অপ্পন্নায়ার যাওয়া ঠিক হল। কিন্তু

চেন্নিগরায় ছাড়বার পাত্রই নয়। জিদ ধরে বসল সেও যাবে। কিন্তু অত পয়সা কোথায়? তাছাড়া সে অতটা পথ হেঁটে যেতে রাজী হবে না কিছুতেই। কিন্তু চেন্নিগরায় নাছোড়বান্দা, বলে, 'যেখান থেকে হোক আমি টাকা যোগাড় করে আনব, তোমাদের ভাবতে হবে না।' স্ত্রী সাবধান করে দেয়, 'খাজনার টাকা আগাম রসিদ লিখে নিয়ে আসতে পারবে না কিন্তু।' সে তাতেও রাজি হয়ে যায় এবং কোথা থেকে কে জানে, টাকার যোগাড় করেও ফেলে। যাক্, চেন্নিগরায়ের খরচ তার নিজের, আর এদের তিনজনের আলাদা। পাঁচ সের ছাতু পিষে নিল নন্‌জম্মা। গ্রাম পর্যটনের ফলে সংগৃহীত ধানের ভাণ্ডার থেকে মায়ের চোখ বাঁচিয়ে অপ্পন্নায়া নিয়ে এল আট সের ধান। নন্‌জম্মা সেই ধানের চিঁড়ে তৈরী করে নিল পথের খাবারের জন্য। তীর্থযাত্রায় যেতে গঙ্গম্মারও বাসনা কিছু কম নয়, কিন্তু এই বউয়ের সঙ্গে সে যাবে না কিছুতেই। ছেলেকেও যেতে সে বারণই করছিল, কিন্তু অপ্পন্নায়া বলল, 'খরচ তো সবই বৌদির, তাহলে আর যেতে আপত্তি কিসের।'

অসুখ থেকে ওঠার পর এই ছ'মাস নন্‌জম্মা প্রাণপণে যত্ন করে শরীরটা সারিয়ে তুলেছে বিশ্বর। ঘি-দুধ খেয়ে সে এখন বেশ গোলগাল হয়েছে। নন্‌জম্মা পলাশ পাতা তুলতে যাবার জন্য যত ভোরে রওনা হত তার চেয়েও আগে, একদিন ভোররাত্রের অন্ধকারে চাটনী আর রুটির পুঁটলি বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল তীর্থযাত্রীরা। চেন্নিগরায় মোটরে চড়ার সুখ ছাড়বে কেন? সে বলেছে বাসে করে গিয়ে ওদের সঙ্গে মিলিত হবে তিপটুরে। রুটির কৌটো, ছাতু, চিঁড়ে, দু'একখানা বাসন-কোসন ও জামা-কাপড় একটা বস্তায় পুরে বেঁধে, সেটা মাথায় তুলে নিয়েছে অপ্পন্নায়া। নিজের ও বিশ্বর জামা-কাপড়, দু'খানা আলোয়ান, একটা চাদর পুঁটলি বেঁধে এক বগলে নিয়ে অন্য হাতে বিশ্বর হাতখানা ধরে পথ হাঁটছে নন্‌জম্মা। আলো ফোটার আগেই ওরা দু'ক্রোশ পথ অতিক্রম করে ফেলল। বিশ্ব মায়ের হাত ছেড়ে এখন কাকার চেয়েও আগে আগে ছুটছে। সে মহা উৎসাহে বার বার জিজ্ঞাসা করছে, 'মা তোমার চেয়েও আমার গায়ে বেশী জোর, তাই না মা?' তিন ক্রোশ হাঁটার পর পথের ধারে একটা চালার তলায় বসে ওরা তিনজনে চাটনী আর রুটি খেয়ে নিল। আরো মাইল দুই চলার পরই বিশ্বর হাঁটার উৎসাহ কমতে শুরু করল। আবার সে এসে মায়ের হাত ধরেছে, পা ব্যথা করছে, কিন্তু মুখফুটে সেটা বলতে আত্ম-সম্মানে বাধছে তার। ইতিমধ্যে গর্জন করতে করতে বাসখানা বেরিয়ে গেল ওদের পাশ দিয়ে।

'পিছনের সিটে বসে আছে, দেখতে পেলে?' বলে উঠল অপ্পন্নায়া।

'না দেখিনি।'

'মোটরওয়ালা বাবাকে নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের কেন নিল না মা?' অবোধ বিশ্ব প্রশ্ন করে।

'হুঁ, এমনি এমনি কি আর বসতে দিয়েছে! ব্যাটাদের ···' অপ্পন্নায়া গজরে ওঠে।

নন্‌জম্মা তাড়াতাড়ি ওকে থামিয়ে দেয়, বলে 'যাকগে যাক, যেতে দাও ওসব কথা।'

অপ্পন্নায়া কিন্তু থামল না, গজগজ করতে থাকল, 'সে তুমি যাই বল, চিন্নৈয়াটা একটা স্বার্থপর উজবুক, ছোটবেলা থেকেই দেখছি তো! কেবল নিজেরটুকু ছাড়া আর কারো কথা ভাবে না, এসব লোককে জুতো পেটা করতে হয়, হুঁ! যতসব···'

'অপ্পন্নায়া, আমরা তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি, এখন খারাপ কথা মুখে উচ্চারণ করতে

নেই। ভুলে যাও ওসব কথা', নন্‌জম্মা উপদেশ দিল দেওরকে। তারপর সে বিশ্বকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হ্যাঁরে, সেই গানটা তোর মনে আছে? সেই যে শিখিয়েছিলাম, "ভজ গোবিন্দ ভজ গোবিন্দ", সেইটা গেয়ে শোনা দেখি! জানিস তো, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই শৃঙ্গেরীমঠের শঙ্করাচার্যই লিখেছিলেন ঐ গান।'

বিশ্ব গাইতে শুরু করে দেয়, যেখানে সুর ভুল হচ্ছে, মা শুধরে দিচ্ছে। এদিকে মুখে কিছু দিতে না পারলে মহা অস্বস্তিবোধ করছে অপ্পন্নায়া। শেষ পর্যন্ত আর কিছু না পেয়ে পকেট থেকে পান, শুপারী বার করে চুন মাখিয়ে দোক্তাসহযোগে মুখে পুরে আবার চলতে শুরু করল। পান আর দোক্তার রসে মুখ ভর্তি হয়ে উঠেছে তার। সারা পথ পিক ফেলতে ফেলতে চলেছে সে।

বেলা একটার সময় ট্রেন ছাড়ে তিপটুর থেকে। পথে একটুক্ষণ বিশ্রাম করেও ওরা বারোটার মধ্যে স্টেশন পৌঁছে গেল। মাঝে মাঝে পাকদণ্ডির পথে হাঁটার ফলে পথ কিছুটা সংক্ষেপ করা গেছে। তিনজনে বসে আর একবার বাড়ি থেকে আনা রুটি খেয়ে নিল চাটনী দিয়ে। ততক্ষণে অশত্থ গাছতলার মাধবভট্টর হোটেল থেকে পেট ভরে খেয়েদেয়ে চেন্নিগরায়ও এসে হাজির হল। সে নিজের টিকিট কিনে ফেলেছে। অপ্পন্নায়াও নিজেদের জন্য কিনে নিল আড়াইখানা টিকিট।

রাত্রে তরীকেরে স্টেশনে নেমে, বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে তীর্থযাত্রীরা স্টেশনের পানীয়জলের কল থেকে জলপান করে নিল। জায়গাটা ঘুরে দেখবার অজুহাতে চেন্নিগরায় বেরিয়ে পড়ল স্টেশন থেকে। তাই দেখে অপ্পন্নায়া বলে উঠল, 'কোথায় গেল এখন তা বুঝেছো তো?' নন্‌জম্মা উত্তর দিল, 'যেখানে খুশি যাক, তাতে আমাদের কি যায় আসে?' প্ল্যাটফর্মের এক কোণে চাদর পেতে ছেলেকে নিয়ে শুয়ে পড়ল নন্‌জম্মা। ওদের মাথার কাছে নিজের বস্তাটাকে বালিশের মত ব্যবহার করে শুল অপ্পন্নায়া। বাইরে থেকে খেয়ে-দেয়ে চেন্নিগরায় যখন ফিরল ততক্ষণে এরা তিনজনেই গভীর ঘুমে মগ্ন। সেও ভাইয়ের পাশে একখানা ধুতি বিছিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে দেখা গেল এখনও অবশিষ্ট আছে দশখানা রুটি। পরশুদিন তৈরী হয়েছে রুটিগুলো, কাজেই শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে, তবে জলে ভিজিয়ে খাওয়া চলে। চাটনীটা অবশ্য খারাপ হয়ে গেছে। অপ্পন্নায়া প্রস্তাব করল হোটেল থেকে এক আনার সম্বর কিনে আনা যাক। চেন্নিগরায় ততক্ষণে মুখ-হাত ধুয়ে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। নন্‌জম্মা দেওরকে নির্দেশ দিল, 'হোটেল থেকে এক আনার সম্বর, বিশ্বর জন্য একটা ইডলি এবং দুটো সাদা দোসা নিয়ে এস, সব মিলিয়ে তিন আনা লাগবে।'

নরসিংহরাজপুরের ছোট লাইনের ট্রেনে উঠে বিশ্ব তো আনন্দে আটখানা। জানলা দিয়ে কত গাছ দেখা যাচ্ছে। তার ওপারে আরো বড় বড় গাছের জঙ্গল, কত রকমের লতা ঝুলছে সেসব গাছ থেকে। সবে মাত্র বর্ষা শেষ হয়েছে তাই গাছগাছালি এখন সতেজ, সবুজ। জঙ্গলের মধ্যে একটা বিরাট জন্তু দেখা গেল, বইতে দেখা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে বিশ্ব চিনতে পারল ওটা হাতি। সে জিজ্ঞাসা করল, 'মা একেই বুঝি বলে "জঙ্গল"?' মাও বুঝতে পেরেছে এ হল গভীর জঙ্গল। এমন অরণ্য সে আগে কখনো দেখেনি।

অপ্পন্নায়া বলল, 'এ অঞ্চলটা এইরকমই। শিবেমোগ্গার ওদিকে তো এর চেয়ে আরো অনেক গভীর জঙ্গল।'

'শিবেমোগ্গা আবার কবে গেলে তুমি?'

উপলক্ষ্যটা মনে পড়তেই অপ্পন্নায়া চুপ করে গেল। নন্‌জম্মারও মনে পড়ে গেল পুরোন দিনের সেই ঘটনা, ওর মনে হল, প্রশ্নটা করা ওর উচিত হয়নি। বৌদিকেই লাথি মেরে তারপর পুলিশের ভয়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিল অপ্পন্নায়া, এখন সেটা মনে পড়ায় অপ্রতিভ মুখে জানলার বাইরে তাকিয়ে বসে ছিল সে। চেন্নিগরায় যথারীতি বসে বসে তামাক চিবোচ্ছে।

দুপুর বারোটায় ছোট লাইনের ট্রেন পৌঁছে গেল নরসিংহরাজপুর। নামতেই বাসের দালালরা 'শৃঙ্গেরী শৃঙ্গেরী' হাঁকতে হাঁকতে ঘিরে ফেলল যাত্রীদলকে।

চেন্নিগরায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কিসে যাবে, মোটরে না হেঁটে?'

অপ্পন্নায়া জবাব দেয়, 'মোটরে চড়ার মত পয়সা কোথায় আমাদের?'

'আমার তো পা মচকে গেছে, মোটরে যেতেই হবে। আগে পৌঁছে তোমাদের জন্য ধরমশালায় জায়গা ঠিক করে রাখব এখন' বলতে বলতে এগিয়ে যায় চেন্নিগরায়।

অপ্পন্নায়া এবার ডেকে বলে, 'চিন্নৈয়া, একটু দাঁড়াও, বৌদি আর বিশ্বকেও নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে। মোটে তিন টাকা লাগবে, বিশ্বর তো হাফটিকিট। তাছাড়া যদি একটু কাকুতিমিনতি করে বল যে, বাচ্চাকে কোলে নেবে, গরীব মানুষ···তাহলে হয়ত টিকিট নাও লাগতে পারে বিশ্বর। আমি একা হেঁটে চলে যাচ্ছি।'

'আমার কাছে টাকা নেই। ওর কাছে যদি থাকে তো নিজের টিকিট কাটুক', চেন্নিগরায় এগিয়ে চলে যায় বাসের দিকে। শত শত তীর্থযাত্রী তখন বাসে জায়গা দখলের জন্য ছুটছে। সেও তাদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে বাসে উঠে বসে পড়ে।

ওরা তিনজনে বসে সেই শুকনো রুটি জলে ভিজিয়ে খেয়ে নেয়। এতদিনে শেষ হল রুটির গোছা। তবে এতে সবার ভাল করে পেট ভরল না। তখন নন্‌জম্মা কিছুটা ছাতু, তেঁতুল আর গুড় সহযোগে মাখল জল দিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার পর নন্‌জম্মা এক টুকরো গুড় আর দু'মুঠো চিঁড়ে ভরে দিল বিশ্বর পকেটে। এরপর নন্‌জম্মার পুঁটলিটাও নিজের বস্তার সঙ্গে বেঁধে মাথায় তুলে নিল অপ্পন্নায়া। ছেলের হাত ধরে, তিনজনে পথ হাঁটা শুরু করে দিল।

২

এমন গহন অরণ্য জীবনে দেখেনি নন্‌জম্মা। গাছপালার প্রতি তার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। চোলেশ্বরের টিলায় পলাশ পাতা পাড়তে যাবার সময় দু'পাশের গাছপালা, খেতখামার আর পলাশ বনের শ্যামলিমা সে দু'চোখ ভরে দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত। আর এখানে তো অজস্র বড় বড় গাছের সমারোহ। দেখতে দেখতে মনটা যেন অজানা একটা আনন্দের অনুভূতিতে ভরে ওঠে। কিন্তু আবার সেই সঙ্গেই কেমন যেন অব্যক্ত কষ্টের আভাস—

এই সতেজ-সবুজ তারুণ্যের প্রতীক গাছগুলোকে দেখেই মনে পড়ছে তাজা ফুলের মত সুন্দর ছেলে-মেয়ে দুটোকে। ঐ সেগুন গাছের পাতাগুলো কি বিরাট, এক-একটা পাতাকেই খাওয়ার থালার মত ব্যবহার করা যায়। পলাশ পাতাগুলো যদি এই রকম বড় হত তাহলে তো গেঁথে গেঁথে তৈরী করার দরকারই হত না। মনে পড়ল পাতা তুলতে তুলতে হঠাৎ একটা বড়-সড় পলাশ পাতা পেয়ে গেলে রামন্না কি খুশি হয়ে উঠত, ঠিক যেন কোন অমূল্যনিধি পেয়েছে। কিন্তু পলাশ পাতা আবার বেশী বড় হলে গাঁথার সময় অসুবিধা হয়, তৈরী পাতার মাপ ছোট-বড় হয়ে যায়। পলাশ পাতার রস লেগে রামন্নার জামা নষ্ট হত বলে পাতা তোলার জন্য একটা ছেঁড়া পুরোন জামা আলাদা করে রাখা থাকত।

পার্বতী পাতা তুলতে তুলতে গান গাইত গুন্‌গুন্ করে, ওর বড় গানের শখ ছিল। মা যত গান জানে সব শেখা হয়ে গিয়েছিল পার্বতীর। বারো বছর বয়স হতে না হতেই তো জাঁতাপেষার কাজটা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল। জাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে কি মিষ্টিগলায় গাইত মেয়েটা! মাস্টারমশাই বলেছিলেন জামাইয়েরও নাকি গান-বাজনার শখ আছে, সে যখন হারমোনিয়াম বাজিয়ে মহাভারতের শ্লোক সুর দিয়ে গায় তখন নাকি লোকের চোখে জল এসে যায়। অনেক শ্লোক আর ভাল ভাল পদাবলী তার কণ্ঠস্থ। বড় মধুর স্বভাব ছেলেটির, কখনও মেজাজ দেখায় না এতটুকু। মা-মরা মেয়েটাকে কি যত্নই করে! পুরুষমানুষ ঠিক এমনটিই তো হওয়া উচিত। এমন স্বামী নিয়ে ঘর করার সৌভাগ্য হল না মেয়েটার। মনে মনে নন্‌জম্মা সূর্যনারায়ণের সঙ্গে তুলনা করছিল চেন্নিগরায়ের। নিজের স্বামীর কথা ভাবলেও ঘৃণা বোধহয় তার। সবই নিশ্চয় তার গত জন্মের কর্মফল। জোর করে মনটা অন্য দিকে ফেরায় নন্‌জম্মা।

জঙ্গল দেখে খুশিতে বিশ্ব যেন আত্মহারা হয়ে উঠেছে। 'মা দেখ, দেখ আমাদের আম গাছের চেয়েও বড় বড় গাছ, ঠিক যেন আকাশে গিয়ে ঠেকছে, না মা?' আবার বলে, 'ও মা ঐ বাঁদরটা ওরকম দেখতে কেন? আমাদের গাঁয়ের বাঁদরগুলো এর চেয়ে ভাল দেখতে।'

'এগুলো যে জংলী বাঁদর, বাবা।'

'আর আমাদেরগুলো কি রকম বাঁদর?'

'সে তো গাঁয়ের, পোষা বাঁদর।'

'কিন্তু সেগুলোও তো গাঁয়ের মধ্যে থাকে না, বাগানের গাছে গাছে থাকে।'

মাঝে মাঝে দু-একটা সাপও চোখে পড়ছে। সাপ ওদের কাছে কিছু অপরিচিত জীব নয়, রামসন্দ্রেও অনেক আছে। এখানে গভীর জঙ্গল, তাই সাপও নিশ্চয় অনেক বেশী। তাই সাবধানে পথচলা দরকার। এসব পাহাড়ী অরণ্যে নাকি অজগর সাপ আছে, তারা আস্ত মানুষ গিলে ফেলতে পারে। তারপর গাছের গুঁড়ির মত নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে।

সমানে মায়ের হাত ধরে চলতে আর ভাল লাগছে না, বিশ্ব হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একা একা হাঁটছে, কখনও বেশ কিছুটা এগিয়ে যাচ্ছে, কখনও বা পিছিয়ে পড়ছে। নন্‌জম্মা নিজের মনে কি ভাবতে ভাবতে অনেকটা পথ হাঁটবার পর হঠাৎ একবার পিছন ফিরে

দেখে বিশ্বকে দেখা যাচ্ছে না। অপ্পন্নায়া হাঁটছে আগে আগে, এতক্ষণে ওর খেয়াল হয়, এ জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, সাপ, বিছে কোন কিছুরই অভাব নেই। সে চিৎকার করে ওঠে, 'অপ্পন্নায়া বিশ্বকে দেখতে পাচ্ছি না যে?' দু'জনেই পিছু ফিরে খুঁজতে থাকে। প্রায় এক ফার্লং পিছু হটে দেখা যায়, একটা মস্ত বড় সেগুন গাছে চড়ে বসে বিশ্ব সামনের গাছের বাঁদরগুলোর মুখভঙ্গী নকল করে তাদের ভেংচি কাটছে। 'না বলে কয়ে এখানে গাছে উঠেছিস যে?' ছেলেকে ধমক দিতেই সে উত্তর দেয়, 'ঐ বাঁদরগুলোই তো আগে আমায় ভেংচি কাটল।'

এরপর থেকে নন্‌জম্মা ছেলেকে নিজের সামনে রেখে চলতে শুরু করে। জঙ্গলের সৌন্দর্য নিয়ে অপ্পন্নায়ার কোন মাথাব্যথা নেই। সে ভাবে, 'এই ভীষণ অজগর বনের চেয়ে আমাদের খেতখামার অনেক ভাল বাপু! এখানে তো ধান মড়ুয়া কিছুই ফলে না, কি খেয়ে থাকে লোকে? এইজন্যই তো বলে পাহাড়ের লোকেরা নাকি আমাদের মত শক্ত সমর্থ হয় না'—এইসব ভাবতে ভাবতেই অপ্পন্নায়ার মনে পড়ে ওর এতদিনকার জীবনের ছোট-বড় সব ঘটনাগুলো। ওর মেয়ে জয়লক্ষ্মী প্রায় পার্বতীরই সমবয়সী। ছেলে রামকৃষ্ণ অনেক ছোট। তৃতীয় সন্তানটি কি হয়েছে কে জানে! মা যাই বলুক, অপ্পন্নায়া জানে রামকৃষ্ণ তারই সন্তান। কে জানে ছেলেটা লেখাপড়া শিখছে কিনা। ওর মা আর দিদিমা তো ওকে পুরোহিতগিরি ধরাবার চেষ্টায় ছিল। এখন হয়ত গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে দান-দক্ষিণা আদায় করে বেড়ায়। সাতু কেমন আছে কে জানে। আমার কথা সে কখনও ভাবে কি? মঙ্গলসূত্রটা ওভাবে ছিঁড়ে নেওয়া উচিত হয়নি। সে হত-চ্ছাড়িও যদি বৌদির মত একটু পাতাটাতা বানিয়ে দু'পয়সার সাশ্রয় করতে পারত তাহলে যাহোক করে সংসার চলেই যেত কোনরকমে। কিন্তু তাঁদের তো আবার রোজ ভোর না হতে গরম কফি চাই। দু'বেলা ধপধপে সাদা চালের ভাত, অড়হর ডাল, কফি এসব জুটবে কোথা থেকে সে চিন্তা কে করে? এদিকে শ্বশুরও তো কিছু টাকার বস্তা রেখে যাননি। কিন্তু সে যাই হোক, ওভাবে তাকে তাড়িয়ে দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে। নিজেকে হঠাৎ বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় অপ্পন্নায়ার, বড় নীরস রুক্ষ এই জীবন। বৌদি পিছনে আসছে, তার সঙ্গেই দুটো মনের কথা বলার ইচ্ছেয় অপ্পন্নায়া ডেকে বলে, 'বৌদি, শুনছ?'

'কি বলছ?'

'বলছিলাম, সে মেয়েটারও এতদিনে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা।'

'কার কথা বলছ?'

কিন্তু মুখফুটে নিজের মেয়ের নামটা বলতে লজ্জা করে অপ্পন্নায়ার। নন্‌জম্মা আবার জিজ্ঞাসা করায় সে বলে ওঠে, 'ও কিছু না। হঠাৎ রেবন্নাশেট্টীর মেয়ে রুদ্রাণীর কথা মনে পড়ে গেল।'

'রুদ্রাণী মারা গেছে, সে তো বহুদিন হয়ে গেল। এতদিন পরে এ কথা বলছ যে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে নন্‌জম্মা, কিন্তু কোন উত্তর পায় না। নিজের ভাবনা-চিন্তায় মগ্ন থাকায় সে দেওরের কথার অন্তর্নিহিত অর্থও বুঝতে পারে না। নিঃশব্দে আবার পথ চলতে

থাকে সবাই। ওদের মাঝখানে প্রায় গজ দশেকের ব্যবধান। বিশ্ব আপন মনে কথা বলতে বলতে চলেছে কখনও কাকার আগে আগে, কখনও বা দু'জনের মাঝখানে। পথটা এক ঘেয়ে মনে হলে আব্দার করছে, 'মা একটা গল্প বল না!'

পথে একবার বিশ্রাম করে সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করে ওরা এসে পৌঁছল কোপ্পায়। নন্‌জম্মা ভাবছিল খাওয়ার জন্য চিঁড়ে আর ছাতু ভেজাবে, না কোন গাছতলায় তিনখানা পাথর দিয়ে উনুন তৈরী করে একটু ভাত রেঁধে ফেলবে। হোটেল থেকে দু' আনার কিছু তরকারী কিনে এনে ভাতের সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে।

অপ্পন্নায়া পরামর্শ দিল, 'এসব পাহাড়ী এলাকার শেঠরা বাড়িতে কত লোককে রোজ খাওয়ায়। চল আমরাও সে রকম কোন বাড়িতে ঢুকে পড়ি।'

কিন্তু বৌদি পরিষ্কার জানিয়ে দিল, 'পরের বাড়ি চেয়ে খেতে যাব না।'

'তা আমি আর বিশ্ব না হয় খেয়ে আসি? তোমার জন্য উনুন বানিয়ে হোটেল থেকে সব্জী এনে দিচ্ছি।'

'কেউ চেয়ে খেতে যাবে না। সঙ্গে যা আনা হয়েছে তাই খাওয়া হবে।'

নন্‌জম্মার কথাই থাকল। উনুন গড়ে কিছু কাঠকুটো যোগাড় করে অপ্পন্নায়া। ভাত রান্না হল। হোটেলে দু' আনার সম্বর যা পাওয়া গেল, তাতে বড় একটা বাটির অর্ধেকের বেশী ভরে গেল। সুতরাং বেশ পরিতৃপ্তি করে খেয়ে নিল তিনজনে। একটা দোকানের বারান্দায় শুয়ে কেটে গেল রাতটা। সকালে উঠে জলখাবারের জন্য ছাতু মাখল নন্‌জম্মা। অপ্পন্নায়া একটা নারকেল ভেঙে হোটেল থেকে কুরিয়ে নিয়ে এল। ভেজানো চিঁড়ে, গুড়, নারকেলের ফলার ও ছাতু দিয়ে পরিপাটি আহার সেরে আবার রওনা হয়ে পড়ল তিনজনে। বিশ্বর দু'পায়ে খুব ব্যথা, বেচারা পরশু ষোল মাইল ও গতকাল চৌদ্দ মাইল পথ হেঁটেছে। বিশ্বর মায়েরও পায়ের অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু কিছুই করার নেই, চলতেই হবে। 'কি রে পায়ে ব্যথা করছে?' প্রশ্ন করতেই বিশ্ব জবাব দিল, 'ছেলেদের পা ব্যথা করে না', বলেই ছুট লাগাল সে। এখান থেকে বারো মাইল দূরে হরিপুর, সেখানে শৃঙ্গেরী কর্তৃপক্ষের মঠও আছে। দুপুরের মধ্যেই হরিপুর পৌঁছে নদীতে স্নান করে ওরা মন্দিরে দেবদর্শন করল, মঠে প্রসাদ ভক্ষণও করে নিল। ওদেরই মত আরো শত শত তীর্থযাত্রী এখানে আহার করছে, তারমধ্যে ব্রাহ্মণ পরিবারের বধূরাও আছে, কাজেই এখানে খেতে কোন সঙ্কোচবোধ করল না নন্‌জম্মা। খাওয়ার পর ঢুলতে শুরু করল বিশ্ব। শৃঙ্গেরী এখান থেকে আর মাত্র ছ'মাইল। কিন্তু নন্‌জম্মার পায়েও খুব ব্যথা, সুতরাং স্থির হল এখানেই রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে বাকিটুকু হাঁটা হবে। বিশ্বকে শুইয়ে তার পাশে তার কাকাও শুয়ে পড়ল। সামনে বয়ে যাচ্ছে নদী। নন্‌জম্মার ইচ্ছা হল, একটু নদীর ধারে গিয়ে বসে। বালির ওপর দিয়ে হেঁটে জলের ধারে এসে একটা পাথরের ওপর বসে পা দুটি নদীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে ভারি আরামবোধ হল তার। সঙ্গে সঙ্গেই রামন্না আর পার্বতীর স্মৃতি ভারাক্রান্ত করে তুলল মনটা। 'আহা, তারা যদি এখানে আসতে পেত কি খুশিই না হত! কত কথা বলত এতক্ষণ। আমি কত পাপ করেছি

ঠাকুর'—ভাবতে ভাবতে চোখ ফেটে জল আসে তার, আঁচলে বার বার চোখ মোছে। সন্ধ্যাবেলা বিশ্ব আর অপ্পন্নায়া ডাকতে না আসা পর্যন্ত সেই নদীর কূলেই বসে থাকে নন্‌জম্মা।

৩

এরা তিনজনে যখন পৌঁছল ততক্ষণে শৃঙ্গেরীর সব কিছু দেখে ফেলেছে চেন্নিগরায়। মঠ, গুদাম, রান্নাঘর, কটা খাবার ঘর আছে, একসঙ্গে কত লোক বসে খেতে পারে, কোন খাবার ঘরে পরিবেশনকারীরা আগে ঢোকে এসব দরকারী খবর সংগ্রহ করা হয়ে গেছে। নদীর ওপারে নরসিংহবন, কাল ভৈরব টিলা ইত্যাদি দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখাও হয়ে গেছে তার। এরা পৌঁছনর পর সে ধর্মশালায় একটা ঘরের জন্য চেষ্টা করল বটে কিন্তু এখন নবরাত্রির সময়, রোজ হাজার হাজার যাত্রী এসে পৌঁছচ্ছে, এ সময়ে আলাদা ঘরের আশা, দুরাশা মাত্র। ধর্মশালার কর্মকর্তাকে অনেক কাকুতিমিনতি করার পর তিনি দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচে ওদের থাকতে অনুমতি দিলেন। সব সময় লোকজন সিঁড়ি দিয়ে যাতায়াত করছে, এক মুহূর্ত শান্ত হয় না জায়গাটা, তবু এটুকুও যে পাওয়া গেছে সেটাই ভাগ্য বলতে হবে। ধর্মশালার চৌকিদারও থাকে ঐখানেই সুতরাং জিনিস-পত্রগুলোর সম্বন্ধে অন্ততঃ নিশ্চিন্ত থাকা যাবে।

বেলা ন'টায় শৃঙ্গেরী পৌঁছেই চেন্নিগরায়ের দেখা পাওয়া গেছে। জিনিসপত্র যথাস্থানে রেখে বিশ্ব ও অপ্পন্নায়াকে নিয়ে নন্‌জম্মা চলল মঠের উদ্দেশ্যে। নদীতে স্নান করে নতুন কাপড় পরে কাচা কাপড়গুলো রোদে শুকিয়ে নিয়ে ওরা এল মন্দিরে। ওদের মানতের 'কুঙ্কুমার্চনা' পুজোর জন্য আজ আর সময় নেই, সেটা কাল সকালে করালেই চলবে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নৌকায় নদী পার হয়ে ওরা গেল নরসিংহবন দেখতে। চেন্নিগরায়ও ঠিক জুটে গেল ওদের সঙ্গে। বিশ্ব বলে উঠল, 'বাবা, তুমি আমাদের ফেলে রেখে একলা একলা মোটর চড়ে এলে, এখন আবার আমাদের সঙ্গে এসেছ যে বড় ?' অপ্পন্নায়াও সম্পূর্ণ একমত বিশ্বর সঙ্গে। কিন্তু নন্‌জম্মা ওদের থামিয়ে দিল। ছেলেকে বলল, 'বিশ্ব তুই তো বুদ্ধিমান ছেলে, এসব কথা বলতে হয় না।'

নরসিংহবনে অজস্র গোলাপ ফুটে রয়েছে। একসঙ্গে এত গোলাপ গাছ নন্‌জম্মার কাছে প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। এখান থেকেই নাকি ভক্তেরা প্রাণভরে ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে দেবী শারদার পুজো দেয়। বিশ্ব এক দৌড়ে গিয়ে দুটো গোলাপ তুলে এনে মাকে দিয়ে বলে, 'তুমি চুলে পর না মা।' হাতে গোলাপের কাঁটা ফুটেছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই ছেলের। নন্‌জম্মা কিন্তু ফুল হাতেই রেখে দেয়, বলে, 'এ ফুল পুজোর জন্য বাবা, এ এখন পরতে নেই।' পার্বতীর কথা মনে পড়ে যায়, কি ঘন কালো দীর্ঘ চুল ছিল মেয়ের। চুল আঁচড়ে বেণী বেঁধে দিলে এত সুন্দর দেখাত যে মনে হত লোকের নজর লেগে যাবে। সুরঙ্গী ফুল যখন ফুটত রামন্না কোন ভোরে উঠে থলি ভরে কুঁড়ি তুলে আনত, পার্বতী তাই দিয়ে মোটা গ'ড়েমালা গেঁথে চুলে পরত। একবার রামন্না তার স্কুলের বাগান

থেকে দুটো গোলাপ এনেছিল, মেয়ের মাথার চুলে সেই গোলাপ দুটো কি অপরূপ যে মানিয়েছিল, নন্‌জম্মা এখনো চোখ বুজলেই যেন দেখতে পায়। কি ভালবাসাই ছিল দুই ভাই-বোনে।

গোলাপগুলো দেখতে দেখতে কত কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে। তবু সব কিছু ঘুরে ফিরে দেখে নন্‌জম্মা। মহান গুরুর তপস্যার গুহা, ভৈরবের টিলা সব চেন্নিগরায় ওদের চিনিয়ে দেয়। ফেরার পথে একটা ভিজে ঝাড়নে বেঁধে কিছু ফুল তুলে নিয়ে গিয়ে মন্দিরে দেবীর চরণে অঞ্জলি দেয় ওরা।

দ্বিতীয় দিন সকালে মানসিক পুজো। খুব সকালে উঠে সবাই প্রস্তুত হয়। বিশ্বকেও উপবাসে থাকতে হবে পুজো না হওয়া পর্যন্ত। সকাল সাড়ে সাতটায় পুজোর সময় নির্দিষ্ট হয়েছে। ভোরে উঠে চেন্নিগরায় বাইরে গিয়েছিল, যখন ফিরে এল দেখা গেল তার কোঁচার খুঁটে বাঁধা মোটাসোটা কয়েকটা করলা।

অপ্পন্নায়া জিজ্ঞাসা করল, 'ওগুলো কি হবে?'

'চমৎকার করলা, মাত্র ছ'পয়সায় এতগুলো পাওয়া গেল, এর চাটনী বানাও দেখি', হুকুম করল সে স্ত্রীকে।

'তুমি কি তামাশা করছ নাকি? আমরা এখন মন্দিরে যাচ্ছি।'

'মন্দির থেকে ফিরে এসে কোর না হয়। আমাদের সঙ্গে তো খাবারের কৌটো আছে, তাইতে করে খাবার জায়গায় নিয়ে গেলেই হবে। এখানকার রান্নায় নুন-ঝাল ঠিকমত হয় না।'

'হাজার হাজার লোক খাচ্ছে সেখানে। তারমধ্যে নিজেদের কৌটো করে চাটনী নিয়ে গেলে লোকে হাসবে না?'

'কে হাসবে শুনি? তার মায়ের ··· ।'

'তীর্থস্থানে এসেছ, মুখ খারাপ কোর না।'

অপ্পন্নায়া বলল, 'এখানে উনুন কই, মশলাপাতি কোথায়, চাটনী পিষবে কিসে? তোমার কি এখন চাটনী না খেলেই নয় নাকি?' ধর্মশালায় শিলনোড়া নিশ্চয় আছে। এইখানেই তিনটে ইঁট দিয়ে উনুন করা যায়, চৌকিদারকে বললে একটু কাঠকুটোও দেবে।

বিশ্ব বলে ওঠে, 'কক্ষনো বানিও না মা।'

'এ হতভাগা আবার মাকে শেখাচ্ছে, বলি তোর মায়ের ···।'

চৌকিদারের কানে গেছে কথাগুলো। সে বলে উঠল, 'এখানে মুখখিস্তি করবে না বলে দিচ্ছি। কর্তার কানে গেলে দূর করে দেবে ধরমশালা থেকে।' তারপর সে জানিয়ে দিল, উনুন জ্বেলে এখানে বারান্দা নোংরা করা চলবে না। সুতরাং বড়ই হতাশ হল চেন্নিগরায়—আহা, করলার চাটনী কি উপাদেয়ই না হয়! রামসন্দ্রে এমন চমৎকার করলা পাওয়া যায় না। এখানে যদি বা পাওয়া গেল তো উজবুক অলপ্পেয়ে মালিকের জন্য রান্নার উপায় নেই! মনে মনে গালাগাল দিতে থাকে চেন্নিগরায়।

কুঙ্কুমার্চনার পর মনের মধ্যে একটা অপূর্ব শান্তি অনুভব করল নন্‌জম্মা। এতদিন

পর্যন্ত সে শারদাদেবীর ছবিই দেখেছে। গতকাল অবশ্য দর্শন করেছিল, কিন্তু তখনও দেবীকে সাজানো হয়নি। এখন বহু ভক্ত একসঙ্গে কুঙ্কুমার্চন করাচ্ছে, অপূর্ব শোভা ধারণ করেছেন দেবী। কি মহিমাময়ী মূর্তি! রামসন্দ্রের মা-কালীর মূর্তি দেখলে তো ভয় করে। কিন্তু শারদাদেবীর মুখখানি দেখলে সমস্ত ভয়-ডর উধাও হয়ে যায় মন থেকে। দেবীর কৃপাতেই তো প্রাণ ফিরে পেয়েছে বিশ্ব। এখন থেকে সুখে-দুঃখে সর্ব কর্মে এই দেবীকেই স্মরণ করবে নন্‌জম্মা। বিশ্বকে তিনবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়ে নিজেও প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করল। মানত করা সিকি পয়সা মন্দিরের বাক্‌সের মধ্যে ফেলে পুজোর প্রসাদী কুঙ্কুম নিয়ে সযত্নে রাখল নিজের কাছে। অপ্পন্নায়াও প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করল ভক্তিভরে।

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ ওরা নদীতে স্নান করতে যাবার উদ্যোগ করছে, তখন হঠাৎ দেখা গেল বিশ্ব কোথাও নেই। এতক্ষণ ওরা ভাবছিল, সে বুঝি বাইরে খেলছে। চেন্নিগরায় তো সকাল হলেই নদী দেখার নাম করে বেরিয়ে যায়, তার ফেরার সময়ের কোন ঠিক নেই, কাজেই তাকে নিয়ে কেউ চিন্তাও করে না। কিন্তু ছেলেটা গেল কোথায়? তীর্থযাত্রীদের ভীড়ের মধ্যে খুঁজতে বেরোল নন্‌জম্মা ও অপ্পন্নায়া। হঠাৎ ভীড়ের মধ্যে পাওয়া গেল বিশ্বকে। সে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের আঁচল ধরে আব্দার শুরু করল, 'আমাকে দোসা কিনে দাও, আমি দোসা খাব ···।'

'এই তো কাপড় বদলেই ছাতু মেখে দেব', ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে মা। কিন্তু বিশ্ব নাছোড়বান্দা, সে জিদ করতে থাকে, 'ঐ তো, বাবা ওখানে বসে দোসা খাচ্ছে, আমাকে কেন দেবে না? আমাকেও দোসা কিনে দাও।'

অপ্পন্নায়া এবার প্রশ্ন করে, 'তুই একা একা কোথায় গিয়েছিলি?'

'বাবা তো একলা একলা হোটেলের দিকে যাচ্ছিল, আমিও পেছন পেছন গেলাম। বাবা দুটো দোসার অর্ডার দিল তারপর আমাকে দেখেই বলল, "তুই এখানে কেন এসেছিস?" আমি বললুম, "আমিও দোসা খাব।" তখন বলল, "আমার কাছে পয়সা নেই। মাকে বল গে যা, ছাতু মেখে দেবে।" আমি তখন হোটেলওয়ালাকেই বললুম, "আমাকেও দোসা দাও।" তখন বাবা বলে দিল, "এ কাদের না কাদের ছেলে কে জানে, একে খাইয়ে তারপর আমার কাছে পয়সা চাইলে পাবে না বলে দিচ্ছি।" তাই শুনেই তো হোটেলওয়ালা আমাকে বকতে বকতে তাড়িয়ে দিল।'

অপ্পন্নায়া খেপে উঠে বলে, 'চোর, হারামজাদা কোথাকার! আমাদের ছাতু আর চিঁড়েতেও ভাগ বসাচ্ছে আবার লুকিয়ে হোটেলেও খেয়ে আসছে।'

'যা খুশি খাক, ওকে কিছু বলতে হবে না। এখন ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে একটা দোসা কিনে দাও।' নন্‌জম্মা পয়সা দিল অপ্পন্নায়াকে এবং একটু পরে বিশ্ব দোসা খেয়ে খুশি মনে ফিরে এল। তারপর তিনজনে গেল স্নান করতে। বিশ্বর ইচ্ছে, বড় বড় মাছগুলোর কাছে গভীর জলে গিয়ে স্নান করে। এত বড় বড় মাছ সেও আগে দেখেনি, তার মাও দেখেনি কখনও। অপ্পন্নায়া বলল, 'রামনাথপুরমে সে এইরকম বড় মাছ দেখেছে। খাবার ছুঁড়ে দিলে তারা ঝাঁক বেঁধে খেতে আসে।' মাছের খেলা দেখে দেখে

বিশ্বর যেন ক্লান্তি নেই। পকেটে যত চিঁড়ে ছিল, সব সে খাইয়ে দিয়েছে এই মাছগুলোকে।

ঘাট থেকে একটু দূরে গিয়ে নন্‌জম্মা কাপড় কেচে নিল, স্নান আগেই করেছে। এবার বিশ্বকে নিয়ে অপ্পন্নায়া নাইতে নেমেছে। হঠাৎ কি করে যেন সবাইকার নজর এড়িয়ে বিশ্ব গভীর জলে গিয়ে পড়ল ও স্রোতে ভেসে যেতে লাগল। সাঁতার জানে, তাই একেবারে ডুবে গেল না। নন্‌জম্মা চিৎকার করে উঠল, 'বিশ্ব ডুবে যাচ্ছে—বাঁচাও, বাঁচাও।' অপ্পন্নায়া তৎক্ষণাৎ সাঁতার দিয়ে এগিয়ে গেল, কিন্তু বিশ্ব ততক্ষণে বেশ কিছুটা ভেসে গেছে। তীব্রবেগে জল কাটতে কাটতে শেষ পর্যন্ত অপ্পন্নায়া গিয়ে ধরে ফেলল বিশ্বকে। তারপর দু'জনেই সাঁতরে ফিরে এল তীরে। এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল নন্‌জম্মার। ছুটতে ছুটতে সে এল ছেলের কাছে। ওদের চারদিকে ততক্ষণে ভীড় জমে গেছে।

তীরে উঠে বিশ্ব বলে, 'মা গাঁয়ের পুকুরে তো যেদিকে খুশি সাঁতার কাটা যায়, এখানে কিন্তু নদীই তোমাকে ঠেলে নিয়ে যাবে।'

ছেলের কথা শুনে নন্‌জম্মা আর রাগ সামলাতে পারে না, তার পিঠে বেশ কয়েকটা চড় কষিয়ে দেয়।

বিশ্ব নিজের পক্ষ সমর্থন করে বলে, 'একটু সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হল যে, তাই তো সাঁতার কেটে এলাম।'

পাশ থেকে একজন মন্তব্য করল, 'আর একটু গেলেই ঘূর্ণির মধ্যে পড়তে।'

ওরা সবসুদ্ধ চারদিন রইল শৃঙ্গেরীতে। রোজ ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মন্দিরের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দেখত। চণ্ডীহোমের পরের দিন ওরা রওনা হল গ্রামের পথে। অপ্পন্নায়া বলল, 'কত বাকি আছে হিসেব করতো। তিপটুর পর্যন্ত ট্রেন ভাড়ার জন্য তো যথেষ্ট আছে নিশ্চয়। আর কিছু বেশী যদি থাকে তো তোমরা কাল চিন্নৈয়ার সঙ্গে বাসে এস। আমি আজ হাঁটাপথে রওনা হয়ে যাই। নরসিংহরাজপুরে দেখা হবে।' এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে অবশ্য। কিন্তু বাসের জন্য তিন টাকা খরচ করলে তারপর পথে বিশ্ব যদি কিছু খেতে চায় তো কিনে দেবার আর পয়সা থাকবে না। তাছাড়া এই অপূর্ব অরণ্যভূমি আর কি কখনও দেখতে পাবে? এ অরণ্য যেন কি এক মায়ায় বেঁধেছে নন্‌জম্মাকে। পা ব্যথা করলেও হাঁটতে আপত্তি নেই বিশ্বর, তাই শেষ পর্যন্ত তিনজনেই হাঁটাপথ ধরে। মালপত্র বহন করছে অপ্পন্নায়া। শারদাদেবীর যে ছবিগুলো কেনা হয়েছে সেগুলো শুধু রয়েছে নন্‌জম্মার হাতে।

মনটা অনেক শান্ত হয়েছে। নন্‌জম্মা ভাবে আমার দু'টি সন্তান বাঁচবে না, এই হয়ত ঈশ্বরের বিধান ছিল; তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষের তো কিছু করার নেই। বিশ্ব তো নদীতে ডুবতে ডুবতে বেঁচে ফিরেছে, ওর হয়ত ফাঁড়া ছিল, এবার তো ফাঁড়া কেটে গেছে কিন্তু এরপর বাবাকে দিয়ে বিশ্বর কোষ্ঠীপত্র তৈরী করিয়ে নিতে হবে। এদিকে অপ্পন্নায়া আজকাল সর্বদাই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। শৃঙ্গেরীতেও এই ক'দিন সে কি যেন চিন্তায় মগ্ন ছিল। অবশ্য অপ্পন্নায়া তো তার কাছে কখনও থাকেনি, সর্বদা সে নিজের মায়ের কাছে কাছেই থাকে। তাই হয়ত বৌদির কাছে সঙ্কোচবোধ করেছে—এই ভেবে নন্‌জম্মাও তাকে বিশেষ প্রশ্ন করেনি।

নরসিংহরাজপুর পৌঁছে ভাত রাঁধা হল। হোটেল থেকে সম্বর এনে খাওয়া-দাওয়া করতে দুপুর গড়িয়ে গেল। ভাত সবটা শেষ হল না। নন্‌জম্মা অবশিষ্ট ভাতটুকু বাটিতে রেখে পুঁটলি বেঁধে নিল সযত্নে। ইতিমধ্যে চেন্নিগরায়কে নিয়ে মোটর বাসও এসে পৌঁছে গেল। বাবাকে দেখেই বিশ্ব বলে উঠল, 'মা, বাবাকে কিন্তু ভাত খেতে দিও না, আমাকে না দিয়ে একলা একলা দোসা খেয়েছিল!' পাছে কেউ কথাটা শুনে ফেলে এই ভেবে লজ্জা পেল নন্‌জম্মা। ট্রেনের এখনও দেরী আছে। চেন্নিগরায় অবশ্য ভাত চাইলও না এদের কাছে। স্টেশনের কাছে হোটেলের তো অভাব নেই।

রাত কাটল তরীকেরে স্টেশনে। পরদিন সকাল ন'টায় ট্রেন। তার আগেই নন্‌জম্মা ভাত রেঁধে ফেলল এবং অপ্পন্নায়া সম্বর নিয়ে এল দোকান থেকে। চেন্নিগরায় কিন্তু খেল না এদের সঙ্গে।

আজ সকাল থেকেই অপ্পন্নায়াকে যেন আরো বেশী অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। ট্রেনেও চুপচাপ বসে রইল। এমনকি চেন্নিগরায় তামাক দিতে গেলে তাও খেল না। বীরুর স্টেশনে গাড়ি বদল করার পর তাকে রীতিমত চিন্তাক্লিষ্ট মনে হতে লাগল। নন্‌জম্মার ইচ্ছা হচ্ছিল চিন্তার কারণটা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু স্বামীর সামনে কোন কথা বলতে চায় না সে। অগত্যা চুপ করেই রইল। আশেপাশের যাত্রীদের মুখে শোনা গেল, কডুর স্টেশনে ইঞ্জিনে জল নেবার জন্য গাড়ি বহুক্ষণ দাঁড়াবে। এখানে বড়া, বোণ্ডা ইত্যাদি খাদ্যের সন্ধানে চেন্নিগরায় নেমে পড়ল ট্রেন থেকে। এই ফাঁকে অপ্পন্নায়া জিজ্ঞাসা করল, 'তিপটুর থেকে বাসে যাবার মত পয়সা তোমার কাছে আছে কি?'

'কেন বলত?' প্রশ্ন করে নন্‌জম্মা। 'তাহলে তোমরা বাসেই চলে যেও। আমি এখান থেকে একবার নুগ্গীকেরে ঘুরে আসব।'

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে নন্‌জম্মা খুব খুশি হল। এই মানুষ নিজের বৌকে এক দিন কত মার মেরেছে। কত বছর পার হয়ে গেল, সেই মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে ফেলার ঘটনার পর। আজ তার কাছে যাচ্ছে, সে এর সঙ্গে কথা বলবে তো? মায়ের কুমন্ত্রণাতেই ঐ কাণ্ড করে বসেছিল অপ্পন্নায়া। এতদিন পরে যদি স্ত্রীর সঙ্গে ওর আবার মিলমিশ হয়ে যায় তো খুবই সুখের ব্যাপার হবে সেটা। নন্‌জম্মার চিন্তায় বাধা দিয়ে এবার বলে ওঠে অপ্পন্নায়া, 'ছেলেমেয়েগুলোকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

পয়সার থলি বার করে গুনে দেখে নন্‌জম্মা---দু' টাকা দশ পয়সা অবশিষ্ট আছে। দু'জনের জন্য গাড়ি ভাড়া লাগবে বারো আনা। সে একটি টাকা অপ্পন্নায়ার হাতে দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও, দেখে এস। জয়লক্ষ্মীর তো বিয়ের বয়স হল। ছেলেপিলেকে তুমি না দেখলে আর কে দেখবে? রামকৃষ্ণ স্কুল যাচ্ছে না পুরুতগিরি করে বেড়াচ্ছে, কে জানে! যাওয়া তো উচিতই।'

বস্তাটা খুলে অপ্পন্নায়া নিজের জামা-কাপড় বের করছে এমন সময় ফিরে এল চেন্নিগরায়। 'কোথায় যাচ্ছিস?' জিজ্ঞাসা করতেই অপ্পন্নায়া কিছু না ভেবে-চিন্তে বলে বসল, 'নুগ্গীকেরে।' ব্যস্, পাটোয়ারীজী গর্জে উঠলেন, 'ত্যাগকরা বৌকে আবার দেখতে যাচ্ছিস? আকাট মুখ্যু কোথাকার?' ইতিমধ্যে ট্রেন চলতে শুরু করেছে। অপ্পন্নায়া দাদার কথার

জবাব না দিয়েই নেমে পড়ল ট্রেন থেকে।

দুপুর তিনটে নাগাদ ওরা তিপটুরে এসে গেল, তারপর সন্ধ্যা ছ'টার মধ্যে পৌঁছে গেল বাড়ি। সঙ্গে কিছুটা ভাত রয়েছে, তাই রাত্রে আর রান্নার হাঙ্গামা করল না নন্‌জম্মা। দেবীর প্রসাদ আর ছবি মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে দিতে চলে গেল।

শৃঙ্গেরী থেকে যেটুকু মানসিক শান্তি সে সংগ্রহ করে এনেছে তা বজায় রাখা ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে। অপ্পন্নায়া নুগ্গীকেরে চলে গেছে সে খবরটা চেন্নিগরায় যত শীঘ্র সম্ভব জানিয়ে দিয়েছে গঙ্গম্মাকে। সুতরাং পরদিন দুপুরবেলাই ঘটল গঙ্গম্মার আবির্ভাব। এসেই চিৎকার শুরু করল, 'ওরে ছেনাল, তুই-ই তাকে মন্ত্রণা দিয়ে পাঠিয়েছিস দু'বারের বার দ্বিরাগমন করে আসতে, সত্যি কিনা বল্?' ঘন্টা-দুই অব্যাহতভাবে পথে দাঁড়িয়ে গালিবর্ষণ চলল। নন্‌জম্মা নিঃশব্দে বসে রইল বাড়ির মধ্যে। ঠাকুমাকে একটু বকুনি দেবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব বাইরে বেরোতে যাচ্ছিল, কিন্তু নন্‌জম্মা তাকেও আটকে রাখল ঘরে। শাশুড়ীর এই পাড়া কাঁপিয়ে 'সহস্রনাম' কীর্তন সমাপ্ত হবার পর তার কেবল মনে হল, সে তো কারো সাতে-পাঁচে থাকতে চায় না, নিজের মনে শুধু একটু শান্তিতে থাকতে চায়, এটুকুও তাকে দিতে ঈশ্বরের এত আপত্তি কেন? 'আমি কিছু না করলেও লোকে শুধু শুধু আমাকে এত কথা শুনিয়ে যায় কেন?' মহাদেবায়াজীকেও সে জিজ্ঞাসা করেছে, কিন্তু তিনিও কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। শুধু বলেছেন, 'ঐভাবেই মানুষকে পরীক্ষা করেন ভগবান।' কিন্তু এ কেমন পরীক্ষা? কেন এমন পরীক্ষা নেন তিনি? কোন মনের মত উত্তর খুঁজে পায় না সে।

চার-পাঁচ দিন পরে একদিন সর্বক্কা এল ওর কাছে। জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা নন্‌জম্মা, পার্বতীকে তোমার ঠাকুমা যে সোনার "শেবন্তি পুষ্প" দিয়েছিলেন বিয়ের সময়, সেটা কি করলে?'

নন্‌জম্মার মনেও ছিল না সেটার কথা। এখন সে ভাবতে লাগল সূর্যনারায়ণকে যে পার্বতীর শাড়ী-গহনাগুলো দিয়েছে তার সঙ্গে সেই গহনাখানিও দিয়ে দেয়নি তো? কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে সেটা ও দেয়নি সূর্যনারায়ণকে। খুঁজে দেখতে হবে। ছেলেমেয়ের কোন জিনিসের দিকে ওর এখন তাকিয়ে দেখতেও ইচ্ছে করে না। রামন্নার জামা-কাপড়-গুলো সব সে দান করে দিয়েছে অছ্যুত মরিয়র ছেলেকে।

'আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু কেন বলত সর্বক্কা?'

'শুনেছি তোমাদের শৃঙ্গেরী যাবার ঠিক আগেই তোমার কর্তা সেটি কাশীমবদ্দির কাছে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রী করেছেন।'

'কে বলল তোমায় একথা?'

'শিবেগৌড়ের মেয়ে বলেছে। আগেকার দিনের অমন সুন্দর জিনিসটা—সে এখন পরে বেড়াচ্ছে।

স্বামী কিভাবে জিদ ধরে শৃঙ্গেরী গিয়েছিল মনে পড়ল নন্‌জম্মার। প্রথমটা রাগে আগুন হয়ে উঠল সে, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে নিজেকে সামলে নিল। যা হবার হয়ে গেছে, এখন রাগারাগি করলেও কিছু লাভ হবে না। স্বামীর এ স্বভাব জীবনেও শুধরোবে না,

তা সে জানে। একটু ভেবে সে বলল, 'যাক গে সর্বক্কা, সেটা বাড়িতে থাকলেও আমি চেয়ে দেখতে পারতাম না গহনাটার দিকে। ও গেছে যাক।' এ প্রসঙ্গ এইখানেই ইতি করে দেয় নন্‌জম্মা।

৪

কড়ুর থেকে নুগ্গীকেরের দূরত্ব ন'মাইল। এই পথটা যেতে যেতে কত কথাই ভাবছিল অপ্পন্নায়া। কেমন দেখতে হয়েছে এখন ছেলেমেয়েরা, তারা ওর সঙ্গে কথা বলবে তো? যতই হোক বাড়িতে একজন পুরুষ অভিভাবক থাকা দরকার। যদি ওরা বলে, 'তুমি এখন থেকে এখানেই থেকে যাও, গ্রামে গ্রামে ঘুরে দান-দক্ষিণা আদায় করতে পারবে', তাহলে কি করা উচিত? চলে যাবার সময় সাতু গর্ভবতী ছিল, ছেলে না মেয়ে কি হয়েছে কে জানে! এইসব চিন্তায় অপ্পন্নায়া একেবারে মগ্ন হয়ে পড়েছিল। যদি তারা বলে, 'কি করতে এসেছ এখানে? দূর হয়ে যাও' তাহলে? এখান থেকেই ফিরে যাবে নাকি সে? কিন্তু আবার ভাবে, 'যাই হোক না কেন, এতদূর এসেছি যখন, একবার দেখেই যাব।' সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা নাগাদ অপ্পন্নায়া পৌঁছে গেল নুগ্গীকেরে গ্রামে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল সাতম্মারা প্রায় তিন বছর আগে এ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। এখানে দিন চলা ভার হয়ে উঠেছিল, তাই কড়ুরে গিয়ে বাস করছে। ঠিকানাও পাওয়া গেল,— মার্কেট রাস্তা, গঙ্গাধরপ্পাজীর দোকানের পেছনে।

'কি করে সংসার চালাচ্ছে সেখানে?'

'তা কি করে জানব বলুন? আপনি তাদের কোন আত্মীয় নাকি?' একটু হেসে জিজ্ঞাসা করে গ্রামের লোকটি। অপ্পন্নায়ার মনে হয়, এখানে আত্মপরিচয় দেওয়াটা ঠিক হবে না। আর কোন প্রশ্ন না করে সে ফেরার পথ ধরে। পথে একটা বড় জলাশয়ের বাঁধের ওপারে ঔড্ডরহল্লী গ্রাম। সেখানে বিদেশী বলে পরিচয় দিয়ে এক গৃহস্থ বাড়ি থেকে একটু জোয়ারের আটা চেয়ে নিয়ে রুটি সেঁকে খাওয়া-দাওয়া সারে অপ্পন্নায়া, তারপর রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দেয়। ভোরবেলা উঠে রাত্রের অবশিষ্ট রুটি দিয়ে জলযোগ সেরে আবার এগিয়ে চলে কড়ুরের পথে।

কড়ুর ওর চেনা জায়গা। আগেও এখানে এসেছে। মার্কেটরাস্তা এবং গঙ্গধরজীর দোকান সহজেই পাওয়া গেল। দোকানের পাশ দিয়ে একটা সরু গলি পথ চলে গেছে, সেটা দিয়ে কিছুদূর যেতেই পিছন দিকে ম্যাঙ্গালোরী খাপরার ছাদওয়ালা একটা ছোট বাড়িও পাওয়া গেল, দরজার কড়ায় বেশ বাহার আছে। এরকম বাড়িতে থাকে কি তারা? মনে একটু সন্দেহ দেখা দিচ্ছে অপ্পন্নায়ার, এমন সময় ভিতর থেকে বছর চৌদ্দ-পনেরোর একটি মেয়ে বেরিয়ে এল, হাতে একখানা বই। পরনের শাড়িটি বেশ জমকালো, মুখ-খানিও পাউডার চর্চিত। অপ্পন্নায়া কিন্তু দেখেই চিনেছে, এই তো জয়লক্ষ্মী, তার মেয়ে।

সে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই বাড়িতেই থাক?' মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি কে?'

'চিনতে পারছ না? আমি তোমার বাবা!'

'কোন গাঁয়ের?' জিজ্ঞাসা করেই ভিতরে চলে গেল মেয়েটি।

'দুত্তোর, নিকুচি করেছে ··· ' নিজের মনেই গজ গজ করতে করতে অপ্পন্নায়াও ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে। ঘরের ভিতরকার সাজসজ্জা দেখে সে বেশ ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল---গদীআঁটা চেয়ার, দেওয়ালে ভাল ভাল ছবি, টেবিলের ওপর হোটেলের মত রেডিও— এবার চোখে পড়ল তার স্ত্রী চমৎকার রেশমী শাড়ী পরে, বেণী বেঁধে একটা চেয়ারে বসে আছে, তারও মুখে চড়া প্রসাধন। এত সুন্দর দেখতে তার বৌ? কোলে বছর দুই বয়সের একটি শিশুও রয়েছে। কাছেই একটা বড় সোফায় আরাম করে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট টানছেন এক ভদ্রলোক, বয়স অনুমান চল্লিশ, সাজ-পোশাক দেখে মনে হয় খুবই অবস্থাপন্ন ঘরের মানুষ। গলায় চেন, হাতে সোনার ঘড়ি, দামী দামী আংটি আঙুলে।

অপ্পন্নায়া বলে উঠল, 'এইখানে থাক নাকি তোমরা? আমি তো নুগ্গীকেরে চলে গিয়েছিলাম।'

সাতু চমকে ফিরে তাকাল স্বামীর দিকে। তারপর স্বামী আর কোন কথা বলার আগেই বলে উঠল, 'কে আপনি? কেন এসেছেন?'

'আরে, আমাকে চিনতে পারছিস না? বটে।'

'একে তাড়িয়ে দাও এখান থেকে' বলতে বলতে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল সাতু।

সেই ভদ্রলোক এবার তেড়ে উঠে প্রশ্ন করলেন 'কে তুই? কি চাস?' তাঁর কথার ধরন দেখে ঘাবড়ে গেল অপ্পন্নায়া। সে পিছু ফিরেই এমন জোরে ছুট লাগাল যেন পিছনে কেউ কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। দিশাহারার মত সে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ছুটল কিছুক্ষণ, শেষে হাঁফাতে হাঁফাতে হাঁটতে শুরু করল। একটু পরে দূরে দেখা গেল একটা গ্রাম। পথের লোককে জিজ্ঞাসা করে জানল ওটা বিরুর, ওখান থেকে একটু পরেই তিপটুর যাবার ট্রেন পাওয়া যাবে। তাড়াতাড়ি স্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে, ট্রেন আসামাত্র চড়ে বসল অপ্পন্নায়া। কিন্তু হতচ্ছাড়া গাড়িটা এখান থেকে ছেড়ে আবার সেই কডুরে গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল। কি বিপদ, সেই লোকটা যদি আবার ওকে দেখে ফেলে? তাড়াতাড়ি সামনের জানালাটা বন্ধ করে দিল সে। গাড়ি না ছাড়া পর্যন্ত মুখ লুকিয়ে বসে রইল। তিপটুর না পৌঁছন পর্যন্ত ভয় কাটল না তার। স্টেশনে নেমে অবশিষ্ট পাঁচ আনা পয়সা দিয়ে দোসা খেয়ে গ্রামের পথ ধরল এবার। এতক্ষণে ওর মনে হল, 'লোকটা কে?' উত্তরটাও মনে এল সঙ্গে সঙ্গেই—'ঐ হারামজাদা রক্ষিতা রেখেছে ওর বৌকে!' কুলটা স্ত্রীকে আপাদমস্তক ঝাঁটাপেটা করতে খুবই ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে আর দ্বিতীয়বার ফিরে যাবার সাহস নেই অপ্পন্নায়ার।

পথে কোথাও না থেমে রাত প্রায় দশটার সময় রামসন্দ্রে পৌঁছে অপ্পন্নায়া হনুমান মন্দিরে এসে দরজায় ঘা দিল। ওর গলা পেয়ে দরজা খুলে দিল গঙ্গম্মা। কেরোসিনের বাতিটা জ্বেলেছে সে। অপ্পন্নায়া ঘরে ঢুকে বসতে না বসতে গঙ্গম্মা জিজ্ঞাসা করল, 'ফের তুই সেই ছেনালটাকে দেখতে গিয়েছিলি? তোকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি তো?'

অপ্পন্নায়া কোন জবাব দিল না। মা আবার শুরু করল, 'নির্লজ্জ, বেহায়া কোথাকার!

একটু লজ্জা হল না তোর! শৃঙ্গেরীতে তীর্থে যাবার ছুতো করে তুই গিয়েছিলি বৌয়ের সঙ্গে পীরিত করতে? এই ঠাকুরের মন্দিরে বসার যোগ্য নস্ তুই। দাঁড়া, অন্নাজোইসকে বলে তোকে একঘরে করাচ্ছি! একবার ত্যাগ করে আবার সেই মেয়েমানুষের কাছে যাওয়া, ছিঃ ছিঃ!'

অপ্পন্নায়া এবার খেপে যায়, চিৎকার করে বলে ওঠে, 'মা, তুমি মুখ বন্ধ করবে কিনা?'

'আমি কেন মুখ বন্ধ করতে যাব রে হারামজাদা, তুই গু খেতে গিয়েছিলি, তোরই তো লজ্জা হওয়া উচিত ··· '।

মায়ের বাক্যবাণ সারা শরীরে যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয়। অপ্পন্নায়া আবার চুপ করতে বলায় গঙ্গম্মা গলা আরো চড়িয়ে দিয়ে গালিগালাজ শুরু করে। সামনে পড়েছিল খেজুর পাতার ঝাঁটা। ক্রোধে অন্ধ হয়ে অপ্পন্নায়া সেটাই তুলে নিয়ে মায়ের মুখে, পিঠে, হাতে, পায়ে বেপরোয়া বেশ কয়েক ঘা কষিয়ে দেয় এবার। গঙ্গম্মা এমন ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে যে, আট-দশ জন প্রতিবেশী ঘুম থেকে উঠে ছুটে আসে মন্দিরে। দেখতে দেখতে ভীড় জমে যায়। গঙ্গম্মা অন্নাজোইসকে ডেকে এনেছে, পেছন পেছন অইয়াশাস্ত্রীও হাজির।

অইয়াশাস্ত্রী বলেন, 'গর্ভধারিণী মাকে ঝাঁটাপেটা করা---এর চেয়ে মহাপাপ আর কি হতে পারে!'

অন্নাজোইস বিধান দেন, 'একশ' এক টাকা দণ্ড দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

অপ্পন্নায়া রাগের মাথায় ঝাঁঝিয়ে উত্তর দেয়, 'একটা কানাকড়িও দেব না আমি। আপনারা যেতে পারেন এখান থেকে।'

এমন লোককে কে আশ্রয় দেবে মন্দিরে? সেই রাত্রেই তাকে একঘরে করে মন্দির থেকে তাড়ানো হল। অন্নাজোইসের ইচ্ছা ছিল, গ্রাম থেকেই ওকে বহিষ্কার করা হোক। কিন্তু অপ্পন্নায়া তেড়ে বলল, 'ওহে পুরুতমশাই, এ গ্রামখানা কি আপনার বাপের জমিদারী নাকি?' ওকে এমনভাবে চোটপাট জবাব দিতে কেউ দেখেনি এর আগে। সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল। অপ্পন্নায়া বেরিয়ে পড়ল তার জিনিসপত্র নিয়ে। মা অভিশাপ দিল পেছন থেকে, 'তোর ঐ হাতে পোকা পড়ুক, হাত খসে যাক।'

প্রথমে বৌদির বাড়ির কথাই ভেবেছিল অপ্পন্নায়া, কিন্তু সেখানে গেলেই তো নুগ্গীকেরের কথা জিজ্ঞাসা করবে বৌদি, কি জবাব দেবে তখন? সে চলে গেল মহাদেবায়াজীর মন্দিরে। রাতটা সেই মন্দিরের বারান্দাতেই কেটে গেল। এর পর মাসখানেক গ্রামে আর দেখা গেল না তাকে।

গঙ্গম্মার বাড়ির সব খবরই শুনল নন্‌জম্মা। গ্রামে ফিরেই মায়ের কাছে ছোট ভাইয়ের নামে চুকলি করে এসেছে বলে নিজের স্বামীর ওপর খুব রাগ হচ্ছিল তার। কিন্তু তাকে কিছু বলা বৃথা। গঙ্গম্মা এখন ছোট ছেলে আর বড় বৌ দু'জনকেই সারাক্ষণ গালাগাল দিয়ে চলেছে। নন্‌জম্মা একেবারে নির্বিকার থাকার চেষ্টা করে। বিশ্বকেও সে বলে রেখেছে, পথেঘাটে ঠাকুমা কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে সে যেন বলে 'আমি কিছু জানি না।'

একমাস পরে অপ্পন্নায়া একদিন এল বৌদির বাড়িতে। চেন্নিগরায় ছিল না।

অপ্পন্নায়া বলল, 'ঐ কুলটা মেয়েমানুষ আমার কাছে না থাকলে কি দিন কাটবে না নাকি? আমার কিসের ভাবনা---হিরীসাবের দিকে গিয়েছিলাম, দেড় পাল্লা মড়ুয়া, বরবটি, লঙ্কা কত কি এনেছি। আমার কুড়ি টাকা দিয়ে দাও, দু'-চারখানা বাসন কিনে নেব, ব্যস্।

'থাকবে কোথায়?'

'বীরেগৌড় রাখালের বারান্দায় একখানা ঘর আছে, সেখানা চেয়েছি। বীরেগৌড় বলেছে নিজে রেঁধে-বেড়ে খেয়ে রাজার হালে থাকা যাবে ওখানে।'

তিন দিনের মধ্যেই কুড়ি টাকা সংগ্রহ করে অপ্পন্নায়ার ঋণ শোধ করে দিল নন্জম্মা। কম্বনকেরের বাজারে গিয়ে সে রান্নার জন্য কিছু এল্যুমিনিয়ামের বাসন, একটা মাদুর ও অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এল। এখন সে নিজেই লোন্দা বানিয়ে খায়। কখনও বা বৌদির বাড়ি থেকে একবাটি সম্বর চেয়ে আনে, তাতে ওর দু'বেলা চলে যায়। মাঝে মাঝে ও বাড়িতেই খেয়ে আসে। গঙ্গম্মা দুই পুরোহিতকেই উস্কে দিয়েছিল যাতে অপ্পন্নায়াকে ঘরে ঢুকতে দেবার অপরাধে নন্জম্মাকেও একঘরে করা হয়। কিন্তু পুরোহিতদের সাহসে কুলোয়নি। একে তো সরকারী হিসাবনিকাশ সবই নন্জম্মার হাতে, তারওপর সে শৃঙ্গেরী তীর্থ সেরে এসেছে। এদিকে পুরোহিত দু'জন তো শৃঙ্গেরী কোনদিকে তাই জানেন না।

নন্জম্মা একদিন জিজ্ঞাসা করল দেওরকে, 'নুগ্গীকেরেতে ওদের সঙ্গে কি কথা হল তোমার?'

'সে ছেনাল তো এখন থাকেই না ওখানে।'

'তা কোথায় গেছে কেউ খোঁজ দিতে পারল না?'

'তা কেন পারবে না। কড়ুরে গিয়ে এক বড় লোকের রক্ষিতা হয়েছে হারামজাদী।' অপ্পন্নায়া যা দেখে এসেছে সবই বর্ণনা করল এবার।

শুনে মনটা বিষাদে ভরে গেল নন্জম্মার। তারা দুটি ছেলেমানুষ-মেয়ে এ বাড়িতে বৌ হয়ে এসেছিল। দু'জনেরই স্বামী অমানুষ। তারা নিজেরাই ভালভাবে বাঁচতে জানে না, স্ত্রীদের দেখাশোনা করা তো দূরের কথা। তবু ওরই মধ্যে বড়র চেয়ে ছোট ভাই কিছুটা ভাল। ভাল করে বুঝিয়ে বললে তাকে দিয়ে কাজ করানো যায়। পরিশ্রম করতে পারে। পরিবারের অন্য সবাইকার খাওয়া জুটেছে কিনা খবর নিয়ে তবে নিজে খায়। সাতু যদি একটু বুদ্ধিমতী হত তাহলে বোধহয় এ অবস্থা হত না আজ। কিন্তু কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তো সবার একরকম নয়। এইরকম শাশুড়ী আর স্বামী নিয়ে ঘর করা অতি কঠিন কাজ। মায়ের কুমন্ত্রণায় ছেলে নিজের ঘরেই নিজে আগুন দিয়েছে, স্ত্রীর মঙ্গল-সূত্র ছিঁড়ে নিয়েছে---এ সবই সত্যি। কিন্তু তবু সাতুর এ পথে পা দেওয়া উচিত হয়নি। নন্জম্মা প্রশ্ন করল, 'আর কাউকে এ কথা বলেছো নাকি?'

'না।' উত্তর দিল অপ্পন্নায়া।

'বলে দরকারও নেই। নিজেদেরই ঘরের ইজ্জত নিয়ে কথা।'

'সে ছেনালের নাম করলেও আমার মনে হয় যেন জিভ নোংরা হয়ে যাচ্ছে। কাউকে বলব না আমি।'

'সে কথা নয়। মাঝে মাঝে রেগে গেলে তোমার তো জ্ঞান থাকে না যে, কি বলছ আর কি করছ! সেই জন্যই ঈশ্বরের নামে শপথ কর কোন অবস্থায়, কোন সময়ে এসব কথা মুখে উচ্চারণও করবে না।'

দেওয়ালে টাঙানো ছিল শৃঙ্গেরী থেকে আনা শারদাদেবীর ছবি। অপন্নায়া সেই ছবি স্পর্শ করে শপথ করল, এই পারিবারিক কলঙ্কের কথা কখনও প্রকাশ করবে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

এই আট বছরে গ্রামের বাইরে সরকার থেকে নতুন প্রাইমারী স্কুলের বাড়ি তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন শিবেগৌড় আর তার বাড়িখানা স্কুলকে ভাড়া দিয়ে কিছু রোজগার করতে পারছে না। নতুন স্কুলের এক পাশে খেলার মাঠ, অন্য তিনদিকে ফসল খেত।

নন্‌জম্মা বসে বসে গত বছরের হিসেব লিখছিল, এমন সময় হঠাৎ মাস্টারমশাই এসে হাজির। এসেই বললেন, 'আপনার বিশ্বর কাণ্ড শুনুন।'

মাস্টারমশাই নিজে বলতে এসেছেন দেখেই নন্‌জম্মা বুঝল বিশ্ব নিশ্চয় গুরুতর রকমের কিছু অন্যায় করে বসেছে। আতঙ্কিতভাবে সে জানতে চাইল, 'কাণ্ডটা কি?' মাস্টার বললেন, 'স্কুলের খেলার মাঠের পেছনে যে ফনীমনসার ঝোপ আছে তারই কাছে বেড়ার ধারে বোধহয় সাপের গর্ত আছে। খোলস ছাড়ার আগে সাপ একেবারে নড়াচড়া করতে চায় না, সেই রকম একটা সাপ চুপচাপ রোদে পড়েছিল। বিশ্ব একটা নারকেলপাতার ডাঁটা তুলে নিয়ে তার পিঠে মেরেছে এক ঘা।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করে নন্‌জম্মা।

'ভাগ্য ভাল যে সাপটা তেড়ে আসেনি, সর সর করে সোজা গিয়ে ঢুকেছে ফণীমনসার ঝোপের মধ্যে। আমি স্বচক্ষে ওটাকে ঢুকতে দেখেছি। ছেলে তখনও তার পেছনে তাড়া করে যাচ্ছিল, আমি ধরে ফেলে দুই চড় কষিয়ে দিয়েছি।'

'মেরে ওর হাত ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল।'

'এখন ওকে মেরে তো কোন লাভ নেই। বলে নাকি সাপ বারো বছর পর্যন্ত প্রতিশোধ নেবার জন্য ঘুরে বেড়ায়! ও রোজ স্কুলে যায়, কোনদিন যদি সুযোগ পেয়ে এক ছোবল দেয় তখন কি হবে?'

বুক কেঁপে ওঠে নন্‌জম্মার। 'ছেলেটার কি যে দুঃসাহসী স্বভাব, সবসময় ওর জন্য মনে দুশ্চিন্তা লেগে থাকে। কি হবে এখন মাস্টারমশাই?'

'সাপটা আছে ঐ ঝোপের মধ্যেই! চটপট ঐ ঝোপ কাটিয়ে সাপটাকে খুঁজে বের করে মেরে ফেলা দরকার।'

তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ল নন্‌জম্মা। ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কারিন্দাকে দিয়ে গ্রামের প্রসিদ্ধ সাপ ধরার ওস্তাদ সঞ্জীব নায়েককে ডেকে তাকে একটি টাকা দিয়ে সাপ মারতে পাঠিয়ে দিল। নিজেও গেল ঘটনাস্থলে। গিয়ে দেখে বিশ্ব খেলার মাঠে ডিগবাজি খাচ্ছে। 'সাপ মারতে গেল কেন'—এই প্রশ্ন করায় সে জবাব দিল, 'তিরুমলইয়াদের বাগানে সেদিন সঞ্জীব নায়েক তো অমনি করেই সাপ ধরছিল, আমিও তাই চেষ্টা করছিলাম।'

সঞ্জীব বাঁশের টুকরো ও সাপ ধরার অন্য সব সরঞ্জাম হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কারিন্দা ফণীমনসার ঝোপটা খুঁড়তে শুরু করে দিল। দেখা গেল সাপের গর্ত বা বিলটা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সমস্তটা খুঁড়ে ফেলা হল কিন্তু সাপ পাওয়া গেল না।

সঞ্জীব নায়েক বলল, 'সাপ ব্যাটা বুঝতে পেরেছে যে, এখন ঝোপের মধ্যে খোঁজাখুজি শুরু হবে, তাই সে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে, এখন আর তাকে পাওয়া যাবে না। সে ঠিক তক্কে তক্কে থাকবে, কোনদিন হঠাৎ এসে ছোবল দেবে ছেলেটাকে।'

কথাটা শুনে ছেলের ওপর অসহ্য রাগ হয়ে গেল নন্‌জম্মার। নায়েকের হাত থেকে বাঁশের কঞ্চিখানা টেনে নিয়ে সে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিল বিশ্বর পিঠে। ছেলে কান্না জুড়ে দিল। মাস্টার বললেন, যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর ওকে মেরে তো কোন লাভ নেই। ছেলের হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ি ফিরল নন্‌জম্মা। দুটো ছেলেমেয়ে হারিয়ে এখন এই একটিকে নিয়ে বেঁচে আছে সে। কিন্তু এ ছেলেকে সামলাবে কে? মাঝপুকুরে গভীর জলে চলে যায়, মাঝনদীতে গিয়ে সাঁতার দিতে চায়, মহাদেবায়াজীর মন্দিরের উঁচু পাঁচিল থেকে লাফ দিচ্ছে নয়ত লোকের বাড়ির গরু, বাছুর ধরে তার পিঠে চড়ে বেড়াচ্ছে। কখনও বা একা একা গিয়ে মৌমাছির চাকে খোঁচা দিচ্ছে, কখনও সাপ ধরতে ছুটছে—সমস্তক্ষণ কিছু না কিছু দুরন্তপনার ফন্দী ঘুরছে ওর মাথার মধ্যে। ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে নিজের বাবাকেই বার বার মনে পড়ে নন্‌জম্মার, ঠিক দাদামশায়ের ধারা পেয়েছে এ ছেলে। তাঁর মত একরোখা বুদ্ধি না হলেই মঙ্গল। উপস্থিত যা অনর্থ বাঁধিয়েছে তার জন্য কি উপায় করা যায়? সাপ নাকি বারো বছর পর্যন্ত প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়ায়। ছেলে তো রোজ সকালে উঠেই স্কুলে যাবে। পরদিন বিশ্বকে স্কুলে পাঠাল না নন্‌জম্মা। মাস্টারমশাই এসে বললেন, 'আজ না হয় স্কুলে না গেল, কিন্তু ক'দিন এভাবে বাড়িতে বসিয়ে রাখবে?'

সত্যিই তো, প্রাইমারী স্কুলের পড়া শেষ হলে তবে তো কম্বনকেরের মিডল স্কুলে পড়তে যাবে। তারপর যাবে তিপটুরের হাইস্কুলে। সব পড়াশোনা শেষ হলে তবে হয়ত এলাকাদার বা মিডল স্কুলের মাস্টারের চাকরী পেতে পারে। শিক্ষা না দিতে পারলে তো ঐ নিজের বাপ আর কাকার মত অবস্থা হবে। কি যে করা যায় ভেবে না পেয়ে মহাদেবায়াজীকে জিজ্ঞাসা করে নন্‌জম্মা। সারাদিন ভেবে-চিন্তে তিনি উপদেশ দিলেন, 'এখন তো তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছে, ওকে রেখে এস তোমার ভাইয়ের কাছে, চতুর্থ শ্রেণীর পড়াটা ওখানেই শেষ করুক। তারপর সেখান থেকেই কম্বনকেরের ইংরিজী স্কুলে গিয়ে ভর্তি হবে। এখানকার স্কুলে আর যাবার দরকার নেই। ছুটির সময় গ্রামে এলেও এ স্কুলের ধারে-কাছে ছেলেকে যেতে দিও না। দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে ছেলে। বাচ্চারা বড় হয়ে গেলে মানুষেই চিনতে পারে না, সাপের পক্ষে তো চিনতে পারা আরোই কঠিন।'

'অইয়াজী, সেখানে আমার বৌদিটি কেমন মেয়ে সে তো আপনি জানেন?'

'যেমনই হোক, সেখানে তোমার ঠাকুমাও তো আছেন? তাছাড়া, ছেলেপিলেও নেই তাদের সংসারে। তোমার ভাই নিশ্চয় বিশ্বকে যত্ন করেই রাখবে।'

পরামর্শটা নন্‌জম্মারও খারাপ লাগল না। কিন্তু বিশ্বকে দূরে পাঠিয়ে ও শূন্য ঘরে থাকবে কি করে? এদিকে গ্রামে থাকলে যে ছেলের প্রাণের আশঙ্কা। সুতরাং তার নিজের কথা ভাবলে চলবে কেন? ছুটির সময় নিয়ে এলেই হবে, সে নিজেও মাঝে মাঝে দেখে আসবে গিয়ে। মনস্থির করে ফেলল নন্‌জম্মা---এই দেড় বছর মামার বাড়িতেই থাকুক ছেলে, তাতেই ওর মঙ্গল হবে।

দরজীকে দিয়ে ছেলের নতুন জামা, প্যান্ট সেলাই করাল নন্‌জম্মা। কোড বোলে, চাকলি ইত্যাদি মুখরোচক খাবার তৈরী করল। পরদিন সকালে ভাল করে স্নান করাল ছেলেকে। বিশ্ব কেবলই বলছে, 'মা, আর কোনদিন দুষ্টুমি করব না, আমাকে পাঠিয়ে দিও না মা।' ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে নন্‌জম্মা, 'এই তো মোটে একটা বছর বাবা, তারপরেই তো তুই কম্বনকেরের বড় ইস্কুলে পড়তে যাবি, তখন আমিও তোর কাছে গিয়ে থাকব, তোকে রান্না করে খাওয়াব। শুধু শুধু কেন যে সাপটাকে মারতে গেলি', বলতে বলতে মায়েরও চোখ জলে ভরে ওঠে। গরুর গাড়িতে দু'বস্তা মড়ুয়া, বিশ সের বরবটির ডাল, বেশ কিছুটা রেড়ির তেল, মাথাঘসার মশলা ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে, বিশ্বর সঙ্গে রওনা হয়ে পড়ে নন্‌জম্মা। ছেলের স্কুলের সার্টিফিকেটখানাও সঙ্গে নিয়েছে মনে করে। বলাবাহুল্য চেন্নিগরায় ওদের সঙ্গে যাচ্ছে না।

ভাগ্নে তার কাছে থাকবে শুনে কল্লেশ খুশিই হল। অক্কম্মা তো আনন্দে আত্মহারা। আজকাল আর কুয়ো থেকে জল টানবার শক্তি নেই তার, কিন্তু তবুও সে নন্‌জম্মাকে আশ্বাস দিল সপ্তাহে একবার অন্ততঃ নাতনীর ছেলেকে খুব ভাল করে তেল মালিশ করে স্নান করিয়ে দেবে। কল্লেশের বৌ অবশ্য বেশ বেজার হল, তবে সে তো কাউকেই দেখতে পারে না।

নন্‌জম্মার আনা জিনিসপত্র দেখে কল্লেশ বলে ওঠে, 'এ সবের আবার কি দরকার ছিল? এ বাড়িতে কি অভাব আছে কিছু? ফিরিয়ে নিয়ে যা ওসব।'

'ছেলের খাই-খরচ বলে তো আনিনি, ভাগ্নেকে তুমি খেতে দেবে সে তো জানিই। তবু ঘরে যা ছিল তাই একটু তোমাদের জন্য আনলাম, তুমি এতে আপত্তি কোর না। বিশ্ব কিন্তু ভারি দুরন্ত ছেলে, গ্রামে তো কাউকে এতটুকু ভয় পেত না। দুষ্টুমি করলেই দরকার বোঝ তো দু'-চার ঘা দিও, আমি কাছে নেই বলে কোন সঙ্কোচ কোর না। লেখা-পড়ায় ওর খুব মাথা, গ্রামে তো আমিই বাড়িতে পড়াতাম। এখানে তুমি যদি পার তো একটু পড়িও, না হলে একটি মাস্টার রেখে দিও। আমি মাসে এক টাকা করে তার মাইনে বাবদ পাঠাব।'

কল্লেশ আর কিছু বলতে পারল না, তবে সে ও অক্কম্মা দু'জনেই অনুরোধ করল, 'ক'দিন থেকে যা।' কিন্তু থাকা সম্ভব নয়, অনেক হিসেব লেখার কাজ পড়ে আছে নন্‌জম্মার, তাই পরদিন সকালেই গ্রামে ফিরে গেল সে।

বিশ্ব কাঁদছে আর বলছে, 'মা, আমাকেও নিয়ে চল।' মায়েরও চোখ-ভরা জল, চোখ মুছতে মুছতে গাড়িতে উঠে পড়ল নন্‌জম্মা।

বাবার সঙ্গে দেখা হল না মেয়ের। গত তিন মাস গ্রামে নেই কণ্ঠীজোইসজী।

২

বিশ্বকে রেখে এসে দিন যেন আর কাটতে চায় না। হাতে কাজ রয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু শূন্য ঘর যেন গিলে খেতে আসছে। পার্বতীর আর রামন্নার কথাও মনে পড়ছে আরো বেশী করে। যে ঘরে বসে ও খাতা লেখে, মড়ুয়া পেষে, কেউ এলে তার সঙ্গে বসে কথা বলে সেই ঘরেই তো রোগশয্যায় শুয়ে ছিল দুই ছেলেমেয়ে, দেখতে দেখতে একের পর এক চলে গেল। নন্‌জম্মার আজকাল এ বাড়িতে আর মন টিঁকছে না, কিন্তু যাবেই বা কোথায়? প্রায় তেরো বছর ধরে বাস করছে এখানে, গুণ্ডেগৌড়জীর এ বাড়িখানা তো বলতে গেলে একরকম তার নিজের বাড়িই হয়ে গেছে। তাঁর অবশ্য এ বাড়িখানায় উপস্থিত কোন প্রয়োজন নেই; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তাদের একখানা নিজস্ব বাড়িও থাকা উচিত। এই নিয়ে ভাবতে শুরু করল নন্‌জম্মা।

নতুন বাড়ি এইজন্যই প্রয়োজন যে, ভবিষ্যতে বিশ্বকে এ বাড়িতে থাকতে দেবার ইচ্ছে নেই তার। ছেলেকে সে অন্ততঃ এলাকাদার বা মিডল স্কুলের মাস্টার করে তুলতে চায়। তা যদি সম্ভব হয় তবে ছেলে এ গ্রামে বাস করবে না। মাও ছেলের কাছেই থাকবে এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তাহলেও গ্রামে একটা মাথাগোঁজার স্থান তো থাকা উচিত। ছুটির সময় এসে থাকবে কোথায়? নন্‌জম্মা স্থির করল বাড়ি তৈরীর জন্য একটু জমি কিনবে। তেলী চেলুবশেট্টী শ্বশুরবাড়ির গ্রামে অনেক সম্পত্তি পেয়েছে। সে এ গ্রামের জায়গা-জমি বিক্রী করে চলে যেতে চায়। নন্‌জম্মা এই বিক্রীর কাগজপত্র লিখে দিতে রাজি হল। অর্থাৎ ভাষাটা নন্‌জম্মার তবে লেখাটা পাটোয়ারীজী চেন্নিগরায়ের বলেই ধরা হবে। জমির ক্রেতা লেখার জন্য কোন খরচ দেবে না। নন্‌জম্মা নিজের বাড়ির জন্য যে জায়গাটা পছন্দ করল সেটা চেলুবশেট্টীরই জমির একটা টুকরো। সরকারী নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে নন্‌জম্মা এখন বেশ পারদর্শী। সে খাজনার টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা কাটিয়ে দিয়ে সেই জমির টুক্‌রোটা নিজের নামে লিখিয়ে নিল। মনে মনে বাড়িখানা ছকে ফেলল—বারান্দার কোলে দু'টি ঘর, ভিতরে উঠোনের পাশ ঘেঁসে আরো তিনখানি ঘর, রান্নাঘর, তাছাড়া ফসল জমা করে রাখার জন্য একটা ছোট ঘরও করতে হবে। ছেলের বিয়ে হলেও কাজে লাগবে। পিছনে অন্ততঃ দুটো গরু বাঁধার মত গোয়াল আর ছোট্ট এক টুকরো সব্জী বাগান। খাপরার ছাদওয়ালা এইরকম একখানা বাড়ি করতে খরচ পড়বে অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা।

ফসলের হিসেব লেখানোর নিয়মটা এখনও চালু আছে, কাজেই তার জন্য বাড়তি উপার্জনও হয়। কুরুবরহল্লী ছাড়া, রামসন্দ্র ও লিঙ্গাপুরের লোকেরাও আসে ফসলের হিসেব লেখাতে; মড়ুয়া ইত্যাদি যার যা সাধ্য দিয়ে যায় তারা। বাড়ির খরচও কমে গেছে এখন, একবেলা রাঁধলে দু' বেলা চলে যায়। সুতরাং বেশ কিছু মড়ুয়া বাড়তি থাকে, যা বিক্রী করা চলে। এখন তো এক খণ্ডি মড়ুয়ার দাম বাজারে নব্বুই টাকায় উঠেছে। দু'বছরের বর্ষাসন মেলালে পাঁচ-শ' টাকা হয়। কুরুবরহল্লীর লোকেদের কাছে আগাম খাজনা চাইলে তারা নিশ্চয় দেবে।

ইতিমধ্যে একদিন মাস্টারমশাই এসে খবর দিলেন, 'সরকার থেকে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাদের আঠার বছরের বেশী বয়স, অথচ লিখতে পড়তে জানে না, তাদের জন্য সন্ধ্যা সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত ক্লাস হবে—একে বলে নাইট স্কুল। এই গ্রামে পুরুষদের নাইট স্কুল চালাবার জন্য আমাকে ভার দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের নাইট স্কুলে ক্লাস নেবার জন্য এ গ্রামে লেখাপড়াজানা মহিলার খোঁজ করা হচ্ছিল, আমি আপনার নাম বলে দিয়েছি।

'আমি কি পারব মাস্টারমশাই?'

'কি বলছেন আপনি? মাত্র তো আট মাস কাজ, গোড়াপত্তন করিয়ে দেওয়া আর কি। অ, আ, ক, খ শিখিয়ে দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত পড়িয়ে দিতে হবে, ব্যস্! তারপর তারা নিজেরাই বাড়িতে পত্র-পত্রিকা পড়ে অভ্যাস করবে। মাসে মাসে পঁচিশ টাকা বেতন পাবেন। কেবল মহিলাদেরই পড়াতে হবে।

'লেখাপড়া শিখতে কে চায়? তাও আবার এখানকার মেয়েরা!'

'সরকার থেকে বই, শ্লেট, পেন্সিল সব দেওয়া হবে। আলো জ্বালার তেলের খরচও দেওয়া হবে, ব্ল্যাকবোর্ড, চক-খড়ি সব পাবেন। নিজের বাড়িতেই স্কুল খুলে ফেলুন। প্রথমে অন্ততঃ সাত-আট জন মহিলা যোগাড় করুন, তারপর আরও আসবে। বলেন তো আমার গৃহিণীকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

প্রথমটা একটু আপত্তি করলেও, একদিন তহশিলদার নিজে এসে অনুরোধ করার পর রাজি হয়ে গেল নন্জম্মা। কম্বনকেরের মিডল স্কুলের হেডমাস্টার সমস্ত ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করছেন। তিনি একদিন গরুর গাড়িতে করে ব্ল্যাকবোর্ড, লন্ঠন, শ্লেট, বই ইত্যাদি স্কুলের যাবতীয় উপকরণ পৌঁছে দিয়ে গেলেন। মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রীর অবশ্য অক্ষরজ্ঞান আছে, তবু তাঁকে ভর্তি করে দিলেন তাঁর স্বামী। সর্বক্কা নিজে থেকে এসে ভর্তি হল দেখে অবাক হয়ে গেল নন্জম্মা। তার স্বামীর অমতেই সে পড়তে এসেছে। লিঙ্গায়েত পাড়ার চারজন, তাঁতীপাড়া থেকে দু'জন, রাখালদের পাড়ার জনদুই, এইভাবে সব মিলিয়ে প্রায় চৌদ্দটি ছাত্রী জুটে গেল। বোর্ডে বড় বড় করে লিখে মেয়েদের অ, আ, ক, খ শেখানোর অভিজ্ঞতাটা বেশ নতুন ধরনের লাগছে নন্জম্মার।

যারা শিখবার তারা শিখে নিল চট করে। আর যাদের কিছু হবার নয় তারা পিছিয়েই রইল। কিন্তু সর্বক্কার বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল নন্জম্মা। প্রথম দিনেই সে সবকটা স্বরবর্ণ শিখে ফেলল। এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণ শিখে সে ছোট ছোট সরল শব্দ পড়তে আরম্ভ করে দিল। নন্জম্মাকে বলল, 'তুমি যদি আরো আগেই আমাকে লেখা-পড়াটা শিখিয়ে দিতে তাহলে আমিও তোমার মত হিসেব লিখতে পারতাম।'

নন্জম্মা উত্তর দেয়, 'পাটোয়ারীগিরি করতে হলে তবে তো হিসেব লিখতে হয় সর্বক্কা। সবাই আর কিসের হিসেব লিখবে?

'তাও তো বটে!'

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সংসারের কাজ, খাতা লেখা ইত্যাদি শেষ করতে হয়। বিকেলে মাঝে মাঝে মহাদেবায়াজী আসেন গল্প করতে। সন্ধ্যার পর থেকে সাড়ে আটটা,

ন'টা পর্যন্ত চলে ক্লাস, তারপর খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুম এসে যায় নন্‌জম্মার। এটা একটা মস্ত উপকার হয়েছে তার। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ বিশ্বর কথা মনে পড়ে, কে জানে কেমন আছে ছেলেটা। মার জন্য কান্নাকাটি করে হয়ত। অক্কম্মা আছে, সে ঠিক ভুলিয়েভালিয়ে শান্ত করবে নিশ্চয়।

মাস দুই-তিন ধরে ক্লাস চলছে। ছ'জন ক্লাসে আসা বন্ধ করেছে, এখন বাকি আছে আট জন। মাস্টারমশাই বলেছেন যারা ছেড়ে দিয়েছে হাজরিখাতায় তাদের নামেও রোজ উপস্থিত চিহ্ন দিয়ে রাখতে। ছেলেদের নাইট স্কুল ভালই চলছে, বাইশ জনের মধ্যে বিশ জন নিয়মিত আসে।

একদিন সন্ধ্যায় মাস্টারমশাই এলেন। চেন্নিগরায় যথারীতি বাড়িতে নেই। উনি নিজের বয়স্ক ছাত্রদের কথা বলছিলেন—'এতখানি বয়স হয়েছে, ক'দিন ধরে শেখালেও একটা অক্ষরও মনে রাখতে পারে না, কোথায় যে এদের মন পড়ে থাকে ঈশ্বরই জানেন।'

'দেখুন মাস্টারমশাই, আমাদের অপ্পন্নায়া কাল যখন সম্বর চাইতে আসবে ওকে আমি বলব। আপনি ওকেও আপনার ক্লাসে ভর্তি করে নিন। যখন গ্রামে থাকে তখন দিনের বেলাও মাঝে মাঝে আপনার কাছে গিয়ে পড়তে পারে। একটু লেখাপড়া জানলে ওর আজ এ অবস্থা হোত না।'

মাস্টারমশাই হেসে উঠে বললেন, 'অপ্পন্নায়া? সে তো আর এক নাইট ক্লাসে ভর্তি হয়ে গেছে।'

'সে আবার কি?'

'তার তো আজকাল শুনছি নরসীর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে।'

কথাটা ঠিক বিশ্বাস হল না নন্‌জম্মার। অপ্পন্নায়ার কাছে এসব সখ-শৌখিনতা করার মত পয়সা কোথায়? গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে মড়ুয়ার লোন্দা খেয়ে প্রাণ বাঁচানো, গরীব বামুনের ছেলে সে, পরস্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহসই হবে না তার। নন্‌জম্মা বলল, 'না, মাস্টারমশাই, এটা কেউ নিশ্চয় বাজে গুজব রটিয়েছে।'

'না, আমি শুনেছি কথাটা সত্যি। নরসী এখন আর আগের মত কারবার চালায় না। পয়সার অভাব নেই তার। এদিকে অপ্পন্নায়ারও বউ, বাচ্চা, আপনার জন কেউ নেই। ভিক্ষে করে এনে নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খায়। দু'জনে কি করে এত বন্ধুত্ব হয়ে গেল ঈশ্বর জানেন।

নন্‌জম্মার হঠাৎ ভারি লজ্জাবোধ হল। হাজার হোক, তাদেরই বাড়ির ছেলে, নিজের দেওর। ভিক্ষা করে খাওয়া হয়ত ওর ভাগ্যের লিখন, কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ এ আবার কি বিপত্তি! ক'দিন ধরেই সে ভাবছিল দেওরকে বলবে, ভিক্ষা করে না বেড়িয়ে সে বরং এ বাড়িতে এসেই থাকুক। গরু দুটোর দেখাশোনা করবে, তাহলেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু এ প্রস্তাব করলেই ওদিক থেকে শাশুড়ী আসবেন ঝগড়া করতে, এবং সেই সঙ্গে নানা-রকম আজেবাজে কথা বলে বেড়াবেন তাও সে জানে। তাছাড়া অপ্পন্নায়ারও মেজাজ-মর্জি সবসময় একরকম থাকে না তো, ভিক্ষেয় বেরোতে না পারলে সে ছটফট করে।

যে যার নিজের ভাগ্যে খায়, এই ভেবেই সে চুপ করেছিল এতদিন। কিন্তু এখন মাস্টারমশায়ের কথাটা শুনে মনে হচ্ছে কিছু একটা করা দরকার।

তিন-চারদিন ধরে নন্‌জম্মা অনেক ভাবল। অপ্পন্নায়াকে একটু উপদেশ দেওয়া উচিত, এ-ক্ষেত্রে একেবারে চুপ করে থাকা উচিত নয়। সেদিন দুপুরে সম্বর নেবার বাটি হাতে অপ্পন্নায়া এল, সে সময় চেন্নিগরায় বাড়িতে নেই। নন্‌জম্মা বলেই ফেলল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, কিছু মনে করবে না তো?'

'কি কথা? বলে ফেল।'

'লোকের মুখে কথা কি রকম ছড়ায় জান তো? তুমি নরসীর দোকানে তামাক কিনতে যাও তাই নিয়ে নানাজনে নানারকম গুজব রটাচ্ছে। তা, অন্য কোন দোকান থেকেই কেনাকাটা কর না? শুধু শুধু বদনাম কিনছ কেন?'

'সেই হারামজাদার মায়ের……, কে বলেছে একথা শুনি?'

'যেই বলুক, নিজেরা সাবধানে থাকাই ভাল, তাই নয় কি?'

আর কিছু বলল না অপ্পন্নায়া, চুপচাপ চলে গেল সম্বর নিয়ে। কিন্তু পরদিন আর এল না। এরপর আট দিন ধরে তার জন্য তুলে রাখা সম্বর নষ্ট হল। তারপর থেকে নন্‌জম্মা দেওরের জন্য আর বেশী করে রান্না করত না। সে ভাবল, বোধহয় ঐ কথা বলায় অপ্পন্নায়া তার ওপর চটে গেছে, আর নয় তো লজ্জায় আসছে না। রুটি তো নিজেই গড়ে রোজ, তার সঙ্গে একটা ডাল রেঁধে নেওয়া কি এমন শক্ত কাজ? যার যা কপালে আছে তা ঘটবেই, যতই চেষ্টা কর না কেন। এইসব চিন্তা করতে করতেই নন্‌জম্মা একদিন শুনল অপ্পন্নায়া গ্রামে নেই। এবারে সফরে বেরিয়ে সে ফিরল একেবারে তিন মাস পরে। যে সব অঞ্চলে খালের জল নিয়ে কৃষিক্ষেত্রে সেচনের সুবিধা আছে সেইদিকে গিয়েছিল অপ্পন্নায়া, ফিরে এসে বৌদিকে এক পাল্লা ধান দিল। তারপর আবার রোজ সম্বর নেবার জন্য আসতে শুরু করল।

মাস্টারমশাই একদিন নন্‌জম্মাকে জানালেন, এবারের পর্যটনের পর ফিরে এসে অপ্পন্নায়া আর এক দিনও নাকি নরসীর দোকানের দিকে যায়নি।

৩

মামার সম্বন্ধে বিশ্বর মনে বেশ একটা ভয় আছে। ভাগ্নের সম্বন্ধে কল্লেশের যথেষ্ট দায়িত্ববোধ দেখা যায়। হাটের দিনে সে প্রায়ই বিশ্বর জন্য ছোলাভাজা, বাতাসা ইত্যাদি কিনে আনে। নিজে সঙ্গে করে খেত-খামারে ফলের বাগানে বেড়াতে নিয়ে যায়। কিন্তু দুষ্টুমি করলে এমন চোখ রাঙায় যে, ভয়ে বিশ্বর ঘাম ছুটতে থাকে। একদিন অন্য একটি ছেলের সঙ্গে মারামারি করেছে শুনে কল্লেশ বিশ্বকে এমন জোরে গালে চড় মারল যে, বিশ্ব ছিটকে পড়ল মাটিতে এবং ভয়ে বেচারা প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলল। এরপর অক্কম্মার কাছে কল্লেশই বকুনি খেল। সেদিন বহুক্ষণ ধরে ভুলিয়েভালিয়ে বিশ্বকে শান্ত করল অক্কম্মা।

কমলা তো দু'চক্ষে দেখতে পারে না বিশ্বকে। তার হাঁটা-চলা, কথাবলা সবকিছুর মধ্যেই দোষ দেখে কমলা। কিন্তু অক্কম্মা আর কল্লেশের ভয়ে সে কিছু করতে পারে না। নিজের মনেই বিড় বিড় করে গালাগাল দেয়, 'এই এক হারামজাদা এসে জুটেছে, বসে বসে গিলছে কেবল।'

বিশ্ব কিন্তু আজকাল অনেক শান্ত হয়ে গেছে। তবে পড়াশোনাতে গ্রামের স্কুলে যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিত তেমনটা আর এখানে দিতে পারছে না। এখানে এসে বেশী আদর পেয়ে পড়ায় মন দিচ্ছে না ভেবে কল্লেশ শাসনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু তাতেও কোন উন্নতি দেখা যায় না বিশ্বর। কল্লেশ যখন পড়াতে বসে সে বলির পাঁঠার মত বসে কাঁপতে থাকে আর কেবল আড়-চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে মামা মারবার জন্য হাত তুলছে কিনা। অক্কম্মার তো অক্ষরজ্ঞান নেই। কল্লেশ মনে মনে এইভেবে বেশ তৃপ্তি অনুভব করে যে, ভাগ্নেকে সে শাসনে রেখেছে।

নাগলাপুরের জলাশয় রামসন্দ্রের পুকুরের চেয়ে অনেক বড়। পুকুরের যে পাড়টা গ্রামের দিকে সেখানে জলের মধ্যে বেশ বড় বড় পাথর আছে। বিশ্বর খুব ইচ্ছে করে সাঁতার দিয়ে ঐ পাথরগুলো পর্যন্ত চলে যায়—তারপর একটা পাথরের ওপর শুয়ে শুয়ে গায়ের জল শুকিয়ে গেলে আবার সাঁতারে তীরে ফিরে আসবে। কিন্তু উপায় নেই, মামা কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছে, কিছুতেই জলে নামা চলবে না। মনের কষ্টে চোখে জল এসে যায়। এ গ্রামে এসে পর্যন্ত গাছে ওঠা, মৌমাছির চাক খোঁজা সবই বারণ হয়ে গেছে। নিজেদের গ্রামে পালিয়ে গেলেই হয়! কিন্তু মা হয়ত আবার এখানেই পৌঁছে দিয়ে যাবে। এবার মায়ের ওপরও বিশ্ব খুব চটে যায় মনে মনে।

সেদিন সকালে বই-স্লেট নিয়ে পথে বেরিয়ে বিশ্ব দেখল বহু লোক ভীড় করে তাদের স্কুলের দিকে চলেছে। ভীড়ের সামনের দিকের লোকগুলোর পরনে সাদা জামা, মাথায় সাদা টুপী। একজনের হাতে একটি পতাকা, সে সবার আগে চলেছে এবং মাঝে মাঝে মুখের সামনে একটা জিনিস ধরে চেঁচিয়ে বলছে 'বোলো ভারত-মাতা কি' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জনতা একসঙ্গে বলে উঠছে 'জয়'! মেলায় রথ টানার সময় যেমন করে লোকে সমস্বরে 'হর হর মহাদেও' বলে চেঁচায় এও যেন অনেকটা সেইরকম। সামনের লোকটি মাঝে মাঝে বলছে, 'বোলো মহাত্মা গান্ধি কি', তৎক্ষণাৎ অন্য লোকেরা বলছে 'জয়'! আরো অনেক কিছু বলে বলে জয়ধ্বনি দিচ্ছে তারা। বিশ্বর ভারি মজার লাগল সমস্ত ব্যাপারটা। সামনের লোকটা যা যা বলছে কয়েকবার শোনার পরই মুখস্ত হয়ে গেল তার। একবার সামনের লোকটি চুপ করতেই বিশ্বও ঐ কথাগুলো চিৎকার করে বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতাও জোর গলায় জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। সামনের লোকটি এবার আদর করে বিশ্বর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, 'বাঃ খাসা ছেলে, এস খোকা, তুমিই বল, এই নাও পতাকাটা ধর ভাল করে।' সেই যন্ত্রটা এবার বিশ্বর মুখের সামনে এনে ধরল লোকটি। এক মুহূর্তে বিশ্ব যেন সমস্ত ব্যাপারটার নায়ক হয়ে উঠেছে, খুব মজা লাগছে তার।

স্কুলের সামনের মাঠে এসে শোভাযাত্রাকারীরা সবাই বসে পড়ল, খালি যে লোকটি

ওর হাতে ঝাণ্ডা দিয়েছেন তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। আরেকজন এসে সেই যন্ত্রটা ধরল তাঁর মুখের সামনে, তাতে একটা তার লাগিয়ে সেটা সামনে রাখা টেবিলে একটা চৌকো-মত জিনিসের সঙ্গে জুড়ে দিল। এবার সেই লোকটি বক্তৃতা শুরু করলেন, 'আমার ভাই-বোনেরা, ··· আমাদের দেশ এখন লাল মর্কটদের দখলে। ওরা আমাদের সব সম্পদ লুটে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্তি দিতে হবে, স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে সবাইকে, এখন আমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক ···।'

বহুদূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে বক্তৃতা। ঐ যন্ত্রটার নাম নাকি লাউডস্পীকার। বক্তৃতার শেষে বলা হল, 'আজ শনিবার, চেন্নরায়পট্টনে দুপুরের হাটে অনেক লোকের ভীড় হবে, আপনারাও সবাই এসে সেখানে সভায় যোগ দিন।' অনেকে এদের সঙ্গেই রওনা হয়ে পড়ল। বিশ্বর খুব যাবার ইচ্ছে, সে সেই লোকটির কাছে গিয়ে বলল, 'আমিও যাব সেখানে।'

'আট মাইল পথ, তুমি কি হাঁটতে পারবে খোকা?'

'কেন পারব না, আমি হেঁটে শৃঙ্গেরী গেছি।' জনতার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে দিল বিশ্ব। পথের পাশে জলভরা নালা, খেজুর গাছের বন, পলাশের জঙ্গল ··· আরো কত কি! তবে শৃঙ্গেরীর পথের মত গভীর জঙ্গল নেই এখানে। তাহলেও খুব ভাল লাগছে। দুপুর একটা নাগাদ সবাই পৌঁছে গেল চেন্নরায়পট্টন। বিশ্ব তখন বেশ ক্লান্ত, খিদেও পেয়েছে খুব। সেই ভদ্রলোককে সে কথা বলতেই তিনি ওর হাত ধরে নিয়ে গেলেন এক জায়গায়। সেখানে বড় বড় ডেকচিতে করে রান্না হচ্ছিল। শৃঙ্গেরীর মতই বহুলোক একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে তারপর বাজারের মাঠে গিয়ে জমা হল। সেখানে তখন অজস্র মানুষের ভীড়। শৃঙ্গেরীতেও এত ভীড় দেখেনি বিশ্ব। রামসন্দ্রেও অম্বাদেবীর মেলায় ভীড় হয়, কিন্তু এর তুলনায় সে কিছুই নয়। নাগলাপুরের হাটেও এত লোক আসে না। মাঠের মাঝখানে একটা উঁচু মঞ্চ, তারওপর লাউডস্পীকার রাখা রয়েছে।

যিনি বিশ্বর হাতে পতাকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি হোলেনরসীপুরের লোক। ওকে বললেন, 'কি খোকা, তুমি ভাষণ দেবে নাকি?'

'হ্যাঁ দেব।'

'কি কি বলতে হবে আমি বলে দেব?'

'ওখানে আপনি যা যা বলেছিলেন, সব মনে আছে আমার। ঐ কথাই বলব—বলব যে লাল বাঁদর আমাদের মাকে জেলে বন্দী করে রেখেছে।'

'ঠিক। তাছাড়া আরো কিছু বলতে হবে', এবার উনি বিশ্বকে শেখাতে শুরু করলেন কিভাবে ভাষণ দিতে হবে। সভা আরম্ভ হওয়ার আগে একজন মঞ্চে উঠে লাউডস্পীকারের সামনে দাঁড়িয়ে চমৎকার সুরে গাইল 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত। তারপর সে ঘোষণা করল, 'এবার দেশমাতৃকার সন্তান একটি ছোট্ট ছেলে ভাষণ দেবে, এর কথা শুনে আপনারা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠুন।' হোলেনরসীপুরের সেই ভদ্রলোক বিশ্বকে মঞ্চের ওপর উঠিয়ে নিজেও উঠলেন এবং ওকে দাঁড় করিয়ে দিলেন মাইকের সামনে। সামনের দিকে চেয়ে দেখল বিশ্ব—সামনে যেন এক বিশাল জনসমুদ্র। বেশ ভয় করছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে

তার। পাশ থেকে সেই ভদ্রলোক এবার ধরিয়ে দিলেন, 'ভয় কি, বল ভারত-মাতা কি ...' বিশ্ব এবার জোর গলায় বলে উঠল। আরে! ওর গলার আওয়াজ কতদূর পর্যন্ত শোনা গেল? এই যন্ত্রটা কি অদ্ভুত, কি আছে এর মধ্যে? আহা এরকম একটা যন্ত্র যদি তার কাছে থাকত! ইতিমধ্যে বিশ্বর শ্লোগানে সাড়া দিয়ে সেই জনসমুদ্র জয়ধ্বনি দিয়ে উঠেছে এবং সেই আওয়াজ আরো জোরে দিগ্‌বিদিকে শোনা যাচ্ছে। যে কটা 'ধ্বনি' ওর মনে ছিল সব কটা ও পর পর বলে গেল, জনতাও প্রত্যেকবার মহা উৎসাহে 'জয়' বলল। সেই ভদ্রলোক পাশ থেকে বললেন, 'এবার শুরু করে দাও ভাষণ।' ভরা পুকুরে চোখ-কান বুজে ঝাঁপ দেওয়ার মত করে ও ভাষণ শুরু করে ফেলল, 'ভাই-বোনেরা, —আপনারা সবাই জানেন আমাদের ভারত-মাতার হাতে পায়ে গোলামীর শৃঙ্খল, আমরা পরাধীন। ঐ লাল বাঁদর আমাদের দেশের সমস্ত খাজনা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা কেউ খাজনা দেবেন না। ওরা আমাদের নেশা করিয়ে মাতাল করে রাখতে চায় ... ।' যা যা শেখানো হয়েছিল তাছাড়াও তোড়ের মুখে আরো অনেক কিছু বলে গেল বিশ্ব, লাল বাঁদরদের অনেক গালিগালাজও করল। তবে সহজ বুদ্ধিতেই এটুকু জ্ঞান ওর ছিল যে, ওর বাবা যে ভাষায় গালাগাল দেয় সেগুলো উচ্চারণ করা উচিত নয়। ভাষণ শেষ হতেই সেই ভদ্রলোক ওর গলায় একটা ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। 'ভারত-মাতা কি জয়' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কাঁপিয়ে শোনা গেল করতালিধ্বনি! সে মঞ্চ থেকে নামার পর আর একজন উঠলেন বক্তৃতা দিতে। তিনি বিশ্বর অজস্র প্রশংসা করে বললেন, 'এই সাহসী ছেলেটিকে দেখে আপনারা সবাই প্রেরণা লাভ করুন। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে এই ছেলেটি যেভাবে সিংহশিশুর মত রুখে দাঁড়িয়েছে, আপনারাও সেইভাবে জেগে উঠুন। এ বছর আপনারা কেউ খাজনা দেবেন না। যদি পুলিশ আসে এই বীর বালকের কথা স্মরণ করবেন তাহলেই মনে সাহস আসবে।' এই বক্তা আরও অনেক কথাই বলে গেলেন তার মধ্যে অর্ধেক কথার মানে বুঝল না বিশ্ব।

হঠাৎ জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তে লাগল। দেখা গেল লম্বা লম্বা লাঠি হাতে খাকি উর্দি-পরা অনেক পুলিশ এসে হাজির হয়েছে। সাদা টুপীপরা লোকেদের তারা ঘিরে ফেলল চারিদিক থেকে এবং ছিনিয়ে নিল লাউডস্পীকারটা। দুই তরফে কিছু বাদপ্রতিবাদের পর সবাইকে যেতে হল থানায়। বিশ্বও ছিল সেই দলে। ওদের সবাইকে একটা বড় ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে লোহার শিকল তুলে তালা বন্ধ করে দেওয়া হল। ঘরের মধ্যে থেকে ক্রমাগত শোনা যাচ্ছে, 'ভারত-মাতা কি জয়।' বন্দীরা নিজেদের মধ্যেও কথাবার্তা বলছে। কেউ কেউ ইংরিজীতেও কথা বলছে। এদের কাউকে চেনে না বিশ্ব। যে লোকটি ওকে দিয়ে ভাষণ দিইয়েছিল, সে এই ঘরে নেই। বিশ্ব এবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিল। একজন ওর কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাতে লাগল, 'ভয় কি খোকা, কেঁদোনা, আমরা সবাই একসঙ্গে আছি। তুমি তো বুদ্ধিমান ছেলে। কান্না থামাল বিশ্ব, কিন্তু ওর ভয় করছে খুবই। সকাল থেকে যা যা ঘটছিল সেগুলো তো বেশ মজার খেলা বলেই মনে হচ্ছিল ওর, কিন্তু এখন এরা খেতে না দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে কেন? এইটেই কি জেলখানা নাকি?

সে একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'একেই কি জেলখানা বলে?'

'আরে না না, এ তো রাজবাড়ি।'

'তাহলে রাজসিংহাসন কোথায়?'

'তুখোড় ছেলে বটে', বলাবলি করে সবাই। কেউ বিশ্বর প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না।

হঠাৎ দরজা খুলে এক পুলিশ অফিসার এসে ঢোকে, বিশ্বর হাত ধরে টানে, 'বাইরে এস।'

অন্যেরা সবাই উঠে দাঁড়ায়. বলে ওঠে, 'না, ওকে আমরা ছেড়ে দেব না, আপনারা ওকে মারধোর করবেন।'

'এইটুকু ছেলেকে কে মারবে? ওর অভিভাবক এসেছেন' বলেই ওকে ঘর থেকে বের করে আবার অন্যদের বন্ধ করে দেওয়া হয়। অফিসে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় বিশ্বকে। সেখানে এক মোটাসোটা পুলিশ অফিসার বসে আছেন চেয়ারে। তিনি জেরা শুরু করেন, 'এই ছোঁড়া, কোন গাঁয়ের ছেলে তুই?'

'রামসন্দ্র।'

'রামসন্দ্র? সে আবার কোথায়?' অফিসার পাশে দাঁড়ানো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করেন। জবাবটা বিশ্বই চটপট দিয়ে দেয়, 'তুমকুর ডিস্ট্রিক্ট, তিপটুর তালুক, কম্বনকেরে এলাকায় রামসন্দ্র গ্রাম।'

'বাঃ, সব কিছু জানে দেখছি। কোন ক্লাসে পড়?'

'ক্লাস থ্রিতে।'

'বাবার নাম কি?'

'পাটোয়ারী চেন্নিগরায়।'

'পাটোয়ারীর ছেলে এইসব করে বেড়াচ্ছ? কে নিয়ে এল তোমায় এই দলে?'

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই অন্য পুলিশ কর্মচারীটি বলে উঠল, 'স্যার, রামসন্দ্র অন্য জেলার গ্রাম. সেখান থেকে আসেনি এ', তারপর বিশ্বর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, 'এখন এখানে কোন গ্রাম থেকে এসেছিলি?'

'নাগলাপুর থেকে।'

'সেখানে কি করতে এসেছিলি?'

'ওখানেই স্কুলে পড়ি।'

'কার বাড়িতে থাকিস?'

'কল্লেশজোইসজীর বাড়িতে।'

'তার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক?'

'উনি আমার মায়ের বড় ভাই।'

কর্মচারীটি এবার বলে উঠল, 'এতক্ষণে সব বোঝা গেল। এই কল্লেশ আগে আমাদেরই একজন কনস্টেবল ছিল, স্যার। এই গ্রামের পিছনদিকে পোড়ো ভুতুড়ে বাড়িতে বসে ঐ যে কন্ঠীজোইসজী কিসব মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুক করেন, কল্লেশ হচ্ছে তাঁরই ছেলে। তা, খোকা তুমি এখানে এলে কি করে?'

সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরোবার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব বলল এবার বিশ্ব। পুলিশ অফিসার অন্য কর্মচারীটিকে বললেন, 'কন্ঠীজোইসজীর কাছে পাঠিয়ে দাও ছেলে-টাকে, আমাদের ঘাড় থেকে তো ঝামেলা নামুক।' তারপর মাটিতে বুট জুতোর ঠোক্কর মেরে চোখ রাঙিয়ে বিশ্বর দিকে ফিরে গর্জন করলেন, 'এই দলবলের সঙ্গে মিশে আবার 'জয় জয়' করে বেড়ালে বেত পেটা করব, বুঝতে পেরেছ?' বিশ্ব দারুণ ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'আর করব না কখনো।' পুলিশ কর্মচারীটি সেই রাত্রেই বিশ্বকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। বাজারের রাস্তা ধরে সাবর মস্‌জিদ পেরিয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে ঘা দিল দরজায়। ভিতর থেকে শোনা গেল, 'কে'? উত্তর হল, 'দরজাটা খুলে দিন, আপনার নাতি এসেছে।' ঘরের মধ্যে আলো জ্বলে উঠল এবং দরজা খুলে দিলেন এক বিরাট লম্বা-চওড়া পুরুষ। পুলিশের লোকটি বলল, 'এই নিন, আপনার নাতি কংগ্রেসীদের দলে মিশে এখানে চলে এসেছিল, এবার থেকে সামলে রাখবেন।' বিশ্বকে কন্ঠীজোইসজীর হাতে সমর্পণ করে চলে গেল সে।

বিশ্বর মনে পড়ল এই দাদুটিকে সে আগে দেখেছে, দিদির বিয়ের আগে অক্কম্মার সঙ্গে ইনি এসেছিলেন তাদের বাড়িতে। দাদুর সঙ্গে বাড়ির মধ্যে ঢুকে ঘরের সাজসজ্জা দেখে ভয় করতে লাগল ওর। মাটিতে বাঘছাল পাতা, এদিক্ ওদিক্ মড়ার মাথার খুলি, হাড়গোড় ছড়ানো রয়েছে। নানারকম সুতো, তামার পাত্র, কয়েক জোড়া চটি, জুতো আরো অনেক অদ্ভুত জিনিস রয়েছে সে ঘরে। সে বলে উঠল, 'আমার ভয় করছে।'

'সে কি রে? আজকে তো তুই বেজায় সাহস দেখিয়েছিস, এখন আবার ভয় কিসের? তুই যে আমারই নাতি তা তো তখন বুঝতে পারিনি। শাবাশ বেটা, এই তো মরদের মত কাজ! তুই আমার রুস্তম। মেয়ে আমার রত্নগর্ভা!' এইসব বলতে বলতে নাতিকে আদর করে কাছে বসালেন কন্ঠীজোইসজী।

মেয়ের ওপর রাগ এখনও পড়েনি তাঁর, নন্‌জুর দু'টি সন্তানের মৃত্যুসংবাদ শুনেও নরম হননি কন্ঠীজোইস। কল্লেশের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে অস্বীকার করে নন্‌জু তাকে অপমান করেছে—এ কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারেন না তিনি। নাতি-নাতনীদের সঙ্গে কোনরকম স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি কখনো। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হত বটে যে, মেয়েটা বড় গভীর শোক পেয়েছে, কিন্তু সেই নাতি-নাতনীর জন্য তেমন কিছু বাৎসল্য-রস কখনই অনুভব করেননি তিনি। মেয়ের প্রতি বিরূপতাই বোধহয় তার কারণ। কিন্তু আজ এই নাতি বড় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। পনেরো বিশ হাজার মানুষের সামনে ভাষণ দিয়ে গলায় ফুলের মালার অভিনন্দন লাভ করেছে, পুলিশকেও ভয় করেনি। তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছেন দশজনে এই ছেলেকে 'সিংহশিশু' বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। এর ভাষণ তিনি নিজেও শুনে এসেছেন, এখন নাতির জন্য গর্বে ওঁর বুক ফুলে উঠছে। বিশ্বকে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে এলি কি করে?'

বিশ্ব জানাল যে, সে আজকাল নাগলাপুরেই থাকে। কন্ঠীজোইস বহুদিন নিজের গ্রামে যাননি, এদিকে হাসন, কৌশিক, মগ্গে, রামনাথপুর এইসব জায়গাতেই ইদানীং ঘোরাফেরা করছিলেন।

'কি রে খিদে পেয়েছে?' জিজ্ঞাসা করেন কন্ঠীজোইস।

'হ্যাঁ।'

'ঐ দেখ, ওখানে কলা আর চিনি আছে। এখন ঐ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। কাল সকালে হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াব।'

'কি খাওয়াবে, দোসা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা তোর খেতে ইচ্ছে।'

কলার খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে চিনি মাখিয়ে নাতিকে দিতে লাগলেন কন্ঠীজোইসজী। পেট ভরে খাবার পর দাদুর বিছানাতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে। শালখানা তার গায়ে ঢাকা দিয়ে আলো নিভিয়ে দিলেন দাদু। বিশ্ব ঘুমিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ, কিন্তু তার দাদুর চোখে ঘুম এল না। মেয়েকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছে করছে, বেচারী দু'টি সন্তান হারিয়েছে প্রায় এক বছর হতে চলল। কত রোগা হয়ে গেছে হয়ত! নাতনীর বিয়েতেও যাওয়া হয়নি। অক্কম্মা এসে বলেছিল, খুব ভাল জামাই হয়েছে। নন্‌জার বরটা তো অকর্মার ধাড়ি! আমার অমন মেয়ের স্বামী হবার কোন যোগ্যতাই নেই তার। তবে এই এক-খানা ছেলের মত ছেলে হয়েছে বটে! বিশ্বর কথা ভাবতে ভাবতে পাশ ফিরে ঘুমের চেষ্টা করেন কন্ঠীজোইসজী।

এই সময় আবার কোন আগন্তুকের সাড়া পাওয়া গেল বাইরে। কল্লেশের গলা চিনতে পেরে উঠে আবার বাতি জ্বেলে দরজা খুলে দিলেন কন্ঠীজোইস। ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত বিশ্বকে দেখে যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এল কল্লেশের। দুপুরের পর থেকে সে গ্রামের সমস্ত কুয়ো পুকুর ইত্যাদিতে ছেলে খুঁজেছে। তারপর সন্ধ্যায় কারো মুখে শোনে যে চেন্নরায়পট্টনের সভায় নাকি বিশ্বকে দেখা গেছে। তৎক্ষণাৎ সে রওনা হয়েছে। চেন্নরায়পট্টনে পেঁাছতে পেঁাছতে মাঝরাত, চারিদিক নিশুতি, কল্লেশ পুলিশ থানায় এসে খোঁজখবর করতে শুরু করে। তার পুরোন সহকর্মী যলুপ্পা এখন জমাদার হয়ে গেছে, সেই ওকে খবর দিল যে, বিশ্বকে সে নিজে কন্ঠীজোইসজীর কাছে পৌছে দিয়ে এসেছে। বিশ্বর সাহসের খুব তারিফ করল সে কল্লেশের কাছে।

নাতি কিরকম বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে সে বর্ণনা কন্ঠীজোইসজীও করলেন। কল্লেশের কাছেও অনেক খবর পেলেন তিনি। ছেলেমেয়ের মৃত্যুর পর নন্‌জার শৃঙ্গেরী যাত্রা, সেখানে বিশ্বর মাঝ-নদীতে সাঁতার দেবার দুঃসাহস, গ্রামে সাপের পিছনে লাগতে যাওয়া এবং অতঃপর তার নাগলাপুরে পড়তে আসা, ইত্যাদি সব কথা সবিস্তারে বাবাকে জানাল কল্লেশ।

সকালে সবারই ঘুম ভাঙতে বেশ দেরী হল। বিশ্ব জেগে উঠে এ পাশে ফিরেই দেখে মামা বসে আছে ঘরে। ভয়ে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সকলে মুখ-হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে হোটেলের দিকে চললেন। দাদু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে মশলা দোসা খাবি তো?' ভয়ে বিশ্বর মুখে কোন কথাই বেরল না। দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করায় কোনমতে জবাব দিল, 'আমি কিছু খাব না।' কল্লেশকে দেখে ছেলেটা এত ভয় পাচ্ছে কেন বুঝতে পারলেন না কন্ঠীজোইস। যাহোক উনি নাতির জন্য মশলা দোসা, মৈসুর পাক ইত্যাদির

অর্ডার দিলেন। যাবার আগে কল্লেশকে বললেন, 'ছেলেটাকে এতখানি হাঁটিয়ে নিয়ে যেও না। নতুন ঘোড়া কিনেছি, বাড়ির পিছনে বাঁধা আছে। জিন কষে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাও।'

নিজেই ঘোড়াটাকে নিয়ে এসে পিঠে সাজ পরিয়ে বিশ্বকে বসিয়ে দিলেন ঘোড়ার পিঠে। বিশ্ব মহা খুশি। গ্রামে থাকতে মাঝে মাঝে প্যাটেলের গরু চুরি করে তার পিঠে চড়ে বসত। কিন্তু এমন জিন, লাগাম পরানো ঘোড়ার পিঠে বসা, জীবনে এই প্রথম। প্রথমটা অবশ্য একটু ভয় করেছিল কিন্তু সে একবারও বলল না 'নামিয়ে দাও'। কল্লেশ ঘোড়ার পিঠে উঠে বসার পর কণ্ঠীজোইস বললেন, 'এখন দিন পনেরো ঘোড়াটা ওখানেই রেখে দিও, এর মধ্যে একে ঘোড়ায় চড়াটা শিখিয়ে দাও ভাল করে। পুরুষমানুষের এটা শেখা দরকার।'

ঘোড়ার পিঠে যাত্রা চমৎকার লাগছে বিশ্বর। মামা একটাও কথা বলছে না। বকাবকি কিছুই করেনি। বিশ্বর আরো জোরে ঘোড়াটাকে ছোটাতে ইচ্ছে করছে কিন্তু সেকথা বলতে সাহস হচ্ছে না। চুপচাপ বসে সে এই ভ্রমণটা উপভোগ করছে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। পরশুদিন কি রকম ভাষণ দিয়েছিল তাও মনে পড়ছে। এই ঘোড়াটা যদি বিশ্বর নিজেরই হত কি মজাই না হত। দাদুর কাছে চাইলে হয় না? এই ঘোড়ায় চেপে সে মাঝরাত্রে গ্রামে গিয়ে হাজির হবে, মায়ের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে আর তারপর মায়ের কাছেই থেকে যাবে সে। মাকে ছেড়ে একা থাকাটা একটুও ভাল নয়। সে তো সবসময় ঘোড়ায় চড়েই যাওয়া-আসা করবে, তাহলে সাপ কামড়াবে কি করে? আবার নিজেদের গাঁয়ের স্কুলেই ভর্তি হয়ে যাবে। মাস্টারমশাইকে বলবে না হয়, 'আমি ঘোড়ার পিঠে বসেই পড়ব।' প্রাইমারী শেষ করে এই ঘোড়ায় চেপেই সে রোজ কম্বনকেরের মিডল স্কুলে যেতে পারবে। মামা যদি সঙ্গে না থাকত তাহলে তো এই মুহূর্তেই সে ঘোড়াটাকে তাদের বাড়ির দিকে ছুটিয়ে দিতে পারত। মামা তো জানে কেবল ধরে ধরে মারতে, মামার ঐ হাত ভেঙে গেলে বেশ হয়! এই সব নানাকথা ভাবতে ভাবতে নাগলাপুরে পৌছে গেল বিশ্ব।

বাড়ির সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামতেই অক্কম্মা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বিশ্বকে। বলে উঠল, 'কোথায় চলে গিয়েছিলি, বাপ আমার?' জুতো খুলে কল্লেশ বিনাবাক্যব্যয়ে ঢুকল গিয়ে রান্নাঘরে, একখানা পোড়াকাঠ তুলে নিয়ে বাইয়ে এসেই সে বেধড়ক পিটতে শুরু করে দিল বিশ্বকে। অক্কম্মা চিৎকার করে উঠল, 'ওরে রাক্ষস, কি করছিস, মরে যাবে যে ছেলেটা!' বিশ্বকে বাঁচাতে গিয়ে অক্কম্মাও এক ঘা খেয়ে 'বাপরে মারে' করে চেঁচিয়ে উঠল, তারপর কল্লেশকে গালাগাল দিতে লাগল---কিন্তু ততক্ষণে বিশ্বর পিঠে গায়ে অনেক-বার চ্যালাকাঠের বাড়ি পড়েছে। কল্লেশ মারতে মারতে বকুনিও চালিয়ে যাচ্ছে, 'ভিখিরির মত যার তার পিছু পিছু চলে যাবে, কোন হুঁশ নেই, যদি কিছু গোলমাল হত, আমাকে বদ-নামের ভাগী হতে হত, ইত্যাদি ...।' মারতে মারতে এতক্ষণে কল্লেশের নজর পড়ল বিশ্বর পিঠ থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছে, প্রস্রাব গড়িয়ে যাচ্ছে মেঝেতে। অক্কম্মা ডুকরে কেঁদে উঠল,

'ওখানে সাপের মুখ থেকে বাঁচাতে ছেলেটাকে ওর মা এখানে রেখে গেল, আর তুই কিনা ওকে খুন করে ফেললি?' পাড়া-প্রতিবেশীও ছুটে এসেছে ইতিমধ্যে। কল্লেশ পরীক্ষা করে দেখল, না—প্রাণে বেঁচে আছে ছেলেটা! তাড়াতাড়ি এক ঘটি ঠাণ্ডা জল এনে মুখে মাথায় দিতে লাগল। আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরল বিশ্বর। তার সারা পিঠে লম্বা লম্বা কালশিটের দাগ পড়ে গেছে। কল্লেশ নিজেই ক্ষতস্থানগুলো ধুয়ে চন্দন তেল লাগাতে বসল। বিশ্ব যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চিৎকার করছে তখন।

৪

ইতিমধ্যে রামসন্দ্র থেকে মাস্টারমশাইয়ের বদলীর আদেশ এসে গেল। এ গ্রামে পাঁচ বছর কাজ হয়ে গেছে তাঁর। তিনি নিজের গ্রাম হুলিয়ারীতে বদলীর জন্য চেষ্টা করছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে সেখানেই যাবার হুকুম হয়েছে। এই মাস্টারমশাই ও তাঁর স্ত্রীর অভাব নন্‌জম্মা খুব গভীরভাবেই অনুভব করছে। এঁরা তার নিজের ভাই-বোনের মত তার সুখে-দুঃখে এসে সাহায্য করেছেন। ওঁরা চলে যাবার ছ'মাস পরে নাইট স্কুলও বন্ধ হয়ে গেল। কম্বনকেরের হেডমাস্টার এসে রিপোর্ট লিখলেন, প্রথম দফার নাইট স্কুল খুব ভালভাবেই চলেছে, এবং দ্বিতীয় দফা স্কুল খোলার জন্য সুপারিশও লিখে দিলেন তিনি। প্রথমবারের জন্য নন্‌জম্মার প্রাপ্য সম্মান-ভাতা একশ' কুড়ি টাকার রসিদ লিখিয়ে নিয়ে গেলেন, বললেন টাকাটা শীঘ্রই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নতুন মাস্টার যিনি এসেছেন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়নি নন্‌জম্মার। মহাদেবায়াজী ও মাস্টার বেঙ্কটেশায়াজীর অভাবটা খুবই বোধ করেন।

নন্‌জম্মা এবার তার নতুন বাড়ি তৈরীর কাজে মন দিল। উপস্থিত হাতে আর কোন কাজ নেই, তাই প্রাণপণ খাটতে শুরু করে দিল যাতে বর্ষা নামার আগেই ছাদের খাপরা ছাওয়ার কাজটা হয়ে যায়। বাড়ি তৈরী করানোর কোন অভিজ্ঞতা নেই নন্‌জম্মার, অথচ এ কাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্দেশ দিয়ে করাতে হবে, না হলে দ্বিগুণ খরচ হয়ে যাবে। এখন ওর হাতে যা টাকা আছে তাতে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি এবং দেওয়াল তোলার কাজ হয়ে যাবে। এর পর খাপরা কেনার টাকা চাই। দেওয়ালের কলি ফেরান ইত্যাদি পরে করলেও চলবে। বাড়ির মালমশলা কেনা থেকে আরম্ভ করে দেওয়াল গাঁথা, কাঠের কাজ সব কিছুতেই মহাদেবায়াজীও মজুরদের যথাসাধ্য নির্দেশ দিচ্ছেন। বাড়িতে এখন করবার কিছুই নেই, অথচ চুপচাপ বসে থাকা কুষ্ঠিতে নেই নন্‌জম্মার। সুতরাং সে গৃহ নির্মাণের কাজেই হাত লাগাতে শুরু করল মজুরদের সঙ্গে। মালমশলা মেখে এনে দেওয়ালের ওপর ঢালা, মাটি মাখার জন্য ঘড়া ভরে ভরে জল আনা কোন কাজেই পিছপা নয় সে। যিনি পাটোয়ারীর হিসেবের খাতা লেখেন তাঁকে এইভাবে খাটতে দেখে অন্য মজুররা সঙ্কোচ বোধ করত, কিন্তু নন্‌জম্মার চিন্তাধারা অন্যরকম, সে ভাবে 'এ আমার নিজের বাড়ি, সুতরাং এর জন্য নিজে পরিশ্রম করাই তো উচিত, হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকব কেন?'

প্রায় আট-নয় ফুট দেওয়াল উঠেছে। এবার খাপরা কেনার টাকা যোগাড় করতেই হবে। সেদিন বিকেলে নন্‌জম্মা দেওয়ালের জন্য মাখা নরম মাটি কোদাল দিয়ে চেঁচে তুলে মজুরদের দিচ্ছে এমন সময় হঠাৎ কন্ঠীজোইসজী এসে হাজির। পরনে সাদা ধুতি, গায়ে শাল, কাঁধে একটা থলি। এককালে তিনি আসতেন ঘোড়ায় চড়ে, পরনে থাকত জুতো-মোজা, কোট-প্যান্ট, মাথায় টুপী, কিন্তু সে অন্য কন্ঠীজোইসজী। আজ নন্‌জুর বাবা এসেছেন পায়ে হেঁটে। এসেই বলে উঠলেন, 'নন্‌জা বাড়ি করাচ্ছিস বুঝি? বাঃ ভাল কাজ শুরু করেছিস।'

তাড়াতাড়ি হাতের কোদাল নামিয়ে রেখে মিস্ত্রীদের পরদিনের কাজ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়ে নন্‌জম্মা বাড়ি ফিরল বাবাকে নিয়ে। হাত-পা ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে আগুন দিল। কন্ঠীজোইসজীও রান্নাঘরে এসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন, বললেন, 'আমার জন্য বেশী কিছু রাঁধিসনে নন্‌জা, ভাত আর তেঁতুলের ঝোল হলেই চলবে।' তারপর সবিস্তারে গল্প শুরু করলেন, 'তোর ছেলে তো দেখি মস্ত বীর হয়ে উঠেছে রে! জানিস, অন্ততঃ বিশ হাজার লোক একবাক্যে তাকে সিংহশিশু বলে তারিফ করেছে। হ্যাঁ, ছেলে যদি হতে হয় তো এমনি!' ছেলের প্রশংসা শুনে মায়ের মন ভরে ওঠে আনন্দে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাও হয়, ছেলে যদি এইভাবে সব কিছুতে এগিয়ে যায় তো কোনদিন পুলিশের লাঠির বাড়িতে মাথা ফাটিয়ে আসবে যে! কন্ঠীজোইসজী আবার বলেন, 'বহুদিন এ দিকে আসা হয়নি তো। কাল দেখলাম তোর ছেলেকে। পুলিশের লোক আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কল্লেশের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়ে তাকে নাগলাপুর পাঠিয়ে দিয়েছি। তোকে একবার দেখতে ইচ্ছে হল, তাই ভাবলাম, দেরী করে কি দরকার? ঝোলাটা কাঁধে ফেলে আজই বেরিয়ে পড়ি!'

পার্বতী আর রামন্নার কথা উনি তুললেন না, নন্‌জম্মাও কিছু বলল না নিজে থেকে। বাবা বললেন, 'বাড়ি করাচ্ছিস, এটা ভাল কাজ। আগে জানা থাকলে তো কিছু টাকাও দিতে পারতাম, ছাদে মাঙ্গালোরী টালি দেওয়া যেত। এই তো মাসখানেক আগেই আটশ' টাকা দিয়ে এই ঘোড়াটা কিনে ফেললাম। তা এই নে, এই দুশ'টা টাকা রাখ', বলতে বলতে ভিতরের পকেট থেকে এক গোছা নোট বার করেন কন্ঠীজোইসজী। বলেন, 'রেখে দে, বাড়ি তৈরীর কাজে লাগবে।'

'আপনার দরকার হবে, ওটা রেখে দিন। আমি বাড়ির জন্য টাকার ব্যবস্থা করে ফেলেছি।'

'আমার টাকার কোন প্রয়োজন নেই এখন। তুই রেখে দে এটা।'

সেদিন রাত্রে বাপে-মেয়েতে অনেক গল্প হল। নন্‌জু বলল, 'বাবা, এতখানি বয়স হল, বলতে নেই, ভগবান তোমার শরীর এখনও ভালই রেখেছেন, কিন্তু এখনও এত বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও কেন? পাঁচ-ছ' মাস বাড়ি যাওনি, অক্কম্মা দুঃখ করছিল, তোমার কোন খবরই পাওয়া যায় না! এখন কিছুদিন বাড়িতে থেকে একটু বিশ্রাম কর না কেন?'

'গ্রামে বসে থেকে করবটা কি শুনি?'

'কেন ? আরাম করবে, জিরোবে।'

'কত আর আরাম করব, কিছু কাজ তো থাকা চাই করার মত?' এ কথার কোন উত্তর জানা নেই নন্‌জার। বাবা আবার বলেন, 'তাছাড়া কল্লেশের বৌয়ের ব্যবহার তো জানিস। ও বেটীকে বাড়ি থেকে তাড়াতে না পারলে এক মুহূর্তে বাড়িতে শান্তি নেই। কল্লেশ বউকে অত মারধোর করে বটে, কিন্তু তাড়াতে পারে না। ওকে খুন করে খেতের মধ্যে পুঁতে ফেললেই আপদ চুকে যায়। কিন্তু কল্লেশের যদি সারা জীবন ঐ বউ নিয়ে অশান্তি ভোগ করাই ভাগ্যে থাকে তো তাই করুক, আমি কেন আর ঝামেলায় জড়াতে যাব, এইভেবেই চুপ করে থাকি। আমার আর কিসের চিন্তা, আমি তো যেখানে খুশি থাকতে পারি।'

নন্‌জম্মা কিছু বলল না। তার ইচ্ছা হচ্ছিল বলে যে, 'এখানে এসে থাক না বাবা', কিন্তু সে জানে, মেয়ের বাড়িতে বাস করার পাত্রই নন উনি। তাছাড়া বাবা এখানে থাকলে ওর স্বামী এ বাড়ি ছেড়ে পালাবে। স্বামীর কাণ্ড-কারখানা দেখলে বাবা কোনদিন তাকে ধরে দু'ঘা বসিয়েও দিতে পারেন, সুতরাং সে চুপ করেই রইল। কুড়ি মাইল পথ হেঁটে কন্ঠীজোইসজী বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, একটু পরেই ঘুম এসে গেল তাঁর।

নন্‌জম্মা অনেকক্ষণ বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছিল। ঘুম আসছে না, বিশ্বর জন্য চিন্তা হচ্ছে। স্বপ্ন দেখল, পুলিশ বিশ্বকে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ওকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে। নন্‌জম্মা পালাচ্ছে। ওর পিছনে তাড়া করে আসছে কালোমত একটা সিপাই। সামনে একটা পুকুর পড়ল, সেটা পেরিয়ে ও আরো দূরে পালাতে চাইছে, কিন্তু পুলিশটা যেন অট্টহাসি হেসে বলছে, 'আমার হাত থেকে পালাবে কোথায়?' এই সময় হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। এটা কি কিছু অশুভ স্বপ্ন? সে তো কোন অন্যায় করেনি, পুলিশ তাকে ধরবে কেন শুধু শুধু? শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল নন্‌জম্মা, বহুক্ষণ ঘুম এল না চোখে।

দিন তিনেক মেয়ের বাড়িতে থেকে গেলেন কন্ঠীজোইসজী। বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে কিছু কিছু উপদেশ ও পরামর্শ দিলেন। আর বেশীদিন থাকা সম্ভব নয়, হাসনে একটা 'গৃহবন্ধন' করাবার ডাক আছে, সেইজন্য রওনা হয়ে গেলেন তিনি।

খাপরা কেনার টাকার জন্য চিন্তা হচ্ছিল কিন্তু এখন বাবা এসে টাকা দিয়ে গেছেন। বাবা চলে যাবার পরই নন্‌জম্মা সন্নেনহল্লী গিয়ে বলে এল যে, টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, দু'দিনের মধ্যেই যেন খাপরা পৌঁছে দেওয়া হয়। দেওয়ালগুলো কিছুটা শুকোবার পর খুঁটি লাগানো হল। খাপরা কেনার পরও পঞ্চাশ টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। লাল মাটি দিয়ে বাড়ির দেওয়াল লেপে রঙ করে দিতে হবে, তাহলেই বাড়ি সমাপ্ত হবে। তারপর গৃহ-প্রবেশের ব্যবস্থা। ততদিনে হয়ত নাইট স্কুলের দরুন টাকাটাও এসে যাবে। নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশের পূজো অনুষ্ঠানের জন্য বাবাকেই ডাকবে নন্‌জম্মা, এ গ্রামের পুরোহিত-দের দিয়ে কাজ করাবে না। বিশ্বকেও আনাতে হবে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষ্যে। অক্কম্মা তো আসবেই, কল্লেশও আসবে নিশ্চয়। কল্লেশের বৌয়ের কথা অবশ্য বলা যায় না।

এবার গ্রীষ্মের শুরু থেকেই আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে। বাড়ির ছাদে খাপরা বসাবার আগেই যদি বৃষ্টি নামে তো দেওয়ালগুলো ধসে পড়বে, কাজেই ছাদের কাজটা আগে সেরে ফেলা দরকার। ছুতোর মিস্ত্রীদের কাজের নির্দেশ দিয়ে সে নিজেই আবার

গেল সন্নেনহল্লী। কুবেরশেট্টী বাড়িতে ছিল না, নন্‌জম্মাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল তার জন্য। অবশেষে খাপরার জন্য তাগাদা দিয়ে সে ফিরল। পরদিন এসে গেল খাপরা। ভাল করে রোদ উঠছে না, আকাশে বেশ মেঘের ঘনঘটা। চটপট খাপরা বসাবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। ছাদের দু'দিকে সুদক্ষ মজুররা বসে গেছে, মজুরনীরা মই বেয়ে খাপরা পৌঁছে দিচ্ছে ওপরে। মনে হচ্ছে সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি নামবে। নন্‌জম্মাও সকাল থেকে একটানা খাপরা বওয়ার কাজ করে যাচ্ছে। দুপুরে একবারও বিশ্রাম না করে বিকেল চারটের মধ্যে সব কাজ শেষ করে ফেলা হল। মজুররা ছাদ থেকে নেমে খুশি হয়ে নন্‌জম্মাকে বলল, 'দেখ দিদি, সব কাজ শেষ, তুমিই জিতে গেলে শেষ পর্যন্ত।'

মহাদেবায়াজী কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'জান নন্‌জম্মা, ঐ অপ্পন্নায়া আখের খেতে আগুন লাগায় আর তারই ফলে তোমাদের সমস্ত জমি-জেরাত শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়ে যায়। আমার মনে আছে, সেইদিন চিন্নেয়া আর অপ্পন্নায়া দু'জনে ছাদে উঠে মুষলের বাড়ি মেরে মেরে নিজেদের বাড়ির সমস্ত খাপরা ভেঙেছিল। ঘর গড়া কত কঠিন অথচ ঘর ভাঙা কত সহজ! যাক তুমি শেষ পর্যন্ত সেই ঘর আবার গড়তে পেরেছ।'

চেন্নিগরায়ও ছিল সেখানে। মহাদেবায়াজীর কথাগুলো কানে যেতেই ভীষণ চটে গেল সে। কোন কথা না বলে সরে পড়ল সেখান থেকে।

চারিদিক ছেয়ে ঘনঘটা করে মেঘ জমল বটে কিন্তু বৃষ্টি হল না শেষ পর্যন্ত। রাত্রে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। সকাল থেকে খাপরা তুলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নন্‌জম্মা কিন্তু পোড়া পেটের জন্য যা হোক কিছু ব্যবস্থা তো করতেই হবে। ভাত রেঁধে স্বামীকে মাঠা ও ভাত দিল, তারপর নিজেও খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে পড়তে লাগল পার্বতী আর রামন্নাকে। নিজেদের বাড়ি তৈরী হল, কিন্তু তারা তো একটি দিন সে বাড়িতে বাস করতে পারল না! বিশ্বর কথাও মনে পড়ছে। ছ'মাস হয়ে গেল তাকে রেখে এসেছে নাগলাপুরে। আর পনেরো দিন পরে গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হলেই ওকে নিয়ে আসবে নন্‌জম্মা। ছেলে আবার এখানে এসেই স্কুলের আশেপাশে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। গরুর গাড়ি ঠিক করে নিজেই আনতে যেতে হবে, ছেলেটা হয়ত মা, মা করে হন্যে হচ্ছে। অক্কম্মাকেও আনতে হবে ওর সঙ্গে। আরো এক বছর বিশ্বকে থাকতে হবে নাগলাপুরে, তারপর সে যাবে কম্বনকেরের স্কুলে। রামন্নাকে রোজ দশ মাইল পথ হাঁটতে হত, বিশ্বকেও যাতে তা না করতে হয় সেজন্য ব্যবস্থা করা দরকার। কম্বনকেরেতে একটা ছোটখাট বাড়ি ভাড়া করে সেখানেই ছেলেকে নিয়ে থাকবে নন্‌জম্মা। পাটোয়ারী কাজের হিসেব লেখার কাজ তো ওখানে বসেও চলতে পারে—এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সকালে ঘুম যখন ভাঙল তখন তার সর্ব শরীর ব্যথায় ভারী হয়ে উঠেছে, জ্বরও এসেছে বেশ। গতকাল সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে পরিশ্রম করতে হয়েছে। রোদ অবশ্য নন্‌জম্মাকে কখনই বিশেষ কাবু করতে পারে না, তবে কালকের দুপুরের রোদটা ছিল সত্যিই খুব চড়া, বৃষ্টির আগে ঠিক যেমন হয়ে থাকে আর কি। তাছাড়া মানুষের শরীর তো সবসময় একরকম থাকে না। সারাদিন খাপরা বওয়ার ফলে দুই বগলেও খুব ব্যথা

হয়েছে, ঠিক যেন ফোঁড়া উঠছে! বিছানা থেকে উঠে মুখ, হাত ধুয়ে নন্‌জম্মা বসল গরু দুইতে। বিশ্বকে পাঠিয়ে দেবার পর থেকে দুধ, দই খরচই হয় না। অপ্পন্নায়াও প্রায় এক মাস গ্রাম ছাড়া। তাই রোজ অনেকটা করে মাঠা জমে যায়। জ্বর গায়েই নন্‌জম্মা ছ'খানা রুটি সেঁকল, নিজে আধখানা মাত্র খেয়ে বাকি সাড়ে পাঁচখানা স্বামীর জন্য রেখে সে আবার শুয়ে পড়ল। সারাটা দিন কাটল তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে। সন্ধ্যা হয়ে এল, বাড়িতে কেউ নেই। স্বামী তো কিছুই করবে না। সন্ধ্যাবেলা উঠে আদা আর গোলমরিচ ফুটিয়ে পাঁচন তৈরী করে খেয়ে আবার শয্যায় আশ্রয় নিল নন্‌জম্মা। কখন রাত্রি নামল, কখন স্বামী বাড়ি ফিরেছে, শুয়েছে এসব কিছুই টের পেল না সে।

মাঝরাত্রে স্বামীর নাক ডাকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নন্‌জম্মার। বাইরে যাবার জন্য উঠতে গিয়ে টের পেল দুই কুঁচকিতেও খুব ব্যথা। আবার শুয়ে পড়ল, কিন্তু মনে একটা আশঙ্কাও দেখা দিল এবার। খাপরা তোলার ফলে বগলে ব্যথা হতে পারে, কিন্তু সারাদিন মই বেয়ে ওঠা-নামা করার জন্য যদি কুঁচকিতে ব্যথা হয় তাহলে সেটা সকালেই হওয়া উচিত ছিল। তবে কি এটা প্লেগ? কিন্তু কোথাও তো ইঁদুর মরার খবর পাওয়া যায়নি! তবে গতবারে পার্বতী ও রামন্নার যখন প্লেগ হল তখনও কিন্তু আগে থেকে কোন সঙ্কেতই পাওয়া যায়নি। এবারও কি সেইরকম অতর্কিত আক্রমণ হল নাকি? বেশ ভয় করছে, মহাদেবায়াজীকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।

স্বামীকে ডাকল নন্‌জম্মা, 'শুনছ, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?' স্বামীর নাক ডেকেই চলেছে অবিশ্রান্তভাবে। এবার তার হাত ধরে ঝাঁকানি দিল সে। চেন্নিগরায় ঘুম চোখেই গর্জন করে উঠল, 'রান্নাবান্না না করে সারাদিন শুয়ে পড়ে আছে, এখন আবার মাঝরাত্রে আমার ঘুম নষ্ট করা, চুপচাপ পড়ে থাক্ বলছি।'

নন্‌জম্মার এত রাগ হল যে, ইচ্ছে হল প্রশ্ন করে, 'তুমি কি মানুষ না পিশাচ?' কিন্তু তাহলেই চেন্নিগরায় এখন গালাগালির ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবে, তাতে কষ্ট বাড়বে বই কমবে না। তাই জিভের ডগায় এগিয়ে আসা কথাগুলো কোনমতে গিলে ফেলে সে শুধু বলল, 'মনে হচ্ছে আমারও প্লেগ হয়েছে, মহাদেবায়াজীকে ডেকে আন গিয়ে।'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না, কিন্তু একটু পরেই আবার শোনা যেতে লাগল নাসিকা গর্জন। সকাল পর্যন্ত এইভাবেই পড়ে থাকবে সে তাহলে? না, কিছুতেই না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওষুধ খাওয়া দরকার। সে উঠে কম্বল মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জ্বরের ঘোরে শরীর টলমল করছে। চলতে গেলে দুই উরুতে লাগছে, কিন্তু বগলের মত অত বেশী যন্ত্রণা নয়। কোনমতে মন্দিরের দরজায় এসে নন্‌জম্মা ডাক দিল, 'অইয়াজী—'। গরমের জন্য মহাদেবায়াজী বারান্দাতেই শুয়েছিলেন, তৎক্ষণাৎ সাড়া পাওয়া গেল। 'আমার বোধহয় প্লেগ হয়েছে, আমাদের বাড়িতে চলুন একবার', বলেই বাড়ির দিকে ফিরল নন্‌জম্মা। টলমল করতে করতে নিজের বাড়ি পৌঁছল যতক্ষণে তারমধ্যেই পেছনে মহাদেবায়াজীও এসে গেছেন। দেশলাই বার করে বাতি জ্বালল সে, তারপরেই ধুপ্ করে পড়ে গেল বিছানার ওপর। আলোটা নিয়ে ওকে ভাল করে দেখলেন মহাদেবায়াজী, সারা মুখ ফুলে উঠেছে, চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, মুখ দেখেই বোঝা যায় প্রবল জ্বর।

'কখন জ্বর এল মা?'

'কাল রাত থেকেই এসেছে। কালই বগলে ব্যথা করছিল, তখন ভেবেছিলাম অত খাপরা তুলেছি তাই, কিন্তু এখন ঘুম ভেঙে দেখি দুই পায়ের কুঁচকিতেও ব্যথা।'

একটুক্ষণ কি ভেবে মহাদেবায়াজী প্রশ্ন করেন, 'সন্নেনহল্লীতে গ্রামের ভিতরে ঢুকেছিলে, না বাইরেই ছিলে?'

'লক্কয়াশেট্টীর বাড়ি তো গ্রামের মধ্যেই, কিন্তু কেন? তাতে কি হয়েছে?'

'তার বাড়িতে বসেছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ, আমি যখন গেলাম, সে তো বাড়িতে ছিল না। দু' ঘন্টা সেখানে তার জন্য বসেছিলাম।'

'শুনলাম ও-গাঁয়ে দশ-বারো দিন ধরেই ইঁদুর মরছে। বোকার দল, কোন হুঁশ নেই, এখনও সব গ্রামের মধ্যেই বসে রয়েছে। আজ ওদিকে ভিক্ষায় গিয়ে কথাটা কানে গেল, তাই গ্রামের মধ্যে আর ঢুকলাম না।'

'তাহলে, আপনার কি মনে হয় আমার প্লেগই হয়েছে?'

'ঠিক বলতে পারছি না। তবে যাই হোক তাড়াতাড়ি ওষুধ পড়া দরকার।'

এতক্ষণ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল নন্‌জম্মা, একটুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল চোখ বুজে। তারপর বলল, 'ঘরে পঞ্চাশটা টাকা আছে, যা হয় ওষুধ আনিয়ে দিন, আপনিই একমাত্র ভরসা আমার।' কথাটা শেষ করেই আবার চোখ বুঝল নন্‌জম্মা। গতবার বিশ্বকে কম্বনকেরের হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর কি ঘটেছিল বেশ মনে আছে মহাদেবায়াজীর, হাসপাতালের ডাক্তারের মুরোদ জানা আছে। খাওয়াতে হলে হেমাদি সিরাপই খাওয়ানো উচিত। টাকা কোথায় আছে দেখিয়ে দিল নন্‌জম্মা। টাকা নিয়ে বাইরে এসে মহাদেবায়াজী দেখলেন মধ্যরাত্রি, আকাশে জ্বলজ্বল করছে কালপুরুষ নক্ষত্র। এখন হেঁটে তিপটুর গিয়ে ওষুধ কিনে ভোরের বাসে কে ফিরে আসতে পারবে? চেন্নিগরায়ের তো অন্ধকারে পথ চলার সাহসই নেই। তার মত বেহদ্দ কুঁড়ে আর দু'টি দেখা যায় না। তাছাড়া হাতে টাকা পেলে সে তিপটুরে গিয়ে ওষুধ না কিনে হোটেলে ঢুকে চর্ব্য-চোষ্য খেতে বসে যাবে। অপ্পন্নায়া গ্রামে নেই। মহাদেবায়াজী নিজে অবশ্য যেতে পারেন, কিন্তু বয়স হয়েছে, এখন দ্রুত হাঁটবার শক্তি আর নেই। তাছাড়া তিনি চলে গেলে এখানে রোগিণীকে দেখবে কে? নরসী অবশ্য সবাইকারই বিপদের দিনে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। নিজের দোকানের জন্য জিনিসপত্র কিনতে সে প্রায়ই তিপটুর যায়, কিন্তু একা মেয়েমানুষ এত রাত্রে যাবে কি করে? তবে সে হয়ত অন্য কাউকে পাঠাতে পারবে---এ কথাটা মনে হতেই মহাদেবায়াজী নরসীর দোকানের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়তে লাগলেন। নরসী বাতি জ্বালিয়ে এসে দরজা খুলে দিল, মহাদেবায়াজীর মুখে খবর শুনে আশ্বাস দিয়ে বলে উঠল, 'অইয়াজী, কোন চিন্তা নেই। লিঙ্গাপুরের সম্বন্নাজী ঘরে রয়েছে, আমি বললে সে নিশ্চয় যেতে রাজি হবে।' ভিতরে গিয়ে সম্বন্নার ঘুম ভাঙাল নরসী। এই সম্ভেগৌড়কে মহাদেবায়াজী ভাল করেই চেনেন। নরসীর বাড়িতে এভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় সে বেশ লজ্জা পেয়ে গেল, মাথা নিচু করে এসে দাঁড়াল

বাইরে। মহাদেবায়াজী একটা কাগজে লিখে দিলেন 'তিপটুর বাজার, বেঙ্কটাচল শেট্টীর দোকান, হেমাদি সিরাপ, প্লেগের ওষুধ।' সম্বন্নাকে সব কথা বুঝিয়ে টাকা দিলেন তার হাতে। নরসী বলে দিল, 'জোর কদমে চলে যান, ভোরের বাসেই যাতে ফিরতে পারেন সেই চেষ্টা করবেন।' জুতোজোড়া পরে নিয়ে মাথায় চাদর জড়িয়ে দ্রুত পায়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সন্তেগৌড়।

নরসী এবার বলল, 'অইয়াজী, এ গ্রামে নন্‌জম্মার মত ভাল মেয়ে আর একটিও নেই, অথচ তার ভাগ্যেই এত দুঃখ? শেষ পর্যন্ত কিনা প্লেগ হল! আপনার ধর্ম কি বলে? কেন এমনটা হয় সংসারে?'

এ কথার কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না মহাদেবায়াজী। তাছাড়া এখন এসব কথা ভাবার মত মনের অবস্থাও নেই। বললেন, 'পরে কখনও বুঝিয়ে বলব, এখন যাই, নন্‌জম্মাকে দেখবার কেউ নেই।'

'আমিও যাব কি আপনার সঙ্গে?'

'না থাক', বলেই এগিয়ে যান মহাদেবায়াজী।

'একটু দাঁড়ান', কাছে এসে নরসী বলে, 'আমি যাব না। জানেন, নন্‌জম্মা রাত্রে যখন মেয়েদের জন্য স্কুল খুলেছিল, আমিও সেখানে ভর্তি হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে ভর্তি করতে সে রাজি হল না। তাই এখন আমি গেলে সে বোধহয় খুশি হবে না।'

'তোমায় স্কুলে ভর্তি করেনি বলে রাগ হয়েছে?'

'না, না, আমি জানি, আমি স্কুলে ভর্তি হলে অন্য কোন মেয়ে স্কুলে আসত না।'

ওষুধ এসে পৌঁছবামাত্র পাঠিয়ে দেবার কথা বলে মহাদেবায়াজী ফিরে এলেন। নন্‌জম্মা যেন ঘুমোচ্ছে মনে হল, বাতিটা জ্বলছে। তিনি ওকে না জাগিয়ে চুপচাপ ওর দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে বসে রইলেন। একবার মনে হল চেন্নৈয়াকে ঠেলে তুলে দেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল চেন্নৈয়ার দ্বারা যদি কোন কাজ হত তাহলে এই অসুস্থ মেয়েটার মাঝরাত্রে মন্দিরে ছুটে আসার তো দরকারই হত না। নন্‌জম্মার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে মহাদেবায়াজী ওর জীবনটার কথাই ভাবছিলেন। যখন প্রথম নতুন বৌ হয়ে এ গ্রামে এল তখন তো বাইরের লোকের সঙ্গে কথাই বলত না। তখন শাশুড়ীর দাপটে বেচারী মুখ বুজে থাকত। শাশুড়ী কোনদিন একটা মিষ্টি কথা বলেনি। স্বামীর কাছ থেকে কখনো পায়নি এতটুকু ভালবাসা। তারপর জমি-জায়গা সব যখন যেতে বসল, ঐটুকু মেয়ে কত চেষ্টা করেছিল সে সব বাঁচাতে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে একা সাহস করে আলাদা সংসার পাতল, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাল, মেয়ের বিয়ে দিল। তারপর হারাল দুই সন্তানকে, আর এখন নিজেই এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর মুখে! নন্‌জম্মার মত মেয়ে সংসারে দুর্লভ। অথচ এরই ভাগ্যে এত দুঃখ! এত কষ্ট বোধহয় আর কেউ কখনো ভোগ করেনি। শেষ পর্যন্ত প্লেগের বলি হতে হবে একেই? এই কি ভগবানের বিচার? ঈশ্বর তো দুর্জনের দণ্ডবিধান করেন, সাধুকে রক্ষা করেন। কিন্তু নন্‌জম্মা কি পাপ করেছে? শাশুড়ীর মূর্খতা আর স্বামীর নীচতার সঙ্গে সমানে কেন একে সারা-জীবন সংগ্রাম করতে হল? প্লেগ এসে এরই দু'টি সন্তানকে কেন ছিনিয়ে নিয়ে গেল?

আর আজ একেও নিতে এসেছে? কোথায় যেন লেখা আছে, এ সংসারের কৃত দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপ ঈশ্বর রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। এ কথাটা পড়ার সময় বেশ ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু আজ নন্‌জম্মার এই ব্যাধি দেখে সব যেন গোল-মাল হয়ে যাচ্ছে। এ রহস্যের কে উত্তর দেবে?

এই সময় মৃদু আর্তনাদ করে জেগে উঠল নন্‌জম্মা। মহাদেবায়াজী কাছে এসে বললেন, 'কি কষ্ট হচ্ছে মা?' একটুক্ষণ চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল সে, তারপর বলল, 'আপনি?'

'হ্যাঁ, কি হয়েছে বলত?'

'স্বপ্ন দেখছিলাম। আগেও একবার এই স্বপ্ন দেখেছি। দুটো কালোমত পুলিশ আমাকে তেড়ে আসছে। আমি পুকুর পাড় দিয়ে ছুটছি আর তারা বলছে, "কোথায় পালাবে আমাদের হাত থেকে?" আজও আবার তাদের দেখলাম। আমায় ধরে ফেলেছে, কালো রঙের দড়ি দিয়ে আমায় বাঁধছে---তখনি তো ঘুমটা ভেঙে গেল।'

'জ্বরের ঘোরে মানুষ ওরকম স্বপ্ন দেখে, ও কিছু নয়। চুপচাপ শুয়ে থাক।'

'জ্বরের জন্য নয় অইয়াজী, আমার মরণ ঘনিয়ে এসেছে। আমাকে একটু ভাতের মণ্ড করে খাওয়াবেন? ব্রাহ্মণের বাড়ি বলে কোন সঙ্কোচ করবেন না আপনি। সেদিন নম্ময়া এসেছিল, কিছু চাল কুটে খুদ বানিয়ে রেখেছে। কালো রঙের কৌটোতে আছে, ওখানে গুড়ও পাবেন। না পেলে শুধু চালের মণ্ডই একটু করে দিন আমাকে।

মহাদেবায়াজী বাতি জ্বেলে রান্নাঘরে ঢুকলেন। সেখানে তখনও চেন্নিগরায়ের ভুক্তাবশিষ্ট রুটির ওপর রাত্রের পোকা-মাকড় ঘুরছে। চালের খুদ আর গুড় সহজেই পাওয়া গেল। শুকনো নারকেলপাতা জ্বেলে চটপট মণ্ড প্রস্তুত করে একটা থালায় নিয়ে আবার এঘরে এলেন মহাদেবায়া। নন্‌জম্মাকে ধরে বসিয়ে দিলেন। সমস্ত মণ্ডটুকু তৃপ্তি করে খেয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই বলে উঠল, 'খেয়েদেয়ে এখন একটু শক্তি এসেছে, আপনার সঙ্গে কথা বলি। এরপর হয়ত বেহুঁশ হয়ে পড়ব, আর কিছু বলাই হবে না।'

'জ্বরের সময় বেশী কথা বলতে নেই, এখন চুপচাপ শুয়ে থাক না?'

'না আমি এখনি বলে নিই। আপনি শুনুন। শুনেছি আমার যখন মোটে এক বছর বয়স সেই সময় আমার মা মারা যান। একদিন নাকি আমি আমার দোলনার মধ্যে শুয়ে বহুক্ষণ ধরে একটানা কাঁদছিলাম। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল আর মা ছিল গোয়াল ঘরে তাই আমার কান্না শুনতে পায়নি। ওদিকে বাবা ঘরে বসে কোন সংস্কৃত মন্ত্র মুখস্ত করছিলেন। আমার কান্নার শব্দে তাঁর কাজে ব্যাঘাত হওয়ায় রেগে গিয়ে দোলনা-সুদ্ধ আমায় নিচে যেখানে ছাদের থেকে বৃষ্টির জল পড়ছে সেইখানে রেখে দেন। তারপর আবার ঘরে বসে নিজের পাঠে মন দেন। এদিকে একটু পরে অক্কম্মা ঘরে এসে দোলনা দেখতে না পেয়ে যখন জিজ্ঞাসা করে, 'বাচ্চা গেল কোথায়?' তখন বাবা জবাব দেন যে, তিনি দোলনাসুদ্ধ আমাকে বৃষ্টির মধ্যে নামিয়ে দিয়েছেন। অক্কম্মা গিয়ে তাড়াতাড়ি আমাকে উদ্ধার করে ও বোধহয় ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে সুস্থ করে। ছাদের জল যেখানে ঝরঝর

করে পড়ছিল সেখানে আমার মুখের দিকটা থাকলে তো সেইদিনই মরতাম, কিন্তু সেই জায়গায় ছিল পা দুটো, তাই প্রাণরক্ষা হয়েছিল।'

মহাদেবায়াজী কন্ঠীজোইসের স্বভাবের কথা জানেন, এরকম কাণ্ড করা তাঁর পক্ষে কিছুই অস্বাভাবিক নয়। নন্‌জম্মা আবার বলতে শুরু করে, 'সেইদিনই মরা উচিত ছিল আমার, কিন্তু মরলাম না কেন? এতদিন ধরে এইরকম স্বামীর ঘর করলাম। এত ভাল দুটি সন্তানের জন্ম দিলাম, আবার হারালামও তাদের। এখনও কি আমার বেঁচে থাকা উচিত? আমার ভাগ্যে সবই এমন হল কেন অইয়াজী?'

ঠিক এই কথাটারই উত্তর তো এতক্ষণ ধরে বসে বসে ভাবছিলেন মহাদেবায়াজী। নরসীও জিজ্ঞাসা করছিল ঠিক এই একই কথা। কিন্তু কেন এমন হয়? ঈশ্বরের কি অভিপ্রায় এতে প্রকাশ পায়? তিনি বেদান্ত পড়েছেন, তত্ত্ব এবং লাবণী পাঠ করেছেন। ভজন শিখেছেন। যখন কাশীতে ছিলেন এই ধরনের প্রসঙ্গ নিয়ে কোন বিতর্ক উঠলে খুব মনোযোগ দিয়ে সবাইকার মতামত শুনতেন। আজ কিন্তু নরসী আর নন্‌জম্মার প্রশ্নের কোন জবাব তিনি খুঁজে পেলেন না। নন্‌জম্মা যথেষ্ট লেখাপড়া জানে। এমনকি অনেক সময় মহাভারতের কোন শ্লোক মহাদেবায়াজীর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকলে নন্‌জম্মা সেটা সুর করে গেয়ে তারপর তার সরল অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার আজকের জিজ্ঞাসার উত্তর কি? সেই শৈশবে কেন তার মৃত্যু হল না? নন্‌জম্মার মত বুদ্ধিমতী মেয়েও আজ দিশাহারা, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করছে এ প্রশ্নের উত্তর।

নন্‌জম্মা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, এটা ঠিক ঘুম নয়, প্রায় অচৈতন্য অবস্থা। মহাদেবায়াজী ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন। মুখখানা এত ফুলে উঠেছে যে, তাতে কোন-রকম রেখা ফুটছে না। একটু পরে আবার সে চোখ মেলে কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে বেশ। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সে বলে উঠল, 'পার্বতী আর রামন্না যখন গেল, আপনি আমায় মা যশোদার গল্প বলেছিলেন। ছেলের মৃত্যুর পরও তিনি মৃত্যুভয় কাটাতে পারেননি, তীরে দাঁড়িয়েছিলেন, জলে ঝাঁপ দিতে পারেননি। আমিও সেই রাতে গিয়েছিলাম শ্মশানের পুকুরে ডুবে মরতে। আর একটু হলেই জলে ঝাঁপ দিতাম, কিন্তু মনে পড়ে গেল বিশ্বকে, ফিরে এলাম। কিন্তু এখন কি হবে বিশ্বর? আমি তো যাচ্ছি। অক্কম্মা ওকে খেতে দেবে, খাওয়ার কষ্ট ওর হবে না। কিন্তু নিজের ভাইয়ের ওপর আমার তত ভরসা নেই। আমার ছেলেটার বুদ্ধি অত বেশী না হলেই বোধহয় ভাল হত।'

কথা বলতে বলতেই শরীরের কষ্টে চোখ বুজল নন্‌জম্মা, আবার অচৈতন্য হয়ে পড়ল সে। মহাদেবায়াজী চুপ করে আছেন, কিছুই করার নেই। জেলেপাড়ায় মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছে। রোজ এইসময় ঘুম থেকে ওঠেন উনি। প্রাতঃকৃত্যের জন্য যাবার আগে চেন্নিগরায়কে ডেকে দেওয়া কি উচিত? কিন্তু সে জাগলেও স্ত্রীকে কোন সাহায্যই করবে না। কাজেই বাতিটা জ্বেলে রেখে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে তিনি নিঃশব্দে বাইরে চলে গেলেন। বাঁধের দিক থেকে ফেরার সময় লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল। লোকে বলাবলি করছে, আশেপাশের গ্রামে ইঁদুর মরছে, এ গ্রামে মরা ইঁদুর দেখতে পাওয়ার

আগেই গ্রাম ছাড়তে হবে সবাইকে, গতরাত্রে গ্রামের মোড়লরা মিলে এই সিদ্ধান্তই নিয়েছেন। আজ সকালেই ঢোল পিটিয়ে এ খবর গ্রামে ঘোষণা করে দেওয়া হবে। কাল সন্ধ্যায় নাকি কম্বনকেরে থেকে খবর এসেছে, এ গ্রামে প্লেগের ইঞ্জেক্শান দিতে লোক আসবে, গ্রামের স্ত্রী পুরুষ শিশু সবাই যেন দেবীর মন্দিরের কাছে জমা হয়, সেখানেই ইঞ্জেক্শন দেওয়া হবে। সরকারের হুকুম, রোগ বেশী ছড়াবার আগেই সবাইকে প্লেগের প্রতিষেধক ইঞ্জেক্শন নিতে হবে।

মহাদেবায়াজীর মনে পড়ল, গতবারে কম্বনকেরের ডাক্তার বলেছিল যার প্লেগ হয়েছে তাকে আর ইঞ্জেক্শন দেওয়া চলবে না। গত বছরও এ রোগের প্রথম হামলা হয়েছিল নন্জম্মারই বাড়িতে। এ বারেও কোন পূর্বসঙ্কেত পাবার আগে নন্জম্মাই প্লেগের প্রথম বলি হতে চলেছে। মহাদেবায়াজী নন্জম্মার বাড়ির দিকে এগোলেন এই কথাই ভাবতে ভাবতে।

৫

দুদিনের মধ্যেই গ্রাম ত্যাগ করে সবাই চলে গেল। নন্জম্মার বাড়ি তৈরীর পর যেসব কড়িবরগার কাঠ অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়েই কুটির বেঁধে দিলেন মহাদেবায়াজী। ওঁর নিজের জন্য তো বাঁধের ওপরের পুরোন মন্দির আছেই। গ্রামসুদ্ধ লোক এবার আশ্চর্য হয়ে দেখল গঙ্গম্মা কুঁড়েতে এসে অসুস্থ পুত্রবধূর সেবা করছে। 'বাড়ি না বানালে কি চলত না? ঐ সন্নেনহল্লী গিয়েই তো রোগ কুড়িয়ে আনল। গুরুজনদের কথা শুনলে কি আর এ দশা হয়?' এ সব মন্তব্য অবশ্য সারাক্ষণ বিড়বিড় করে করেই চলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গেই মহাদেবায়াজীর নির্দেশ অনুসারে সময় মত হেমাদি সিরাপ, ভাতের মণ্ড ইত্যাদি খাওয়াচ্ছেও নন্জম্মাকে।

ইঞ্জেক্শন নিয়ে চেন্নিগরায়ের হাতে ব্যথা হয়েছে, সুতরাং সে প্রায় সর্বক্ষণই মহাদেবায়াজীর মন্দিরে আর নয়ত দেবীমন্দিরের বারান্দায় গিয়ে শুয়ে থাকে। মহাদেবায়াজী বলেছিলেন, 'আমি তো সন্ন্যাসীমানুষ, আমি মরলে কারো কোন ক্ষতি হবে না। আমি শুধু শুধু ইঞ্জেক্শন নেব কেন?' কিন্তু সরকারী লোকেরা সে যুক্তি শোনেনি, বলেছে, 'আপনার মৃত্যুর কথা হচ্ছে না, কিন্তু আপনার দ্বারা রোগ আরো ছড়াতে পারে।' সুতরাং তাঁকেও নিতে হয়েছে ইঞ্জেক্শন। একদিন হাতে একটু ব্যথা হয় বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রামের সবাই জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিজের নিজের কুঁড়েতে। কিন্তু গঙ্গম্মা কিছুতেই ইঞ্জেক্শন নিল না।

নন্জম্মার বিছানাটার চার কোণা ধরে চারজন লোক তাকে বিছানাসুদ্ধ তুলে নিয়ে গিয়ে কুঁড়ের মধ্যে শুইয়ে দিল, সে তখন একেবারে অচৈতন্য। সারাদিনই তার জ্ঞান নেই, কিন্তু শাশুড়ী মাঝে মাঝে তার মুখ জোর করে ফাঁক করে ওষুধ আর মণ্ড খাওয়াচ্ছে, সেগুলো গিলতে পারছে সে। কুঁড়েতে আসার পরদিন একটু চেতনা ফিরে এল, কথা বলার চেষ্টা করতে লাগল। মহাদেবায়াজী পাশেই বসেছিলেন, তার মুখের কাছে মাথা নামিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবে?'

'বি ··· শ্বা ···।'

'দেখতে চাও তাকে?'

ইশারায় সম্মতি জানাল নন্‌জম্মা। মহাদেবায়াজী বললেন, 'আচ্ছা, তাকে আনতে লোক পাঠাচ্ছি।' বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। গ্রামসুদ্ধ লোক নিজের নিজের কুঁড়ে তৈরীর কাজে ব্যস্ত, এখন কাকে পাঠানো যায়? ভাবতে ভাবতে কারিন্দার ঘরের সামনে এসে বললেন, 'নন্‌জম্মা তো মরতে বসেছে, ছেলেকে একবার দেখতে চাইছে। কেউ একবার নাগলাপুর যেতে পারবে কি?'

কারিন্দা জবাব দেয়, 'অইয়াজী দেখুন আমার কুঁড়ের অবস্থা, ছাদের নারকেল পাতা ছাওয়াই হয়নি, এখন গৌড়ন্বীর বাগান থেকে পাতা আনতে যেতে হবে আমাকে।'

'ওটা না হয় কাল কোর ভাই। মা মরবার সময় ছেলের হাতের জলটুকুও পাবে না সেটা কি ভাল হবে? একবার যাও ভাই।'

'ঠিক আছে', রাজি হয়ে গেল কারিন্দা। তাকে চটপট রওনা হতে বলে মহাদেবায়াজী ফিরে আসতেই গঙ্গম্মা ওঁকে বলল, 'বউ কিছু বলছে। আমি ওর কথা বুঝতে পারছি না, অইয়াজী আপনি দেখুন একটু।'

মহাদেবায়াজী নন্‌জম্মার মুখের কাছে কান এনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলছ মা?' প্রায় চার পাঁচ মিনিট পরে সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল কিছু। ভাল বোঝা না গেলেও এটুকু বুঝলেন যে নন্‌জম্মা বলতে চাইছে, 'গ্রামে প্লেগ ঢুকেছে, ছেলেকে এখানে আনবেন না।'

'কারিন্দাকে বারণ করে দিচ্ছি' বলে আবার বেরিয়ে গেলেন মহাদেবায়াজী। তাঁর নিজেরও মনে হচ্ছে বিশ্বকে এই রোগের সংস্পর্শে না আনাই ভাল। নন্‌জম্মার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সে এখন ভাবছে, মৃত্যুকালে ছেলের হাতে জল নাই বা পেল, কিন্তু ছেলে যেন দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাকে। তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু নন্‌জম্মার ঠাকুমা আর ভাইকে অন্তত ওর অসুখের খবরটা দেওয়া উচিত। কারিন্দার বাড়ির দিকে ছুটলেন মহাদেবায়াজী। সে তখন মড়ুয়ার লোন্দা খেয়ে রওনা হবার জন্য তৈরী হচ্ছে। তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন, বিশ্ব যেন এ খবর না শোনে কিছুতেই, কিন্তু নন্‌জম্মার ঠাকুমা আর কল্লেশকে যেন কারিন্দা যত শীঘ্র সম্ভব নিয়ে আসে।

কারিন্দা দ্রুতপায়ে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু যতই ছুটে যাক চোলেশ্বর টিলা, নালা, ফণীমনসা ঝোপের ধারের গলিপথ ধরে নাগলাপুর পৌঁছতে পৌঁছতে ওর বেলা দুটো বেজে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে নাগলাপুরের লোকেও গ্রামের বাইরে গিয়ে কুঁড়ে বেঁধেছে। কল্লেশদের কুঁড়েতে গিয়ে জানা গেল, বিশ্ব স্কুলে গেছে। কল্লেশও গ্রামে নেই, হাসানে গেছে, পরদিন ফিরবে। কারিন্দার মুখে খবর শুনে আঁতকে উঠল অক্কম্মা। কল্লেশের জন্য অপেক্ষা করলে চলবে না। কমলুকে বলে দিল, কল্লেশ এলেই যেন তাকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু কমলুকে কোন বিশ্বাস নেই, তাই দু' একজন প্রতিবেশীকে কথাটা বলে সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোন্নাকে ডেকে গাড়ি জুতিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

প্লেগ-রাক্ষসী গত বছর দুটো ছেলেমেয়েকে খেয়েছে, এ বছর আবার খেতে এসেছে তার নন্‌জুকে। শৃঙ্গেরীর শারদাদেবীর কাছে পুজো মানত করে বিশ্ব সেরে উঠেছিল।

এখন নন্‌জুর জন্য কেউ কি আর মানত করবে? তাড়াতাড়ি পথের পাশে এক পুকুর পাড়ে গাড়ি থামিয়ে অক্কম্মা নামল, তারপর হাত-পা ধুয়ে নিজের কোমরের থলি থেকে একটি রূপোর টাকা বার করে হাতে নিয়ে মানত করল নাতনী সেরে উঠলে শৃঙ্গেরী গিয়ে শারদামায়ের কুঙ্কুমার্চনা করাবে। তারপর আবার উঠে বসল গাড়িতে। এবছর সবাই গ্রাম ছেড়েছে, তবু সরকার থেকে গ্রামসুদ্ধ লোককে প্রতিষেধক ইঞ্জেক্‌শনও দেওয়া হয়েছে। কমলা, কল্লেশ, বিশ্ব সবাই ইঞ্জেক্‌শন নিয়েছে কিন্তু বুড়ি অক্কম্মা কিছুতেই রাজি হয়নি। সারাটা জীবন হাসপাতালের জল না খেয়ে কেটে গেল এখন বুড়ো বয়সে ছুঁচ ফুটিয়ে নিজের দেহে হাসপাতালের ওষুধ ঢোকাতে দেবে না সে।

সারাটা পথ অক্কম্মা বার বার কারিন্দাকে জিজ্ঞাসা করছে নন্‌জম্মার অবস্থা কেমন? কারিন্দা বিশেষ কিছুই জানে না, যেটুকু জানে তা বলেছে। অক্কম্মা হোন্নাকে বলছে বলদ দুটোকে আরো জোরে ছোটাতে, আর নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে নন্‌জুর প্রাণের আশঙ্কা নেই নিশ্চয়। প্রাণপণে গাড়ি ছুটিয়েও ওরা যখন রামসন্দ্রে পৌঁছল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে।

৬

নাতনীর সঙ্গে দেখা হল না অক্কম্মার। সে যখন পৌঁছল গঙ্গম্মা তখন উচ্চকন্ঠে বিলাপ করছে। মহাদেবায়াজী জানালেন দুপুরবেলাই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে নন্‌জম্মা। ছেলেকে এই প্লেগের মড়কের মধ্যে আনতে বারণ করেছিল সে, সেই কথাই তার শেষ কথা। শেষ পর্যন্ত নন্‌জম্মার দেহে কোন গ্রন্থি ফুলে ওঠেনি বা ফাটেনি। মিনিট পাঁচেক শ্বাসকষ্ট হবার পরই সব শেষ হয়ে যায়। গঙ্গম্মা পাশে ছিল, সেই মুখে জল দিয়েছে। অক্কম্মাদের জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয়েছিল, কিন্তু প্লেগের মৃতদেহ সারারাত ফেলে রাখলে দুর্গন্ধ হবে বলে শেষ পর্যন্ত শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাত্র আধঘন্টা আগেই শববাহকরা রওনা হয়েছে এখান থেকে।

'ওরে, তোকে একবার শেষ দেখাও দেখতে পেলুম না রে' বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল অক্কম্মা। তারপর, 'শ্মশানে গিয়েই দেখব', বলেই অন্ধকারের মধ্যে ছুটতে শুরু করল। মহাদেবায়াজী বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে শ্মশানে স্ত্রীলোকের যাওয়া উচিত নয়, কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না অক্কম্মা। অগত্যা মহাদেবায়াজী নিজেই ওকে হাত ধরে নিয়ে চললেন, না হলে এই ন্যুব্জদেহা বৃদ্ধা অন্ধকার পথে কোথাও আছাড় খেয়ে আর একটা বিপদ বাধাবে। বাঁধ থেকে নিচে নামার পথটার ধারে দেখা গেল অইয়াশাস্ত্রী ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন নিজের পাওনার আশায়। এদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে যায়?' মহাদেবায়াজী উত্তর দিলেন 'নন্‌জম্মার ঠাকুমা', তারপর অক্কম্মার হাত ধরে নারকেল বাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললেন শ্মশানের দিকে। ওঁরা যতক্ষণে পৌঁছলেন ততক্ষণে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যা যা আচার অনুষ্ঠান করার কথা সবই সমাপ্ত হয়েছে। শব চিতার ওপর তুলে বস্ত্রাদি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। একদিন নবজাত নন্‌জুকে যে রূপে দেখেছিল অক্কম্মা আজ

আবার দেখল সেই রূপে। সেদিন শিশু নন্‌জম্মা ছিল ফুটফুটে ফরসা, আজ এই কালব্যাধি তার সোনার দেহ কালি বর্ণ করে দিয়েছে। অক্কম্মা পাগলের মত ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল নন্‌জুর মৃতদেহটাকে। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে চিতার ওপর থেকে সরিয়ে আনতে বহুক্ষণ লাগল, তারপর তারই চোখের সামনে বড় আদরের নাতনীর দেহের ওপর আরো কাঠ চাপিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হল চিতায়। দেখতে দেখতে ধু ধু করে জ্বলে উঠল আগুন। সেই জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল অক্কম্মা, 'ওরে রাক্ষসী, চোর কোথাকার, আমার ধন তুই ছিনিয়ে নিলি? দাঁড়া, তোর কি শাস্তি দিই দেখ।'

অক্কম্মার কথার অর্থ বুঝতে পারছে না কেউ। সে হঠাৎ পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করেছে, মহাদেবায়াজী তাড়াতাড়ি এসে তার হাত ধরতে গেলেন, এক ঝটকায় তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিল অক্কম্মা। বাঁধের কিনারে অইয়াশাস্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল, এমন করে ছুটছ কেন মা?' সেকথা শুনতেও পেল না অক্কম্মা। সোজা ফিরে এল কুঁড়েতে, সেখান থেকে তুলে নিল খেজুর পাতার ঝাঁটাটা, তারপর গরুর গাড়ীর কাছে গিয়ে হোন্নার খুলে রাখা জুতো তুলে নিল অন্য হাতে। এবার সে ছুটল গ্রামের মধ্যে। গঙ্গম্মা এবং হোন্না কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে আছে। অক্কম্মা কোথায় গেল কিছুই বুঝতে পারছে না তারা। অমাবস্যার পরের রাত্রি, তাই চারিদিকে যেন জমাট বাঁধা চাপ চাপ কালো অন্ধকার। তারই মধ্যে পথ চিনে অক্কম্মা এসে হাজির হল নন্‌জম্মার বাড়িটার সামনে, তারপর বাড়ির দরজায় ঝাঁটা এবং জুতো দিয়ে আঘাত করতে করতে চিৎকার শুরু করল, 'ওরে ছেনাল, সবাইকে ছেড়ে শুধু এই বাড়িটার দিকেই তোর এত নজর কেন? ওর ছেলেমেয়ে দুটোকে খেয়েছিস, আবার মা শারদার কাছে মানত করবার আগেই ওকেও গিলে বসলি? যে তোকে ভয় পায় তাকেই তুই কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাস! এখন আবার ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছিস, আয় বলছি, বাইরে আয়! জুতো মেরে, ঝাঁটা মেরে তোর মুখ ভেঙে দেব, আয় বাইরে ...।' অক্কম্মা প্রাণপণ শক্তিতে বন্ধ দরজাটার ওপর ঝাঁটা আর জুতো বর্ষণ করে চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লেগের দেবীর উদ্দেশ্যে শাপশাপান্ত করতে থাকে। বহুক্ষণ পরে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে বারান্দার ওপর। ঝাঁটা আর জুতো তখনও তার হাতে। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে পড়ে। গত বছর এই বাড়িতেই পার্বতী আর রামন্নার মৃত্যুর পর এসে নাতনীকে কত সান্ত্বনা দিয়েছিল সে। এই বাড়িতেই পার্বতীর বিয়েও দেখেছে। নন্‌জু এ বাড়িতে বাস করেছে তেরো বছর। প্লেগ কেন প্রতি বছর ঠিক এই বাড়িটাতেই এসে হানা দেয়? এতক্ষণে কান্নার বাঁধ ভাঙে অক্কম্মার, প্রথমটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, তারপর অঝোর ধারে। অনেকক্ষণ পরে উঠে দাঁড়ায় সে। এখন আর ঝাঁটা মারতে বা গালাগাল দিতে ইচ্ছে করছে না। সেই অন্ধকারের মধ্যেই ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে আসে গ্রাম থেকে।

মহাদেবায়াজী ওকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায় ছিলেন? সেই থেকে কত খুঁজছি। গ্রাম সবাই ত্যাগ করেছে, ওখানে ঢুকেছিলেন কেন?'

'ঐ প্লেগ রাক্ষসীকে জুতোপেটা করতে।'

শবদাহ শেষ করে ফিরে এসেছে সবাই। চেন্নিগরায় বসে বসে চোখ মুছছে আর

বলছে, 'এই বাড়িটা না বানালে কি ক্ষতি হত? ঐ নতুন বাড়ি তৈরী করতে গিয়েই দেবীর কোপে পড়ল।' সারারাত কাঁদল অক্কম্মা। সকালে উঠেই সে ফিরে যাবে, না কল্লেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তাই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। মহাদেবায়াজী বললেন, 'কল্লেশের জন্য এখানেই অপেক্ষা করুন।' সুতরাং হোন্নাও থেকে গেল গাড়ি নিয়ে।

দুপুরবেলা অক্কম্মা কুঁড়ের মধ্যে শুয়েছিল চুপ করে। গঙ্গম্মা কাছেই বসে আছে মাথায় হাত রেখে। চেন্নিগরায় মনের দুঃখে গ্রামদেবীর মন্দিরের বারান্দায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই সময় দেখা গেল বিশ্ব ছুটতে ছুটতে আসছে। নরসী নিজের দোকানে বসেই তাকে দেখতে পেল। দেখেই সে ছুটে বাইরে এসে বিশ্বকে ডাকল, বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস বাবা?' বিশ্ব জিজ্ঞাসা করল, 'আমার মা নাকি মরে গেছে?'

নরসী বিশ্বকে দু হাতে জড়িয়ে কাছে টেনে নিল। বিশ্ব ছটফটিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ছেড়ে দাও, আমাকে ধরছ কেন? আমি বাড়ি যাব এক্ষুণি।'

'বাড়ি গিয়ে কি করবি বাবা?'

'আমার মা আছে, নিশ্চয় বেঁচে আছে, কক্ষণো মরেনি।'

'আয় আমার সঙ্গে' বলে নরসী বিশ্বকে নিজের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসায়, জিজ্ঞাসা করে, 'একলা চলে এসেছিস?'

'হ্যাঁ!'

'তোকে কে বলল, মা মরে গেছে?'

'আমাদের পাশের কুঁড়ের নাগম্মাজী বলেছে।'

'তাই শুনেই তুই ছুটে চলে এলি?'

'হুঁ'।

'রাস্তা চিনলি কি করে?'

'গাড়িতে চড়ে যাবার সময় তো দেখেছিলাম। বাঁধের ওপর দিয়ে, তারপর ফণী-মনসার ঝোপের পাশের গলি দিয়ে নালা পার হয়ে, তারপর হবিনহল্লী, চোলাটিলা, পলাশের জঙ্গল সব পার হয়ে চলে এলাম।'

ছেলেটার কথা শুনতে শুনতে কান্না পেয়ে যায় নরসীর। বিশ্বকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরে সে।

'নরসী মাসী তুমি কাঁদছ কেন? আমাকে ছেড়ে দাও, বাড়ি যাব আমি', বিশ্ব নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে থাকে। নরসী বলে, 'চল, আমি সঙ্গে যাচ্ছি।' বিশ্বর হাত ধরে ওদের কুঁড়ের কাছে আসতেই অক্কম্মা ছুটে এসে কোলে টেনে নেয় নাতনীর ছেলেকে। ডুকরে কেঁদে ওঠে, 'বাপ আমার তুই যে অনাথ হয়ে গেলি রে—।' বিশ্বরও কান্না পেয়ে যায় এবার। 'মা সত্যি মরে গেছে?' বলতে বলতে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে সে।

৭

সন্ধ্যার মুখে অক্কম্মার তেড়ে জ্বর এল। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, চোখ দুটো লাল হয়ে ঠেলে বেরোচ্ছে, মুখ ফুলে উঠেছে—লক্ষণ দেখে মহাদেবায়াজীর বুঝতে দেরী হল না যে,

অক্কম্মাও প্লেগের বলি হতে চলেছে। বিশ্বকে এ রোগের সংস্পর্শে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। নরসীর কাছে নিয়ে গেলেন বিশ্বকে, বললেন, 'দেখ মা, এই ছেলেটাকে কিছুতেই তোমার বাড়ির বাইরে যেতে দিও না। তুমিই ওকে খেতে দিও, জাত নষ্ট হবার ভয় কোর না। ওর বুড়ি ঠাকুমারও প্লেগ হয়েছে, তাঁর কাছে ও যেন কোনমতেই না যেতে পারে।'

বিশ্ব কিছুই খেতে চায় না, মায়ের জন্য কেবলই কাঁদছে সে। নরসী তাকে নিজের কাছে বসিয়ে রাখল, এক মুহূর্তও একা ছাড়ল না।

নন্‌জম্মার জন্য আনা হেমাদি সিরাপ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। মহাদেবায়াজী সেই ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করলেন অক্কম্মাকে, কিন্তু বুড়ি ওষুধ মুখে ছোঁয়াবে না কিছুতেই। মনে হচ্ছে সে যেন মৃত্যুর জন্য কৃতসঙ্কল্প।

কল্লেশ এসে পৌঁছল রাত দশটায়। যা যা ঘটেছে সবই তাকে জানালেন মহাদেবায়াজী, শুনে খানিকক্ষণ কান্নাকাটি করল কল্লেশ। তারপর কি করা উচিত তারই পরামর্শ চলল।

কল্লেশ বলল, 'বিশ্ব ইঞ্জেক্‌শন নিয়েছে, কাজেই ওর কোন ভয় নেই। মায়ের শ্রাদ্ধাদি না হওয়া পর্যন্ত ও এখানেই থাকুক। তারপর আমি এসে নিয়ে যাব। প্লেগের মড়ক-লাগা গ্রামের মধ্যে ঢুকেই রোগটি বাধাল অক্কম্মা। যাহোক, ওকে আমি গাড়িতে তুলে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

এ প্রস্তাবে আপত্তি করার কিছু নেই। মহাদেবায়াজী সম্মতি দিয়ে বললেন, 'তাই কর তাহলে।' কিন্তু অক্কম্মা জিদ ধরল, 'আমি আর কোথাও যাব না। যেখানে আমার নাতনীকে তোমরা পুড়িয়েছ, সেইখানেই আমাকে দাহ করতে হবে।' কল্লেশ এসব কথায় কান না দিয়ে গাড়িতে ভাল করে খড় বিছিয়ে তার ওপর চট ও শাড়ি পেতে বিছানা করে তাতে শুইয়ে দিল অক্কম্মাকে। তারপর নন্‌জম্মারই একটা কম্বল দিয়ে ভাল করে তাকে ঢাকা দিয়ে, রওনা হল বাড়ির পথে।

পরদিন সকালে গ্রামে ফিরল অপ্পন্নায়া। ইতিমধ্যে গ্রামে প্লেগ শুরু হয়েছে এবং নন্‌জম্মা মারা গেছে—এসব খবর কিছুই শোনেনি সে। এখন সব শুনে খুবই কান্নাকাটি করল। পার্বতীর বিয়ের পর থেকেই বৌদির প্রতি তার মনে বেশ কিছুটা শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব জেগেছিল। তারপর পার্বতী ও রামন্নার মৃত্যু এবং বৌদিকে নিয়ে শৃঙ্গেরী যাত্রার ফলে নন্‌জম্মার প্রতি অপ্পন্নায়ার মনে একটা আন্তরিক টান জন্মেছে। মায়ের কাছ থেকে চলে আসার পর থেকে এই বৌদিই তাকে ডাল-তরকারী যুগিয়েছে প্রতিদিন। আজ তার মনে হল যেন সারা গ্রামে তার আপনার জন বলতে আর কেউ রইল না। নরসীর বাড়ি থেকে বিশ্বকে সে নিয়ে এল নিজের কাছে। অইয়াজী ছাড়া এ গ্রামে বিশ্বর প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী যদি কেউ থাকে তো, সে তার কাকা অপ্পন্নায়া। রেবন্নাশেট্টীর স্ত্রী সর্বক্কা ও আরো অনেক মহিলা এসে বিশ্বকে আদর করল, তার কাছে বসে কাঁদল, কিন্তু তার মাকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারল না কেউ। বিশ্ব শোনে, মাকে নাকি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুড়িয়ে ছাই করে ফেললে আর কি কেউ ফিরে আসতে

পারে? কি দরকার ছিল পুড়িয়ে দেবার? এমনিই রেখে দিলে হয়ত আবার বেঁচে উঠত মা।—এইসব কথাই ভাবতে থাকে বিশ্ব মনে মনে।

বৌদির শ্রাদ্ধ ভাল করে করতে হবে। অপ্পন্নায়া দাদাকে গিয়ে বলে, 'আমার কাছে ষাট টাকা আছে। তোমার কাছে যা আছে সব দাও। বৌদির মত পুণ্যবতীর কাজ খুব ভালভাবে হওয়া উচিত।'

'লক্ষ্মীছাড়ি ছেনালটা তো যথাসর্বস্ব খরচ করে ফেলেছে ঐ বাড়ি তৈরী করতে গিয়ে। আর আমার কাছে কোথা থেকে কি থাকবে?' খিঁচিয়ে উঠে উত্তর দিল চেন্নিগরায়।

মহাদেবায়াজী বললেন, 'ওষুধ কেনার পর বত্রিশটা টাকা বেঁচেছে। আমার কাছে আছে সে টাকা, দিয়ে দিচ্ছি। ভাল করে শ্রাদ্ধ কর। এই গ্রামের পুরোহিতদের দান-দক্ষিণা ঘুষ দিয়ে পরলোকে শান্তি পাবার প্রয়োজন নেই নন্‌জম্মার। পুণ্যবতী ছিল সে, নিজের পুণ্যেই অক্ষয় স্বর্গলোকে চলে গেছে।'

সেদিনই কম্বনকেরের হেডমাস্টার এলেন নাইট স্কুলের দরুন নন্‌জম্মার প্রাপ্য একশ' কুড়ি টাকা নিয়ে। শিক্ষয়িত্রী মারা গেছেন শুনে তার স্বামী চেন্নিগরায়কে দিয়ে সই করিয়ে সে টাকা তার হাতেই দিয়ে গেলেন। অপ্পন্নায়া এ টাকাটাও শ্রাদ্ধে খরচ করতে চায়। কিন্তু মহাদেবায়াজী বললেন, 'ছেলেটার বই-খাতা, কাপড়-চোপড়ের খরচের জন্য রেখে দাও এ টাকাটা।' এবার অপ্পন্নায়া বলল, 'বেশ কথা, তাহলে ও টাকাটা অইয়াজীর কাছে রেখে দেওয়া হোক।' কিন্তু চেন্নিগরায় টাকা হাতছাড়া করার পাত্রই নয়। সে সমস্ত টাকা পুঁটলি বেঁধে, নিজের কোমরের কাপড়ে গুঁজে রেখে দিল।

শেষ পর্যন্ত খুব সাদাসিধেভাবেই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হল। কিছু নারকেল ও শাকসব্জী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অপ্পন্নায়া চলে গেল কুরুবরহল্লী। সে জানত ওখানেও লোকে কুঁড়ে বেঁধে বাস করছে গ্রামের বাইরে। কুরুবরহল্লী গ্রামে প্রবেশ করতে গিয়ে অপ্পন্নায়া দেখে গ্রামবাসীরা গুণ্ডেগৌড়জীর শবদেহ বহন করে নিয়ে চলেছে। সেদিন সকালে মারা গেছেন তিনি। গুণ্ডেগৌড়জীর সঙ্গে অপ্পন্নায়ার বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলেও ছোট-বেলা থেকেই তাঁকে দেখেছে সে। তাঁর সম্বন্ধে ওর মনে বরাবর একটা শ্রদ্ধা মেশানো ভীতির ভাব ছিল। বৌদিকে উনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং অতি মহৎ লোক ছিলেন এটাও জানা ছিল অপ্পন্নায়ার। এখন বৌদির সঙ্গে প্রায় একই সময় এঁরও মৃত্যু ঘটতে দেখে ওর মনে হল, 'দু'জনকেই ভগবান ডেকে নিলেন এক সঙ্গে। পুণ্যাত্মা মানুষদের নাকি ভগবান এ সংসারে বেশীদিন ফেলে রাখেন না। আমার মা আর ঐ নুগ্গীকেরের হারামজাদীটার মত পাপীদেরই বহুদিন বেঁচে থাকতে হয়'---ভাবতে ভাবতে সে ফিরল বাড়ির পথে, কুরুবরহল্লীতে যাওয়ার আর ইচ্ছে নেই তার।

বিশ্বর এখনও উপনয়ন হয়নি। সুতরাং তার পরিবর্তে অপ্পন্নায়াই পুত্রস্থানীয়রূপে অশৌচের সবরকম কর্তব্য পালন করছে। বাগানের কুয়োর পাড়ে বসিয়ে বিশ্বরও মাথা কামানো হল। তারপর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের একপাশে চুপচাপ বসে রইল সে। অন্নাজোইসজী মন্ত্রপাঠ করালেন। নন্‌জম্মার সংসারের বাসনপত্র দিয়েই কাজ হচ্ছে। 'বৈকুণ্ঠ সমারাধন'এর দিন সেইসব বাসন ব্রাহ্মণদের দান করে দেওয়া হল।

৮

বৈকুন্ঠ সমারাধনের দিন দশেক পরে কল্লেশ এসে জানাল, গ্রামে ফিরে যাবার দু'দিন পরেই মারা গেছে অক্কম্মা। এরপর বেচারা কল্লেশ হাসন, কৌশিক, মাবিনকেরে, গোরুরু, হেব্বল ইত্যাদি বহু জায়গায় খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে কন্ঠীজোইসজীর সন্ধান পায় ও তাঁকে অক্কম্মার মৃত্যুসংবাদ জানায়। অক্কম্মারও শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেছে, তাই এবার বিশ্বকে নিয়ে যেতে এসেছে কল্লেশ।

বিশ্ব এখন আর কাঁদে না। মহাদেবায়াজীর মন্দিরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকে তাঁর কাছে। গ্রামে তার মন বসে না। মহাদেবায়াজী নিজের ভিক্ষান্নের থেকে তাকে জোর করে কিছু খাওয়ান। মন্দির ছাড়া অন্যত্র যেখানে বিশ্বকে দেখা যায় সেটা হল নরসীর দোকান। 'আচ্ছা নরসীমাসী, গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে একবার মাকে খুঁজে দেখব? সবাই বলছে, মা মরে গেছে, কিন্তু আমার মনে হয় সব মিথ্যে কথা।' বিশ্বর এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না নরসী। সে শুধু ওর হাতে দুটো বিস্কুট গুঁজে দিয়ে বলে, 'আমি তো জানিনে বাবা! নে, তুই একটু বিস্কুট খা এখন।'

'বিস্কুট চাই না আমার। তুমি ঠিক করে বলত গাঁয়ের মধ্যে বাড়িতে গেলে মাকে পাওয়া যাবে কিনা?'

একদিন সবাইকে লুকিয়ে পরিত্যক্ত গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে বিশ্ব। কিন্তু নিজেদের বাড়িটার দরজায় তালা ঝুলছে দেখে নিঃশব্দে আবার ফিরে আসে।

মামা নিতে এসেছে দেখে সে এবার সাহস করে বলে ফেলল, 'আমি যাব না।'

'কেন যাবি না শুনি?'

'তুমি তো কেবল মারো আমাকে। আমি এ গাঁয়ের স্কুলেই পড়ব।'

কিন্তু এ গ্রামে কে দেখবে ওকে? গঙ্গম্মা অবশ্য বলছে সে বিশ্বকে রাখতে পারে, কিন্তু তার কথায় ভরসা করা চলে না। মহাদেবায়াজীও বোঝাতে চেষ্টা করেন বিশ্বকে— 'মামার সঙ্গেই চলে যাও বাবা।'

'না যাব না। ও আমাকে গরু-গাধার মত মারে।' মামার সামনেই বলে বসল বিশ্ব।

'এবার থেকে আর মারব না' আশ্বাস দেয় কল্লেশ। অন্য সকলেও জোর করতে থাকে, অগত্যা যেতেই হয় বিশ্বকে শেষ পর্যন্ত। অইয়াজী আর কাকা অপ্পন্নায়া মাইল-খানেক পথ এগিয়ে দিতে আসে ওদের। তাদের ফিরতে দেখেই হঠাৎ বিশ্ব চিৎকার করে থামতে বলে মহাদেবায়াজীকে। ছুটে তাঁর কাছে এসে বলে ওঠে, 'অইয়াজী, সবাই বলছে মা মরে গেছে, কিন্তু সেটা মিথ্যেও তো হতে পারে! সবাই যখন কুঁড়ে ছেড়ে গাঁয়ে ফিরে যাবে তখন মা-ও হয়ত ফিরে আসবে। মা এলেই বলে দিও, আমাকে যেন নাগলাপুর থেকে নিয়ে আসে।' মহাদেবায়াজী সেইখানেই দাঁড়িয়ে বলেন 'তাই বলব, বাবা।' কল্লেশ এবার বিশ্বর হাত ধরে এগিয়ে যায়। বিশ্ব অতি অনিচ্ছার ভঙ্গিতে পা ঘষে ঘষে চলেছে আর বারে বারেই পিছু ফিরে ফিরে দেখছে। টিলার ওপরে উঠে

সে পিছনে তাকিয়ে দেখল ওঁরা দু'জনে তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। বিশ্ব চোখের আড়ালে চলে যাবার পর গ্রামের দিকে ফিরতে ফিরতে মহাদেবায়াজী ভাবছিলেন, 'নাগলাপুরে যাবার আগে পর্যন্ত ছেলেটা কত হাসিখুশি ছিল! এখন কেমন যেন শুকিয়ে রোগা হয়ে গেছে। মামা নাকি গরু-গাধার মত পেটায়। এতদিন তবু বুড়ি ঠাকুমাটা ছিল, এখন মামীর হাতে আরো কত দুর্গতি হবে কে জানে। মা-মরা ছেলেটাকে মামা হয়ত এখন আর অত মারধোর করবে না। মাতৃহীন শিশুদের ঈশ্বর স্বয়ং রক্ষা করেন।'

কুঁড়ে ঘরে ফিরে এল অপ্পন্নায়া। এ ক'দিন সে স্থির হয়ে কোন কিছু ভাববার অবকাশই পায়নি। এখন মনে পড়ল তার জিনিসপত্র সবই তো বীরেগৌড়ের বারান্দার ছোট ঘরখানায় পড়ে আছে। গ্রামে এখন মানুষজন বাস করছে না। তারও নিজের জন্য একটা কুঁড়ে বেঁধে ফেলা উচিত। কিন্তু সেসব অনেক হাঙ্গাম। বর্ষা না পড়লে কেউ এখন গ্রামে ফিরে যাবে না। সুতরাং আবার পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেই হয়? সে স্থির করে ফেলল পরদিন সকালেই আবার বেরিয়ে পড়বে।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর গঙ্গম্মা বলল, 'যতদিন ঐ হতভাগী ছিল, আমার নিন্দে করে সবাইকার কান ভাঙাত আর ঝগড়া বাধাত। এখন আর কোন দুঃখে তুই আলাদা থাকবি? এখানেই একসঙ্গে থাক।'

কথাটা শুনেই জ্বলে উঠল অপ্পন্নায়া। বলল, 'সে কোনদিনও আমার কান ভাঙায়নি। তুমিই যত নষ্টের গোড়া।'

'নিজের গর্ভধারিণী মাকে এমন কথা বলিস? তুই একটা চণ্ডাল, রাঁড়ের পুত কোথাকার!'

'বেশ করব বলব। তোর সঙ্গে থাকব না আমি, তুই মরলে ছেরাদ্দও করব না বুঝলি?' নিজের জামা-কাপড় পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে অপ্পন্নায়া তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ল কুঁড়ে ছেড়ে। বাইরে চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেছে। কোনদিকে যাবে সেটা এখন পর্যন্ত ভাবা হয়নি। মিনিট পাঁচেক চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল অপ্পন্নায়া। এই অঞ্চলে মড়ুয়া ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না, তাছাড়া প্লেগের প্রকোপে সব গ্রাম এখন জনশূন্য। সুতরাং যেসব এলাকায় খালের জল-সেচ ব্যবস্থা আছে সেদিকেই যাওয়া ভাল। দিব্যি চাঁদের আলো। বেডেকেরে এখান থেকে প্রায় আট মাইল। এখন গ্রামের বাইরের মন্দিরে গিয়ে শুয়ে থাকা যাক, ভোর হলে যাত্রা শুরু করলেই হবে, এই স্থির করে মন্দিরের দিকে পা বাড়াল অপ্পন্নায়া।

সকালবেলা চালচুলোহীন অপ্পন্নায়া যখন দেশ পর্যটনে বেরিয়ে পড়ল ঠিক সেই সময়ে তার দাদা গিয়ে বসেছে অন্নাজোইসের কুঁড়েতে। সেখানে চেন্নিগরায়ের নতুন করে সংসার পাতার সলা-পরামর্শ আরম্ভ হয়ে গেছে। নন্‌জম্মার 'বৈকুন্ঠ সমারাধন' অনুষ্ঠানের দিনই পুরুতমশাই চেন্নিগরায়ের কাছে আবার বিবাহের প্রস্তাব এনেছিলেন। তিপটুর থেকে তিন মাইল দূরে বেবিনহল্লীতে নাকি একটি ভাল পাত্রী আছে। মেয়েটির বাপ নেই, মা বড়ই কষ্টে পড়েছে। মেয়েটিকে যত শীঘ্র সম্ভব কোনো সদ্‌ব্রাহ্মণের হাতে তুলে দেওয়াই মায়ের একমাত্র বাসনা। পুরুতঠাকুর চেন্নিগরায়কে উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'আরে, কি

এমন বয়স হয়েছে তোমার? বিয়েটা করে ফেল, নতুন করে ঘর-সংসার পেতে বস। পৈতৃক পাটোয়ারীগিরিটা তো হাতেই আছে, আর কি চাই তোমার? মেয়েটি কিন্তু খাসা! আর, এমন একা একা দিন কাটাবে কি করে সেটাও তো ভাবতে হবে, কি বল?'

আর বেশী বলতে হল না। চেন্নিগরায় বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করল, 'ব্যবস্থা করে ফেলুন, বিয়ে করেই ছাড়ব।'

'মেয়ের মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। যাবার সময় মেয়ের জন্য একখানা নতুন শাড়ী হাতে করে গেলে ভাল দেখাবে। তাছাড়া পাটোয়ারীগিরির রোয়াব দেখাতে চাও তো একখানা দামী শাল গায়ে জড়ানো দরকার। অন্ততঃ পঁচাত্তরটা টাকা ছাড়', বলে ফেলল অন্নাজোইস। চেন্নিগরায়েরও মনে হল নতুন বৌ পেতে হলে খরচাপাতি তো করতেই হবে। নন্‌জম্মার স্কুলের দরুন পাওয়া একশ' কুড়ি টাকা তার কোমরেই বাঁধা আছে। অন্নাজোইসও জানে এই টাকার কথা। সব জেনেই সে টোপ ফেলেছে। ওর সামনেই চেন্নিগরায় কোমরের কষি ঢিলে করে টাকা বের করে, পঁচাত্তর টাকা গুনে দিয়ে দিল পুরুতকে। কত টাকা অবশিষ্ট রইল তাও জানা হয়ে গেল অন্নাজোইসের।

পরদিনই অন্নাজোইস বাসে করে তিপটুর গেল। ফিরল যখন, চেন্নিগরায় স্বচক্ষেই দেখল তার গায়ে জড়ানো রয়েছে অন্ততঃ বিশ টাকা দামের একখানা সবুজ শাল। এতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে সে পাত্রীকেও একখানা পঞ্চাশ টাকা দামের শাড়ী দিয়ে এসেছে! দিন দুই পরে পাঁজিতে শুভক্ষণ দেখে দু'জনে মিলে তিপটুর রওনা হল। রাত্রে হোটেলে খেয়ে বারান্দাতেই শুয়ে পড়ল দু'জনে। অন্নাজোইসের নির্দেশ অনুসারে চেন্নিগরায় ফরসা ধুতি, তার পাটোয়ারীগিরির কোট, পাগড়ী সব ধুইয়ে পরিষ্কার করে সঙ্গে এনেছে। সকালে উঠে সেগুলো ইস্ত্রি করানো হল। তারপর জোইসজী পুকুরপাড়ে একটি নাপিত যোগাড় করে নিয়ে এলেন। তিনি বৈদিক ব্রাহ্মণ, তাই কোন সেলুনে প্রবেশ করেন না। পুকুরের ধারে বসে নাপিত চেন্নিগরায়ের মাথা পরিষ্কার করে কামিয়ে দিল, দাঁড়ি-গোঁফের ব্যবস্থাও হল সেইভাবে, যাতে পাকা চুল বা পাকা দাড়ির চিহ্নমাত্রও কোথাও না থাকে। তারপর স্নান করে, কোট, পাগড়ি ইত্যাদিতে সুসজ্জিত চেন্নিগরায়কে অন্নাজোইস বলল, 'হোটেলে চল, সেখানে বড় আয়না আছে, নিজের চেহারাখানা দেখ একবার, কিরকম খোলতাই হয়েছে!'

হোটেলে বসে 'মসলা-দোসা' প্রস্তুত হয়ে না-আসা পর্যন্ত চেন্নিগরায় সামনে আয়নায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে দেখতে লাগল বসে বসে। এর আগে এত যত্ন করে সাজগোজ করেনি সে কোনদিন। সে লক্ষ্মীছাড়ি তো কোনদিন তার পোশাক এমন সুন্দর করে ইস্ত্রি করে দেয়নি! দোসা, ইড্‌লি, মৈসুর পাক ও কফি খাওয়া হল। এরপর অন্নাজোইস আট টাকা ভাড়ায় একখানা ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করে ফেলল, গাড়িটা তাদের নিয়ে গ্রামে যাবে ও সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই থেকে ওদের তিপটুরে ফিরিয়ে আনবে।

বেবিনহল্লী গ্রামটি ঘন জঙ্গলে ঘেরা, মাত্র পনের ঘর লোকের বাস সেখানে। এই পাত্রীপক্ষই একমাত্র ব্রাহ্মণ পরিবার সে গ্রামে। এদের সামান্য জমি-জমা আছে, কিন্তু বিধবা মহিলা সেগুলো ঠিকমত দেখাশোনা করতে পারে না। অগত্যা কৃষাণেরা যা হাতে

তুলে দেয় তাই নিতে হয়, তারপর ভিক্ষার ওপর নির্ভর করতে হয়। বাড়ির সামনে ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াতে এরা যেন আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়ল। মেয়েটির বয়স চৌদ্দ বছর। মা জানালেন এখনও নাকি সে ঋতুমতী হয়নি। মেয়ে দেখার আগে থেকেই তো চেন্নিগরায় রাজি হয়ে বসে আছে। এখন কন্যাকে দেখার পর আর আপত্তি করার কোন প্রশ্নই উঠল না।

অন্নাজোইস মেয়ের মাকে বোঝাচ্ছিল, 'পাটোয়ারীগিরির খাটুনি তো কম নয়, তাই ছেলের আমাদের এমন চেহারা হয়েছে, না হলে বয়স তো মোটে এই বত্রিশ বছর। নিজের বাড়ি রয়েছে, চার একর জমি-জমা আছে, তার ওপর এই পাটোয়ারী কাজ! মেয়ে আপনার রোজ খেয়ে উঠে জলে নয়, দুধে আঁচাবে, বুঝলেন!'

'বিবাহ যখন স্থির হয়েই গেল তখন আর বিলম্বে কাজ নেই' বলেই কাগজ,-কলম নিয়ে জোইস ঠিকুজি মেলাতে বসল এবং মিলেও গেল দেখতে দেখতে। 'জন্ম-পত্রিকায় বেশ মিল হয়েছে। এই বৈশাখ মাসেই শুভদিনও আছে। কিছু ঘটা করতে হবে না, ভাত আর তেঁতুলের ঝোল খাইয়ে বিয়ে দিয়ে ফেলুন', অন্নাজোইসের মুখে এই কথা শুনে মেয়ের মা ভারি খুশি, এখনই যেন তার ঘাড়ের বোঝা নেমে গেছে--এত হাল্কা লাগছে তার। চেয়েচিন্তে জিনিসপত্র যোগাড় করে সে এদের ঘি দেওয়া ভাত ও পায়েস রেঁধে খাওয়াল। পানটান খেয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে দু'জনে তিপটুরে ফিরে এসে দেখে ফিরতি বাস তখনি ছাড়বে। কিন্তু এত চট্‌পট্‌ গ্রামে ফেরার ইচ্ছা ওদের মোটেই নেই। হোটেলের খাবারের স্বাদ এখনও জিভে লেগে রয়েছে। কাল সকালে ফিরলেই চলবে! সন্ধ্যাবেলা জোইসজী কিছু কেনাকাটা করলেন, একজোড়া ধুতি ও একখানা শাড়ি---কিন্তু উনি টাকা-কড়ি আনেননি সঙ্গে, অগত্যা চেন্নিগরায়ই বের করে দিল পঁচিশটা টাকা।

চেন্নিগরায় আবার বিয়ে করছে এ খবর দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল সারা গ্রামে। নরসী বলল, 'একি পাগলামি দেখ দেখি, ঐটুকু একটা মেয়েকে বৌ বলে ভাবতে পারবে?' তার কথা শুনে সর্বক্কা বলে, 'আমাদের অমন গুণের বোনটিকেই ও শান্তি দেয়নি, এখন এই বাচ্চা মেয়েটার কপালে কি আছে কে জানে!' রেবন্নাশেট্টী একদিন তামাশা করে উস্‌কে দেয় চেন্নিগরায়কে বলে, 'বাঃ পাটোয়ারীজী, এই তো ঠিক রাজার মত কাজ, বিয়েটা চটপট সেরে ফেলুন, নইলে রেঁধে খাওয়াবে কে?' গঙ্গম্মা কিন্তু নির্বিকার, কোন উৎসাহ নেই তার। সে বলে 'আমার আর কি যায় আসে? সব ছেনালই এক জাতের, আমার সেবা তো কেউ করবে না?'

এক সপ্তাহ পরেই চৈত্র শেষ হয়ে বৈশাখ পড়ল। এই মাসেই বিয়েটা সেরে ফেলা উচিত। প্রথমা স্ত্রীর কানবালা আর নথ ঘরে আছে। চিতার ছাই ঘেঁটে মঙ্গলসূত্রের সোনাটুকুও বার করে নেওয়া হয়েছে। এখন শ'খানেক টাকা যোগাড় হলেই শুভকাজ সমাধা হতে পারে। বাড়ির গরু বিক্রী করে এ টাকাও যোগাড় হয়ে গেল। কিন্তু ও-পক্ষের ব্যবস্থা কিরকম এগোচ্ছে তা জানাতে কেউ তো আসছে না এখনও? মেয়ের মা বলেছিল তার বাপের বাড়ির দিকের একটি আত্মীয়কে এখানে পাঠাবে, তার এখনও দেখা নেই। এদিকে বিয়ের তারিখ আসতে আর মাত্র ছ'দিন বাকি। উতলা হয়ে পড়েছে

চেন্নিগরায়। জোইসজীকে জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয়, 'কি হল বুঝছি না, এখন আমার হাতে সময় নেই, তুমি নিজেই গিয়ে খোঁজ নাও।' অগত্যা চেন্নিগরায় নিজেই গেল তিপটুর, সেখানে আবার আগের মত চুল-দাড়ি কামিয়ে সাজসজ্জা করে পাত্রীর গ্রাম বেবিনহল্লীতে গিয়ে দেখে ভাবী শ্বশুরবাড়ির সামনেই বসে রয়েছে এক বৃদ্ধ। তার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে সবেমাত্র কথা বলতে আরম্ভ করেছে চেন্নিগরায় এমন সময় পাত্রীর মা বেরিয়ে এল রণরঙ্গিণী মূর্তিতে। এসেই চিৎকার শুরু করল, 'মেয়ের যদি বর না জোটে নাই জুটুক বরং হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেব, কিন্তু তোমার মত লোকের হাতে দেব না, বুঝলে?'

ভ্যাবাচেকা খেয়ে, হাঁ করে তাকিয়ে রইল পাটোয়ারী চেন্নিগরায়। মহিলা আবার শুরু করল, 'ঐ বিটলে পুরুত বর খুঁজে দেবে বলে কুড়ি টাকা নিয়েছে আমার কাছে, আর এই এক দোজবরে বুড়োবর এনে হাজির করেছে। আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি! ভাগ্যিস, ঠাকুরের কৃপায় সময় মত সব খবর পেয়ে গেছি, না হলে সর্বনাশ হত।'

'আ-আমার অপরাধটা কি মা?' বহু কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করে চেন্নিগরায়।

'অপরাধটা কি আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে! প্রথম বৌয়ের সঙ্গে কি ব্যবহার করেছ তুমি? সে বেচারী পাতা তৈরী করে পেট চালাত। সবাই বলছে তোমার পাটোয়ারী কাজের খাতা সেই লিখে দিত। আমার মেয়ে ওসব কাজ জানে না বাপু। আর কোথায় তোমার খেত-খামার আছে শুনি? বাড়িখানাও তো তোমার সেই বউই তৈরী করিয়েছে শুনছি। বাড়ি তার নামে, তার ছেলেই পাবে সে বাড়ি। বলেছিলে একটি-মাত্র ছেলে তোমার! আর গত বছর যে পৈতে হয়ে যাওয়া ছেলে আর বিয়ে হওয়া মেয়ে মরেছে, সেটা কি মিথ্যে কথা?'

'কো-কোথায় শুনলেন এত কথা?'

'কোথায় শুনলুম? তোমাদের গাঁয়েরই এক বুড়ো সন্ন্যাসী এসে বলে গেছেন। এখন বল তাঁর কথা সত্যি না মিথ্যে? তোমার বয়স মোটে বত্রিশ বছর, এটা কি সত্যি? দিব্যি করে বল দেখি?'

'দুত্তোর, তোর মায়ের ···' মহাদেবায়াজীর উদ্দেশ্যে অকথ্য গালি দিয়ে ওঠে চেন্নিগরায়।

'ছি, ছি, এত মুখ খারাপ তোমার! সেই বউকেও নাকি দিন-রাত এই সব কথা বলতে! এমন লোককে ঘরে বসিয়ে জল খাওয়ালেও পাপ হয়। দূর হয়ে যাও এখান থেকে।'

অগত্যা উঠতে হল চেন্নিগরায়কে। এ-গ্রামে আর দাঁড়াতে সাহস হল না, সোজা ফিরে এল তিপটুরে। মহাদেবায়াজীকে সমানে বিড় বিড় করে গালাগাল দিয়ে চলেছে সে। 'বুড়োর এই গাঁয়ে এসে চুগলি করে যাবার দরকারটা কি ছিল? বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপারে অমন একটু-আধটু মিথ্যে তো বলতেই হয়! ব্যাটা বজ্জাত বুড়ো, বিয়ের পথে কাঁটা দিয়ে গেছে এখানে এসে। ব্যাটার বংশলোপ হোক।' মহাদেবায়াজীর মুণ্ডপাত করতে করতে হোটেলে গিয়ে খেতে বসল চেন্নিগরায়। এত তাড়াতাড়ি গ্রামে ফেরার ইচ্ছে নেই তার। গরু বেচা টাকার অনেকটাই এখনও সঙ্গে আছে। অন্ততঃ দিন কুড়ি তিপটুরে ফূর্তি মারা যেতে পারে। দেওয়ান ছত্রের বারান্দা পড়েই আছে রাতের আশ্রয়। সারা শহরে যত হোটেল আছে সব চেখে দেখা যাবে এই ক'দিনে।

পয়সাগুলো নিঃশেষে উড়িয়ে তারপর গ্রামে ফিরে এল চেন্নিগরায়। এতদিনে নৈঋতের বর্ষা নেমেছে, লোকজন কুঁড়ে ছেড়ে ফিরে এসেছে গ্রামে। কিন্তু সে এখন যাবে কোন্ বাড়িতে? হনুমান মন্দিরে মা আছে, সুতরাং প্রথমে সেখানেই হাজির হল গিয়ে। গঙ্গম্মা তো তাকে দেখেই চিৎকার করে উঠল, 'ওরে ও মুখ্যু, হারামজাদা, পাটোয়ারীগিরি যে তোর হাতছাড়া হয়ে গেল রে!'

'কোথায় গেল মা?'

'যেদিন বৌ মরেছে তারপর থেকে তো আর হিসেবপত্তর কিছুই লেখা হয়নি। প্যাটেল-দের খাজনা দেবার সময় পার হয়ে গেছে দু'সপ্তাহ হয়ে গেল। এলাকাদার নিজে এসেছিল খোঁজ নিতে, তা তুই তো তখন গাঁয়েই নেই, কোথায় গায়েব হয়ে বসে আছিস! শুনলুম প্যাটেল শিবেগৌড় আর শিবলিঙ্গে দু'জনে গিয়ে দেখা করেছে আমলাদারের সঙ্গে। এলাকাদার পুলিশ নিয়ে এসে তোদের ঐ গুণ্ডেগৌড়ের বাড়ির তালা ভাঙিয়ে খাতাপত্তর সব শিবলিঙ্গেকে দিয়ে দিয়েছে। এখন থেকে সেই পাটোয়ারী হল।'

মুখ চুন করে বসে পড়ল চেন্নিগরায়।

'তুই না হয় একবার যা সেখানে. গিয়ে বল, আমি এসে গেছি, আমার কাজ আমায় ফিরিয়ে দিন হজুর।'

'কাকে বলব? যদি জিজ্ঞাসা করে, কোথায় ছিলুম এতদিন, তাহলে কি জবাব দেব? তাছাড়া হিসেব লিখবে কে এখন? ঐ সব ফসলের ওজনের হিসেব ··· ওরে বাব্বা!' একটা কথা মনে হওয়ায় চেন্নিগরায় চলল শিবলিঙ্গের বাড়ি। শিবলিঙ্গে পুরোন রীতিতে হিসেব লিখতে জানে কিন্তু এখনকার এই ফসলের হিসেব লেখার ব্যাপার তার কাছেও নতুন। সে তাই কম্বনকেরের পাটোয়ারীর কাছে শিখে নিয়ে সেইভাবেই হিসেব লিখছিল বসে বসে। চেন্নিগরায়কে দেখে বেশ ডাঁটের সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'এখানে কি মনে করে?'

'দেখুন শিবলিঙ্গে গৌড়জী, আমার এই পাটোয়ারী কাজ তো আপনি আগেও সামলে দিতেন, এখনও না হয় আপনিই করুন। শুধু আমাকে বছরে কতটা বর্ষাসন দিতে পারবেন সেইটে বলে দিন, আর কিছু চাই না।'

'আরে, এ-কাজ কি তুমি আমাকে দিয়েছ নাকি? যাও যাও, সরকার থেকে আমাকে এ-কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।'

'তাহলে কিছুই দেবেন না?'

'এক পয়সাও দেব না। সোজাসুজি বিদেয় হবে না কারিন্দাকে ডেকে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়াতে হবে?'

এবার বেশ অপমান বোধ করল চেন্নিগরায়। অকথ্য গালাগালটা জিভের ডগায় উঠে এলেও কোনমতে সামলে নিল সে। ব্যাটা যদি সত্যিই কারিন্দাকে ডেকে বসে তাহলে ব্যাপার সুবিধের হবে না। অগত্যা রাগে জ্বলতে জ্বলতে চুপচাপ ফিরে চলল।

পথেই মহাদেবায়াজীর মন্দির। তিনি তখন মন্দিরের বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন। ওঁকে দেখেই চেন্নিগরায় একেবারে অগ্নিমূর্তিতে সামনে গিয়ে হাজির, বলল, 'অইয়াজী, আমি

ভাবতাম আপনি সাধুপুরুষ, বিবেচক লোক। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে অন্যের নামে চুগলি করা কবে থেকে শিখেছেন বলুন তো?'

'কেন, বিয়েতে বাগড়া পড়ল বলে বড্ড রাগ হয়েছে বুঝি?' বেশ ঠাণ্ডাগলায় জিজ্ঞাসা করেন মহাদেবায়াজী। তারপর আবার বলেন, 'পাটোয়ারীর হিসেব নিজে লিখতে পারবে তুমি? জমি-জমা কোথায় তোমার? বউকে খাওয়াবে কি? বাড়ি তো নন্‌জম্মার নামে, সে তো বিশ্ব পাবে। তাছাড়া বয়স কত হল তোমার? ঐটুকু একটা বাচ্চা মেয়েকে এনে ঘর করতে কি করে?'

'এ-বাড়ি ও-বাড়ি চেয়েচিন্তে ঠিকই চালিয়ে নিতাম আমি।'

'নন্‌জম্মা কি করে সংসার চালাত তা আমরা সবাই দেখেছি। কিন্তু সব মেয়ে তো নন্‌জম্মার মত নয়? তোমার নতুন বৌ যদি শেষে ঐ নরসীর পথ ধরে তখন কি করবে?'

এ-কথার কোন জবাব দিতে পারে না চেন্নিগরায়। কিন্তু তাহলেও রাগ তার পড়েনি এখনও। মহাদেবায়াজী এবার বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'নিজের স্বভাবটা নিজেই বিচার করে দেখ একবার। কোন কাজ-কর্ম করাই তোমার দ্বারা হবে না, সুতরাং চুপচাপ সন্ন্যাসীর মত থাক। যদি কিছু সত্যিই করতে চাও তো এখন বিশ্বর জন্যই করা উচিত। শিবলিঙ্গের বাড়ি গিয়েছিলে নাকি? কি বলছে সে?'

'বর্ষাসনের এক পয়সাও দেবে না, সাফ বলে দিয়েছে।'

আর কিছু বললেন না মহাদেবায়াজী। প্যাটেল শিবেগৌড় প্রায় ওঁরই বয়সী। শিবলিঙ্গে তার চেয়ে বছর দশেকের ছোট। কিন্তু এদের দু'জনের ভাব দেখে মনে হয়, বয়স যেন এদের আর বাড়ছে না। যাক্, চিরদিন কারও একরকম যায় না—ভাবলেন মহাদেবায়া। তাঁর থলি থেকে পান-সুপারি নিয়ে চিবোতে চিবোতে চেন্নিগরায় মায়ের কাছে ফিরে গেল।

এরপর আরো আট দিন গ্রামেই রইল চেন্নিগরায়। অন্য গরুটা এবং বাড়ির সব বাসনপত্র বেচে ফেলল। নন্‌জম্মার নথ আর কানবালাও তুলে দিল কাশিমবদ্দির হাতে। তারপর দু মাস কেউ আর গ্রামে তাকে দেখতে পেল না।

জীবনে আর কি আছে? মহাদেবায়াজীর মত সন্ন্যাসী হওয়াই ভাল, এই স্থির করে গ্রামে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল মালেকল্লু তিরুপতি। অরসিকেরের বাজারে কেনা গেরুয়া রঙের ধুতি আর জামা পরে, তিরুপতির মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে সে নিজের মনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করে ফেলল। সন্ধ্যার দিকে বেশ খিদে পাওয়ায় পাহাড় থেকে নেমে এক গ্রামে ঢুকে সংগ্রহ করল ভিক্ষান্ন—ভাত, ডাল, লোন্দা সবই জুটে গেল। একটা বাড়ির বারান্দায় রাত্রে শোবার অনুমতি চাওয়ায় গৃহস্থ তাকে পান-তামাক পর্যন্ত খাওয়াল শ্রদ্ধা-ভরে। সন্ন্যাসজীবন নেহাত খারাপ নয় দেখা যাচ্ছে!

কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতে এ জীবনে বিতৃষ্ণা ধরে গেল তার। এই দু'মাসে মেটিকুরিকে, কানকাট্টে, হুলিয়ারু, বুদালু প্রভৃতি গ্রামে ভিক্ষা করে চালিয়েছে। কিন্তু রোজ এত হাঁটাহাঁটি আর ভাল লাগছে না। সন্ন্যাস গ্রহণ করে বিভিন্নজাতের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার সময় ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দেওয়া চলে না। কেউ কেউ যখন

বলে, 'হাত-পা আছে, খেটে খেতে পার না?' তখন ইচ্ছে হয় গালে এক চড় বসিয়ে দেয় লোকটার।

হতাশ হয়ে ভাবে গ্রামেই আবার ফিরে যাবে। কিন্তু কে আছে ওর সেখানে? কোন আকর্ষণ নেই। সে লক্ষ্মীছাড়ী বেঁচে থাকলে কত ভাল হত। আবার ভাবে, আর কেউ না থাক মা তো ত্যাগ করবে না? শেষ পর্যন্ত একে ওকে পথ জিজ্ঞাসা করে করে আবার একদিন গ্রামেই ফিরে আসে চেন্নিগরায়।

গঙ্গম্মা সেই হনুমান মন্দিরেই বাস করছে। সে এখন একাই যায় গ্রাম পর্যটনে। ভিক্ষা সে ভালই পায়, কিন্তু দূর গ্রাম থেকে এত জিনিস বয়ে আনতে পারে না। অপ্পন্নায়া তো আর আসবে না তার কাছে, ভাগ্যই খারাপ, শনির দশা চলেছে যেন—এইসব দুশ্চিন্তায় গঙ্গম্মার দিন কাটছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন দেখে বড় ছেলে চেন্নিগরায় এসে হাজির, অঙ্গে তার সন্ন্যাসীর বেশ। গেরুয়া ধুতি আর জামা চিটময়লা, মুখে এক ঝুড়ি দাড়ি গোঁফ কাঁচা-পাকায় মেশানো। প্রথমটা তো গঙ্গম্মা চিনতেই পারেনি বড় ছেলেকে। তারপর হঠাৎ বুঝতে পেরে, 'ওরে হতভাগা, একি মূর্তি করেছিস?' বলতে বলতে চোখে জল এসে যায় তার।

'আমার জীবনে আর কি আছে মা? তাই সব ছেড়ে-ছুড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম।'

'ওমা ছিঃ, ছিঃ, ওকি কথা? আমি কি মরেছি নাকি? আয়, ভেতরে আয়, কে দেখে ফেলবে আবার। ঐ গেরুয়া কাপড় ছেড়ে ফেল এখুনি। কাল রুদ্রন্নাকে ডেকে চুল দাড়িগুলো কাটিয়ে ফেল।'

সুতরাং সন্ন্যাস জীবন শেষ হল চেন্নিগরায়ের। মায়ে-ছেলেতে এক সঙ্গেই রইল। অপ্পন্নায়ার মত বড় ছেলে অত মোট বইতে পারে না যদিও, তবু কিছুটা সাহায্য করে। মা যখন কোন গ্রামে গিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চেয়ে বেড়ায় সেই সময়টা ছেলে কারো বারান্দায় বসে পান তামাকে মুখ ভর্তি করে মৌজ করে।

নন্‌জম্মার তৈরী করানো বাড়িটা পড়েই রয়েছে। এদিকে মন্দিরে থাকার খাটুনি যথেষ্ট—রোজ পুজোর যোগাড়, সারা মন্দির ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা। সুতরাং মা আর ছেলে যুক্তি করে নতুন বাড়ির দরজা-জানলায় ছিটকিনি ইত্যাদি লাগিয়ে ফেলল এবং তারপর একদিন নতুন বাড়িতে দুধ উথলানোর অনুষ্ঠান করে গৃহপ্রবেশ করে ফেলল গঙ্গম্মা। দুই পুরোহিতকে ডেকে খাইয়ে-দাইয়ে দু'টি করে টাকা দক্ষিণা দিয়ে প্রণাম করে বলল, 'বউ মারা গেল, এখনও তো বছর ঘোরেনি, কাজেই এর চেয়ে বেশী আর তো কিছু ঘটা করা যাবে না। তাছাড়া আমি গরীব বিধবা, সাধ্য তো বিশেষ নেই। এখন এই নিয়েই আশীর্বাদ করুন।'

গুণ্ডেগৌড়জীর যে বাড়িখানায় এত বছর নন্‌জম্মারা বাস করত সেটা এখন খালি পড়ে আছে। রামসন্দ্রের মুদ্দয়্যা গুণ্ডেগৌড়জীর সম্বন্ধী। সে গুণ্ডেগৌড়ের ছেলের কাছ থেকে ঐ বাড়িতে বাস করার অনুমতি এবং চাবি চেয়ে আনল একদিন। কিন্তু একের পর এক তিনটি প্রাণ ও-বাড়িতে প্লেগ রাক্ষসীর বলি হয়েছে, তাই চট করে ও-বাড়িতে ঢুকতে সাহস হল না তার। কোন ভাল পুরোহিত ডেকে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করানো দরকার। তাই উপস্থিত মুদ্দয়্যা নিজের ভাঙা-ঘরেই থেকে গেল এবং ও-বাড়ির দরজায় তালা ঝুলতে লাগল।

ষোড়শ অধ্যায়

এই গ্রামে জীবনের পঁয়তাল্লিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন মহাদেবায়াজী। জীবনের গোড়ার দিকে উনি মনে মনে স্থির করেছিলেন, একা থাকবেন, কারো সাহচর্য, বন্ধুত্ব কিছুই প্রয়োজন নেই তাঁর। কিন্তু যত দিন কেটেছে পরিচিতের গণ্ডিও ততই বেড়েছে। আশে-পাশের সমস্ত গ্রামের লোক তাঁকে চেনে। কিন্তু উনি নিজে কারো সঙ্গেই অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা করেন না, অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতেও যাননা। তাই কখনো কোন ঝঞ্ঝাটেও পড়তে হয় না ওঁকে। বরং যেখানে উনি থাকেন সে জায়গায় অন্যেরাও বেশ ঝগড়া-বিবাদ ভুলে থাকে। একবার মনে ব্যথা পেয়ে গ্রাম ছেড়ে কাশী চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই তীর্থ-ক্ষেত্রেও শেষ পর্যন্ত মন বসেনি, আবার ফিরে এসেছেন এই গ্রামে। এখানে এমন কি আছে যা কাশীতে পাওয়া যায় না? ওদিকের জল হাওয়া অন্যরকম, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু শুধু সেই কারণেই কি উনি কাশী ছেড়েছিলেন? ভাষা নিয়ে তো অসুবিধা ছিলই না। হিন্দী উনি ভালই জানেন। জঙ্গমবাড়ি মঠে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল চমৎকার! ইচ্ছা হলে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টাই ভজনপূজন করা যায় কাশীতে, কেউ বাধা দেবে না। তবু মন চাইল রামসন্দ্রেই ফিরে আসতে। এ-গ্রামের পথঘাট, মন্দির, জলাশয়, বাঁধের ঢালু পথটা যেন ওঁকে টানছিল, এ-গ্রামের মানুষগুলোও যেন ওঁর মনের অনেকখানি জুড়ে বসেছিল। মহাদেবায়াজী নিজেও বুঝতে পারেন না কেন এই গ্রামটির প্রতি তিনি এমন অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করেন।

কাশী থেকে ফিরে আসার পর তিনি যেন পুরোপুরিভাবেই এ-গ্রামের মানুষ হয়ে গেলেন। আশেপাশের গ্রামে ভিক্ষায় যান, দুঃখী দুর্গতকে যথাসাধ্য সাহায্য করেন আর অবসর সময়ে ভজন গেয়ে সময় কাটান। কিন্তু আজকাল সময় যেন আর কাটতে চায় না। আজকাল কেবলই ওঁর মনে হয়, এখানে আপনারজন কেউ নেই। নিজেই মনকে বোঝান, 'আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ, আপনারজন তো কোনকালেই কেউ ছিল না, তা এখন আবার আপনারজন আসবে কোথা থেকে?' তবু বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় আজকাল ওঁর। আর কি হবে এ-গ্রামে থেকে? এ-চিন্তাও মনে এসেছে দু'-এক বার। ক'দিন ধরেই ভাবছেন মহাদেবায়াজী---আর এখানে নয়, তিপটুর, তুমকুর বা অন্য যেখানে হোক, কোথাও চলে যাবেন এবার।

এরই মধ্যে একদিন অপ্পন্নায়া এসে হাজির। এ গ্রামে তারও কোন আকর্ষণ নেই। বৌদির মৃত্যুর পর থেকে এ-গ্রামে যেন টিকতে পারে না সে। সেই জন্যই এবার বহু-দিন বাইরে বাইরে ঘুরেছে। ভিক্ষা মন্দ হয়নি---দেড় পল্লা চাল, বিশ সের ডাল, দশ সের

লঙ্কা, মশলার গুঁড়ো ইত্যাদি মালপত্র এনে সে নামিয়ে রাখল বীরেগৌড়ের বারান্দার ঘরখানাতে। নিজেই রান্না করে খেতে লাগল। সারা গ্রামে অইয়াজী ছাড়া আর কারো সঙ্গেই মেশে না সে। রোজ খেয়েদেয়ে মন্দিরে এসে বসে। যা নিয়েই কথা শুরু হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত বৌদির প্রসঙ্গই ওঠে। অপ্পন্নায়া প্রায়ই দুঃখ করে, 'আমার ঐ হারামজাদা দাদাটি অনেক জ্বালিয়েছে তাকে, শেষ পর্যন্ত মরিয়ে ছাড়ল।'

একদিন মহাদেবায়াজী বললেন, 'যা হবার হয়ে গেছে, ও নিয়ে ভেবে কি করবে? এখন দুই ভাই মায়ের কাছে এক সঙ্গেই থাক।'

'ও-বাড়ির সর্বনাশ হয়ে গেছে। ঐ ছেনালের সঙ্গে আবার কেন থাকতে যাব আমি? পুরুষমানুষ আমার ভাবনা কি? আমার ঘরে এসে দেখে যান ভিক্ষা করে কেমন ধপধপে সাদা চাল এনেছি দেড় পল্লা।'

মহাদেবায়া চুপ করে গেলেন। প্রায় কুড়ি দিন গ্রামে রইল অপ্পন্নায়া, কিন্তু এর মধ্যে একবারও মা বা বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল না। ওদের নাম শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে সে। এ-গ্রামে একটুও ভাল লাগে না তার। শুধু শুধু এখানে বসে থেকে লাভ কি? আশেপাশের গ্রামে মা আর বড় ভাই ভিক্ষা করে বেড়ায়। সেসব জায়গায় আবার চাইতে গেলে ভিক্ষা মিলবে না নিশ্চয়। সুতরাং একদিন নিজের আস্তানায় তালা লাগিয়ে আবার সে বেরিয়ে পড়ল দূর দূর অঞ্চলে পর্যটনের উদ্দেশ্যে।

সেই দিনই রাত্রে শুয়ে শুয়ে মহাদেবায়াজী ভাবছিলেন নন্‌জম্মার জীবন-নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের কথা। সেই কোন বালিকা বয়সে বধূবেশে এসেছিল এ-গ্রামে। শ্বশুরবাড়ির কত নির্যাতন সয়েছে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলল, আলাদা সংসার পাতল, ছেলের উপনয়ন, মেয়ের বিয়ে সব কর্তব্য করল। তারপর হারাল দুই সন্তান, সেই অসহ্য শোক সহ্য করল নিঃশব্দে, তারপর একদিন নিজেই বিদায় নিল এ পৃথিবী থেকে। প্রত্যেকটি ঘটনা ছবির মত স্পষ্ট ফুটে উঠছে স্মৃতির পটে। একটু একটু করে এই পরিবারটি মহাদেবায়াজীর একান্ত আত্মীয় হয়ে উঠেছিল, এই কথাটা আজ স্পষ্ট করে অনুভব করছিলেন তিনি। সমস্ত বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। এই পরিবারের একটিমাত্র আশার প্রদীপ এখন বিশ্ব। বিশ্ব ওঁর কোলে বসে ভিক্ষান্নের ভাত খেত, বড় ভালবাসত অইয়াজীকে। কি বুদ্ধি! সিংহশিশুর মত সাহসী ছেলে। ভাল করে লেখাপড়া শিখলে খুব উন্নতি করবে। নন্‌জম্মার কত সাধ ছিল ছেলেকে ভাল করে মানুষ করবে। সেই জন্যই তো মামার বাড়ি পাঠাল। কে জানে কেমন আছে ছেলেটা। এখন বোধহয় আর তত দুষ্টুমি করে না। মামা মামী তো নিঃসন্তান, তবুও ছেলেটাকে যত্ন করে কিনা কে জানে! এ-গ্রাম ছেড়ে যাবার আগে নাগলাপুরে গিয়ে বিশ্বকে দেখে আসতেই হবে।

২

দিন দুই পরে একলা মন্দিরের বারান্দায় বসেছিলেন মহাদেবায়াজী, এই সময় তাঁর কাছে এসে বসল নরসী। তার মুখে বেদনা ও উদ্বেগের চিহ্ন বড় স্পষ্ট। মহাদেবায়াজী জিজ্ঞাসা

করলেন, 'কি খবর বলত মা? সাত-আট দিন গ্রামে দেখতে পাইনি, কোথাও গিয়েছিলে নাকি?'

'শান্তিগ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম।'

'তোমাকে বড় চিন্তিত দেখছি যেন?'

'কি বলব অইয়াজী। কাল নাগলাপুরের বাঁধের ওপর দিয়ে আসতে আসতে বিশ্বর সঙ্গে দেখা হল। তাকে দেখে চোখে জল এসে গেল আমার।'

মহাদেবায়াজী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কেমন দেখলে তাকে?'

'কেমন দেখলাম? অমন গোলগাল সুন্দর ছেলেটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জল নিতে এসেছিল, হাতে একটা ঘড়া। গাড়ির মধ্যে আমাকে দেখেই চিনতে পেরেছে। কিন্তু এত রোগা হয়ে গেছে যে, আমিই ওকে চিনতে পারিনি প্রথমটা। তারপর বুঝতে পেরেই গাড়ি থামিয়ে নিচে নামলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছিস বাবা?" তারপর বাছার সে কি কান্না। কত বোঝাই, কিছুতে আর কান্না থামে না। আমাকে বলে, "আমায় নিয়ে চল তোমার সঙ্গে।" কিন্তু আপনিই বলুন, নিয়ে আসা উচিত হত কি? আরো কত কথা বলল। তারপর, দেরী হলে মামী মারবে বলে তাড়াতাড়ি জল ভরতে চলে গেল। ঐটুকু ছেলেকে জল নিতে পাঠিয়েছে সেই লক্ষ্মীছাড়ি।'

'তা কল্লেশজোইসকে তো চেন তুমি। গাঁয়ে ঢুকে তার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বললে না কেন?'

'ছেলেটা চলে যাবার পর, গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমি খোঁজ নিয়েছি। পুকুরে একটি বৌ কাপড় কাচছিল। তাকে বললুম, "আমি রামসন্দ্রে থাকি, ওটি আমাদের গাঁয়ের ছেলে, কল্লেশজোইসের কাছে থাকে। তা তিনি ওকে দেখাশোনা করেন তো?" তখন বউটি অনেক কথাই বলল। সে কল্লেশদেরই পড়শী। বিশ্বকে দিয়ে বাড়ির সব কাজ করায়, কল্লেশের বৌ নিজে খায় চালের রুটি আর বিশ্বকে দেয় মড়ুয়ার রুটি। তাও যে সব দিন খেতে দেয়, তা নয়। ওকে দিয়ে কাপড় কাচায় পর্যন্ত। তারওপর প্রায়ই নাকি হাতা-খুন্তি দিয়ে পেটায় ছেলেটাকে।'

'কল্লেশজোইস জানে এসব?'

'সে কিছুই করে না। মেজাজ ভাল থাকলে, কোনদিন হয়ত বাজারে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি কিনে দেয়, আবার রাগ হলে উনুনের কাঠ তুলে তাই দিয়ে মারে। তাছাড়া মেয়েরা বাড়ির মধ্যে কখন কি করছে অত খোঁজ রাখার সময় কোথায় পুরুষ মানুষের।'

আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না মহাদেবায়াজী। মা-মরা ছেলেটা মামার বাড়িতে খুব আনন্দে আছে, এটা অবশ্য কখনই ভাবেননি মহাদেবায়াজী, কিন্তু তার দুর্গতি যে এই পর্যায়ে পৌঁছেছে এটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। কল্লেশের স্ত্রী অতি নীচ স্বভাবের স্ত্রী-লোক এটা তিনি আগেই শুনেছিলেন। কিন্তু নিজের বোনের ছেলের দেখাশোনা করার দায়িত্ব তো কল্লেশেরই। তার বুদ্ধিশুদ্ধি যদি ভাল হত তবে না নিজের দায়িত্ব বুঝত—ভাবছিলেন মহাদেবায়াজী। নরসী হঠাৎ বলে ওঠে, 'অইয়াজী, একটা কথা বলব, শুনবেন?'

'বল মা।'

'আমার কোলে তো সন্তান দিলেন না ঠাকুর। এই ছেলেটাকে আমার কাছে এনে দিন না অইয়াজী। পেটের ছেলের মত যত্ন করব আমি। আমার দোকান, টাকাকড়ি সব ওকেই দেব। যখন মরণের মুখে গিয়ে পড়েছিল, তখন তো আমার কোলেই দিয়েছিলেন ওকে, আর বেঁচেও গিয়েছিল সেবার। ওর মা-ও বলেছিল, "নরসী, ও আমার ছেলে নয়, ওকে তুই-ই মানুষ কর।" আপনি নাগলাপুর গিয়ে নিয়ে আসুন বিশ্বকে, আমি বুক দিয়ে আগলে রাখব, ছেলের এতটুকু অনিষ্ট হতে দেব না।'

শেষ পর্যন্ত মহাদেবায়াজীকে নিজের প্রস্তাবটা ভেবে দেখতে বলে তখনকার মত বিদায় নিল নরসী।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন মহাদেবায়াজী। রাত্রেও ঘুম এল না। নন্‌জম্মার রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে বলা কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। সেই মধ্যরাত্রিতে, তাঁর নিষেধ না শুনে নন্‌জম্মা শেষ বারের মত তার যা কিছু বলার ছিল সব কথা বলেছিল তাঁকে—'পার্বতী আর রামন্নার মৃত্যুর পর আপনি আমায় মা-যশোদার গল্প শুনিয়েছিলেন। ছেলের মৃত্যু দেখেও যশোদা জলে ঝাঁপ দিতে পারেননি। আমিও ডুবতে গিয়েছিলাম শ্মশানের পুকুরে, কিন্তু বিশ্বর কথা ভেবে মরতে পারিনি। আজ সত্যি মরতে বসেছি, কে দেখবে বিশ্বকে এখন? যতদিন অক্কম্মা আছে খেতে পাবে, কিন্তু খাওয়াই তো সব নয়। আমার ভাইয়ের ওপর কোন ভরসা নেই। ছেলেকে মানুষ হতে হবে ত?'

প্রত্যেকটি কথা মনে আছে মহাদেবায়াজীর। অক্কম্মা বেঁচে থাকলে অবশ্য খাওয়া-পরার কষ্ট থাকত না বিশ্বর। মামীও এত অত্যাচার করতে পারত না। কিন্তু নাতনীর পিছু পিছু সেও তো চলে গেল। 'ছেলেটাকে মামার সঙ্গে পাঠাবার সময়ই এসব কথা ভাবা উচিত ছিল, আমারও বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে' নিজেকেই মনে মনে দূষতে থাকেন মহাদেবায়াজী। কিন্তু এখন কি করা উচিত? নরসী চাইছে নিজে থেকেই তার কাছে কি এনে রাখা যায়? মামার বাড়ির চেয়ে ঢের বেশী যত্নে থাকবে। নরসীর যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে, দোকানও ভালই চলে। কিন্তু নন্‌জম্মা বেঁচে থাকলে ছেলেকে নরসীর সংস্পর্শে আসতে দিত কি? তার ঘরে, শোনা যায় প্রতি রাত্রে নতুন নতুন পুরুষ রাত কাটাতে আসে। নন্‌জম্মা বলেছিল 'খেতে পাওয়াটাই আসল নয়, ছেলেকে মানুষ হতে হবে।' কিন্তু মানুষ করবে কে? জন্মদাতা বাপের যোগ্যতা তো জানাই আছে। কাকাও তো ঐরকম। ঠাকুমা গঙ্গম্মার যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকত তাহলে সংসারের আজ এ অবস্থা হত না। কিন্তু তাহলে এখন ছেলেটার দায়িত্ব কে নেবে?

সাত-আট দিন ধরে এই এক চিন্তায় ডুবে রইলেন মহাদেবায়াজী। হঠাৎ এক রাত্রে শুয়ে শুয়ে যেন পথ দেখতে পেলেন একটা। 'আমি তো এ গ্রাম ছেড়ে চলেই যাচ্ছি, বিশ্বকেও সঙ্গে নিয়ে গেলেই হয়? আমার ভিক্ষান্নেই পেট চলবে দু'জনের। আমিই স্কুলে পড়াব ওকে। এত বুদ্ধি ছেলের, ইংরিজী স্কুলে তো পড়াতেই হবে, যতদূর পারি পড়াব। তাই ঠিক হবে।' ভাবতে ভাবতে আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠলেন সন্ন্যাসী।

কিন্তু আবার চিন্তা আসে মনে, 'আমারও তো বয়স কম হল না। হঠাৎ যদি নিজেই মরে যাই তখন কে দেখবে বিশ্বকে?' কিছুক্ষণ ভেবে সিদ্ধান্ত হল, 'নাঃ ছেলেটার

বুদ্ধিশুদ্ধি যথেষ্ট, যদি মরেও যাই, ও দিন-মজুরী করেও নিজের পেট চালিয়ে নেবে। কিন্তু মামা-মামীর কাছে যে বিভীষিকাময় জীবন-যাপন করছে তার থেকে ওকে উদ্ধার করা দরকার। আমার আয়ু কত কে জানে? আমার নাতনীর বয়সী নন্‌জম্মা, সে কেমন হঠাৎ চলে গেল আর আমি দিব্যি পাথরের মত অক্ষয় হয়ে রয়েছি। বিশ্ব বড় না হওয়া পর্যন্ত মরব না আমি কিছুতেই!'

৩

কটিগেহল্লীতে রাত্রে বিশ্রাম করে পরদিন সকালে মহাদেবায়াজী নাগলাপুর পৌঁছে গেলেন। বেলা তখন প্রায় দশটা। পথে নদীতে স্নান সারা হয়ে গেছে। পরিধানে গেরুয়া ধুতি আর জামা। মাথায় লাল কাপড়ের পাগড়ি বেঁধে কপালে ভস্ম বিভূতির রেখা টেনে সোজা গিয়ে হাজির হলেন স্কুলে। একটু পরে টিফিনের ঘন্টা বাজতেই ছেলেরা বাইরে বেরিয়ে এল, তাদের মধ্যে ছিল বিশ্বও। মহাদেবায়াজীকে দূর থেকে দেখেই চিনেছে সে। ছুটে এসে 'অইয়াজী' বলে জড়িয়ে ধরল ওঁকে।

মহাদেবায়াজী ওর হাত ধরে স্কুলের পিছন দিকে একটা বট গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। নরসী মিথ্যা বলেনি, ছেলেটা একেবারে রোগা কাঠির মত হয়ে পড়েছে। উনি বললেন, 'কিরে, আমার সঙ্গে যাবি?'

'গাঁয়ে নিয়ে যাবে আমাকে?'

'যে কোন একটা গাঁয়ে যাব, তুই চল আমার সঙ্গে। খুব বড় একটা জায়গায় যাব আমরা। আমি ভিক্ষা করে আনব, আর তুই স্কুলে পড়বি। অনেক লেখাপড়া শিখতে হবে তো? যাবি কি না বল?'

'যাঃ, তুমি ঠকাচ্ছ আমায় অইয়াজী।'

'নারে, একদম সত্যি কথা বলছি।'

'দিব্যি করে বল দেখি!'

'তোর দিব্যি বাবা', বিশ্বর মাথায় হাত রেখে বলেন মহাদেবায়াজী।

'চল তাহলে, এক্ষুণি এখান থেকে পালাই।'

'না, আগে বাড়ি যা, মামাকে জিজ্ঞাসা কর।'

একথা শুনেই কেঁদে ফেলল বিশ্ব। হতাশভাবে বলল, 'তাহলে আর যেতে দেবে না আমাকে।'

'প্রথমে একবার বলে দেখ। যদি রাজি না হয় তখন কাল আবার আমি এইখানে আসব আর এখান থেকেই সোজা তোকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব।' অনেক করে বোঝানোর পর শেষ পর্যন্ত বিশ্ব মামাকে জানাতে রাজি হল।

বিশ্বকে আগে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে প্রায় দশ মিনিট পরে মহাদেবায়াজী পথের লোকের কাছে হদিশ জেনে নিয়ে কল্লেশের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন। কল্লেশ তখন ভাগ্নেকে গালিগালাজ করছিল, 'এই হারামজাদা, বাড়ি ফিরতে এত দেরী হল কেন?' হঠাৎ মহাদেবায়াজীকে দেখে চুপ করে গেল সে।

মহাদেবায়াজী কল্লেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন এরই মধ্যে একটা বিরাটাকৃতি লাল ঘোড়া এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। দেখা গেল কন্ঠীজোইসজী নামছেন ঘোড়া থেকে। সেই অক্কম্মার শ্রাদ্ধের পর বেরিয়েছিলেন, আজ ফিরে এলেন। যাওয়ার আগেই শুনে গিয়েছিলেন যে বিশ্ব কল্লেশের কাছেই থাকবে। এতদিনে হঠাৎ বোধহয় নাতিটাকে এক-বার দেখার ইচ্ছে হয়েছে তাই চলে এসেছেন। বাড়িতে ঢুকে আগে বিশ্বকে ডেকে তারজন্য আনা মিষ্টির প্যাকেট তার হাতে তুলে দিলেন, তারপর মহাদেবায়াজীর সঙ্গে রামসন্দ্রের ও নন্‌জম্মার বাড়িটার সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করলেন। কল্লেশ এসে মহাদেবায়াজীকে জিজ্ঞাসা করল 'আপনি কি স্বপাকে খাবেন? না হলে কোনো স্বজাতীয়ের বাড়িতে ব্যবস্থা করতে পারি।'

'তাই বলে দাও' উত্তর দিলেন মহাদেবায়াজী।

কল্লেশ বিশ্বকে বলল মল্লশেট্টীকে ডেকে আনতে। মল্লশেট্টী এসে আহারের জন্য মহাদেবায়াজীকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। মল্লশেট্টীর স্ত্রী তাড়াতাড়ি রাঁধতে বসল অতিথির জন্য। সেই অবসরে মহাদেবায়াজী মল্লশেট্টীর সঙ্গে আলাপ জুড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, কল্লেশের বাড়িতে বিশ্বর দেখাশোনা ঠিক মত হয় তো?' মল্লশেট্টী জবাব দিল, 'শিব, শিব! ছেলেটা কি করে বেঁচে আছে সেটাই আশ্চর্য, ওভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না।' মল্লশেট্টীর স্ত্রীও সায় দিল স্বামীর কথায়।

'শেট্টীজী, আপনি কন্ঠীজোইসজীকে একবার এখানে ডেকে আনতে পারবেন?'

মল্লশেট্টী গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই কন্ঠীজোইসজীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। মল্লশেট্টী তাড়াতাড়ি মাদুর পেতে বসাল ওঁকে। মহাদেবায়াজী এবার কন্ঠীজোইসজীকে খোলাখুলি বললেন, কেন তিনি এসেছেন এ গ্রামে। তারপর মল্লশেট্টীদের দেখিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস না হয় এদের জিজ্ঞাসা করুন। গ্রামের অন্য লোকেদের কাছেও খোঁজ নিতে পারেন। অমন নধরকান্তি ছেলের কি চেহারা হয়েছে সে তো নিজের চোখেই দেখলেন আপনি। আপনার পুত্রবধূর স্বভাবও আপনার অজানা নয়। ছেলেটাকে আপনি আমার কাছে দিন, আমি কথা দিচ্ছি ওকে বিদ্বান, বুদ্ধিমান করে মানুষ করে তুলব।'

কন্ঠীজোইসজীর অসহ্য রাগ হল। সম্ভব হলে পুত্রবধূকে হয়ত এখনই খুন করে ফেলতেন কিন্তু মহাদেবায়াজী তাঁকে বোঝালেন যে বউকে মারধোর করে কোন লাভ নেই। তার স্বামীও তাকে এতদিনে শায়েস্তা করতে পারেনি। তাছাড়া ছেলেপিলে কিভাবে মানুষ করতে হয় তা কল্লেশ নিজেও বোঝে না। কাজেই এখন বিশ্বকে ওঁর সঙ্গে যেতে দিলেই তার মঙ্গল হবে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কন্ঠীজোইস জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি করবেন ওকে নিয়ে গিয়ে?'

'কি করব, কোথায় থাকব তা আমি নিজেই এখনও জানি না। যদি আমার ওপর আপনার বিশ্বাস থাকে তাহলেই নিশ্চিন্ত মনে ছেলেকে আমার হাতে দিন।'

চট করে কোন উত্তর দিতে পারলেন না কন্ঠীজোইসজী। তাঁর রাগ পড়েনি তখনও। তিনি ভাবছেন, 'আমি ছেলের দাদামশায় বেঁচে রয়েছি, মামা কল্লেশ রয়েছে—আর এই

সন্ন্যাসী এসে বলে কিনা, তোমরা ছেলেকে মানুষ করতে পারছ না, আমার হাতে দিয়ে দাও!' কতটুকু ক্ষমতা এর? মহাদেবায়াজীকে কিছু কড়া কথা শোনাতে উদ্যত হয়েও শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নিলেন কন্ঠীজোইস। প্রায় দশ মিনিট বসে রইলেন মৌন-ভাবে। কল্লেশের সংসারের কথা মনে পড়ল,—'বউটা সত্যিই বড় খারাপ। ছেলেটা খেতে না পেয়ে আধমরা হয়ে পড়েছে। কল্লেশও যথেষ্ট মারধোর করে এটাও ঠিক। যদি আমি সঙ্গে নিয়ে যাই কেমন হয়? কিন্তু আমার কাছে কি শিখবে? ঐ মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক আর ঘোড়ায় চড়া? না, না, ছিঃ, ওসব শিখে দরকার নেই। আমরা ওকে ঠিকমত মানুষ করতে পারব না। মহাদেবায়াজী ভাল লোক, নন্‌জু বলত দেবতুল্য মানুষ।'

কন্ঠীজোইস এবার কথা বললেন, 'আচ্ছা দেখুন, আমি তো আজ দৈবক্রমে এখানে এসে পড়েছি। আমি না এলে আপনাকে কল্লেশের সঙ্গেই কথা বলতে হত। সে যদি রাজি না হত তো কি করতেন আপনি?'

'কিন্তু এখন তো আপনি স্বয়ং উপস্থিত রয়েছেন, সে কথায় আর প্রয়োজন কি?'

'এমনিই কৌতূহল হচ্ছে। বলুন না কি করতেন?'

'সত্যি বলব? আগামীকাল তাহলে স্কুল থেকেই ছেলেটার হাত ধরে সোজা রওনা হয়ে পড়তাম। কেউ যদি পথ আটকাতে আসত তাকে উচিত জবাব দিয়ে দিতাম।'

জোইসজী কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মহাদেবায়াজীর দিকে। তারপর কাছে এসে ওঁর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠলেন, 'সাবাশ অইয়াজী, আপনি পুরুষ বটে! ঠিক আছে, নিয়ে যান ছেলেকে। আমি কল্লেশকে সব জানিয়ে দিচ্ছি।' কন্ঠীজোইস কথা শেষ করেই ফিরলেন বাড়ির দিকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, বেশ কিছুটা বিলম্ব করেই মহাদেবায়াজী গেলেন কন্ঠীজোইসের বাড়িতে। ততক্ষণে কল্লেশকে রাজি করানো পর্ব শেষ হয়েছে। সেইদিনই স্কুল থেকে বিশ্বর সার্টিফিকেট নেওয়া হল। পরদিন সকালে বিশ্বর জামা-কাপড় পুঁটলি বেঁধে সন্ন্যাসী তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। বিশ্বকে বললেন, 'দাদু, মামা, মামী সবাইকে প্রণাম কর বাবা।' বিশ্ব যখন নত হয়ে প্রণাম করল, কমলা একটি কথাও বলতে পারল না আর কল্লেশের চোখে জল দেখা দিল।

সন্ধ্যা থেকেই কন্ঠীজোইসজীকে কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। রাত্রে মহাদেবায়াজীর সঙ্গেই বারান্দায় শুয়েছিলেন কিন্তু বিশেষ কথাবার্তা বলেননি। নাতিকে বিদায় দেবার জন্য কল্লেশের সঙ্গে উনিও পুকুরের ওধারে এলেন, ঘোড়াটার লাগাম হাতে ধরা। কল্লেশকে বললেন, 'তুই ফিরে যা, আমি আর একটু পথ ওদের এগিয়ে দিয়ে ফিরব।'

ফেরার আগে কল্লেশ মহাদেবায়াজীকে বলে, 'আমি একে খুব শাসনে রেখেছিলাম। বড় দুরন্ত ছেলে। নন্‌জম্মাও বলত খুব শাসনে রাখা দরকার না হলে বিগড়ে যাবে। আপনিও শাসন করবেন, যাতে একটু ভয়-ডর থাকে মনে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বটেই। ভাস্করের অনেক হাতুড়ি পড়লে তবেই না পাথর থেকে শিবমূর্তি গড়ে ওঠে? তবে কিনা কোথায় কখন ঘা দিতে হবে তার সীমাটা বোঝা উচিত। যাক তুমি যা করছিলে ভাল ভেবেই করছিলে। যেতে দাও ওসব কথা।'

মহাদেবায়াজীর জবাব শুনে মুখ চুন হয়ে গেল কল্লেশের। সে আর একটিও কথা না বলে ফিরে গেল। ওরা তিনজনে ঘোড়াটা নিয়ে আরো কিছুদূর ধীরে ধীরে চলবার পর মহাদেবায়াজী বললেন, 'কন্ঠীজোইসজী, আপনি এবার ফিরে যান, আমরাও জোর কদমে চলতে শুরু করে দিই।'

জোইসজী যেন কিছু বলতে চান, অথচ কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। মহাদেবায়াজীও দাঁড়িয়ে গেলেন। দু'জনের মাঝখানে ছোট্ট বিশ্ব। মিনিট পাঁচেক সবাই চুপচাপ। অবশেষে মৌন ভঙ্গ করে মহাদেবায়াজী বললেন, 'আমরা চলি তাহলে?' কন্ঠীজোইস এবার মহাদেবায়াজীর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'অইয়াজী, আপনিই জিতলেন। মানুষের মত মানুষ আপনি!'

কথাটার মর্মার্থ না বুঝে মহাদেবায়াজী একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলছেন?'

'না, ও কিছু না। যাক, এই নিন', নিজের পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে কন্ঠীজোইস ওঁর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'যেখানেই যান, আমাকে একটা চিঠি দেবেন। চিঠির ওপর, "নাগলাপুরের কন্ঠীজোইস, মসজিদের পিছনের ভূতঘর, চন্নরায়পট্টন" এই ঠিকানা লিখলেই চিঠি আমি পেয়ে যাব।' নিজের বিরাট দেহখানা নত করে এবার নাতিকে চুম্বন করলেন কন্ঠীজোইস। থাবার মত হাত দুখানা বিশ্বর মুখে মাথায় বুলিয়ে আদর করলেন একবার। তারপরেই ঘোড়ায় চড়ে ছুটিয়ে দিলেন ঘোড়াটাকে। কন্ঠীজোইসের দুচোখ অশ্রুতে ভরে গেছে এটা মহাদেবায়াজীর চোখ এড়াল না। কন্ঠীজোইস কিন্তু একবারও পিছু ফিরে তাকালেন না, ঝড়ের বেগে ফিরে গেলেন গ্রামের দিকে। বিশ্ব পিছন ফিরে দেখতে লাগল ছুটন্ত ঘোড়াটাকে। কিছুক্ষণ দেখার পর মহাদেবায়াজী ওর হাত ধরে এগিয়ে চললেন সামনের পথে।

প্রায় আধ মাইল পথ হেঁটেছেন ওঁরা। মহাদেবায়াজী লক্ষ্য করলেন বিশ্ব কি যেন ভাবছে, নিজের মনেই কথা বলছে সে, ঠোঁট নড়ছে নিঃশব্দে। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ভাবছিস রে অত?'

'দাদুর ঐ ঘোড়াটার মত একটা ঘোড়া আমাকে কিনে দেবে অইয়াজী?'

'ঘোড়া নিয়ে আমরা কি করব রে?'

'ঘোড়া দেখলেই আমার সওয়ার হতে ইচ্ছে করে। দাদু যেমন জোরে ঘোড়াটাকে ছুটিয়েছে আমি তার চেয়েও জোরে ছোটাতে পারব।'

'আর কি কি করতে ইচ্ছে হয় বল তো?'

'অনেক দূর সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হয়।'

'আর পড়তে ইচ্ছে করে না বুঝি?'

'হ্যাঁ, তাও করে। আমাদের ক্লাসে আমিই তো অঙ্কতে ফার্স্ট হই।'

'আর কিসে কিসে ফার্স্ট হোস শুনি?'

'মামার বাড়িতে পড়াই হয় না, না হলে তো সব কিছুতেই ফার্স্ট হতে পারতুম। মাস্টার-মশাইও সেই কথাই বলেন।'

'এখন থেকে খালি লেখাপড়া করবি। বই, স্লেট যত চাই সব এনে দেব।'

'আমাদের গ্রাম থেকে কোথায় যাব আমরা?'

'সেটা এখনও ভেবে দেখিনি। গুব্বী নয়ত তুমকুরের দিকে যাব।'

'অইয়াজী, যেখানে যাব সেখানে একটা সাঁতার কাটার মত পুকুর থাকা চাই কিন্তু। আর মাঝে মাঝে যদি কারো একটা ঘোড়া পাই তো ঘোড়ায় চড়ব। ঘোড়ায় চড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে।'

'আচ্ছা, দেখা যাক কি করা যায়', বলতে বলতে মহাদেবায়াজী বিশ্বর মুখখানা ভাল করে লক্ষ্য করেন। ওকে দেখলেই কন্ঠীজোইসকে মনে পড়ে। একটু আগেই কন্ঠীজোইস বলেছেন, 'আপনিই জিতলেন।' এ কথার অর্থ এখনও মহাদেবায়াজী ঠিক করে বুঝতে পারছেন না।

৪

সেইদিনই রামসন্দ্রে পৌঁছে গেলেন ওঁরা। গঙ্গম্মা গ্রামের বাইরে গেছে। মহাদেবায়াজী নিজের ভাঁড়ারের সঞ্চিত মড়ুয়া, ডাল, লঙ্কা ইত্যাদি যা কিছু ছিল সব বিক্রী করে ফেললেন সন্ধ্যার মধ্যে। সব মিলিয়ে একশ' কুড়ি টাকা পাওয়া গেল। এছাড়া ওঁর কাছে চল্লিশ-খানা রুপোর টাকা আছে। কন্ঠীজোইসজীর দেওয়া দেড়শ' টাকাও সাবধানে রেখেছেন জামার ভিতর দিকের পকেটে। বাসনপত্র ও কম্বল, বিছানা বহন করার জন্য একটি মুটে ঠিক করা হল। সকালে রওনা হবার সময় বিশ্ব হঠাৎ বলল, 'অইয়াজী, আমার মা কি সত্যিই মরে গেছে?'

'হ্যাঁ বাবা।'

'আমাদের বাড়িতে গিয়ে একবার দেখব।'

'কি আছে বাবা সেখানে দেখবার?'

'না, আমি একবার যাবই' জিদ ধরে বিশ্ব।

সে বাড়ির চাবি এখন মুদ্দয়্যার কাছে এটা জানা ছিল মহাদেবায়াজীর। তিনি মুদ্দয়্যাকে ডেকে সে বাড়ির দরজা খোলালেন। বহুদিন বন্ধ পড়ে আছে বাড়িখানা, চাপা ভ্যাপসা গন্ধ, চারদিক ধুলোয় ভরা। বিশ্ব রান্নাঘরে, ধান রাখার ঘরে সব জায়গা খুঁজল, ছাদে উঠে দেখল, তারপর চিৎকার করে ডাকল, 'মা তুমি কি কোথাও নেই?' কেউ সাড়া দিল না। হতাশ হয়ে এবার নিচে নেমে এসে বলল, 'অইয়াজী, মা তাহলে সত্যি সত্যি মরেই গেছে!'

চাবি হাতে মুদ্দয়্যা পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহাদেবায়াজী উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, তোমার মা সত্যিই আর নেই।'

বিশ্ব কেঁদে ফেলল এবার। ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিয়ে উনি বললেন, 'চলো বাবা, এবার যেতে হবে আমাদের।'

নিঃশব্দে হাঁটতে শুরু করল বিশ্ব। মালপত্র নিয়ে কুলিটা চলেছে আগে আগে।

মহাদেবায়াজীর হাতে তাঁর একতারাটি। বিশ্বর এখন এত রোগা শীর্ণ চেহারা যে গ্রামের অনেকে তাকে দেখেও চিনতে পারল না। মহাদেবায়াজী কাউকেই বলেননি যে তিনি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কারণ তাহলেই লোকের নানারকম প্রশ্নের উত্তর দিতে হত। সব কথা তো সবাইকে বোঝানো যায় না, তার চেয়ে চুপচাপ থাকাই ভাল।

কম্বনকেরের পথ ধরে ওঁরা বাসের রাস্তায় এসে পড়লেন। কুলিটা অনেক এগিয়ে গেছে। মহাদেবায়াজী এখন আর জোরে হাঁটতে পারেন না। বিশ্ব তো আরো ধীরে ধীরে চলেছে, তার দৃষ্টি মাটির দিকে। হঠাৎ দেখা গেল পথের পাশে একটা গাছতলায় মড়ুয়ার বস্তায় মাথা রেখে শুয়ে আছে চেন্নিগরায়। পানের রসে মুখভরা, তাই বার বার মুখ মুছতে হচ্ছে। এদের দু'জনের পায়ের শব্দ শুনে সে উঠে বসল। মহাদেবায়াজী কোন কথা বললেন না ওর সঙ্গে। গঙ্গম্মা নিশ্চয় আশেপাশেই কোথাও আছে, এখন যদি দেখতে পায় তাহলেই চেঁচামেচি শুরু করবে, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমার নাতিকে?' মহাদেবায়াজী গোলমালের ভয়ে জোরে পা চালিয়ে দিলেন। চেন্নিগরায় কোন কথাই বলল না। বলবে কি করে? মুখভরা যে পানের রস।

বিশ্ব জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে বাবা বসে আছে না?' চেন্নিগরায়ও চিনতে পারল ছেলেকে, কথা বলবার ইচ্ছাও হল খুব। কিন্তু কথা বলতে গেলেই যে এমন চমৎকার ম'জে আসা পানের পিকটা মুখ থেকে ফেলতে হবে। আর পানও নেই এখন সঙ্গে। সুতরাং কথা বলা হল না। ততক্ষণে ওরা বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে, বিশ্ব বার বার ফিরে ফিরে দেখছে।

মহাদেবায়াজী বললেন, 'ওদিকে তাকিও না, তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল।'

মুখভরা পানের রস নিয়ে চেন্নিগরায় বসে বসে ভাবতে লাগল, 'আমাকে দেখেও সন্ন্যাসী কোন কথা বলল না কেন? ঠিক আছে, এরপর যখন দেখা হবে ভাল করে জিজ্ঞাসা করব আমাকে দেখেও না চেনার ভান করার অর্থটা কি?'

ততক্ষণে সামনের চড়াইটা পার হয়ে বিশ্ব আর মহাদেবায়াজী ঢালু পথে নামতে শুরু করেছেন। দেখতে দেখতে চেন্নিগরায়ের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন দু'জনে।

—০—

Printed by

NAYA PROKASH
206 Bidhan Sarani
Calcutta-700 006